ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

দীনেশচন্দ্র সেন

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা

GHARER KATHA O YUGA SAHITYA
by Dinesh Chandra Sen

প্রথম মুদ্রণ : ১ বৈশাখ, ১৩২৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ জুন, ১৯৬০

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু কলিকাতা ২৯
৩৩ কলেজ রো কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

এক সময়ে যাঁহাদের কাছে সুখ দুঃখের কথা না বলিলে হৃদয় জুড়াইত না, তাপ-দগ্ধ জীবনের অকথিত কথাগুলি সেই আমার স্বর্গীয় পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া বলিয়া গেলাম।

তাঁহারা স্বর্গ হইতে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় পুত্রকে আশীর্বাদ করুন, এই কামনা।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

প্রথম মুদ্রণের ভূমিকা

ভূমিকা একটা লিখিতে হয় বলিয়াই লিখিতেছি, নতুবা বক্তব্য বিশেষ কিছু নাই। দুইটি কথা বলিব, তাহা হইলেই পালা শেষ। এই পুস্তকে বহু লোক সম্পর্কে বহু কথা লিখিয়াছি, সাময়িকভাবে ভালমন্দের বিচার করিয়া গিয়াছি, কিন্তু আমার বিচারশক্তি অল্প, এজন্য ভ্রমবশতঃ যদি কাহারও মনে ব্যথা দিয়া থাকি তাঁর কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, হয়ত অনেকবার ভ্রম হইয়াছে, যতবার হইয়াছে ততবার আমি মাথা নোয়াইয়া ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; সর্বাপেক্ষা আমার লিখিবার বিপদ গিয়াছে যেখানে আত্মপ্রশংসার বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সেই অপরাধের জন্য যদি চাবুক খাইতে হয়, তাহা আমার প্রাপ্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইব।

দ্বিতীয়ত : ছাপা ও বানানের ভুল এত হইয়াছে যে তাহা একেবারে অমার্জনীয়, একে ত আমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ প্রুফ দেখিয়াও প্রুফ দেখা শিখিলাম না, ভুলগুলি আশ্চর্যরূপে আমার চোখ এড়াইয়া যায়। তারপর কাত্যায়নী প্রেসের অধ্যক্ষমহাশয় পীড়িত থাকায় সমস্ত প্রুফ আমাকে একা দেখিতে হইয়াছে, এবং অর্ডার দেওয়া প্রুফে যে সকল ভুল কাটিয়া দিয়াছি, ছাপা হইলে দেখিতে পাইয়াছি সেই ভুলের অনেকগুলি রহিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অবশ্য আমাকেই দায়ী করিবেন, এবং সেই দায়িত্ব অস্বীকার করিবার পথও আমি দেখিতেছি না। ১০৯ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্রে ১০ এর জায়গায় ১৫ হওয়াতে যে মারাত্মক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, শত শত ভুলের মধ্যে সেই একটির উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

৭নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩২৯

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' ১লা বৈশাখ ১৩২৯ সালে শিশির পাব্লিশিং হাউস কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থপ্রকাশের অল্পকাল পরেই গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠান দীনেশচন্দ্র জন্ম শতবর্ষে গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা হেতু এই পরিকল্পনা বিলম্বিত হয়।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থে নিম্নরূপে সংশোধনী মন্তব্য ছিল :

এই পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায়[১] আমার মাতার সম্বন্ধীয় মন্তব্যে পূজনীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় তৎপ্রবর্তিত স্ত্রী সর্বনামের নিয়মানুসারে 'তস্যার' এবং 'সা' এই দুইটি সর্বনামের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বস্তুত বাংলা ভাষায় স্ত্রী সর্বনাম না থাকাতে একটা বিশেষ অভাব রহিয়া গিয়াছে। ডাক্তার মহাশয় এই অভাব পূরণ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। আমি অনবধানতা বশত 'তস্যার' স্থলে 'তাঁহার' এবং সা কথার স্থলে তিনি লিখিয়া দিয়া তাঁহার রচনাটির যে একটু পরিবর্তন করিয়াছি, তজ্জন্য দুঃখিত আছি।

বানান ভুলের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, মহারাজ জগদিন্দ্রের নাম ছাপিতে বর্ণাশুদ্ধি হইয়াছে, ইহা আমার বড়ই ক্ষোভের বিষয়।[২] শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

এবং এই গ্রন্থের একটি তথ্য সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (বৈশাখ|১৩৩১, পৃঃ ১৩০) দীনেশচন্দ্রের যে চিঠি প্রকাশিত হয় তদনুযায়ী সংশোধন বর্তমান মুদ্রণে করা হয়েছে। প্রথম প্রকাশিত পুস্তকে বহুল পরিমাণে মুদ্রাকর প্রমাদ ও কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাষাগত অশুদ্ধি ছিল। বর্তমান মুদ্রণে আমরা এ সব ত্রুটিবিচ্যুতি পরিহার করতে যত্নবান হয়েছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দু-একটি ক্ষেত্রে বানানের অসঙ্গতি আছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

প্রথম প্রকাশিত পুস্তকে একটি অসম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট ছিল। বর্তমান মুদ্রণে বিস্তৃত নির্ঘণ্টটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রস্তুত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থে বিভিন্ন ব্যক্তির ছবি ও চিঠির প্রতিলিপি ছিল মোট উনিশখানি। যোগ্য উপাদানের অভাব হেতু সেগুলি বর্তমান মুদ্রণে সংযোজিত হল না। এ ত্রুটি মার্জনীয়।

ইতি—

বিনীত
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

[১] বর্তমান মুদ্রণের ৩২ পৃষ্ঠায়।
[২] বর্তমান মুদ্রণে এই ভুল শুদ্ধ হয়েছে

সূচিপত্র

প্রথম মুদ্রণের ভূমিকা ... ... [৫]
দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে ... ... [৬]
জ্যেষ্ঠ পিতামহ রমানাথ সেনের অপমৃত্যু ... ... ১—৩
পিতামহ রঘুনাথ সেন ... ... ৪—১১
সুয়াপুর গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস ... ... ১২—১৬
পিতৃদেবের আত্মীয়গণ ... ... ১৭—২২
পিতৃদেবের কথা ... ... ২৩—৩৯
শিক্ষাদীক্ষা ... ... ৪০—৪৯
গৃহে হিন্দু ও ব্রাহ্মমত। পিতামাতা ও ভগিনীদের মৃত্যু ... ৫০—৫৩
খেলাধুলা ... ... ৫৪—৬২
পড়াশুনা ... ... ৬৩—৭০
ঢাকায় ওলাউঠা ... ... ৭১—৭৪
সাহিত্যের সেবা : কৌতুক ও উৎসব ... ... ৭৫—৮৬
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ... ... ৮৭—৯১
পরীক্ষা সমস্যা ... ... ৯২—৯৪
সাহিত্যিক বন্ধুগণ, বিপদ ও গৃহত্যাগ ... ... ৯৫—৯৮
হবিগঞ্জ ... ... ৯৯—১০৩
কুমিল্লায় চাকুরী ... ... ১০৪—১২৯
কালকাতায় একমাস ... ... ১৩০—১৩৬
কুমিল্লা-জীবনের শেষাংক ... ... ১৩৭—১৫৭
ফরিদপুরে ... ... ১৫৮—১৬৬
কলিকাতায় ... ... ১৬৭—২০০
ভারতী ও বঙ্গদর্শন ... ... ২০১—২০৫
ভগিনী নিবেদিতা ... ... ২০৬—২১৫
কলিন সি. গ্যালিল্যান্ড এবং জে. ডি. অ্যান্ডারসন ... ... ২১৬—২২৪
ইংরাজীতে লিখিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ... ... ২২৫—২৩০
অপরাপর বন্ধু ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ... ... ২৩১—২৩৭
বেহালায় ... ... ২৩৮—২৪৩
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ... ... ২৪৪—২৫৪
নির্ঘণ্ট ... ... ২৫৫—২৭০

১

জ্যেষ্ঠ-পিতামহ রমানাথ সেনের অপমৃত্যু

জয়দেবোক্ত পবনদূতের প্রসিদ্ধ কবি ধোয়ীর বংশে আমার জন্ম। একখানি প্রাচীন গীতগোবিন্দের টীকায় 'ধোয়ী'—'ধূয়ী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই 'ধোয়ী' বা 'ধূয়ী' কবিকে জয়দেব দুইটি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, একটি হইতেছে 'শ্রুতিধর' আর একটি 'কবিক্ষ্মাপতি'। দ্বিতীয় বিশেষণটি দ্ব্যর্থবাচক, ইহাতে কবি যে রাজতুল্য বৈভবশীল এবং ভূম্যধিকারী ছিলেন তাহার প্রতি ইঙ্গিত আছে। পবনদূতে দৃষ্ট হয়, তিনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বন্ধু ছিলেন। হস্তী, স্বর্ণছত্র প্রভৃতি নানা মূল্যবান রাজযোগ্য উপহার দ্বারা লক্ষ্মণসেন ধোয়ী কবিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় ভরত মল্লিক উল্লেখ করিয়াছেন যে এই 'ধোয়ী' শুধু মহাকুলীন ছিলেন এমন নহে, তিনি পাণ্ডিত্য, অর্থপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতেও এত বড় ছিলেন যে সমস্ত শক্তি গোত্রের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ঐ গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিবিধ বীজপুরুষ ছিলেন, কিন্তু প্রতিভা ও পদ-গৌরবে শ্রেষ্ঠ থাকায় শক্তি গোত্রীয় বৈদ্যমাত্রেরই তিনি 'বীজী' বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকাগুলিতেও ইঁহার নাম কোথায়ও 'ধোয়ী' কোথাও 'ধূয়ী' এবং কোথায়ও 'দুহী' রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রপ্রভায় এই তিন নামই দৃষ্ট হয়। রাঘবকৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় দৃষ্ট হয়, ধোয়ীর পিতার নাম ছিল পুণ্ডরীক এবং পিতামহের নাম ছিল শ্রীবৎস।

ধোয়ীর দুই পুত্র—কাশী ও কুশলী। কুশলীসেনের পুত্র হিঙ্গুসেনকেই আমরা নিজেদের পূর্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। রাঘবকৃত পঞ্জিকায় লিখিত আছে, হিঙ্গুপুত্র অনন্তের উপাধি ছিল 'ঠাকুর', সুতরাং এই সূত্রে আমাদের কৌলিক উপাধি 'সেন ঠাকুর'। ধোয়ীর সন্তানগণের মধ্যে হিঙ্গুই কৌলীন্যে মণ্ডিত হইয়াছিলেন। ধোয়ী মহাকুলীন হইলেও তাঁহার বংশের অপরাপর শাখা কতকটা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা আর নিজদিগকে ধোযীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেই না, হিঙ্গুর নামেই এখন আমাদের পরিচয়। কিন্তু এই শাখার যাঁহারা কুল রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এখনও 'ধোয়ী', 'ধূয়ী' বা 'দুহী'র সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকেন।

আমার প্রপিতামহ রাজচন্দ্র সেন মহাশয় হিঙ্গুবংশীয়দের সর্বপ্রধান কেন্দ্র খুলনা জেলায় পয়োগ্রাম ছাড়িয়া ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রামে আসিবার অব্যবহিত পরেই ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় জ্ঞাতিগণের ষড়যন্ত্রে বিতাড়িত ও জমিদারীর অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজচন্দ্র সেনের পত্নী দুইটি শিশুপুত্র ও কন্যা লক্ষ্মীকে লইয়া পূর্বোক্ত সুয়াপুর গ্রামে তাঁহার পিতা ভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন।

বহুকষ্টে এই বিধবা রমণী তাঁহার পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে লালনপালন করেন। কন্যাটি আবার বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিধবা হন। দুই পুত্রের মধ্যে রমানাথ

জ্যেষ্ঠ ও রঘুনাথ কনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই সংস্কৃত বাংলা ও ফারসীতে ব্যুৎপন্ন হন। রঘুনাথ সেন জাতীয় বৈদ্যব্যবসা অবলম্বন করেন, এবং তাহা ছাড়া বাড়ীতে মক্তব খুলিয়া ছাত্রদিগকে বাংলা ও ফারসী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

রমানাথ সেন ছিলেন সেকালের পুলিশের দারোগা। কিন্তু পুলিশে কাজ করিলেও তাঁহার এমন অনেকগুলি গুণ ও প্রবৃত্তি ছিল, যাহা আদবেই পুলিশের কাজের সঙ্গে খাপ খাইত না। তিনি অতি সুদক্ষ চিত্রকর ছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হস্তলিখিত 'কামিনী-কুমার' পুঁথি বহুদিন আমাদের গৃহে ছিল; অক্ষরগুলি ঠিক মুক্তার মত, ও তাহার মধ্যে শুধু কালিতে আঁকা অনেকগুলি এমন সুন্দর চিত্র ছিল, যাহা দেখাইয়া এখনও আমি গৌরব করিতে পারিতাম। একখানায় কামিনী পুরুষবেশে ঘোটকারূঢ় হইয়া স্বামীর অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে সখী, তিনিও পুরুষের ছদ্মবেশে অশ্বারোহণে চলিতেছেন। আর একখানায় পুরুষবেশী 'কামিনী' রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে মৃদঙ্গ, বীণা প্রভৃতি বাদ্যের সহযোগে সখী-কণ্ঠোদ্‌ভূত একতান সঙ্গীত শুনিতেছেন। এই সকল চিত্র আমার স্মৃতিপটে এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে। পুরুষবেশী কামিনীর গণ্ডদ্বয়ে যুবতীসুলভ কমনীয়তা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; তাঁহার উষ্ণীষের কোমলতা যেন শাড়ীর শোভা আড়াল করিয়া রহিয়াছে; মধুর কোমল দেহযষ্টি অশ্বের বেগে যেন লতিকার ন্যায় কাঁপিতেছে। ঘোড়ার মুখের লাগাম তিনি কোমল করে ধরিয়া আছেন; সেইভাবে আকৃষ্ট হইয়া ঘোড়া মুখ বাঁকাইয়া পায়ের খুরে অসহিষ্ণু গতি সূচনা করিয়া চলনোন্মুখ হইয়া আছে। এই মহামূল্য পুঁথিখানি আমি বহু যত্নে রাখিয়াছিলাম। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লায় আমাদের বাসাবাড়ীতে আগুন লাগায় এত সাধের বইখানি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ত্রিশ বৎসরেও আমার সেই পুস্তক নষ্ট হওয়ার শোক কমিয়া যায় নাই। রমানাথ সেন মহাশয়ের স্ত্রী এবং আমাদের গ্রামের বৃদ্ধদের নিকট শুনিয়াছি রমানাথকৃত বহু সুরঞ্জিত চিত্র ঐ গ্রামের অনেকের বাড়ীতেই ছিল। আমি তাহার একখানিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কেবল তাঁহার হস্তলিখিত আমাদের একখানি কুলপরিচয় ও বংশাবলী এখনও আমাদের নিকট আছে, সেই বংশাবলীর চারিদিকে তাঁহার চিত্রাংকননৈপুণ্যের একটু আভাস আছে।

রমানাথ চিত্রবিদ্যা দ্বারা অবসর রঞ্জন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; তিনি নানারূপ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান দ্বারা নিজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রয়াসী ছিলেন। এই প্রচেষ্টাই তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে শীত-কালে তিনি তাঁহার বন্ধু স্বগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে গাজিখালী নদীর ধারে শবসাধনা করিতে গিয়াছিলেন। রমানাথের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী গৌরমণি দেবী তখন অষ্টাদশবর্ষীয়া। আমি তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই লিখিতেছি। রমানাথের বন্ধুর নাম মনে পড়িতেছে না, কিন্তু তাঁহার পুত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়কে আমি বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। গৌরমণি ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:—

'তখন শীতকাল, কর্তা (রমানাথ) তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যাকালে বাহির

হইয়া গেলেন। সেদিন শনিবার অমাবস্যা, কোথা হইতে দুইটি চণ্ডালের মৃতদেহ তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়া ইঁহারা সাধনা করিবেন।

'আমাদের বাড়ীতে তখন অনেক লোকজন, খাওয়া শেষ করিতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইত। সেইরাত্রি তখন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি; বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া তখনও শেষ হয় নাই। আমি বাড়ীর বৌ, আমার খাওয়ার ডাক পড়ে নাই। আমি ঘোমটা টানিয়া উনুনের পাশে বসিয়া শীতকালের আগুন পোহাইতেছিলাম। আমার বড়ই ঘুম পাইতেছিল, চক্ষে তন্দ্রা আসিয়াছিল। সেই তন্দ্রার ঘোরে স্পষ্ট দেখিলাম, একটা কালো বুড়ী আমার কাছে একটা থলে হাতে করিয়া আসিল এবং থলেটার মুখ খুলিয়া আমার মাথার উপর ঝাড়িতে লাগিল এবং বলিল—"আজ হতে পৃথিবীর যত দুঃখ তা এই থলে করে তোর মাথায় দিয়ে গেলাম।"

'আমার তন্দ্রার ঘোর ছুটিয়া গেল। যেমনই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছি, অমনই বাড়ীতে একটা ভয়ানক গোলমাল শুনিলাম, তারপর জানিলাম আমার কপাল পুড়িয়াছে। লোকজনেরা একটা বাঁশের দোলায় আমার স্বামীকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন, তাঁহার বামগণ্ডে ভয়ানক থাপ্পড়ের দাগ, পাঁচটা আঙুলের আঘাত যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, ঘাড়ের হাড় বোধ হয় ভাঙিয়া গিয়াছে, যেহেতু সমস্ত মুখখানি ডানদিকে বাঁকিয়া আছে।

'এই অবস্থায় তিনি তিন দিন জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করিয়াছেন, কোন জ্ঞান ছিল না, কোন কথা বলিতে পারেন নাই। সকলেই বলিল, শবের উপর বসিয়া জপ করিতেছিলেন—ভূতের চড়ে এই দুর্দশা হইয়াছে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর পিতাও তাহাই বলিলেন।'[১]

সাধ্বী গৌরমণি দেবী, সুদীর্ঘ বৈধব্য জীবন কর্তন করিয়া ১৮৯২ সনে ৭২ বর্ষ বয়সে কুমিল্লায় প্রাণত্যাগ করেন।

রমানাথ পুলিশের দারোগা ছিলেন। সুতরাং ভূতে মারিয়াছে কিংবা কেহ একাকী তাহাকে নির্জন স্থানে সুবিধায় পাইয়া প্রাণান্তকর আঘাত করিয়া পালাইয়াছে—সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই, যদিও গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস, ভূতের হাতেই তাঁহার প্রাণ গিয়াছে।

[১] এই ঘটনা সম্বন্ধে গ্রামের সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ মদীয় খুল্লতাত দেবীচরণ দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন—"রমানাথ শ্মশানক্ষেত্রে চিতায় বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, প্রকাশ আছে তিনি তপস্যায় স্খলিত হওয়ায়ই মৃত্যুর কারণ সংঘটিত হইয়াছিল।"

২

পিতামহ রঘুনাথ সেন

রমানাথ সেন ছিলেন আমার পিতামহ রঘুনাথ সেনের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

পূর্বেই লিখিয়াছি পিতামহ এদিকে কবিরাজী করিতেন, আর তা ছাড়া বাড়ীতে একটি মক্তব খুলিয়াছিলেন। ই'হারা দুই ভ্রাতাই যৌবনের অনেকটা মাতামহ ভবানীপ্রসাদ দাশের বাড়ীতে কাটাইয়াছিলেন। এখনও সুয়াপুর গ্রামে উক্ত দাশ মহাশয়ের বাড়ীর উত্তরে ৮।১০ কাঠা জমি খালি পড়িয়া আছে; ঐখানেই কয়েকখানি ঘর তুলিয়া রমানাথ-রঘুনাথ তাঁহাদের মাতা ও বিধবা ভগিনী সহ বাস করিতেন। সেখানে একটি দেবদারুগাছ আমরা শৈশবে দেখিয়াছি, তাহা আমার পিতামহ রঘুনাথ সেনের হস্তরোপিত ছিল।

কিন্তু রমানাথ সেনের আয়বৃদ্ধির সঙ্গে ই'হারা ঐ গ্রামের ভিন্ন স্থানে বাড়ী করিবার সংকল্প করিলেন। সুয়াপুর গ্রামের যে প্রান্তে ইতিহাসবিশ্রুত বাজাসনের ভিটা এখনও বর্ষায় বন্যাপ্লাবিত সমস্ত পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ডের মধ্যে মাথা জাগাইয়া থাকে, যে ভিটা খনন করিয়া মৃন্ময় বুদ্ধমূর্তি ও প্রাচীন অট্টালিকার ভিত্তি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই বাজাসনের পশ্চিমে ও সুয়াপুরের পূর্ব সীমান্তে ৯।১০ বিঘা পরিমিত ভূমির মৌরসী স্বত্ব লাভ করিয়া রমানাথ-রঘুনাথ স্বীয় আবাস নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।

উভয় ভ্রাতাই খেয়ালী ছিলেন। রমানাথের খেয়াল ছিল চিত্রবিদ্যা ও যোগসাধন। রঘুনাথের খেয়ালের মাত্রা আর একটু বেশী ছিল, বৃক্ষরোপণই তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত ছিল। পূর্বোক্ত ৯।১০ বিঘা ছিল একটি চতুষ্কোণ জমি। এই জমির চতুর্দিকে ঘিরিয়া তিনি আম্রবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। আমাদের সে অঞ্চলে লেংড়া, ফজলী, বোম্বাই প্রায় কোথাও দেখা যাইত না। রঘুনাথ দূর হইতে সেই সকল আমের কলম আনিয়া এই বৃক্ষ-বাটিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রোপিত আমগাছের সংখ্যা প্রায় ৪০০ শত ছিল; আমগাছের নীচে সেই বাটিকার চারিদিক বেষ্টন করিয়া তিনি গড়খাই করিয়াছিলেন, তাহা বর্ষায় জলে ভরিয়া যাইত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে আমাদের বাড়ীর যে শোভা হইত, তাহা একটা বিশাল চিত্রপটের ন্যায় আমার স্মৃতিতে দেদীপ্যমান আছে। সিন্দূর, হলুদ, কালো, কত রকম বর্ণের সহস্র সহস্র আম শাখায় দুলিতে থাকিত। ঝড় হইলে সেই গড়খাইয়ের মধ্যে সেগুলি ঝরিয়া পড়িত। সেই দৃশ্য দেখিয়া আমার বাল্মীকির 'অনেকবর্ণম্ পবনাবধূতম্ ভূমৌ পতত্যাম্রফলম্ বিপক্কম্' শ্লোক মনে পড়িত। বাড়ীর উত্তর দিকে একটি উৎকৃষ্ট বোম্বাই আমের এবং পশ্চিমে, কয়েকটি সিন্দূরে ও ফজলীর গাছ ছিল; পড়ন্ত সূর্যের আলো জ্যৈষ্ঠমাসে সেই সিন্দূরে আমের উপরে পড়িলে কি সুন্দর দেখাইত! এমন গাছ ছিল না যাহার শাখায় চড়িয়া আমি কখনও প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া, আম না পাড়িয়াছি, এমন শাখা ছিল না, যাহার সঙ্গে আমার আনন্দ, চাঞ্চল্য, ও মৃত্যুভয়ের কোনো না কোনো স্মৃতি জড়িত না ছিল। যখন ঝড় হইত, তখন বৃক্ষতলে শত শত আম পড়িয়া

সেই সুদীর্ঘ পরিখা পূর্ণ করিয়া ফেলিত। সুয়াপুরের তো কথাই নাই, নান্নার, রোঁওরা প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম হইতেও সেই ঝড়ের সময় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সিক্তবস্ত্রে গা ঢাকিয়া মেয়ে-পুরুষেরা থলে ভরিয়া আম কুড়াইয়া লইয়া যাইত। আমাদের অঞ্চলে কোনো ভদ্রলোক আম বিক্রয় করিতেন না। আমরা অধিকাংশ আম গ্রামে বিলাইয়া দিতাম। সুতরাং যাহারা আম কুড়াইত বা গাছে চড়িয়া পাড়িত, আমরা তাহাদিগকে বাধা দিতাম না। কেবল ফজলী ও বোম্বাই গাছে কাহাকেও চড়িয়া আম পাড়িতে দেখিলে বারণ করিতাম।

সেই সকল দিনের স্মৃতি আমার কাছে মধুময়। আমার ভগিনীরা খোলা চুলে অসম্বৃত বস্ত্রে বিপুল উৎসাহে আম কুড়াইয়া উঠান ভর্তি করিত। তাহাদের সর্দার ছিল কর্পূরা দিদি। সে আমাদের বাড়ীর পরিচারিকা হইলেও আমরা তাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়াই জানিতাম। কোথায় ছিল তখন ম্যালেরিয়া, প্লীহা, লিভার—রেল গাড়ীতে চড়িয়া এই সকল পীড়া এ দেশে আসিয়াছে। আমাদের শৈশবাবস্থায় ইহারা সুয়াপুরের ধারে কাছেও উঁকি মারিত না। কত যে জলঝড় সহিয়া আমরা আম কুড়াইয়াছি, কত ভেজা কাপড় যে গায়ে শুকাইয়াছে, ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যের সঙ্গে অনেক সময় সাক্ষাৎ হইত না, দীর্ঘকেশী ভগিনীদের ভেজা চুলে বালিশ আর্দ্র হইয়া থাকিত। কই, কাহারও তো কখনও মাথাটি ধরিতে দেখি নাই। আজ ছেলেদের ছাতা মাথায় সত্ত্বেও যদি বর্ষার জলবিন্দু দুই ফোঁটা মাথায় পড়ে, তাহা হইলেই তো ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিমুনিয়ার আশঙ্কায় আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। এখন ছেলেরা ব্যারামের ভয়ে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ভগবানের দান রৌদ্রবৃষ্টিকে জুজুর মত ভয় করে।

এখনও বর্ষাকালে দেখিতে পাই, বৃক্ষের শাখায় বসিয়া পক্ষিকুল বর্ষার জলে ভিজিয়া ভিজিয়া পক্ষপুট হইতে জল ঝাড়িতেছে। আমরা যে শৈশবে সেইরকম করিয়া বর্ষার অজস্র জল শরীর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতাম। বাড়িতে আসিলে মা খিচুড়ী ও দশ রকম ভাজা রাঁধিয়া দিতেন। আমাদের পল্লী-লক্ষ্মী এখন অন্তর্হিত হইয়াছেন, আমাদের বাড়ীর 'সিন্দুরে' আমে তাঁহার কপালের যে সিন্দুররাগ ফলিয়া উঠিত, সেই কি তাঁহার শেষ চিহ্ন দেখিয়াছিলাম!

আমি পিতামহের কথা ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তিনি এই চারি শত আমগাছের প্রত্যেকটি নিজ হাতে রোপণ করিয়াছিলেন। ভক্ত যেরূপ নিজহস্তে মন্দিরটি সাফ্ করেন, অপরকে সে কাজ করিতে দেন না, পিতামহ সেইরূপ গাছের কাজ মজুর দিয়া করিতে দিতেন না। কেমন করিয়া মাটি গুঁড়া করিতে হইবে, কতটুকু জল দিতে হইবে, সূর্যের কিরণ প্রখররূপে আসিয়া পড়িলে গাছের কোন্ দিকটায় একটু ঢাকা দিতে হইবে—এসকল বিষয়ের সূক্ষ্মবিচার তাঁহার ছিল। যদি মজুরেরা সেই কাজ করিত, তাহারা দুদিনের মধ্যে মারপিট খাইয়া পলাইয়া যাইত, কারণ এই ব্যাপারটিতে পানের থেকে চুন খসিলে আর রক্ষা ছিল না। এই জন্য অপরে ঐ কাজ করিলে তিনি তৃপ্তি পাইতেন না, এবং তাঁহার মনের মত কাজ করিতে গেলে বহু ত্রুটি থাকিয়া যাইত। তিনি গৃহের নিকটে কমলালেবুর চারা ও গোলাপজাম, পেয়ারা প্রভৃতি রোপণ করিয়াছিলেন, সারি সারি গুবাকপঙ্‌ক্তি প্রহরীর ন্যায় বাড়ীর ধারে ধারে দণ্ডায়মান থাকিত। এমন

বৃক্ষ ছিল না, যাহা আমাদের এই বৃক্ষবাটিকাকে শোভাসৌন্দর্যমণ্ডিত করে নাই।

এই বৃক্ষগুলির উপর পিতামহের যে যত্ন ছিল, সদ্যোজাত শিশুর উপর তাহার মাতার ততোধিক যত্ন থাকে না। একদা তিনি মৃৎপাত্রে কমলালেবুর ছোট চারা পুঁতিয়া রৌদ্রের দিকে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সেগুলি একটু বড় হইলে যথাস্থানে লাগাইবেন। আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী নাম্নী এক পরিচারিকা ছিল, সে ছোটবেলা আমাকে 'মানুষ' করিয়াছিল। সেই দাসী ঐ কমলালেবুর চারা-সম্বলিত মৃৎভাণ্ডগুলির উপর কাপড় শুকাইতে দিয়াছিল। তখন পিতামহ বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া যখন ঐ দৃশ্য দেখিলেন, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইলেন। তাঁহার একখানি খড়্গ ছিল, উহা সুতীক্ষ্ম ও সুদীর্ঘ, উহার নাম 'রামদা'। এই রামদাখানি হাতে করিয়া তিনি লক্ষ্মীকে কাটিয়া ফেলিতে ছুটিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া পিতামহ এমনই চোট পাইয়াছিলেন যে প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার একটি পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। এই পঙ্গুত্বই লক্ষ্মীর প্রাণরক্ষার হেতু হইয়াছিল। লক্ষ্মীর পশ্চাতে পশ্চাতে রামদা হস্তে ছুটিয়া তিনি আমাদের বৃক্ষবাটিকা কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তারপর একটি বলিষ্ঠ লোক লক্ষ্মীকে তুলিয়া লইয়া খুব দ্রুতবেগে অন্যত্র চলিয়া গেল। পিতামহ খড়্গ হাত হইতে ফেলিয়া নিজ গৃহে বসিয়া উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ও চোখের জল ফেলিয়া নিজের ক্রোধ উড়াইয়া ভাসাইয়া দিলেন।

আমি আর একদিন তাঁহার এই উন্মত্ত ক্রোধ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তখন আমার বয়স সাত। কে যেন কোন্ গাছের উপর কি অত্যাচার করিয়াছিল। পিতামহ তাঁহার রামদা হস্তে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন এবং আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে এক সার (প্রায় ১৫।১৬টা) সুপারী গাছ ছিল, এক এক চোটে এক একটি গাছ কাটিয়া যখন শেষ গাছটার উপর আঘাত পড়িল, তখন আমাদের ভৃত্য জগা-গয়লা যাইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া হাত হইতে খড়্গ ছাড়াইয়া লইল। সেদিনও দেখিলাম তিনি জগার কাঁধে মুখ লুকাইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন।[১] আমাদের পরিবারে কেহ রাগ করিলে তাহাকে রঘুনাথ সেনের সঙ্গে তুলনা করা হইত। বস্তুতঃ তাঁহার ক্রোধপ্রবণ স্বভাব আমাদের পরিবারে প্রবাদবাক্যের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমাদের সেই বৃক্ষ-বাটিকার কথা আর কি বলিব? আমার মানসপটের উজ্জ্বলতম চিত্র—সেই সকল বৃক্ষের পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দু মুক্তার মতন দেখাইত! সূর্যের কিরণ কত রং দিয়া তাহা সাজাইত! রাত্রির আঁধারে যাহা জীবনের অব্যক্ত প্রহেলিকার মত গাঢ় ভাবে আমার কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিত, দিনের বেলায় যাহা ফুলফল লইয়া হাসিয়া উঠিত, সেই আম্রবাটিকার উপর ১৮১৯ সনের নিদারুণ শারদীয় ঝড় প্রবাহিত হইয়া আমার পিতামহের স্নেহ-অধ্যবসায়ের সেই অপূর্ব কীর্তি উৎপাটিত করিয়া

১ দেবীচরণ দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন, "রঘুনাথ একজন উৎকৃষ্ট শিকারী ছিলেন, তিনি প্রায়ই সজারু প্রভৃতি শিকার করিয়া আনিতেন। একদিন অভয়শঙ্কর সেনের বাড়ীর একটা বাতাবি বৃক্ষের শাখায় জড়ানো একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপকে তিনি শুল্পীর আঘাতে মারিয়াছিলেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম।"

লইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকালে যখন নাম্নারের মাঠে বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিতাম, তখন দেখিতাম, সূর্যাস্তের আলোকে পক্ষপুট মণ্ডিত করিয়া অসংখ্য পাখী কলরব করিতে করিতে আমাদের বাড়ীর পশ্চিমদিকের সুবৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষটির উপর আসিয়া পড়িতেছে। কখনও দেখিতাম আমাদের পুকুরপাড়ের কালোজাম গাছে শত শত ফল ফলিয়া আছে, তখন বাল্মীকির সেই 'অঙ্গার-চূর্ণোৎকর-সন্নিকাশৈঃ ফলৈঃ সুপর্যাপ্ত রসৈঃ সমৃদ্ধৈঃ॥ জম্বু দ্রুমাণাং প্রবিভান্তি শাখা। নিপীয়মানা ইব ষট্‌পদৌঘৈঃ।' শ্লোকটি মনে পড়িয়াছে।

আমার পিতামহের আর এক খেয়াল ছিল ঘুড়ি উড়ানো। শুনিয়াছি প্রকাণ্ড 'চিলে' ঘুড়ি তৈয়ারী করিয়া তিনি গুপ্তদের বাড়ীর বাবুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া ঘুড়ি উড়াইতেন। উভয় দলে বহুসংখ্যক লোক এই প্রতিযোগিতায় এ পক্ষ ও পক্ষের সহায়তা করিয়া দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন। ঘুড়ির সুতা তৈয়ারী করিতে নাকি ধুনা, কাঁচের টুকরা প্রভৃতি অনেক মালমসলা বহুদিন ধরিয়া খরচ হইত। সেই সুতা খুব মোটা ও শাণিত তরবারির ন্যায় সুতীক্ষ্ম হইত। ঘুড়িগুলিও এক একটা মানুষের মত উ'চু হইত। এই প্রকাণ্ডাকৃতি ঘুড়ি কোনটি চিলের মত, কোনটি সর্পাকৃতি, কোনটি বা ঠিক মানুষের মূর্তির মতই নির্মাণ করা হইত, সেই ঘুড়ির শব্দ এখনকার এরোপ্লেনের শব্দের মতই ভোঁ ভোঁ শব্দে গগনমণ্ডল আলোড়িত করিয়া উড়িয়া চলিত। গুপ্তপাড়ার ঘুড়িগুলি ও পিতামহের ঘুড়িগুলি দুই প্রতিপক্ষীয় সৈন্যের ন্যায় আকাশের উপর যুদ্ধ করিত। যাঁহাদের ঘুড়ি কর্তিত হইয়া স্খলিত নক্ষত্রের ন্যায় আকাশ হইতে হে'টমুণ্ডে ভূতলে পতিত হইত, তাঁহাদের ক্ষোভের সীমা থাকিত না এবং অপর পক্ষের জয় জয়কার শব্দে পাড়া প্রতিশব্দিত হইত।

ইহা ছাড়া ঘোটকারোহণের কৃতিত্বও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপর এক বিষয় ছিল। আমি শিশুকালে আমাদের একটা প্রকাণ্ড সিন্দুকবোঝাই অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়াছি। তাহা অনেক রকমের ছিল, কোনটি ব্যাঘ্র-নখের ন্যায়, কোনটি শূলাকৃতি, কোনটি বল্লম, কোনটি বৃহৎ চক্রবিশিষ্ট ২½ ফুট লম্বা খড়্গ, ইহা ছাড়া পিতামহের প্রিয় রামদাটি তো ছিলই। শুনিয়াছি আমাদের ও অঞ্চলে প্রায়ই ডাকাতি হইত, তখন গ্রামের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ডাকাতের সম্মুখীন হইতেন। বাজাসনের ভিটার নিকটে নাকি দস্যুদলের সঙ্গে গ্রামবাসীদের একবার একটি সম্মুখ সমর হইয়া গিয়াছিল, গ্রামের দলের নেতা ছিলেন আমার পিতামহ।

ধর্ম সম্বন্ধে পিতামহ একেবারে উদাসীন ছিলেন। বোধহয় ধর্ম করিতে যাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর হই'তে পিতামহের ধর্মের প্রতি একটা বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছি আমাদের কুলগুরু একবার আমাদের বাড়ীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। পিতামহঠাকুর তাঁহাকে লগুড় লইয়া তাড়া করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদের ইষ্টদেবতারা আর কেহ আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমা মাড়ান নাই।

আমার পিতা যখন একান্ত শিশু, তখন আমার পিতামহীর মৃত্যু হয়। আমাদের বাড়ীতে একটি কোচ জাতীয় পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম করুণা। যৌবনে সে রূপবতী ছিল—তাহার চোখ দুটি নাকি বড় সুন্দর ছিল। পিতামহ তাহাকে

একটা বাড়ী করিয়া দেন। এখন অভয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের বাড়ীর পশ্চিমে কালাচাঁদ সিংহের কন্যা কাশী যে জায়গাটা দখল করিয়া আছে, সেইখানে করুণার বাড়ী ছিল। এই করুণাও একটি অদ্ভুত রকমের জীব ছিল। আমি যখন ইহাকে দেখিয়াছি, তখন করুণা বিগতযৌবনা লোলচর্মা বৃদ্ধা। আমি স্কুলে যাইবার পথে ইহার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতাম। আমার মাতা আমাকে সর্বদা মানা করিয়া দিতেন, 'তুই ঐ বুড়ীর বাড়ীতে কিছুতেই যাস্ না, এবং সে কিছু খেতে দিলে খাস্ না।' কিন্তু আমি ঐ পথ দিয়া যাওয়ার সময়, করুণা এমনই বিনয় সহকারে ক্লেশ জানাইয়া আমাকে অনুনয় করিতে থাকিত, যে আমি কিছুতেই তাহার অনুরোধ এড়াইতে পারিতাম না। আমি তাহার বাড়ীতে গেলে সে যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে, এরূপ বোধ হইত। তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয়। করুণা উৎকৃষ্ট চিড়া, ক্ষীর, চাটিম কলা, ভাল দুধের সর, মাখন, ভাল আখি গুড় ও কদমা-তিলে প্রভৃতি আমাকে খাইতে দিত। সেই বয়সে কোন্ শিশু এরূপ লোভনীয় দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছে? আমি মাতার নিষেধ ভুলিয়া যাইতাম, এবং দুই একবার 'না, আমার ক্ষিধে নাই, পেটের অসুখ' প্রভৃতি মিথ্যা অজুহাত দিয়া শেষে সেই উপাদেয় খাদ্যগুলির প্রতি সম্বিচার করিতে লাগিয়া যাইতাম। করুণা আমাকে খাওয়াইয়া যে কি তৃপ্তিলাভ করিত, আমি একজন লেখকাভিমানী হইলেও তাহা বর্ণনা করিতে আমার সাধ্য নাই।

করুণার একটি ঘর বহুবিধ মাটির দেবদেবীমূর্তিতে পূর্ণ ছিল। ইন্দ্র, যম, ব্রহ্মা, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবতার সুবৃহৎ মূর্তি সে নিজে বিবিধ উপচারে পূজা করিত। পূজা করিবার সময় সে তসর পরিত। তাহা ছাড়া তাহার বাড়ীর নিকট একটা অতি প্রাচীন পুকুর হইতে একখানি প্রস্তর নির্মিত বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল, সেটিও তাহার দেবপঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইয়াছিল। সে কোন মূর্তি পাইলে মাটি খুঁড়িয়া সাবধানে আবৃত করিয়া তাহা বৃক্ষতলে পুঁতিয়া রাখিত এবং একদিন ঘুম হইতে জাগিয়া বলিত যে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যেন অমুক দেবতা তাহার বাড়ীর কোন নির্দিষ্ট দিকে ভূনিম্নে থাকিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইতে আদেশ করিয়াছেন। এইভাবে মূর্তিখানি সে তুলিয়া খুব আড়ম্বরের সহিত পূজা করিত। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তাহার ভক্তের অভাব ছিল না।

আমার পিতামহের মৃত্যুর পর সে যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়াছিল, তখন তাহার এই পূজার ঝোঁকটা তাহাকে একটা নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল। বয়স তখন তাহার সত্তর। শীর্ণ দেহ, লোল চর্ম, স্খলিত দন্ত। তাহার বর্ণটা হয়ত এককালে ফরসা ছিল, কিন্তু শেষটা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে উহা শ্যাম কি গৌর তাহা বোঝা যাইত না। কোন কোন সন্ধ্যায় যেমন দিবালোক ও আঁধার মিশিয়া যাইয়া একটা ঘোলাটে রঙে দাঁড়ায় তাহার রঙটা সেইরূপ হইয়া গিয়াছিল। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবপূজা উপলক্ষে সে ধুনচি হাতে বহুলোকপরিবৃত হইয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে ছুটিতে থাকিত। ধুনচি হইতে ধুনার ধোঁয়াতে ও তাহার এলোচুলে মুখ ঢাকিয়া গিয়া তাহাকে একটা কবন্ধের মত দেখাইত। বহু লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত। তাহার মাথার ঝাঁকুনি ক্রমশ বাড়িয়া চলিত, তারপর একটা জায়গায় সে বসিয়া পড়িয়া যাইত; হাতের ধুনচিটা তখনও ছাড়িত না। কিন্তু একরাশ পাকা

চুলসুদ্ধ মাথাটা এরূপভাবে ডাইনে বামে ঝাঁকিতে থাকিত যে, মনে হইত ব্যাটের তাড়া খাইয়া বলটা একবার এদিকে তারপর অপরদিকে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। ইহার কিছু পরেই সে মুখে ফেনা তুলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িত। আমাদের দেশে একে 'বাইল পড়া' বলে। আন্ডারউড্ সাহেব 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকাতে এই 'বাইল পড়া'—যাহা খ্রীষ্টানদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল—তাহা বৈষ্ণবের 'দশায়' পড়ার সঙ্গে গোল করিয়াছেন। কিন্তু 'বাইল পড়া' ও 'দশায় পড়া' দুই ভিন্ন বস্তু। একটা হইতেছে বর্বরদের শারীরিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন উত্তেজনার ফল; অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে উহা দেখা যায়, আর বৈষ্ণবের 'দশায় পড়া'—অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের ফল। বৈষ্ণবেরা ইহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাঁহাদের ভক্তিগ্রন্থে সম্যক আলোচনা করিয়াছেন; এবং দশার প্রণালীবদ্ধ নানারূপ সূক্ষ্মভেদ আবিষ্কার করিয়া উহাকে সাধনার অঙ্গীয় করিয়াছেন।

করুণা এই সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা অশিক্ষিত লোকের মধ্যে একটা ভাল রকমের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছিল। এমন কি শুনিয়াছি, এই বৃদ্ধ বয়সে সে গাছের উপর সন্ধ্যাকালে চড়িয়া পাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকিত এবং বিস্ময়াপন্ন ও ভীত পথিককে নানারূপ দৈববাণী শুনাইয়া তাহার আবাসস্থলটিকে একটা সিদ্ধ পীঠে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা করিত। দেবীচরণ দাশ মহাশয় ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'ইতর লোকের নিকট করুণার খুব প্রতিপত্তি ছিল। হরি জেলে ইহার প্রধান শিষ্য হয়, তাহার প্ররোচনায় অনেক ইতর লোক ইহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিত। এমন কি গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সবজজ কালীকিঙ্কর রায় মহাশয়ের বন্ধ্যা স্ত্রী অপত্য-কামনায় করুণার দেবদেবীর নিকট মহিষ বলি মানত করিয়া পূজা দিয়াছিলেন।'

কিন্তু করুণার এই সমস্ত বীভৎস আচারের মধ্যে প্রেমপিপাসু বালবিধবার সন্তপ্ত হৃদয়ের হাহাকারের পরিণতি আমার নিকট এখন দীপ্যমান হইতেছে,—সেই প্রেম-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য সে যৌবনে একজনের পক্ষপাতী হইয়াছিল এবং সেই হৃদয়ের ক্ষুধার খাদ্যস্বরূপ নানারূপ দেবতার পূজা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাহার মাতৃত্বের লোভ ফুটিয়া উঠিত আমাকে খাওয়াইতে যাইয়া। তখন তাহার যে আনন্দ দেখিয়াছি তাহা তাহার সর্বপ্রকার বীভৎসতাকে ঢাকিয়া আমার নিকট তাহার অপূর্ব অন্নপূর্ণামূর্তি প্রকট করিয়া দেখাইত। প্রেম মানুষকে ভুলাইয়া শেষে কোন্ কূপে নিক্ষেপ করিতে পারে, করুণার জীবন আমার কাছে তাহারই নিদর্শন। তাহার গৃহত্যাগকে আমি কখনই কামুকতার প্রেরণার ফল মনে করি নাই; সে প্রাণের ক্ষুধা লইয়া বিপথে বাহির হইয়াছিল।

করুণার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত ঠাকুর দেবতা আমি লইয়া আসিয়াছিলাম। যমরাজের মূর্তিটিকে ফেলিয়া দিয়া আমি তাঁহার প্রকাণ্ড মহিষটার উপর চড়িয়া বসিয়াছিলাম। সেই ক্রোধেই বোধ হয় যমরাজ এখন আমার দিকে রক্ত-চক্ষে দৃষ্টি করিতেছেন। কয়েকদিনের জন্য এইভাবে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া আমি তাঁহার ঐরাবতকে দখল করিয়া লইয়াছিলাম। ৮৷১০ দিনের মধ্যে করুণাপূজিত বহু দেব-দেবীর মূর্তিকে আমি এইভাবে বিড়ম্বিত করিয়াছিলাম। বোধ হয়, কালাপাহাড়ের

পরে ইংরেজী আমলে এরূপ আর কেহ করে নাই। কিন্তু সেই প্রস্তর-নির্মিত বাসুদেব মূর্তিটিকে যে আমি কত যত্নে পূজা করিতাম, এবং তাহার চালচিত্রের ছাপ লইয়া মাটি দিয়া কত প্রতিমূর্তি গড়িতাম, তাহা আর কি বলিব! আমি যখন সুয়াপুর ছাড়িয়া হবিগঞ্জ চলিয়া যাই, তখন রোয়াইল গ্রামবাসী একজন ব্রাহ্মণ এই মূর্তি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই অপহৃত বিগ্রহকে পূজা করিয়া পুণ্য অর্জনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বাসুদেব তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমি সেই দেবতার দর্শন পাইলে জিজ্ঞাসা করিতাম।

পূর্বে বলিয়াছি, আমার পিতামহের এক বিধবা ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল লক্ষ্মী দেবী। তাঁহাকে আমরা 'কালো ঠাকুরমা' বলিয়া জানিতাম। তিনি বোধ হয় কালো ছিলেন, এই জন্যই তাঁহার ঐ নাম হইয়াছিল। এই বিধবা ভগিনীর সঙ্গে পিতামহের একবারেই সদ্ভাব ছিল না। শুনিয়াছি, উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না। কালো ঠাকুরমা পিতামহকে 'কালাপাহাড়' উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার পিতামহ কালো ছিলেন না।

আমার মাতা বড় মানুষের মেয়ে ছিলেন, সে কথা পরে লিখিব। শুনিয়াছি, পিতামহের নানারূপ কার্যকলাপে আমার পিতা বিরক্ত ছিলেন এবং আমার মাতাও নাকি তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন না। বহুকাল পর্যন্ত পিতামহ শয়নঘরে স্বয়ং রাঁধিয়া খাইতেন। আমি দেখিয়াছি, তিনি নিজের বাজার নিজে করিয়া বেলা একটা'র সময় উনুনে আগুন ধরাইতেন। দোষ যে পক্ষেরই থাকুক না কেন, তিনি যে একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূর সেবায় বঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট পাইতেন তাহার সন্দেহ ছিল না। তিনি তেজস্বী ছিলেন, এজন্য অনিচ্ছা বা অবহেলাকৃত সেবা গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার পুত্র বা পুত্রবধূর নিন্দা কাহারও নিকট করেন নাই; গার্হস্থ্য জীবনের অশান্তি তাঁহার বুকে চাপিয়াছিল, কিন্তু মুখে ফুটিত না। একান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরাও তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নীরব হইয়া যাইতেন।

বহু দোষ ও গুণ লইয়া তিনি যেদিন এই সংসার হইতে বিদায় লইলেন, সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমার বয়স সাত কি আট। শীতকালের প্রত্যুষে, বোধ হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইবে, জগা-গয়লা (আমাদের ভৃত্য) উৎকণ্ঠিতভাবে আসিয়া বাবাকে চীৎকার করিয়া ঘুম হইতে জাগাইল। আমরাও লেপ মুড়ি দিয়া জাগিয়া বসিলাম। সংবাদটি এই, পিতামহ অতি প্রত্যুষে (প্রভাতের বহু পূর্বে) উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিতেন। সেদিনও সেইরূপ যথারীতি মুখধাবনাদি সারিয়া নিজ গৃহে ঢুকিতেছেন, এমন সময় কাঁপিতে লাগিলেন এবং দুই এক মিনিট পরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আমার মনে আছে, বাবা এই সংবাদ শুনিয়া অসম্বৃত বস্ত্রে উঠিয়া বাহির হইলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। কামিনীফুলের একটা গাছের নীচে তিনি শায়িত, তাঁহার পাদমূল হইতে অনতিদূরে তাঁহার সখের কমলালেবুর গাছটি। জ্ঞান নাই, চক্ষে পলক নাই। সংবাদ পাইয়া অতি দ্রুত গ্রামের বহু লোকজন তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ জমিদার বৃদ্ধ তারিণীপ্রসাদ রায় এবং আমাদের আত্মীয় পরম শ্রদ্ধেয় ভারতচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়। ভারত দাশ মহাশয়ের হাতে ঘৃতকমল। কায়স্থ কবিরাজ দ্বারকানাথ অনেক চেষ্টা

করিলেন, কিন্তু পিতামহের প্রাণ পূর্বেই বহির্গত হইয়া গিয়াছে, ঘৃতকমল, লক্ষ্মীবিলাস ও স্বর্ণসিন্দূরে কি করিবে?

পূর্বের দিনও তিনি নিজে বাজার করিয়া নিজ হাতের রান্না খাইয়াছিলেন, একটি দিন রোগশয্যায় পড়িয়া সেবার ভিখারী হইলেন না। তেজস্বী সন্ন্যাসিকল্প বৃদ্ধ সন্ন্যাসরোগে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এখনও মনে পড়ে, তাঁহাকে আমি কত বিরক্ত করিয়াছি। তাঁহার ঘরে সরু সরু বাঁশের চোঙায় নানারূপ কবিরাজী ঔষধ থাকিত, তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেই আমি তাঁহার সঙ্গে অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়া সেই চোঙার মধ্যে কি কি আছে, তাহা আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়া তাড়া খাইতাম। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি অবাধে তাঁহার সেই চোঙাগুলি দখল করিয়া বসিলাম। আমার মনে আছে, আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের পুকুরপাড়ে বসিয়া আমি সেই চোঙাগুলি খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে লাল, কালো—নানারূপ ঔষধের বটিকা ছুড়িয়া পুকুরে ফেলিয়াছিলাম। এই ভাবে কত পূর্ণচন্দ্র রস, মহা-লক্ষ্মীবিলাস, কস্তুরী-ভৈরব, রামবাণ, মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ আমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পুকুরে পড়িয়া চরম শান্তিলাভ করিয়াছিল। পিতামহের ঋণ এই ভাবে শোধ করিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ সেই বাঁশের চোঙাগুলি আমি পুকুর-ঘাটের তক্তার উপর বাড়ি মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলাম এবং আমার পিতামহ সম্বন্ধে এই শেষ ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাটীতে প্রবেশপূর্বক মায়ের আঁচলের নিকট ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

৩

সুয়াপুর গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস

সুয়াপুরের কথা ভাবিতে মন করুণরসে আর্দ্র হয়। শুনিয়াছি, সুখাবতী বৌদ্ধদিগের স্বর্গ, যেমন বৈকুণ্ঠ ও অমরাবতী হিন্দুদের। সমস্ত প্রাচীন কুলজীগ্রন্থে— সুয়াপুর গ্রামকে 'সুয়াপুরী' বলিয়া উল্লেখ আছে, সুয়াপুরী অর্থ সুখপুরী— ইহা 'সুখাবতী'রই বোধ হয় নামান্তর। শুধু নামটি দেখিয়াই আমি মনে করিয়াছিলাম, এই গ্রাম অতি প্রাচীন; কারণ যে কালে 'সুখ' শব্দটির স্থলে 'সুয়া' রূপ প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত, সে আজকালকার কথা নহে। এক সময়ে 'সুয়ো রানী' ও 'দুয়ো রানী' কথায় প্রচলিত ছিল। তাহার অর্থ—'সুখী রানী' ও 'দুঃখী রানী'। এখনও আমরা আমাদের শত্রুদিগকে 'দুয়ো' দিয়া থাকি। যে সময়ে গ্রাম পত্তন করিয়া তাহার নাম 'সুয়াপুরী' রাখা হইয়াছিল, তখন 'সুখ' শব্দ সাধারণ্যে 'সুয়া' রূপেই প্রচলিত ছিল। সেটি সংস্কৃত ভাবার পুনরভ্যুত্থানের পূর্বে— প্রাকৃত ভাষার যুগে। অন্তত ১৫০০ বৎসর পূর্বে শব্দটির এইরূপ প্রাকৃতিক ব্যবহার থাকার কথা।

তারপর এই গ্রামের পুরাতত্ত্ব সন্ধান করিয়া আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ গ্রাম বেষ্টন করিয়া যে একটা বৃহৎ পরিখা ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও আছে। বেনে পাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া দাশপাড়া ও ব্রাহ্মণপাড়া বেষ্টনপূর্বক বিশ্বম্ভর সাহাদের বাড়ী অবধি এই পরিখা বিস্তৃত ছিল। বিশ্বম্ভর সাহাদের বাড়ীর পর সেই পরিখা শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে এই সীমা-চিহ্নিত স্থানটি এখনও একটি সুদীর্ঘ খালে পরিণত হইয়া যায়। বিশ্বম্ভর সাহার বাড়ীর পর হইতে গুপ্তপাড়া আরম্ভ, তাহা এখন খুব সমৃদ্ধ হইলেও উহা অপেক্ষাকৃত নূতন পত্তন। গুপ্তপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে একটি দীঘি ছিল—তাহার নাম 'দিবাকর'। এই দীঘির পাড়ে শ্মশান ছিল। এখনও গ্রামের কোন কোন নিম্নশ্রেণীর বৃদ্ধ রাগিয়া গেলে 'তোকে দিবাকরে দেব' এইরূপ অভিশাপ দিয়া থাকে। দিবাকর দাশ ঐ দীঘি কাটাইয়া তার পাড়ে কালী স্থাপন করিয়াছিলেন। সে ৫।৬ শত বৎসরের কথা।

পূর্বোক্ত পরিখার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একটা জায়গা আছে, তাহা এখনও 'রাজার বাড়ী' নামে বৃদ্ধদিগের নিকট পরিচিত, এবং তাহার অনতিদূরে রেবতী চক্রবর্তীর বাড়ীর নিকটবর্তী স্থানটির নাম ছিল 'হাতীর পিলখানা'। রাজবাড়ীর পূর্ব দিকে একটা উঁচু জায়গা এখনও আছে, তাহার নাম 'কোটবাড়ী'। প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গে 'কোটবাড়ী' বলিতে দুর্গ বুঝাইত।[১] দাশদের পাড়ায় রাধাকান্তের মন্দির হইতে শুরু করিয়া অভয় সেন মহাশয়ের বাড়ী ছাড়িয়া আরও খানিকটা দূর পর্যন্ত ৫।৭ হাত মাটি খুঁড়িলে সর্বত্র একটা সুদীর্ঘ প্রাচীরের শীর্ষদেশ টের পাওয়া যায়। এই বৃহৎ সীমা জুড়িয়া ছোট ছোট লাল রঙের ইষ্টক পাওয়া যায়। সমস্ত

[১] কোন না কোন প্রাচীন তাম্রশাসনে 'কোটপালক' শব্দ পাওয়া যায়। 'কোটপালক' অর্থ 'দুর্গপালক' এবং এই শব্দ হইতেই বোধহয় 'কোটাল' শব্দের উৎপত্তি।

গ্রামটি প্রাকার-বেষ্টিত ছিল কিনা বলা যায় না। রাধাকান্তের মন্দির এখন ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় ১৭৫ বৎসর হইল নির্মিত হইয়াছিল। বৃদ্ধদিগের মুখে শোনা যায়, ঐ মন্দির নির্মিত হইবার পূর্বে দোচালা ঘরের মত একটা ইষ্টক-মন্দির তথায় ছিল, ফার্গুসন সাহেব এই দোচালা ঘরের অনুকরণে নির্মিত (curvilinear) ছাদযুক্ত ইষ্টকালয় বাংলাদেশের স্থপতি-শিল্পের বিশেষত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশেই এইরূপ স্থাপত্যের জন্ম এবং ইহা বঙ্গদেশ হইতে পৃথিবীর সর্বত্র অনুকৃত হইয়াছে। ইহাতে বীম-বরগা থাকে না, এবং এগুলি সচরাচর খুব টেকসই হয়। এইরূপ মন্দির ৬।৭ শত বৎসর স্থায়ী হইয়া থাকে। সুতরাং সেই পূর্ব-নির্মিত মন্দিরটি অন্তত ৮।৯ শত বৎসর পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই মন্দিরের নিকটবর্তী পূর্ব দিকে একটি অতি প্রাচীন পুকুর আছে, তাহার পঙ্ক উদ্ধারের সময় একটা প্রস্তর-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সেই অঞ্চল অতি নিম্নভূমি, বর্ষায় ভাসিয়া যায়। প্রস্তরময় পাহাড় এই স্থান হইতে বহু দূরে; এত দূরে প্রস্তর আনিয়া যাঁহারা আবাসস্থান বা মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ঐ পুকুর হইতে করুণার পূজিত ভগ্ন বাসুদেব-বিগ্রহ উঠিয়াছিল। দাশপাড়ার দাশগুপ্তেরাই গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। তাঁহাদের মধ্যে চিরন্তন প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে যে তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষদিগকে বৈশ্বানর-গোত্রীয় কোন রাজা আনিয়াছিলেন। এদেশে কিম্বদন্তী এবং সর্বত্র প্রচলিত ধারণা এই যে সেনরাজারা বৈশ্বানর-গোত্রীয় ছিলেন।

দাশগুপ্তেরা পন্থ হইতে উদ্ভূত। পন্থ বল্লালসেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পন্থ বালিনছী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং বল্লালসেন তাঁহাকে মহাকুল দান করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীখন্ডবাসী নরহরি সরকার-প্রভু এই পন্থদাস বংশসম্ভূত।

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে বল্লালীকুল প্রথম প্রথম সর্বত্র স্বীকৃত হয় নাই; কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গদেশের সর্বত্র এই কৌলীন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুলজীগ্রন্থে পাওয়া যায়, পন্থদাস হইতে নবমস্থানীয় চন্ডীবরের পুত্র বিষ্ণুদাস ফৌজদার প্রমুখ তিন ভ্রাতা সুয়াপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই ঘটনা সম্ভবত ১৩৪৫ খৃীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। বৈদ্যকুলের শ্রেষ্ঠ—মহাকুলীন এই তিন ভ্রাতা গঙ্গাতীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের স্বীয় আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া—কি জন্য এই অবজ্ঞাত পূর্ববঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে আসিয়াছিলেন? স্বদেশে যাঁহাদের গৌরব, মান ও প্রতিষ্ঠার অভাব ছিল না, যাঁহাদের একজন উচ্চ সরকারী খেতাবে ভূষিত ছিলেন—এহেন ব্যক্তিরা কেন এই সুয়াপুরে আসিয়াছিলেন? সম্ভবত সেন-রাজাদের এক শাখা এই সুয়াপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই আহ্বানে ইঁহারা আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে যে যে স্থানে ৮।৯ শত বৎসর পূর্বে বৈশ্বানর-গোত্রীয় ব্যক্তিরা ছিলেন, সেখানেই তাঁহারা অতি প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বল্লভদি নামক গ্রামে (ফরিদপুর জেলায়) বৈশ্বানরদের বাড়ীর নিম্নে তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগের কৃত প্রকান্ড তোরণের ভগ্নাবশেষ খুঁড়িলেই পাওয়া যায়, সেই তোরণের ইটগুলিতে নানারূপ দেবমূর্তি ও ফুল ক্ষোদিত দেখা যায়। রাজতুল্য বৈভবশালী ব্যক্তি ভিন্ন এরূপ হর্ম্য কেহ

প্রস্তুত করিতে পারিতেন না।

সুয়াপুর রায়দের পাড়ায় শতদল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিত্যক্ত একটা বাড়ীতে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা ছাদ ভূনিম্ন হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মাতা সংস্কারবশত ভয় পাইয়া সে জায়গা আর খুঁড়িতে দেন নাই। অনেকে বলেন, ঐ ছাদই সেই প্রাচীন রাজবাড়ীর একাংশ। উহার নিকটবর্তী পুকুর হইতে বাসুদেব-মূর্তি ও প্রস্তর-স্তম্ভ উত্তোলিত হইয়াছিল। সুয়াপুরের কোন কোন স্থান হইতে অতি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে আমি শুনিয়াছি, কিন্তু আমি নিজে দেখি নাই। পন্থদাসের বংশধরেরা যে এককালে খুব বিক্রমশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। ১৭৫ বৎসর পূর্বে নির্মিত রাধাকান্ত মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহের যে কাষ্ঠ-সিংহাসন ছিল, তাহাতে বিচিত্র দৃশ্য ও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত ছিল, তাহা 'প্রবাসী'তে ছাপা হইয়াছিল। সেই সিংহাসন ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে। সেই সুদর্শন খোদাই-চিত্র সমন্বিত কাঠগুলি স্ত্রীলোকেরা উনুনে জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন। জ্বলন্ত অগ্নির মুখ হইতে অর্ধদগ্ধ দুই একখানি এবং নিতান্ত অবহেলায় রক্ষিত জীর্ণশীর্ণ আর ৩।৪ খানি আমি রক্ষা করিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় শিল্প-সমালোচক এ. কে. কুমারস্বামী ২০০্ মূল্যে তাহার তিন চারিখানি ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহা দেই নাই। ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট ফ্রেঞ্চ সাহেব তাহার একখানি ধার লইয়াছিলেন, তাহা এখনও প্রত্যর্পিত হয় নাই।

সুয়াপুরের নিকটবর্তী বাজাসনে যে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে অনেক মৃন্ময় বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার খনন-কার্য আরম্ভ হওয়ার পরই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই উচ্চ ভূমি খনন করিলে এখনও প্রাচীন ইতিহাসের কতক নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। সুয়াপুরের নিকটবর্তী নান্নারগ্রামে সম্ভবত মুণ্ডিত-শীর্ষ বৌদ্ধভিক্ষুর আবাস ছিল। 'নান্না' শব্দ অর্থ মুণ্ডিত-মস্তক। এখনও সে অঞ্চলে কোন স্ত্রীলোকের চুল না থাকিলে তাহাকে 'নান্নী' বলা হয়। 'নাণ্ডামুণ্ডা' 'নান্না মুন্না' প্রভৃতি শব্দ এখনও প্রচলিত আছে, ইহাদের অর্থ 'মুণ্ডিতশীর্ষ'।

বস্তুত সুয়াপুর ও তৎসন্নিহিত বিস্তৃত জনপদ যে বহু প্রাচীন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুয়াপুর হইতে ৬।৭ মাইল দূরে 'ধামরাই' গ্রামে হয়ত অশোকস্তম্ভ বিরাজিত ছিল। সেই গ্রামে অনেক প্রাচীন চিহ্ন এখনও আছে। প্রাচীন দলিলপত্রে এই স্থানটির নাম 'ধর্মরাজিকা' রূপে দৃষ্ট হয়। অশোক সমস্ত ভারতবর্ষে ৮৪০০০ গ্রামে বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বজা উড়াইয়া তাহাতে কীর্তিস্থাপন করিয়াছিলেন—সেই গ্রামগুলির নাম 'ধর্মরাজিকা'।

এই বাজাসন-বিহারে সুপ্রসিদ্ধ দীপঙ্কর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু সুয়াপুরের দাশবংশের আদি উপনিবেশকারী তিন ভ্রাতা যে বিক্রমপুরের দ্বিতীয় বল্লালের আত্মীয় ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বল্লালসেন ও কাহ্নু খাঁ—সেই ভ্রাতাদের পিসীদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন। কপোতের আকস্মিক আগমনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিক্রমপুরের রাজ-অন্তঃপুরের যে সমস্ত ললনা জহরব্রত পালন করিয়া অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণী রাজমহিষী

এই তিন ভ্রাতার পিসী ছিলেন।

সুয়াপুরের অদূরবর্তী সাভারের নাম টলেমির ভৌগোলিক বৃত্তান্তে পাওয়া যায়—সে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর কথা। তথায় ধীমন্ত, রণধীর, হরিশচন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ নৃপতিরা রাজত্ব করিয়াছিলেন। হরিশচন্দ্র কুবেরের মত ধনশালী হইয়াও বৃদ্ধ বয়সে বৌদ্ধ-মঠ পরিদর্শনপূর্বক ভিক্ষুকের ন্যায় বেড়াইতেন। তাঁহার উপাধি ছিল 'রাজর্ষি'। সম্ভবত এই হরিশচন্দ্রের দুই কন্যাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) বিবাহ করিয়াছিলেন।

সুয়াপুরের নিম্নে যে নদী বহিয়া যাইতেছে, তাহার নাম এখন গাজিখালি। যে গাজিরা সুয়াপুরের হিন্দু রাজত্ব ধ্বংস করিয়াছিল এবং বাসুদেব-বিগ্রহের নাক ও পদ্মহস্ত ভগ্ন করিয়া পুকুরে ফেলিয়া দিয়াছিল, সেই গাজিরাই কানাই নদীকে গাজিখালি আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। গাজি-আক্রমণের বহুদিন পরেও সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে এই নদীর আদত নাম প্রচলিত ছিল। রেনেলের মানচিত্রে এই নদীর নাম 'কানাই' দৃষ্ট হয়। কানাই ও বংশাই দুই নদী সাভারের নিকট ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বংশাই ধামরাই গ্রামের নিকট দিয়া ভাওয়াল ও ময়মনসিংহ পর্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছে, কানাই মুসলমান নাম-লাঞ্ছিত হইয়া অর্ধপথে শুকাইয়া গিয়াছে।

এই কানাই ও বংশাই -সন্নিহিত বিশালাকায়া ধলেশ্বরী—অদূরবর্তী জনপদ, সাভার, ধামরাই, সুয়াপুর, নান্নার ও বাজাসন প্রভৃতি গ্রামসমূহকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া এক সময়ে বৌদ্ধকীর্তিময় মন্দির ও স্তূপ বিভূষিত হইয়া শোভা পাইয়াছিল। পরবর্তী যুগে তান্ত্রিকতা ও বামাচারে এই জনপদ ডুবিয়া গিয়াছিল। বাজাসন-বিহার তখন জ্ঞানগরিমা হারাইয়া পঞ্চ মকারের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। এজন্য এখনও বাজাসনের সংস্রব সুয়াপুরবাসীদের জুজুর ভয় উৎপাদন করে। 'বাজাসনের দাশ' বলিলে পন্থদাসেরা ক্ষুব্ধ হইয়া এই প্রবাদ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান এবং দুই এক ঘর ব্রাহ্মণ 'বাজাসনের ঠাকুর'—এই প্রাচীন প্রবাদের আরোপে উত্তেজনায় অসহিষ্ণু হইয়া গালমন্দ দিতে থাকেন। অথচ বাজাসন যে কি বস্তু, এই নামের আড়ালে কি কলঙ্ক নিহিত আছে, তাহার বিন্দুমাত্রও তাঁহারা জানেন না। কিন্তু বাজাসনের প্রবাদ সেই অঞ্চলময় পরিজ্ঞাত। এখনও যদি আমি বলি আমার বাড়ী সুয়াপুর, তাহা হইলে সে অঞ্চলের লোক বলিবে 'কোন্ সুয়াপুর? "সুয়াপুর নান্না, মদে ভাতে পান্না।" সেই সুয়াপুর নাকি?' বস্তুত—আমাদের গ্রাম যে একশত বৎসর পূর্বে ভৈরবীচক্রের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা ভালরূপ জানা আছে। ভদ্র ঘরের যে সকল মহিলা এই ভৈরবীচক্রে বসিতেন, তাঁহাদের দুই এক জনকে অতি বৃদ্ধাবস্থায় আমি আমার শৈশবে দেখিয়াছি। আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ যে শবারূঢ় হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই ঘটনাও এই গ্রামের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য প্রমাণিত করিতেছে।[১]

[১] বাংলার পল্লীগুলির অনেকগুলি অতি প্রাচীন। বহু প্রাচীন পল্লীর মন্দিরাদির নিদর্শন মাটির উপর না থাকিবারই কথা। প্রাচীনত্ব নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। (১) গ্রামের লুপ্ত ও চলিত পাড়াগুলির নামের লিস্ট করা—'কোট', 'সদর খণ্ড', 'বাহির খণ্ড', 'পাট গাঁ', 'পাইকপাড়া', প্রভৃতি নাম পাইলে বুঝা

যাইবে, সেখানে হয়ত পুরাকালে কোন রাজা ছিলেন। কোট বাড়ী=দুর্গ, পাট (পত্তন হইতে উদ্ভূত)=রাজ-সিংহাসন, পাইকপাড়া=সৈন্য-নিবাস, ইত্যাদি। (২) গ্রামে কোন পরিখার চিহ্ন আছে কিনা। (৩) বড় দীঘি ছিল কিনা, দীঘির কোন পাড়ে মাটি খুঁড়িলে প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় কিনা। বাংলার পল্লীগুলির দীঘিসমূহে এখনও বঙ্গের অর্ধেক পুরাতত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, যেহেতু, মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনেক সময় হিন্দু রাজগণ দীঘির মধ্যে তাঁহাদের সর্বস্ব ফেলিয়া দিয়াছেন। (৪) মন্দির কোন্ দুয়ারী, দীঘি কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে খনিত। ইহা দ্বারা হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান ইঁহাদের মধ্যে কাঁহারা সেই কীর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা টের পাওয়া যাইবে। (৫) গ্রামে কোন জায়গা খুঁড়িলে প্রচুর খোলা পাওয়া যায় কিনা। ইতিহাসপূর্ব বহু প্রাচীন গ্রাম ও নগরগুলিতে সেইরূপ প্রাচীন খোলা পাওয়া গিয়া থাকে। (৬) গ্রামের প্রাচীন কুলজীপুস্তক ও অপরাপর হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির ভালরূপ অনুসন্ধান করা। (৭) বিগ্রহের নীচে, প্রস্তরে বা ইণ্টকে অনেক সময় এইরূপ ভাবের লেখা থাকে যে তাহা লেখা বলিয়াই মনে হয় না। সেই সকল লেখা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহ সচরাচর পড়িতে পারেন না। সুতরাং পূর্বোক্ত ভাবের কোন নিদর্শন পাইলে তাহা ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া দেখা উচিত। (৮) তাম্রশাসন বা প্রাচীন দলিলাদি কিছু আছে কিনা অনুসন্ধান করা। (৯) গ্রাম্য ছড়া ও প্রবাদ সংগ্রহ করা—তাহা যতই কেন অমার্জিত ভাষায় থাকুক না কেন—সেগুলি অগ্রাহ্য না করা। (১০) মুসলমান পাড়াতে যে সকল প্রবাদ পাওয়া যাইবে, অনেক সময় তাহাই সত্যের অধিক সন্নিহিত। কারণ হিন্দুরা সমস্ত প্রাচীন তত্ত্ব পৌরাণিক গল্পের আড়ালে ফেলিয়া দেন; তাঁহারা রামায়ণ-মহাভারত বর্ণিত কথা দ্বারা সমস্ত ইতিহাস আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। (১১) মুসলমান পাড়া যেদিকে সেই দিকেই সম্ভবত হিন্দুর প্রাচীন রাজধানী ছিল, কারণ বিজয়ীরা হিন্দুর উৎকৃষ্ট স্থানগুলিই প্রথম দখল করিয়া লইয়া তথায় বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পুরাতত্ত্বের খোঁজ করিতে হইলে প্রথম মুসলমান-পাড়ার অনুসন্ধান করা কর্তব্য। অনেক সময় হিন্দু মন্দিরের ইট পাথর দিয়া মস্‌জিদ তৈয়ারী হইয়াছিল। সেই সকল ইট পাথরের উলটা দিক খুঁজিলে দেবদেবীর মূর্তি কখন কখনও দেখা যায়। (১২) সমৃদ্ধ গ্রামগুলির সকলটিই কোন না কোন নদীর পাড়ে নির্মিত হইয়াছিল। নদী শুকাইয়া গেলেও নদীর গতি কোন্ দিকে ছিল তাহা খুঁজিয়া বাহির করা। (১৩) অনেক বৌদ্ধ দেবদেবী-মূর্তি হিন্দু দেবদেবী বলিয়া পূজা পাইতেছেন। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' তারা রূপে গৃহীত হইয়াছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব কখনও কখনও শিব, এমন কি কালী বলিয়া পূজা পাইতেছেন। পাণ্ডা বা পুরোহিতের কথা এ বিষয়ে একেবারেই বিশ্বসনীয় নহে। বাসুদেবমূর্তি আর সূর্যমূর্তিতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, কেবল বাসুদেবের নিম্নে গরুড় ও সূর্যের নীচে সাতটি ঘোড়া এবং সূর্যমূর্তির পায়ে বুট জুতা পরানো।

৪

পিতৃদেবের আত্মীয়গণ

আমার পিতার শৈশব কিভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা জানি না, কিন্তু মাতৃহারা বালকের শৈশব যে খুব সুখকর ছিল না, তাহার কোন কোন কথা আমি শুনিয়াছি। পিতৃদেবের মাতামহেরা বাসণ্ডা গ্রামনিবাসী ছিলেন, তাঁহাদের বিস্তৃত কারবার ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে হঠাৎ মড়ক লাগিয়া এই বৃহৎ পরিবার নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের সম্পদ, গৃহ এবং বহু আসবাবপত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভগবান দাশগুপ্ত ও চন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত—আমার পিতামহের শ্যালকদ্বয়—আশ্রয়শূন্য হইয়া আমাদের বাড়ীতে প্রতিপালিত হন। তাঁহাদের ভগিনী অর্থাৎ আমার পিতামহী ঠাকুরানী তখন স্বর্গগতা। তাঁহাদের যত্ন লইবার লোক বাড়ীতে কেহই ছিল না। ভগবান দাশ মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন : 'আমরা জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়াছি। তোমার বাবারও যে কষ্ট কম ছিল তাহা নহে, আমাদের মামা-ভাগিনেয় তিনজনকে দেখিবার লোক বাড়ীতে কেহই বড় ছিল না। করুণার উনুনের জন্য আমাদের জঙ্গলে কাঠ কাটিতে হইত। করুণা তোমার বাবাকে এ সকল কাজে লাগাইতে দিত না, কিন্তু আমাদের দুই ভাইকে এই মজুরী করিতে হইত।'

কিন্তু এই দুই ভ্রাতার দুঃখ-নিবারণের ব্যবস্থা বিধাতা করিয়া দিলেন। আমার পিতামহের বিধবা ভগিনী লক্ষ্মীদেবী ক্রমশ এই দুই বালকের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন—ইঁহারা উত্তরকালে তাঁহার এতটা স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে তিনিই শেষে ইঁহাদের মাতৃস্থানীয়া হইয়াছিলেন। বিধবার 'নন্দদুলালে'রা এইভাবে সুয়াপুর গ্রামে বর্ধিত হইলেন। ঐ গ্রামবাসী রামকমল দাশ মহাশয়ের চেষ্টায় দুই ভ্রাতা বাংলা ও ফারসী শিখিয়া পূর্বাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। ভগবান দাশ নোয়াখালী জেলায় এক জমিদারের নায়েব হইয়া বেশ দুই পয়সা অর্জন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমোহন দাশ কুমিল্লা মুন্সেফ কোর্টের সর্বপ্রধান উকিল হইয়া সেই সময়ে মাসে ৪।৫ শত টাকা রোজগার দ্বারা সম্পন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এই দুই ভাইয়ের চেহারা বেশ একটা দর্শনীয় জিনিস ছিল। ভগবান দাশ ছিলেন লম্বা, দোহারা, রাস্তায় যাইতে অন্য সকলের হইতে তাঁহার মাথা এক ফুট উঁচু দেখাইত। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী ছিল সরল, উদ্দীপনাময়। চন্দ্রমোহন দাশ যেমন দীর্ঘ তেমনই স্থূলাকৃতি ছিলেন। বিশাল গোঁফজোড়া ক্ষুদ্র একটা পাখীর পক্ষপুটের ন্যায় কোঁকড়াইয়া বাঁকিয়া তাহার মুখশ্রীর শোভা বর্ধন করিত; তাঁহার হাসি সেই গোঁফজোড়ার মধ্যে মেঘের ভিতর হইতে সূর্যাস্তের আলো যেরূপ ফোটে তেমনই ভাবে দেখা দিত। তিনি যখন চলিতেন, তখন তাঁহাকে সুমেরু-মন্দরের মত দেখাইত, দেখামাত্র তিনি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতেন। তাঁহার স্বভাব ছিল চাপা, কিন্তু কথাবার্তায় বেশ প্রসন্ন ভাব ও উদারতা দেখাইতেন। তিনি কুমিল্লায় ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি সারা বৎসরের পর পূজায় যখন বাড়ীতে আসিতেন তখন সেই একটা মাস বাড়ীতে খুব ধুমধাম করিয়া ব্যয় করিয়া নাম কিনিতেন, গ্রামের সব লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। আমার মনে আছে, বন্যাপ্লাবিত গ্রামের কোন উঁচু জায়গায়

দাঁড়াইয়া আমরা শৈশবকালে পূজোপলক্ষে আগন্তুক প্রবাসী গ্রামবাসীদিগের পাল-সমন্বিত নৌকা আসিতে দেখিতাম। এক এক সম্পন্ন ব্যক্তির প্রকাণ্ড নৌকা দৃষ্টিপথে পড়িবার পূর্বেই আমরা বহু দূরাগত 'ভ্যা' 'ভ্যা' শব্দের ভেরীনিনাদ শুনিতে পাইতাম। বুঝিতাম, শারদীয় উৎসবের মহা উপচারস্বরূপ বহু ছাগল লইয়া গ্রামবাসী কেহ আসিতেছেন।

চন্দ্রমোহন দাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনীমোহন এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া পাগল হন। তাঁহার উন্মত্ততার কারণ প্রেমব্যাধি। তিনি একটি কন্যাকে পড়াইতেন। সেই কন্যাও কুমিল্লায় ছিলেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে ক্ষেপিয়া গিয়া তিনি যে সকল কাণ্ড করেন, তাহা এখন বলা সম্ভবপর নহে, কারণ কন্যাটি এখন একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহলক্ষ্মী। ঐ কন্যা অবনীবাবুর উন্মত্ত প্রেমোচ্ছ্বাসে কোন সাড়া দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অবনীবাবু, সমুদ্রে পড়িলে যেরূপ তৃণ আশ্রয় করিয়া লোক বাঁচিতে চায়, তেমনই সেই কন্যার অন্যত্র বিবাহ ঠিক হইয়া গেলে তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য একটা প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিধিলিপি! কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার বিবাহ অন্যত্র হইয়া গেল, এবং ধরিয়া বাঁধিয়া যেরূপ লোককে বিষ খাওয়ায়, তেমনই অপর একস্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভগবান দাশ তাঁহার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। দুই বিবাহই যথারীতি হইয়া গেল। কিন্তু প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বোধ হয় একটু হাসিলেন। এই প্রেমভঙ্গে অবনীবাবু এত দূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, যে তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আর ছিল না।

বিবাহ হওয়ার চার পাঁচ মাস পরে সেই কন্যাটির এক ভ্রাতা আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন। সেই ছেলেটি সেবার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া সরকারী বৃত্তি পাইয়াছিল, তাহার নাম ছিল 'ন—'। অবনীবাবু সেইবার তৃতীয় শ্রেণীতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছিলেন, এবং 'ন—'এর সঙ্গে একত্র পড়িয়াছিলেন। 'ন—' আমাদের গ্রামে আসিয়া আমাকে বলিল, 'চল্,—অবনীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসি।' আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া অবনীবাবুদের বাড়ী গেলাম। দেখিলাম অন্দরে এক ঘরে অবনীবাবু একখানি খট্টায় শুইয়া বই পড়িতেছেন, খট্টাটার চারিদিকে কাষ্ঠের কারুকার্যময় একটা বেড়া। 'ন—' এবং আমি যাইয়া সেই বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইলাম। 'ন—' জিজ্ঞাসা করিল—'অবনী, কেমন আছ?' অবনীবাবু মাথা গুঁজিয়া বই দেখিতে লাগিলেন, একটিবার মাথা উঁচু করিলেন না, একটি কথা বলিলেন না, কিন্তু দেখিলাম তাঁহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই অবনীবাবু পাগল হইয়া গেলেন। কিন্তু পাগল মানে হাত-পা ছোড়া দৌড়-ধাপ, মারধর করা গোছের নহে; যেন বুদ্ধদেব নির্বাণ-প্রাপ্ত হইয়া সমাধিতে বজ্রাসনে বসিয়া আছেন—একবারে তুষ্ণীম্ভাব। কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বের পুকুরপাড়ে যখন সদ্য বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েরা বাসন মাজিতে আসিত, তাহাদের হাতের চুড়ি ঠুন ঠুন করিয়া কাঁসার থালায় লাগিয়া বাজিয়া উঠিত, তখন যেন বুদ্ধদেবের হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যাইত, তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়া নিশ্চল চক্ষে মেয়েদিগকে দেখিতেন, কিন্তু কোন উৎপাত করিতেন না। বলিতে ভুলিয়াছি—তাঁহার উন্মত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার দুর্ভাগ্য পত্নী ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।

চন্দ্রমোহন দাশের দ্বিতীয় পুত্র যামিনীমোহন দাশ প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া এম. এ.-তে গণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তিনি 'ল' পাশ করিয়া কিয়ৎকাল কুমিল্লায় ওকালতি করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন।

চন্দ্রমোহন দাশের মনের ভাব ছিল, ডেপুটি হইয়া যামিনীবাবু তাঁহার বেতনের টাকা সমস্তই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়া নিজের খরচ বাবদ টাকা চাহিয়া লইবেন। এই ছিল সেকালের দস্তুর। কিন্তু যামিনীবাবু আধুনিক ধরণের ছেলে, তিনি পিতাকে একটি কড়াও দিতেন না। ইহাতে চন্দ্রমোহন দাশ বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ থাকিতেন। কারণ বহুদিবস পূর্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল, তিনি অনেক যত্নে অনেক কষ্টে মাতৃহীন শিশুদিগকে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি মিতব্যয়ী এবং বৈষয়িক ছিলেন, তিনি স্নেহের প্রতিদান প্রত্যাশা করিতেন। আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'ঠাকুরদাদা, ছোট খুড়া (যামিনীবাবু) কি আপনাকে কিছু দেন না?' সেই বিরাট গোঁফের ব্যূহ ভেদ করিয়া একটি অতি দুঃখের, অতি ক্ষুদ্র চাপা 'না' শব্দ বাহির হইল। আমি বলিলাম 'ধরুন, এই জ্যৈষ্ঠমাস, তিনি কি দু-এক ঝুড়ি আম কিনিয়াও আপনাকে খাইতে পাঠান না?' দেখিলাম তাঁহার দুটি চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি আর কিছু না বলিয়া সুমেরু-কল্প বৃহৎ দেহখানি উঠাইয়া ডান হাতে পাখাখানি সঞ্চালন করিতে করিতে অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। এর পরে তাঁহাকে আর অনুসরণ করিয়া প্রশ্নবাণ-বিদ্ধ করা নিষ্ঠুরতা মনে করিলাম।

এর পরে যামিনীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম— 'ঠাকুরদাদাকে আপনি একটি পয়সাও দেন না—এ ব্যবহার কি ভাল করেন?' তিনি বলিলেন 'আমার পিতা আমার মত চারটা ডেপুটি কিনিতে পারেন—তাঁহার এত টাকা আছে। ও সকল বৃথা ও অনাবশ্যক ভালমানুষী আমি করিতে জানি না।'

উভয় পক্ষেরই ভাব দেখিলাম, কিন্তু যামিনীবাবুর কথায় মন সায় দিল না।

যামিনীবাবু বহুদিন তাঁহার স্ত্রী ও কয়েকটি সন্তান তাঁহার বাপের নিকট ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। ৪।৫ বছর এইভাবে চলিয়াছিল। এমন কি যামিনীবাবুর প্রথমা কন্যার বিবাহেরও সমস্ত খরচ চন্দ্রমোহন বাবুকে দিতে হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে যামিনীবাবু ইত্যবসরে কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া লইবেন, এই সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম সময়ে নোয়াখালীর সেটল্‌মেণ্ট অফিসরের কাজ করিয়াছিলেন। তখন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'পাথেয় (travelling allowance) সমেত হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, আমি ৫৩৩৲ টাকা মাসিক পাইব। সেখানে আমি একা প্রাণী। ৩৩৲ টাকায় রাস্তার খরচ সুদ্ধ আমার একার খরচ চলিয়া যাইবে; আর ৫০০৲ টাকা প্রতিমাসে সঞ্চয় করিব।' এই শেষ কথা বলার সময় তাঁহার চক্ষে একটা অপূর্ব উদ্দীপনার ভাব দেখিয়াছিলাম।

আপনারা যামিনীবাবুকে চিনিবেন। ইনি হইতেছেন সেই ডেপুটি, যিনি বিপ্লবী পুত্রের কথা ইংরাজ সরকারকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। সেই ছেলেটিকে আমি জীবনে দেখি নাই। শুনিয়াছি সে অব্যাহতি পাইয়াছিল এবং বিলাতে বহু বৎসর কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাকে ধরাইয়া দিয়া যামিনীবাবু উৎকৃষ্ট কাজ করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে সমস্ত পরিবারকে বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু যেমন বিশাল শাল্মলী তরুবরের ডাল ঝঞ্ঝায় ভাঙিয়া পড়ে, সেইরূপ চোখের সামনে দেখিলাম, সৌম্যদর্শন,

অপূর্ব সহিষ্ণুতার মূর্তি যামিনীবাবু এই ঘটনায় নীরবে শোকে ভাঙিয়া পড়িলেন। আমার খুড়ীমাকে আদালতে পুনঃ পুনঃ যাইয়া সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে, এই অপমান যামিনীবাবু সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি আলীপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল পদগৌরব তাঁহাকে শান্তি বা স্ফূর্তি দিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম গভর্নমেণ্টের উচ্চ কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ ইঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এই অপমান তাঁহার প্রাণে শেলের মত বিঁধিয়াছিল। তারপর নিজের প্রিয় পুত্রের বিরুদ্ধে সস্ত্রীক আদালতের সমক্ষে পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দেওয়া যে কিরূপ মর্মবিদারক কার্য তাহাও সহজে অনুমেয়। তাঁহার শরীর বেশ ভাল ছিল, তিনি কখনও স্বাস্থ্যনীতি লঙ্ঘন করেন নাই। অথচ যে নিদারুণ কষ্টে তিনি ক্রমে হীনবল হইয়া মৃত্যুর কোঠায় পা দিয়া চলিলেন, তাহা আর কি বলিব? আমি একদিন দেখিলাম, তিনি জ্বর গায়ে আলীপুর কোর্টে যাইতেছেন। আমি বলিলাম, 'ছোট খুড়া, আজ না হয় নাই গেলেন।' কিন্তু তিনি কুইনাইনের কোটা দেখাইয়া বলিলেন, 'দ্যাখ্, রোজ ২৫।৩০ গ্রেন কুইনাইন খাই, এইভাবে কাজ করি।' তিন মাস তিনি ঘুসঘুসে জ্বর লইয়া কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না, তখন আর কি করিয়া যাইবেন? মৃত্যু সজোরে আসিয়া তাঁহার কর্মোৎসুক দেহকে নিরস্ত করিয়া রোগশয্যায় কয়েকদিন আটকাইয়া রাখিয়া শেষে শেষ-মুক্তি দিয়াছিল।

ইতিমধ্যে কতদিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, 'ছোট খুড়া, আপনি আমার বেহালার বাড়ী দেখিলেন না, আলীপুরের এত কাছে।' কয়েক বার তিনি আমার এই সনির্বন্ধ আমন্ত্রণের পাশ কাটাইয়া অন্য কথা পাড়িতেন। শেষে আমি নাছোড়-বান্দা হওয়াতে একবার বলিলেন, 'আমার যাইতে ভয় হয়।' তখন বুঝিলাম, অনেক ভয়ের চিঠি আসিয়াছে; পাছে হত্যা করে, এই ভয়ে তিনি কোথায়ও যাইতেন না। কিন্তু তিনি খুড়ীমাতাকে বেহালায় দু-তিনবার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি আমাকে তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়া দু-তিনবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি বাসা পরিবর্তন করিয়াছিলেন, সে বাসা আমি চিনিতাম না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম. এ. আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইবেন এই ভরসা দেওয়ায় এবং তাঁহার মৃত্যু যে এত সন্নিহিত তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি যথাসময়ে যাইতে পারি নাই, তজ্জন্য চিরসন্তপ্ত রহিয়াছি। শেষের দিন গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার বিকার, আমি যাইয়া তাঁহার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে রাখিলাম। তিনি 'কে ও?' বলিয়া একবার চাহিলেন, এবং 'দীনেশ' এই বলিয়া চক্ষু বুজিলেন। তার পর ভয়ঙ্কর কষ্টসূচক কয়েকটি অসংলগ্ন কথা বলিয়া ১০ মিনিট পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার জীবনে কোন অভিশাপের ফল যেন আমি স্পষ্টভাবে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি বা তাঁহার পত্নী তাঁহাদের কষ্টের সঙ্গে যে পিতার মনে দুঃখ দেওয়ার কোন সংস্রব ছিল, তাহা একেবারেই মানিতেন না, বরং সুয়াপুরের পাকা বাড়ীঘর এবং সঞ্চিত টাকার অংশ তাঁহাকে না দিয়া যাওয়ার দরুন তাঁহাদের উভয়েই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

চন্দ্রমোহন দাশ মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ এখন সব্-জজিয়তী করিতেছেন।

কিন্তু তৃতীয় পুত্র কালীমোহন দাশের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহাকে আমি 'কাকা' বলিয়া ডাকিয়া থাকি এবং কথাবার্তায় খুল্লতাতযোগ্য কোন মর্যাদা স্বীকার না করিয়া 'তুই' শব্দ ব্যবহার করি। কাকার মত কালো বঙ্গ দেশে সুলভ নহে; চেহারা লম্বা, সর্বদাই মুখে হাসিটুকু লাগিয়া আছে। লেখাপড়া চর্চাটা বেশী হয় নাই। এন্ট্রান্স ক্লাশে যাইয়াই উপরে উঠিবার পথঘাট না পাইয়া বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইনি চন্দ্রমোহন দাশের প্রিয়পুত্র ছিলেন। যেহেতু লেখাপড়া ভাল না শিখায় ই'হার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতা নিরতিশয় দুর্ভাবনা ভাবিতেন সেহেতু সুয়াপুর গ্রামে যখন চন্দ্রমোহন দাশ পাকা বাড়ী তৈয়ারী করিতেছিলেন, তখন সেই এমারত নির্মাণের ভার দিয়াছিলেন কালীমোহনের উপর। সে টাকা ভাঙিয়া গ্রামবাসীদিগকে পোলাও কোরমা খাওয়াইয়া বেশ যশ-উপার্জন করিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া চন্দ্রমোহন বাবুর দারুণ কষ্ট হইয়াছিল। তিনি ছেলেমেয়েদের ভালবাসিতেন সত্য, কিন্তু সম্রাটের নামাঙ্কিত গোলকের প্রতি তাঁহার মমতা কম ছিল না। যতই কেন রাগ না করুন, মরিবার সময় সঞ্চিত টাকার অনেকাংশ তিনি কালীমোহনকেই দিয়া যান, এবং চেষ্টা করিয়া উহাকে ৪০৲ টাকা মাহিয়ানার একটা কাজ কুমিল্লা কালেক্টরীতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শেষবার চক্ষু মুদিত করিয়া ধরাধাম ত্যাগ করেন।

মনে হইতেছে যেন কালীমোহন 'দাইল-কোম্পানি' কিম্বা অন্য কোনো কোম্পানির নাম দিয়া একটা ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসেন। সেটা একটা মস্তবড় আড্ডার স্থান হয়। বন্ধুরা কৃপা করিয়া সেই দোকানে সন্ধ্যায় পদধূলি দিতেন। কর্তৃপক্ষগণ অভ্যাগত-দিগকে অভ্যর্থনা-পূর্বক প্রত্যেককে দোকানের মিছরি হইতে এক এক প্লাস সরবৎ খাওয়াইতেন, শেষে এমন দাঁড়াইয়াছিল যে রোজ প্রায় ৬০।৭০ প্লাস মিছরির সরবৎ খরচ হইত। এইভাবে সেই কোম্পানির লীলা অবসান হয়। তখন কি এক অপরাধে তাঁহার কাজটি যায়, এবং তিনি পিতৃদত্ত ২০০০০৲ টাকা লইয়া বাড়ী আসিয়া সখের নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা করেন, বোধ হয় তিনি তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণঠাকুর সাজিতেন। দলের প্রত্যেক লোককে এবং আগন্তুকদিগকে পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ ছাগ মারিয়া, পোলাও করিয়া দুই বেলা খাওয়াইতেন। এই অবস্থায় দু-চারি বছর তাঁহার বাড়ীতে এরূপ ধুমধাম চলিল, যেন জাহাঙ্গীর বাদশার বিবাহ হইতেছে। তারপর রৌপ্য-চক্রগুলি ভগবানের সুদর্শন চক্রের ন্যায় আকাশে চলিয়া গেল এবং এখন কালীমোহন দৈন্যের চরম দশায় পড়িয়া ছোট ভাই জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ সব্-জজের দত্ত মাসিক কয়েকটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া কায়ক্লেশে বহু সন্ততিপূর্ণ পরিবার পালন করিতেছেন। তাঁহার হস্তের প্রসার এখনও কমে নাই। যেদিন ভ্রাতৃ-দত্ত টাকা কয়েকটা আসে, সেই দিন রুইমৎস্য ও ভাল সন্দেশ খাইয়া বেজায় স্ফূর্তির সঙ্গে বাগানে বেড়াইতে থাকেন, তার পরদিন হইতে ধার করিবার জন্য এখানে সেখানে ঘোরেন।

কিন্তু ই'হার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ। পরকে খাওয়াইয়াই ই'হার আনন্দ, এবং তাহা না পারিলে যে ইনি কি কষ্ট বোধ করেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভগবান এই নিরীহ উদারপ্রকৃতি লোকটির উপর নির্মম হইয়া যেন শিক্ষা দিতেছেন—কার্পণ্যই প্রশস্ত, মুক্তহস্ততা বিধেয় নহে। অবশ্য কাণ্ডাকাণ্ডবুদ্ধিরাহিত্য ভগবানের

নিকটও অমার্জ্জনীয়।

তিন বৎসর অতীত হইল, আমি সুয়াপুর গিয়াছিলাম। বহুদিন পরে মাতৃভূমি দেখিতে যাওয়া, প্রায় ৩৩ বৎসর পরে। আমার বাড়ীর ভিটার পথেই কালীমোহন দাশের বাড়ী। আমি ঘাটে নৌকা লাগাইয়া তাহাদের বাড়ীতে উঠিয়া ডাকিলাম 'কাকা বাড়ী আছিস?' উত্তরে শুনিলাম 'বাড়ী নাই।' কিন্তু তথা হইতে ফিরিয়া যাইয়া শুনিতে পাইলাম কাকা বাড়ীতে ছিল। আমি এত দিন পরে বাড়ী আসিয়াছি, কিন্তু তাহার হাতে একটা পয়সা ছিল না যে আমাকে জল খাওয়াইয়া আদর করিতে পারে। কাজেই সেই ক্ষোভে ও শোকে সে আমার গলার আওয়াজ পাইয়া তাহার শয্যাগৃহের খট্টার নীচে লুকাইয়াছিল।

কালীমোহনের বাহিরটা যে পরিমাণে কালো, মনটা সেই পরিমাণে সাদা। সে যেরূপ অভাবগ্রস্ত, সেই পরিমাণে ব্যয়শীল। জীবনের অনেক ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও এই সচ্চরিত্র অথচ দুঃস্থ ব্যক্তির প্রতি মনটা সহজেই অনুরাগী হয় এবং ইঁহার সঙ্গসুখের জন্য চিত্ত লালায়িত হইয়া থাকে।

৫

পিতৃদেবের কথা

আমার পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র সেন ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সুয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশব জীবনে তাঁহার মাতুলদ্বয় ভগবান দাশ ও চন্দ্রমোহন দাশের সঙ্গে গ্রাম্য আমোদপ্রমোদ, যথা নৌকা লইয়া নদীতে 'বাছ' দেওয়া, গাছে গাছে উঠিয়া আম পাড়া, প্রভৃতি করিয়া বেড়াইতেন। রঘুনাথ সেন মহাশয় পুত্রটিকে স্বীয় মক্তবে বাংলা ও ফারসী পড়াইয়াছিলেন। পিতা ছোটকাল হইতেই শান্ত-শিষ্ট বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মাতৃহীন বালক; পিতা বৃক্ষরোপণ লইয়া ব্যস্ত, জ্যেষ্ঠতাত শবসাধনায় রত, কে তাঁহাকে দেখিবে? রঘুনাথ সেনেরা তখনও মাতুলের সংসারেই ছিলেন। তাঁহার মাতুল ভ্রাতা রামকুমার দাশের তখনও সন্তানাদি হয় নাই। শ্রীযুক্ত দেবীচরণ দাশ লিখিয়াছেন, 'রামকুমার দাশের পেয়ারের ছিল শিশু ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি তাহাকে জরির জুতা, সাটিনের চাপকান, ইজার ও জরিপাড় চাদর ও নানাপ্রকার মূল্যবান কাপড় পরাইয়া সুখী হইতেন।' বালকের বর্ণ গৌর ছিল না, কিন্তু শ্যামবর্ণের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া রংটি প্রায় গৌরবর্ণকে ধরিবে ধরিবে করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই আদি শিল্পীর নির্মাণকার্য শেষ হইয়া গেল। চুলগুলি কোঁকড়ানো ছিল, আর এতবড় ডাগর পদ্মের পাপড়ির মত চোখ দুটি খুব কমই দেখা যাইত। গৌরবর্ণ না হইয়াও ছেলে দেখিতে এত চমৎকার হইতে পারে, লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া বলাবলি করিত। বুদ্ধি ও কমনীয়তাপূর্ণ চেহারায় মুগ্ধ হইয়া ঢাকা জেলা কোর্টের সরকারী উকিল গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী মহাশয় তাঁহার কন্যা রূপলতা দেবীকে ইঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন; তখন আমার পিতার বয়স ১৫।১৬। মুন্সী মহাশয়ের এই বিবাহে সম্মত হইবার অপর এক কারণ—আমরা কুলীন ছিলাম।

এই বিবাহের পরে পিতৃদেব ঢাকা জেন্দাবহরের গলিতে তাঁহার শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তখন রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্তলিকতা নিরসন বিষয়ক গ্রন্থ ও 'বেদান্তসূত্র' প্রভৃতি বাহির হইয়াছে। পিতৃদেব ঢাকায় আসিয়া ইংরেজী শিখিবার বিশেষ সুবিধা পান, এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভাষায় পারদর্শী হইয়া উঠেন।

তখন ইংরেজী শিক্ষার ফলে যাহা হইত তাঁহার তাহাই হইল, তিনি নব ব্রাহ্মমতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এদিকে আমার মাতামহের আবাসে নিত্য কবিগান, যাত্রা এবং দেবদেবীর উৎসব হইত। কিন্তু আমার পিতা শান্ত ও মৃদুস্বভাব হইয়াও তাঁহার প্রবল প্রতাপান্বিত শ্বশুরের অনুরোধ-উপরোধ এড়াইয়া একটা নির্জন প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া পড়াশুনা করিতেন। তিনি কোন ঠাকুরদেবতার নিকট মাথা নোয়াইতেন না, কোন কোন যাত্রা বা কবিগানের আসরে উপস্থিত হইতেন না, পূজা বা উৎসবে যোগ দিতেন না। কবির দলে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া গাহিত। খেমটা নাচ ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা তখন আসর মাৎ করিয়া দিত। সেই আসর কখনও ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া যাইত, কথকতা ও কীর্তন শুনিয়া লোকেরা অজস্র দান করিয়া ফেলিত, তখন এমনই প্রাণ ছিল, এমনই দান ছিল!

কিন্তু আবার কখনও অতি কদর্য বিকৃত রুচির গান—যাহার নাম ছিল 'লাল', তাহা ছেলেতে বুড়াতে একত্র হইয়া শুনিত। ভোলা ময়রা ও গোপাল উড়ের কথা কে না শুনিয়াছে? এই তো যুগ! শিক্ষিত আধুনিকতন্ত্রী যুবকেরা কবি ও যাত্রার প্রতি যেরূপ বিমুখ ছিলেন, কীর্তন ও কথকতার প্রতিও সেইরূপই বিমুখ ছিলেন। তাঁহারা এ সমাজের ভালমন্দ উভয়ের কিছুই চাহিতেন না; আত্মনিষ্ঠ, স্বীয়শ্রেষ্ঠত্বে নিঃসংশয়, ভাবের শুষ্ক এক ব্রহ্ম-ডাঙায় বসিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেন। আমার মাতুলেরা আমার পিতাকে কিছুতেই আমোদ উৎসবের আসরে টানিয়া আনিতে পারিতেন না, তাঁহাদের চেষ্টার বাড়াবাড়ি হইলে তিনি স্বীয় প্রকোষ্ঠে অর্গল বন্ধ করিয়া ফেলিতেন।

পিতার প্রতিষ্ঠা ঢাকার নব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজে বাড়িয়া চলিল। আমার মাতামহ এরূপ দুর্ধর্ষ ছিলেন যে, তাঁহার কথার প্রতিবাদ তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষ নিজ পরিবারের মধ্যে তাঁহার অখণ্ড প্রতাপের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিলে তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত। অথচ মৃদু স্বভাবাপন্ন পিতা তাঁহার বাটীতে থাকিয়া কোন পূজার উৎসবে যোগ দিতেন না, কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা দেব-প্রতিমার নিকট মাথা নোয়াইতেন না। প্রকাশ্যে কোন বক্তৃতা করিয়া প্রতিবাদ তিনি করিতেন না, কিন্তু ঐরূপ কোন বিষয়ে আদিষ্ট হইলে, তিনি তাঁহার বড় দুটি শান্ত চোখে আমার মাতামহের দিকে চাহিয়া বিনীত সহকারে বলিতেন 'আমি পারিব না', ফুলদলে যেন শাল্মলীতরু কাটা যাইত; মাতামহ ভিতরে যতই কেন বিরক্ত না হউন, তাঁহার শান্তস্বভাব ধীর গম্ভীর জামাতার কাছে যেন নিতান্তই হীনবল হইয়া পড়িতেন, কারণ তিনি জানিতেন আমার পিতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি মৃদুভাবে বলিলেও সে কথার পশ্চাতে দুর্জয় নৈতিক শক্তি লুক্কায়িত আছে। এ কথার উপর জোর করিলে তিনি জামাতাটিকে চিরদিনের জন্য হারাইবেন; তিনি সে বাড়ীতে আর তিলার্ধকাল থাকিবেন না, এবং আমার মাতামহী তাহা হইলে অন্নজল ত্যাগ করিবেন এবং মাতামহেরও নিন্দার অবধি থাকিবে না, কারণ পিতৃদেবকে তাঁহার চরিত্রের গুণে চাকরবাকর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত।

ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও আমার পিতৃদেবকে মাতামহ অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। কোন সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার কথা শুনিলেই তাহা স্থির বিশ্বাস করিতেন। 'ঈশ্বর ইহা বলিয়াছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঘটনা এইরূপ।' সত্যবাদী বলিয়া তিনি পিতাকে জানিতেন এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মত লইয়া কার্য করিতেন।

আমোদপ্রমোদের বিরুদ্ধে স্বগৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া তিনি কিভাবে সময় কাটাইতেন, তাহা তাঁহার রচিত 'সত্যধর্মোদ্দীপক নাটকে' কবিতার ছন্দে লিখিত আছে।

বাসনা যদ্যপি হয় আলোক দর্শনে।
চল মন হেরি গিয়ে সুদৃশ্য গগনে॥
সুধেন্দু যথায় করে নিত্য বিচরণ।
লইয়া নক্ষত্র সব অনুচরগণ॥

নৃত্য সন্দর্শনে যদি হও আকিঞ্চন।
কেন মন নাহি যাও শিখীর ভবন॥
সংগীত শ্রবণে যদি হও ব্যাকুলিত।
বিহঙ্গম গানে মন হবে প্রফুল্লিত॥
উচ্চাসন নিম্নাসন দ্বেষের কারণ।
নাহি ভেদাভেদ তথা করিতে দর্শন॥
অনায়াসে লব্ধ তারা সবাকার ঠাঁই।
ভূপতি দরিদ্রে কিছু বিভিন্নতা নাই॥

অবশ্য নৃত্য দর্শন করিতে হইলে যে রূপসীকে একেবারে বর্জন করিয়া ময়ূর-ময়ূরীর পেছন পেছন ছুটিতে হইবে এবং চন্দ্র-নক্ষত্র-ভূষিত আকাশ দেখিয়াই যে আমরা দীপোজ্জ্বল হর্ম্যরাশির উৎসবের প্রতি বিমুখ হইয়া বসিব—একথা আমি মানিয়া লইতে পারিব না। কিন্তু সেকালে ব্যভিচারের স্রোত এরূপ চলিয়াছিল, যে নৈতিক বলসম্পন্ন দৃঢ়চরিত্র ও পবিত্রচেতা যুবকদিগের এই সকল আমোদপ্রমোদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল ভ্রূক্ষেপশূন্য প্রতিকূলতা দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। নৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পিতৃদেব বীরের ন্যায়ই যুঝিয়াছিলেন।[১]

সম্ভবত ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের ভাষা সেই আমলের ভাষার পক্ষে বেশ সরল রচনা, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস রচিত হয় নাই, তখনকার কবি ছিলেন রঙ্গলাল এবং দ্বারকানাথ অধিকারী।

তাঁহার রচনার উৎকৃষ্ট অংশ শেষের দিকে ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, যাহা পাইয়াছি তাহা হইতেই কিছু নমুনা দিতেছি—

[১] ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা লন্ডনের 'এসিয়াটিক রিভিউ' পত্রিকায় আমার একটি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়—তাহাতে পিতৃদেব সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে :

Mr. Sen's maternal grandfather was a typical Bengalee Country gentleman, lavish in expenditure on the musical plays called yatras and other such amusements, which being performed before the family temple are held to give pleasure to gods as well as to mortals. All such dissipations were uncongenial to Mr. Sen's father who thought them at once frivolous and irreligious. He was something of an authority on the doctrines of Samaj and wrote books on the subject. He also composed hymns and spiritual songs, one of which is roughly translated to the following effect, "My soul, if you would enjoy the sight of beautiful dancing, what need is there to frequent gaudily-dressed dancing girls? What is more entrancing than the dance of the peacock? What bayadere's dress can compare with his splendid attire? And if you love the brilliant midnight illumination of royal palaces, what can compare with the glorious firmament where the moon holds court among his minister stars? In courtly entertainments a petty question of precedence may cause jealousy and heart-burning, but here is an entertainment open to all, king and cowherd alike."

'দুর্গানন্দ—ভাল, পূর্বে যখন আপনার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের সভায় বিচার হইয়াছিল, তখন তো আপনি শাস্ত্র ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এক্ষণে যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিতেছেন, এমন অকস্মাৎ পরিবর্তন কি প্রকারে হইল?

'ব্রহ্মানন্দ—হাঁ, তখন ব্রাহ্মরা বৈদান্তিক ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু যেমন পৃথিবীর প্রাক্কাল হইতে সমুদয় বিষয়ই উন্নতিলাভ করিতেছে, তেমনই ধর্মমতও এক্ষণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে।

'দুর্গানন্দ—আশ্চর্য! আপনি যে সমুদয় বিষয়েই এককালীন বিপর্যয় ভাবাবলম্বন করিয়াছেন; কেন না পৃথিবীর কোন বিষয়েই এক্ষণে উন্নতি লাভ হয় নাই বরং কুকর্মেরই উন্নতি হইয়াছে। সত্যযুগে কিদৃশ সমতা ভাব ছিল, ধর্ম যেন তৎকালে পৃথিবীতে মূর্তিমান ছিলেন। দ্বিধাভাব কাহাকে বলে, তখন তাহা জানিত ছিল না। তবে কি প্রকারে পৃথিবী উন্নতিশালিনী হইল?

'ব্রহ্মানন্দ—পৃথিবীর সকল বিষয়ে কি উন্নতি হয় নাই? দেখুন, পুরাকালে মানুষেরা বৃক্ষকোটরে এবং মৃত্তিকার নীচে গর্ত খনন করিয়া অবস্থান করিত। এক্ষণে সুরম্য মনোহারী হর্ম্যাবলী শিল্প-কার্যোন্নতি পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। লৌহের গুণ অপরিচিত থাকায় পূর্বে কেবলমাত্র বাহুযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধই প্রচলিত ছিল, ক্রমে লৌহের গুণ প্রকাশিত হইলে অস্ত্রযুদ্ধ, পরে বাণযুদ্ধ প্রচলিত হয়, তৎপরে চীনদেশে বারুদের গুণ আবিষ্কৃত হওয়া অবধি বন্দুক দ্বারা যুদ্ধের কি অপূর্ব উন্নতি হইয়াছে! ইলেকট্রিক, টেলিগ্রাফ, রেল রোড ও অর্ণবযান, পদার্থ-বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি পক্ষে...সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিদ্যার প্রভাবে মনের ক্ষুদ্রত্ব দূর হইয়া কি পর্যন্ত প্রশস্ততা লাভ হইয়াছে, তাহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে সহজেই প্রতীতি হইতে পারে। সর্বপ্রথমে বর্ণপরিচয় অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়াই একে অন্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মরণ রাখিতেন, তজ্জন্যই শ্রুতিশাস্ত্রের নামোদ্ভূত হয়। বর্ণজ্ঞান উপলব্ধি হওয়া অবধি অলক্তক দ্বারা তৎসমুদয় ভূর্জপত্রে এবং তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইত। তদুন্নতি পক্ষে এক্ষণে কাগজ, মসী ও মুদ্রা-যন্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।...সনাতন ব্রাহ্মধর্মরূপ চন্দ্র কাল্পনিক পৌত্তলিক মত রূপ রাহু দ্বারা কবলিত হইয়া এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অস্মদ্দেশে কি প্রকারে সেই গ্রাস পরিত্যক্ত হইয়া উহার বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।...যেমন কোন গ্রন্থ প্রচার সময়ে বিশেষ রূপ আদৃত হইবার জন্য কোন সুবিখ্যাত জগন্মান্য গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হইয়া থাকে, ব্রহ্মার বেদ প্রকাশ করাও ঠিক সেইরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি ব্রহ্মারই বেদ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে চন্দ্র, সূর্য সদৃশ জ্যোতির্ময় অক্ষরে সর্বস্থানব্যাপক গ্রন্থ অবশ্যই প্রচার করিতে পারিতেন।'...

ইহার পরে আছে যে ব্রহ্মা যে সেরূপ গ্রন্থ প্রচার করেন নাই তাহা নহে, মানবের মনই সেই মহাগ্রন্থ।

পিতৃদেব দিনাজপুরের একখানি মৌলিক ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা ছাপা হইলে ২।৩ শত পৃষ্ঠা হইত। সেই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমারই অবহেলায়

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মুদ্রিত দুইখানি বইয়ের বহু খণ্ড আমাদের বাড়ীতে ছিল, আমি যখন এল. এ. (বর্তমান আই. এ.) ক্লাসে পড়ি, তখনও সেগুলি ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তখন আমি সেগুলির প্রতি কোনরূপ যত্ন দেখাই নাই। পিতৃদেব কখনই ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু এই সকল পুস্তক যখন আমারই অনবধানতায় প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তখন একদিন বলিয়াছিলেন, 'এগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছ, কিন্তু এক সময়ে হয়ত খুঁজিবে, তখন পাইবে না।' তাঁহার আশঙ্কা ফলিয়াছে, আমি অনেক অর্থব্যয় করিয়া বহু চেষ্টায়ও মুদ্রিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-রত্নাবলী'র এক খণ্ড পুস্তক এমন কি একখানি পত্রও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ব্রাহ্মধর্মে একান্ত অনুরাগী হইয়াও তিনি নবযৌবনে একটি সরস্বতীর স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে। স্তোত্রটি এই—

'সারদে বরদে বাণী, নারায়ণী বীণাপাণি,
তারো মাগো সর্বপ্রাণী, ভবভয়ভঞ্জিনী।
মণ্ডিত মল্লিকামালা, দশদিক্ করে আলা,
ভুবনমোহিনী বালা, সর্বমনোরঞ্জিনী।
ত্বমাদ্যা প্রকৃতি সতী, অগতি জীবের গতি।
ত্বং হি মাতা ভগবতী, গিরিরাজনন্দিনী।
কোমলাঙ্গী সিতচ্ছবি, উজ্জ্বলা জিনিয়া রবি,
চরণাবনত কবি, সুররাজনন্দিনী।
সরাগ রাগিণী রঙ্গে, তালমান সুপ্রসঙ্গে,
অমর অমরী সঙ্গে, নৃত্যগীতরঙ্গিণী।
আসরে আসিয়া উর, অজ্ঞানের আশা পূর,
সুরেশ্বরী মহাশূরে হরিহরসঙ্গিনী।'

তখন ঢাকা জেলার তেঁতুলঝোরা নিবাসী ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় সেকালের ডেপুটি ছিলেন। তিনি নব্যতন্ত্রী; ব্রাহ্মধর্মে তাঁহার এরূপ আস্থা ছিল এবং সমাজ-সংস্কারে তিনি এরূপ উদ্যোগী ছিলেন যে, তিনি তাঁহার বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ঘটনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের অন্যতম ফল, এবং সমাজের প্রাথমিক সংস্কারচেষ্টা। সম্প্রতি ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের যে বৃহৎ জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে আমার পিতৃদেবের নাম আছে এবং তাঁহার সহিত যে ব্রজসুন্দর বাবুর সর্বদা পত্রব্যবহার চলিত, তাহারও উল্লেখ আছে। ব্রজসুন্দর বাবু ঢাকায় নব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। পিতৃদেবের আর একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ 'সদ্ভাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ইনি আমাদের সুয়াপুর গ্রামের অভয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের উদ্যমকালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। 'সীতার বনবাসে'র কবি নবসমাজের বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় হরিশ্চন্দ্রবাবু পিতৃদেবের অন্যতম সুহৃদ্।

পিতৃদেব তাঁহার পিতার নিকট ফারসী শিখিয়াছিলেন, আমার মাতামহের বাড়ীতেও ফারসীবিদ্যার খুব প্রচলন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের হাতের লেখা একখানি ফারসী কাগজ আমার নিকট ছিল, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ঐ কাগজখানি ধামরাই গ্রামবাসী ময়ুরভঞ্জ এস্টেটের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বসু বি. এল. মহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন।

পিতৃদেব ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সে আমলে লোকে এডিসনের স্পেকটেটার, জনসনের র‍্যামব্লার এবং রাসেলাস, লাইফ অফ এম্পারার চার্লস দি ফিফথ, আলেকজান্ডার পোপ, গোল্ডস্মিথ ও ড্রাইডেনের কবিতা—এই সব পুস্তক বেশী পড়িতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই সমস্ত পুস্তক খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকাগারে তাঁহার নিজ হাতের নোটসুদ্ধ এই সকল পুস্তক আমি ছোট-কালে দেখিয়াছি।

তিনি ইংলিশম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং ইংরাজী ও বাংলায় দাঁড়াইয়া অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সেকালের ব্রাহ্মসমাজে ততটা গোঁড়ামি ছিল না। এইজন্য ঈশ্বরচন্দ্র সমাজে দীক্ষিত না হইলেও ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে উপাচার্য হইয়া বেদীর উপর হইতে বক্তৃতা করিতেন। ঢাকার তখনকার প্রকাশিত কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহার বক্তৃতাগুলি প্রায়ই প্রকাশিত হইত। সেই পত্রিকাগুলি আমি শৈশবে ঘুড়ি বানাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলাম। জীবনে একদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। মানিকগঞ্জের একজন সর্বজনপ্রিয় মুন্সেফ স্থানান্তরিত হওয়ার সময় তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে মহতী সভার অধিবেশন হয়, তখন তিনি যেরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাঁহার বন্ধুর গুণগরিমা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সহজ সরলভাবে কথা বলার মত ছিল না। তাহা বড় বড় সমাসবদ্ধ পদাড়ম্বরে উদ্দীপনাময় হইয়া উঠিত, কোন স্থানে যতিভঙ্গ বা তালভঙ্গ হইত না। সমানভাবে ওজস্বিতা রক্ষা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া শেষে সপ্ততন্ত্রীর তান যেরূপ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়ে, সেই ভাবে শেষ হইত।

পিতৃদেবের আর এক প্রিয়বন্ধু ছিলেন, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি বহুকাল ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে নেতৃত্ব করিয়া কয়েক বৎসর হইল স্বর্গলাভ করিয়াছেন। ইঁহার এক কন্যাকে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিবাহ করিয়াছেন। ধামরাই স্কুলে পিতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং নবকান্তবাবু দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করিতেন। পরম শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখে আমি পিতার প্রশংসাসূচক অনেক কথা শুনিয়াছি। ঢাকায় পিতৃদেব কয়েক বৎসর ওকালতি করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ পশার হয় নাই। তিনি সর্বদা থিওডোর পার্কারের গ্রন্থ লইয়া থাকিতেন, মক্কেলের কাজের দিকে বিশেষ কোন দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার আদর্শ জীবন ছিল সচ্চরিত্র দরিদ্রের জীবন। বড়লোকদিগের ব্যভিচার-দুষ্ট সংসর্গ তিনি ঘৃণা করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি ধামরাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, ১৮ বৎসর তিনি এই শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

এই শিক্ষকতাকালে তিনি ধামরাই স্কুলটি ঢাকা-বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। ইঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কৃতী হইয়া দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা

লাভ করেন। স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান মিস্টার অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় আমার নিকট-জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে খুল্লতাত ছিলেন। ইনি পিতার আশ্রয়ে থাকিয়াই ধামরাই স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। পিতাই তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্মে মত লওয়াইয়াছিলেন। ইনি যখন পিতৃদেবের কথা বলিতেন, তখন মনে হইত, তাঁহারই চরিত্র ও সাধুজীবনের আদর্শ অনুকরণ করিতে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। পিতার আর এক ছাত্র স্বনামধন্য ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'পিতার প্রভাব তাঁহার সমস্ত ছাত্রের জীবনেই কোন না কোন রূপে লক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু আপনি এরূপ গোঁড়া হিন্দু রহিয়া গেলেন কিরূপে?' তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমিও তাঁহার প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলাম, শেষে মতিগতি ফিরিয়াছে।' তাঁহার আর দুই ছাত্র গৌহাটি জেলা কোর্টের সর্বপ্রধান উকিল স্বর্গীয় দীননাথ সেন, এবং বাঁকিপুরের ভূতপূর্ব উকিল ব্রজেন্দ্রকুমার দাশ, (ইনি ওকালতীতে অনেক টাকা উপার্জন করিতেছিলেন, হঠাৎ বৃন্দাবনে গিয়া সর্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন)। পিতার জীবনের প্রভাব যে তাঁহার উপর বিলক্ষণ পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুদিন হইল তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন 'তোমার পিতা আমারও পিতাই ছিলেন।'

সুয়াপুরবাসী স্বনামধন্য স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়—যিনি 'আলো ও ছায়া'র কবি শ্রদ্ধাস্পদা কামিনী সেনকে বিবাহ করেন, এবং যাঁহার তিন পুত্র এখন সিভিল সার্ভিস অলংকৃত করিতেছেন—তিনিও পিতার নিকট শৈশবে পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।

পিতৃদেব রচিত দ্বিতীয় পুস্তকের নাম 'ব্রহ্মসংগীতরত্নাবলী', ইহাতে রাজা রামমোহন রায়ের ভাবে অনেকগুলি ব্রহ্মসংগীত বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি আমার জন্মের (অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের) দুই তিন বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। 'ব্রহ্মসঙ্গীতরত্নাবলী' হইতে কয়েকটি গান নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রহ্মসঙ্গীত-সংগ্রহের প্রথম সংস্করণে সংকলিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত প্রকাশিত দুইখানি পুস্তকই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'সত্যধর্মোদ্দীপক নাটকে'র কয়েকটি পত্র মাত্র আমার নিকট আছে।

অষ্টাদশ বর্ষকাল পিতৃদেব ধামরাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মার্টিন, উড্রো ও অন্যান্য ইন্সপেক্টর সাহেবদের লিখিত তাঁহার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্র আমাদিগের গৃহে ছিল। তাঁহারা একবাক্যে পিতৃদেবের শিক্ষাপদ্ধতি ও স্কুলের সাফল্য সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব সম্বন্ধে মানিকগঞ্জের উকিল-সরকার আমার পূজনীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন :— 'ঈশ্বরচন্দ্র ধামরাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, পরে কমিটি পাশ করিয়া এখানে উকিল হন। তাঁহার সময়ে তিনিই একমাত্র ইংরেজী-জানা উকিল ছিলেন এবং বাংলানবীশ উকিলেরা তাঁহাকে ঈর্ষা করিতেন এবং হাকিমেরা তাঁহাকে খুব সম্মান করিতেন। তাঁহার মক্কেলেরা তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত।' বাঁকিপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ৭৫ বৎসর বয়স্ক ব্রজেন্দ্রমোহন দাশ এখন সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে আছেন, তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। তিনি পিতৃদেবের সম্বন্ধে একখানি সুদীর্ঘ পত্র ইংরাজীতে লিখিয়াছেন। তিনি পিতৃদেবের ঋণ যে

ভাবে স্বীকার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া স্বতঃই গৌরব বোধ করিতেছি—তাহা ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সকলগুলি কথাই ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের পত্রে আছে; চন্দ্রশেখর বাবু তৎসময়ের শিক্ষাদীক্ষার যে আনুষঙ্গিক চিত্র দিয়াছেন, তাহা পূর্ববঙ্গের অতীত সামাজিক-ইতিহাসের একখানি যথাযথ আলেখ্য, এই জন্য দীর্ঘ হইলেও পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি।

'স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় ও ধামরাই স্কুল'

'আমার শিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে শালকাঠের পিঁড়ার উপর খড়িমাটি দিয়া পিতৃদেব মহাশয় 'ক' 'খ' লিখিয়া দিতেন, তাহার উপর খড়িমাটি দিয়া মক্‌স করিতে করিতে কতকগুলি বর্ণের লেখা ও নাম অভ্যস্ত হইল। পরে তালপত্রে লৌহশলাকা দিয়া বর্ণগুলি লিখিয়া দিতেন। এইরূপ লেখাকে 'আঁচড়া' বলিত। আমরা মসী দ্বারা ঐ সমস্ত 'আঁচড়া'য় লিখিয়া লিখিয়া মক্‌স করিয়া যাইতাম। শুষ্ক তালপত্র সহজে ফাটিয়া ভাঙিয়া যায় বিধায় উহা ব্যবহারের পূর্বে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে বহুকাল স্থায়ী হইত। সিদ্ধ করা তালপত্রে প্রাচীন সমস্ত পুঁথিই লিখিত হইত। তাহা অনেকের ঘরেই এ পর্যন্ত উৎকৃষ্ট অবস্থায় বর্তমান আছে। তালপত্রে লিখা অভ্যাস হইলে কদলীপত্রে লিখিতে অভ্যাস করি। তৎপশ্চাৎ কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এই অবস্থায় শিশুরা বলিত 'আমি কাগজে উঠিয়াছি' অর্থাৎ কাগজে প্রমোশন পাইয়াছি। ইহা একটি উচ্চ শ্রেণী। সেকালে অনেক গ্রামে এবং অনেক পাড়ায় একজন 'গুরুমশাই' পাঠশালা করিতেন। প্রাতঃকালে এই পাঠশালা বসিত এবং ৮টার সময় ছুটি হইত। পরে বৈকালে ৩।৪ টার সময় পাঠশালার কার্য হইত। প্রতিপদ এবং অষ্টমীতে এবং পর্বদিনে ছুটি ছিল। সকল শিশুই বসিবার জন্য ছোট ছোট পাটি-মাদুর 'ধাড়ি'-'মোলা' ইত্যাদি এবং নিজের লিখার জন্য তালপত্র, কলাপত্র এবং দোয়াত-কলম সঙ্গে লইয়া যাইত। পূর্বে বাঁশের কলমেরই অধিক ব্যবহার ছিল, তাহাতে একটি পয়সাও ব্যয় হইত না। পরে ক্রমে খাগ, 'ওয়াস্থি-খাগ', ঢেকীলতা, ইত্যাদি কলম ক্রয় করিতে হইত। তন্মধ্যে ওয়াস্থি-খাগের কলমই মূল্যবান; বড় বড় জমিদার এবং মহাজনেরাই ইহা ব্যবহার করিতেন, এবং এই কলম দেশী কর্মকারের প্রস্তুত ছুরি দিয়াই কাটা যাইত। পরে 'সোয়ানের পেন' 'রাজহাঁসের পেন' এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে রজর্সের (Rogers) ছুরি আমদানী হইয়া পড়িল। তৎপরে 'নিব' 'হ্যান্ডেল' ইত্যাদি আমদানী হইল। ইহাতে সামান্য লেখনীর জন্য—যাহার জন্য এক পয়সা ব্যয় ছিল না—তাহারই জন্য ভারতবর্ষ লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশের পায়ে ঢালিয়া দিতেছে। পূর্বে জমিদারদের, মহাজনদের খাতা ও অন্যান্য দলিলপত্র ইত্যাদির লিখনসময় বালি দ্বারা 'ব্লটিং'-এর কাজ চলিত এবং তাহাতে কালির অক্ষর ঠিক থাকিত, এখন সহজ-লভ্য মূল্যহীন 'ব্লটিং'-এর (বালির) পরিবর্তে ব্লটিং কাগজ আসিয়া বহু টাকা নিয়া যাইতেছে।

'গুরুমহাশয়ের পাঠশালা খোলা জায়গায় পত্রপূর্ণ বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিত। আমাদের পাঠশালা স্বর্গীয় রামনাথ মালাকারদের বকুলতলার নীচে বসিত। আমরা

মৃত্তিকার উপর ছোট ছোট পাটি বিছাইয়া লিখাপড়া করিতাম। এতাদৃশ খোলা বাতাসে শিক্ষা (open air teaching) অতি স্বাস্থ্যকর ও স্ফূর্তিপ্রদ ছিল। তাহার সুফল আমরা এখনও ভোগ করিতেছি। প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জ অর্থাৎ এই লর্ড হার্ডিঞ্জের ঠাকুরদাদা এদেশে বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই বাঙ্গালার অনেক স্থানে বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে ধামরাইয়ে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপিত হয়। তাহাতে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জনিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণগোবিন্দ দে মহাশয় সর্বাগ্রে শিক্ষক হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে 'মাষ্টারমশাই' বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে রোয়াইলের শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয় এবং সুয়াপুরের ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় এবং বিক্রমপুর আউটশাহীর আনন্দ পণ্ডিত মহাশয় এবং জপসার প্রসিদ্ধ বৈদ্যসরকার-বংশোদ্ভব হাইকোর্টের উকিল প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের পিতা দীননাথ সেন মহাশয় আমাদের এই গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক হইয়া আসেন। এই ধামরাই স্কুলটি ঢাকা জেলার মধ্যে প্রায়ই ১ম, ২য় ইত্যাদি ভাবে উচ্চ স্থান অধিকার করিত। স্কুলের ছাত্রেরা শিক্ষক মহাশয়দিগকে বিশেষ ভক্তি ও ভয় করিত। শিক্ষক মহাশয়েরাও ছাত্রদিগকে বিশেষ স্নেহ ও যত্নের সহিত তাহাদের উন্নতিকল্পে সদুপদেশ ও শিক্ষা দান করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা সানন্দে ক্রীড়াকৌতুক এবং গল্পচ্ছলে তাহাদের সহিত সময় কাটাইতেন। আমরা অসময়ে রাস্তায় খেলা আরম্ভ করিলে সেই সময় রাস্তায় কোনও শিক্ষক মহাশয়কে দেখিলে ছুটিয়া পালাইয়া যাইতাম। কৃষ্ণগোবিন্দ মাষ্টার মহাশয় একটু কড়া ছিলেন, কোনও ছাত্র তাঁহার নিকট পড়িলে তাহাকে ধমকাইয়া বা কান মলিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেন।

'প্রথমে ধামরাই স্কুলের নিজস্ব কোনও ঘর ছিল না। ঠাকুর মাধবের যাত্রাবাড়ী অর্থাৎ গুঞ্জবাড়ীতেই স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। ঈশ্বর বাবুর যত্নে পরে থানার পুকুরের উত্তর পাড়ে খড়ের ছাউনি সহ এক প্রকাণ্ড আটচালা প্রস্তুত হইল। তাহার মেজে ও দেওয়াল কাঁচা মাটির নির্মিত ছিল। ভুঁইমালী নামক একজাতীয় লোক আছে তাহারা মাটি কাটে, ভিটা বাঁধে, দেওয়াল দেয়, ঘর নিকায়। ভুঁইমালী দ্বারাই মেজে দেওয়াল ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল। ঘরের মেজেতে সময় সময় অত্যন্ত ধূলা হইলে আমরা কথিত পুকুর হইতে ভাঁড়ে ভাঁড়ে জল আনিয়া মেজে নিকাইয়া দিতাম, তখন আমাদের আনন্দ-স্ফূর্তি কত! ঐ সময় মাষ্টার মহাশয়রাও একটু একটু উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন, তাহাতে আমাদের উৎসাহ আরও বর্ধিত হইয়া যাইত। শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় তখন আমাদের হেডমাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা যেটুকু পড়াইতেন তাহা ছাত্রদিগের হৃদয়ে গাঁথিয়া থাকিত। ফুল ও ফল বাগান করিতে তাঁহার নিতান্ত সখ ছিল। স্কুলের চতুর্দিকে অনেক জমি ছিল। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা জঙ্গল কাটিয়া ঐ সমস্ত স্থান পরিষ্কার করিলাম। সেই স্থানে আবশ্যকমত বেড়া দিয়া তাহাতে অনেক প্রকার ফুলের গাছ রোপণ করা হইল। ঈশ্বরবাবু সুয়াপুরে নিজের বাড়ীতেও আম লিচু ইত্যাদি অনেক প্রকার ফলের গাছ এবং ফুল গাছ রোপণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বাড়ীখানি সুস্নিগ্ধ ছায়াময় নির্জন ছিল। যেদিন আমরা তাঁহার বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করিলাম, তখন মনে হইল যেন কোনও মুনি-নিকেতনে প্রবেশ

করিয়াছি। ঈশ্বরবাবুর স্ত্রী অতি স্নেহময়ী ছিলেন। তাঁহার আদর ও স্নেহে যে কত পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তাহা এখনও স্মৃতিতে উপস্থিত হইলে বিশেষ আনন্দ উদ্ভূত হয়। এথায় ভগবানের একটি আশ্চর্য খেলার কথা উল্লেখযোগ্য। হেড মাষ্টার ঈশ্বরবাবুর একটি গাভী ছিল, গাভীটির ষাঁড় বাছুরই প্রসব হইত এবং তাঁহার স্ত্রীরও কন্যাসন্তানই জন্মিত। এইরূপে অধিক পরিমাণে কন্যাসন্তানই হইল, তখনও তাঁহার কোনও পুত্রসন্তান জন্মে নাই। এই রহস্যের মর্মকথা বিধাতা পুরুষ ছাড়া কে বলিবে? গাভীটি যেবার মাদী বাছুর প্রসব করিল, সেইবারেই আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান দীনেশচন্দ্র সেন ভায়ার জন্ম হইল। দীনেশ বাবুর চেহারা মুখের গঠন, বর্ণ, চক্ষু, চাহনি, হাস্য ঠিক পিতৃ অনুরূপ হইয়াছে। দীনেশ বাবুর পিতা পূর্ববঙ্গের বৈদ্যদিগের মধ্যে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন কুলীন। তিনি তৎকালীয় ঢাকার গভর্নমেণ্ট উকিল বগজুরীনিবাসী গোকুল মুন্সী মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী পরমা সুন্দরী গৌরবর্ণা ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন। সর্বদাই সস্মিত বদন ছিল; সংসারের গৃহকার্যাদি নিজেই সমাধা করিতেন। তাঁহার শরীর আমরা বেশ সুস্থ দেখিয়াছি। সেকালে এমন কি ৪০।৫০ বৎসর পূর্বেও পূর্ববঙ্গে স্ত্রীলোকেরা কপালে এবং নাসিকায় গোধনী অর্থাৎ উলকি লইতেন। তখন উহা এক সৌন্দর্য-বৃদ্ধির একটি পাকা চিহ্ন মধ্যে গণ্য ছিল। তাঁহারও কপালে এবং নাসিকায় উলকি ছিল। ঈশ্বরবাবু অনেকদিন সপরিবারে ধামরাইয়ে রামগতি কর্মকারের বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন। তখন সর্বদাই আমরা তথায় যাইতাম। আমার মা ছিলেন না বলিয়া তাঁহার স্ত্রী আমাকে স্নেহ করিতেন। একবার তাঁহাদের সুয়াপুরের বাড়ীর বাগানের নিচুফল আমাদিগকে খাইতে দিলেন। ইতিপূর্বে আমরা কখনও নিচুফল দেখি নাই। উহা খাইয়া অপূর্ব পরিতৃপ্তি পাইলাম। আমাদের গ্রামে তখনও নিচু গাছ ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে আমার মুখে রামায়ণ-কীর্তনিয়াদের ২।৪টি পদ শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং নাচিয়া নাচিয়া উহা গাহিতে বলিতেন। আমার কোনও কালেই সুর ও রাগিণী ছিল না। তবুও তিনি আমাকে নির্বন্ধাতিশয়ে গাহিতে বলিতেন। তাঁহার নাম ছিল রূপলতা, তিনি রূপে গুণে ও স্নেহে, দেবী ও জননী-বিশেষ ছিলেন।[১]

'ইহার পরে হেডমাষ্টার বাবু, আনন্দ পণ্ডিত মহাশয় ও সেকেণ্ড মাষ্টার দীননাথ সেন মহাশয়ের সহিত বাজারের প্রান্তে বাসা করেন। উহা পূর্বে বালিয়াটির জগন্নাথবাবুর কাছারী-বাড়ী ছিল। তাহার পাশেই গোয়ালাদিগের বাড়ী। আমরা পাঠ বলিয়া লইবার জন্য কয়েকটি বালক তথায় প্রাতে যাইতাম। এবং তাঁহাদের প্রাতের রান্নার অসুবিধা হইলে, কালীচরণ চক্রবর্তী নামক একটি ব্রাহ্মণ বালক তাঁহাদের নিকট থাকিতেন, তিনিই রান্না করিতেন। তাঁহার অসুখ হইলে, আমরা রান্না-বান্না করিয়া দিয়া আসিতাম। কথিত কালীচরণ চক্রবর্তী সদ্বংশজাত এবং সৎস্বভাবান্বিত ব্রাহ্মণ বালক। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের 'শিল্পদর্শন' পাঠ করিয়া ভাল সোরা প্রস্তুত করিবার শিক্ষা পাইলাম। তাহাতে লিখা ছিল, গোয়ালঘরের মেজেতে

[১] চন্দ্রবাবু স্ত্রীপ্রত্যয়ে সাঁ, তস্যা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সাঁ স্থলে 'তিনি' 'তস্যার' স্থলে 'তাঁহার' লিখিয়াছি।

শীতকালে লবণের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে। উহা সোরা নামক পদার্থ (Saltpetre)। ইহা চাঁচিয়া সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় এবং জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ধোপারা যেমন করিয়া ক্ষারের জল বস্ত্রমধ্যে বাঁধিয়া টেপান ফেলিয়া প্রস্তুত করে, সেইরূপে সোরার জলও প্রস্তুত করিতে হয়। এই টেপান জল যত মাটিশূন্য ও পরিষ্কার হইবে ততই সোরা পরিষ্কার দেখাইবে। নিকটস্থ গোয়ালাদের গোয়াল হইতে আমরা ঐ সোরা সংগ্রহ করিলাম এবং তাহার জল কথিত প্রকারে টেপান ফেলিয়া প্রস্তুত করা হইল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, কাঠের পরিবর্তে আমপাতার জ্বালে অতি উৎকৃষ্ট সোরা তৈয়ার হয়; সোরার কলমগুলি মোটা এবং সুদীর্ঘ হয় এবং বর্ণও পরিষ্কার হইয়া থাকে। আমরা তাঁহার উপদেশানুযায়ী আমপাতার জ্বাল দিয়া যে সোরা প্রস্তুত করিলাম তাহা ফলত অতি উৎকৃষ্ট হইল। সোরা বিক্রেতারা বলিল এরূপ উচ্চাঙ্গের সোরা বাজারে কমই পাওয়া যায়। মাষ্টার মহাশয়েরা আমাদের এই কার্যে প্রবর্তিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বিশেষ উৎসাহ দিলেন। এই সোরা দিয়া যে বারুদ প্রস্তুত করিলাম তাহাও উৎকৃষ্ট হইল। ইহা বন্দুক-ব্যবহারে চীনা বারুদের ন্যায় কাজ করিত। মাষ্টার মহাশয়দের বাসায় অনেক প্রকার ক্রীড়াকৌতুকের স্থানও ছিল, এবং সখের ভোজনের আড্ডাও ছিল। সেকালে আমাদের গ্রামে সন্দেশাদির দোকান ছিল না, গোয়ালবাড়ী হইতে মালাই কিম্বা ক্ষীর আনিয়া চিড়াসহ ভোজন করিতাম। একদিন ঐরূপ ক্ষীর-চিড়া মাখিয়া সকলকে পৃথক পৃথক ভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছি। ইতিমধ্যে আমাদের একটি ব্রাহ্মণ সহপাঠী তাহার ভাগেরটা খাইয়া ফেলিয়া একটি শূদ্র সহপাঠীর ভাগ হইতে খানিকটা নিয়া খাইয়া ফেলিল। তখন আমরা তাহাকে বলিলাম, "তুমি শূদ্রের পাতেরটা খাইয়াছ আমরা বাড়ী গিয়া বলিয়া দিব"। ব্রাহ্মণ বালকটি তোতলা ছিল। সে রাগিয়া বলিল, "যা-যা-যাও-ব-ব-ব-লে দিয়া কি-কি-কি করবে? আ-আ-আ-আমি ব্রাহ্ম"। আমরা সকলেই তাহার বাক্যে হাসিয়া বিশেষ আমোদ পাইলাম। খাদ্যাখাদ্যের বিচার না থাকিলেই তাহাকে লোকে ব্রাহ্ম বলিত।

'সেকালে কোনও ইংরাজী বইয়ের মানের বহি ছিল না। ইংরাজী-বাঙ্গালা একখানি অভিধান বাহির হইয়াছিল তাহাতে ইংরাজী মানে পাওয়া যাইত না। জন্‌সন্স পকেট ডিকসনারি নামক অতি ক্ষুদ্র লিখাযুক্ত একখানি অভিধান হইতে ইংরাজীর ইংরাজী মানে আমরা সংগ্রহ করিতাম। আমরা মানে লিখিয়া না আনিলে মাষ্টার মহাশয়েরা পড়া বলিয়া দিতেন না। সুতরাং আমাদের সকলকেই ঐ প্রকার ডিকসনারি হইতে মানে লিখিয়া প্রস্তুত হইয়া যাইতে হইত। মত্ত-নিবাসী অম্বিকাচরণ সেন নামক একটি বালক ঈশ্বরবাবুর সম্পর্কিত ভাই তাঁহার বাসায় ছিল। সেই বালকটি ঐ মানে সংগ্রহ করিয়া লিখিতে বিশেষ আলস্য করিত না। আমরা তাহার দ্বারা মানে লেখাতে বিশেষ সাহায্য পাইতাম। অম্বিকা চিরদিনই সুনিপুণভাবে লিখাপড়া করিত এবং ধামরাই স্কুল হইতেই অম্বিকা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ১ম হইয়া তিন টাকা বৃত্তি পাইয়া ঢাকা কলেজে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিল। সে ঢাকা কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়া কলিকাতায় বিজ্ঞানে এম. এ. পাশ করিল। পরে গভর্নমেণ্ট তাহাকে স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান করেন। অম্বিকাই এ দেশে সর্বপ্রথম স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান। এই অম্বিকাবাবুর উন্নতির প্রকৃত মূলই আমাদের ঈশ্বরবাবু।

'ঈশ্বরবাবু তত্ত্ববোধিনী নামক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন।[১]

'ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ টান ছিল। তখন বড়মানুষমাত্রেই বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে বাঈ খেমটা নাচের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরবাবু তাদৃশকার্যে বিশেষ ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন এবং সেইজন্য একটি পুস্তিকা ছাপাইয়াছিলেন। পুস্তকখানির নাম আমার মনে নাই। তাহাতে বাঈ খেমটা নাচের বৈঠকের যে একটি দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি লিখিয়াছেন—"নাচের বেলায় বাঁয়া তবলার 'চাটি'তে যে বোল উঠে তাহা 'ধিক্কার' 'ধিক্কার' বলিতেছে, সারেং 'কোন্' 'কোন্' জিজ্ঞাসা করিতেছে, খেমটাওয়ালী হাত নাড়িয়া বলিতেছে—'ইয়া বাবু লোককো', 'বাবু লোককো'।"

'ধামরাইয়ের অনেকেই শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরবাবুর ছাত্র। পাটনার অন্যতম প্রধান উকিল ব্রজেন্দ্রমোহন দাশ, যিনি বহু টাকা উপার্জন করিতে করিতে ব্যবসা ছাড়িয়া প্রায় ২৫ বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবনে যোগী-জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহার ভ্রাতা মনোমোহন দাশ (গাজীপুরের Civil Surgeon), ঢাকা জগন্নাথ কলেজের Superintendent শ্রদ্ধাস্পদ অনাথবন্ধু মল্লিক মহাশয় প্রভৃতি আমরা অনেকেই তাঁহার ছাত্র। তিনি আমাদিগকে ঢাকা কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর standard পর্যন্ত পড়াইয়া দিতেন। আমাদের সময় ছাত্রবৃত্তির সাহিত্যের অন্তর্গত রত্নাবলী নামে একখানা গ্রন্থ ছিল। গ্রন্থখানি *Self-help* নামক একখানি ইংরাজী গ্রন্থের স্বাধীন অনুবাদ। ঈশ্বরবাবু আমাদিগকে ঐ গ্রন্থখানি এমনভাবে পড়াইয়াছিলেন যে, তাহা হইতে সাহিত্যশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, এবং কর্মশিক্ষা যেরূপ পাইয়াছি তাহা আমাদিগের চিরজীবনের সাথী হইয়া রহিয়াছে।

'এই রত্নাবলী পুস্তকখানা পাঠ করিয়াই আমার নবজীবন উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল সন্দেহ নেই। বাল্যকালে পুস্তকপাঠ-আদিতে আমার মন পড়িত না। শিল্পকর্মের উপরই আমার মন বেশী যাইত। আমি দুই বার বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তিতে ফেল হই, পরে লক্ষ্মী-জনার্দনের কৃপায় এবং ঈশ্বরবাবু এবং দীননাথ সেন মহাশয়ের যত্নে আমার মত মূর্খ সেবারকার বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ঢাকা সার্কেলের মধ্যে প্রথম হইয়া ৪৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিল। তখন ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ এবং পাবনা ইত্যাদি এই সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীননাথ সেন মহাশয়ের যত্নে আমরা ক্ষেত্রতত্ত্ব ও অংক যাহা শিখিয়াছিলাম তাহার

[১] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার খসড়াটা তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই—

মান্যবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক মহাশয়েষু

সবিনয় নিবেদনমিদং—

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করিয়া প্রতিমাসে চারি আনা দাতব্য দিতে স্বীকার করিলাম। সভাপ্রবেশ দক্ষিণা এক টাকা প্রেরণ করিতেছি। ইতি ১৩ই পৌষ ১৭৭৫।

এই ১৭৭৫ অবশ্যই শকাব্দ, তাহা হইলে ইংরাজী ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে এই চিঠি লেখা হইয়াছিল।—গ্রন্থকার

পন্থা অতি সরল এবং আনন্দপ্রদ ছিল। অধিকাংশ স্থানে শিক্ষকের শিক্ষাপ্রণালী, যত্ন, ভালবাসাতে অনেক মূর্খ ছাত্র মনুষ্যজীবন লাভ করে। তবে ২।৪টি মাত্র অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক নিজের চেষ্টায় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাও জানি।

'বালককাল হইতেই আমার হৃদয়ের বাসনা ছিল আমি ডাক্তার হইব। অনেক ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহাতে হতাশপ্রায় হই; কিন্তু মা ইচ্ছাময়ী জীবের প্রকৃত ইচ্ছা জানিলে কালে তাহা পূর্ণ করিয়াই থাকেন। তাই আমার মত মূর্খ লোক কলিকাতায় একটি চিকিৎসক মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

'প্রত্যেক বালকই ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কি করিবে তাহার লক্ষ্য স্থির থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার পথ পাইবে; কিন্তু আমাদের দেশে সকলেই স্রোতের মুখে গা ঢালিয়া দেয়। ইউরোপ আমেরিকার প্রত্যেক বালকই আপনি লক্ষ্য স্থির করিয়া লয় এবং নিজ নিজ অভিভাবক দ্বারা লক্ষ্যস্থলে যাইবার উপায় করিয়া লয়।

'আমাদের সৌভাগ্যগতিকে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র সেন এবং দীননাথ সেন প্রভৃতি মহোদয়ের মত শিক্ষাগুরু আমরা পাইয়াছিলাম। এক্ষণে জানিতে পাই অনেক শিক্ষক মহাশয়রাই ছাত্রদের সহিত সেরূপ স্নেহ মমতা রাখেন না।

'ওকালতীর পদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরবাবু যখন ধামরাই ছাড়িয়া যান, তখন তাঁহার জন্য সমস্ত ছাত্রবৃন্দ এবং অভিভাবকেরা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। তাহাতে ছাত্রেরা সভা করিয়া অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা পাঠ করে। আমার রচনাটুকুতে লিখিয়াছিলাম যে—"জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও জ্ঞানদাতা ও শিক্ষাদাতা শ্রেষ্ঠতর।"'

* * *

পিতৃদেবের অপর এক ছাত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন চক্রবর্তী মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে আছেন। তিনি এখন অতি বৃদ্ধ, এবং 'নোলক বাবাজী' নামে পরিচিত হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির গুরুরূপে পূজা পাইতেছেন। তাঁহার বাড়ীও ধামরাই গ্রামে।

আমার পিতামাতার বহুকাল যাবৎ কেবল কন্যাই হইতেছিল। আমার জন্মের পূর্বে নয়টি কন্যা হইয়াছিল। তাহাদের ছয়টি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমার প্রথমা ভগিনী দিগ্বসনী দেবীর বিবাহ খুব সম্পন্ন গৃহে হইয়াছিল। তাঁহার শ্বশুর দেওয়ান গৌরমোহন রায় আমাদের সে অঞ্চলের একজন বড়লোক ছিলেন। অপরা ভগিনী বসন্তবালার বিবাহও গ্রামের জমিদার ভরতচন্দ্র দাশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। ইঁহাদের অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। তৃতীয়া কন্যা বগলাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বায়রা গ্রামবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ণচন্দ্র রায়। তখন তিনি সবে ডেপুটি হইয়া কর্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন। প্রথমা ভগিনীর স্বামী ব্রজমোহন রায় অল্প বয়সে কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। একটি কন্যা লইয়া দিদি আমাদের সংসারে আগমন করেন এবং প্রায় চিরজীবনটা আমাদের সংসারে অতিবাহিত করেন। তৃতীয়া বগলাদেবী ১৬ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

নয়টি কন্যা হইবার পরে, আমার মাতার বহু মানতের ফলে, দেবগৃহে বহু ধন্না

দেওয়া, মাদুলি ধারণ ও গ্রহ-শান্তির বহু ব্যবস্থা করার ফলে হউক, কিম্বা কোনো একটা দুঃসহ দুঃখজগতে প্রবেশ করিবার হঠাৎ সুবিধা লাভের গতিকে হউক আমি আমার যমজ ভগিনী মৃন্ময়ী দেবীকে সঙ্গে লইয়া মাতুলালয় বগজুড়ী গ্রামে এক আম্রবৃক্ষতলে আঁতুর ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কার্তিক মাসের ১৭ই, শক ১৭৮৮ শুক্রবার, রাত্রি তখন ৪ দণ্ড বাকী আছে। আমার পিতা তখন ধামরাই ছিলেন, তিনি পরদিন বেলা ১০টার সময় স্নান করিতেছিলেন, এই সময়ে বগজুড়ী হইতে প্রেরিত লোক তাঁহাকে আমার জন্মের খবর দিল। তিনি যে সিক্ত বস্ত্রখানি ছাড়িয়াছিলেন এবং যে শুষ্ক বস্ত্র পরিতেছিলেন, উভয়ই, একটি কলসী যাহার জলে স্নান করিয়াছিলেন, ঘটিটি ও জলচৌকিখানা, গামছা এবং যাহা কিছু সামনে ছিল, চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার সমস্তই সেই সংবাদবহ লোককে দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

জন্মিয়াই তাঁহাকে এরূপ আনন্দ দিতে পারিয়াছিলাম কি গুণে? তাঁহাদের বংশে একটা মুষল হইল কি অলাবু হইল তাহা তো তাঁহারা জানিতেন না, তবু সারারাত্রি জাগিয়া আমার পিতামাতা আমার মুখ দেখিয়া কি আনন্দ পাইয়াছিলেন? বোধহয় আমাদের মধ্যে তাঁহারা আনন্দস্বরূপকে পাইয়াছিলেন, বোধহয় সকল ছেলের মধ্যেই সেই আনন্দস্বরূপ থাকেন, যখন আমিত্ব প্রবল হইয়া সেই আনন্দস্বরূপকে আড়াল করিয়া ফেলে, তখন জীব ভগবানের সঙ্গে পৃথক হইয়া পড়ে।

পিতৃদেব পুত্রলাভ বিষয়ে একেবারে হতাশ হইয়া ধামরাই স্কুলের পদেই চিরজীবন কাটাইবেন, এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। 'বেশী অর্থ উপার্জন করিয়া কি ফল হইবে? আমরা কাহার জন্য রাখিয়া যাইব?' এই কথা বলিতেন। মেয়েদের তখন সম্পন্ন ঘরেই বিবাহ হইয়াছিল। আমার মায়ের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তাঁহার সর্বদা তর্কযুদ্ধ চলিত ও ফলে তিনি অর্থোপার্জন সম্বন্ধে এ পর্যন্ত নিতান্ত উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট রহিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু যেদিন আমার জন্ম হইল, সেই দিন, তাঁহার একটি নূতন কর্তব্যের ভার পড়িল, ইহা মনে হইল; এবং অল্পকালের মধ্যেই ধামরাই স্কুলের পদ ত্যাগ করিয়া মানিকগঞ্জ মুন্সেফ-কোর্টের উকিল হইলেন।

আমার পিতা ও মাতা দুই ভিন্ন মতাবলম্বী এবং দুই ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। মাতা ছিলেন তেজস্বিনী, পিতা ছিলেন মৃদু-স্বভাব। মাতা ছিলেন অর্থ সম্পদের প্রয়াসী, পিতা ছিলেন অনাড়ম্বর এমন কি দরিদ্র জীবনের পক্ষপাতী। পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম, মা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে জিনিসপত্র ও আসবাব সম্বন্ধে মা সাদাসিধা ধরনের টেকসই দ্রব্যাদি পছন্দ করিতেন, বাবা জমকালো প্রাচীন জড়োয়া-পাড় বস্ত্রাদি এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন শিল্প-যুক্ত কাংস্য, পিত্তল ও তামার জিনিস পছন্দ করিতেন। মা অর্থ সঞ্চয় করিতে চাহিতেন, বাবা যে জিনিসপত্র দেখিতেন তাহাই কিনিতেন। পুরাতন জিনিস কিনিবার তাঁহার একটা বিষম সখ ছিল। এই লইয়া প্রায়ই মাতার সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটিত। মাতার বহু নিষেধ সত্ত্বেও তিনি খুব চওড়া নানারূপ কারুকার্য-ভূষিত শাল—তাহা যত পুরাতনই হউক না কেন—নানারূপ চিত্রবিচিত্র খোদাই পুরাতন আলমারী ও খট্টা—যাহা হয়ত ব্যবহারে ক্ষয় পাইয়া গিয়াছিল,—এইগুলি কিনিয়া

কিনিয়া বাড়ী বোঝাই করিতেন। মা ইহার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন, 'এগুলির আয়ু দুই দিন, অনর্থক এদের পিছনে টাকা নষ্ট করা কেন?' বাবা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন 'এই শিল্প দুর্লভ শিল্প, এমনটি কি এখনকার দিনে হইবার জো আছে?' ইঁহাদের এ সম্বন্ধে মত কিছুতেই মিলিত না। একদিন বাবা আমাকে সাচ্চা জড়োয়া সিল্কের একটা মোগলাই পোশাক নীলামে কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, আমি সেইটি পরি, কিন্তু সেটি পরিলে আমাকে নবাব খাঞ্জা খাঁর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের মত দেখাইত। তাঁহার বহু অনুরোধে আমি উহা পরিয়া একদিন স্কুলে গিয়াছিলাম; তখন আমার বয়স দশ। আমার সহপাঠীরা আমাকে দেখিয়া হাতে তালি দিয়া ঠাট্টা করিয়াছিল, এমন কি গিরীশ পণ্ডিতের অটুট গাম্ভীর্য ভাঙিয়া তাঁহারও ঠোঁটের আড়ালে একটা পরিহাসের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, আমি তো সেই এক বারের পর তাহা আর পরি নাই, এখন মনে হয়, কেন পরিলাম না! তিনি যে বেশে সাজাইয়া আমাকে দেখিতে আনন্দ পাইতেন, আমি কেন তাহার প্রতিকূল হইলাম? সেই জামাটার সাচ্চা নক্ষত্রগুলি ও জড়োয়া পাড়, উইয়ে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল, বহুদিন আমি একটা সিন্দুকে উইয়ের সেই ভুক্তাবশেষ দেখিয়াছি। একবার বাবা আমার জন্য একটা চোগা কিনিয়াছিলেন—সে ১৮৭৭ সনে হইবে। আমার মাসীমা তাঁহার বড় ছেলের জন্য একটা কিনিলেন। একটার লাল জমি—পশ্চাদ্‌ভাগে বহু বিস্তৃত সাচ্চা কাজ, সম্মুখভাগ ও কণ্ঠের দিকেও নানা সাচ্চা কাজে ঝলমল, সেটি ছোট, ১০ বৎসরের বালকেরই যোগ্য। আর একটা প্রমাণ সাইজ, সাদা জমি, পশমের তোলা ধারে ধারে কিছু কিছু কাজ আছে। আমার দাদার জন্য মাসীমা এই শেষোক্তটি কিনিলেন। হাতের দিকটার মাঝে একটা সেলাই দিয়া সেই লম্বা জিনিস দুইটি গুটাইয়া ফেলিয়া কোটটা দাদা তখনই ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং এখন পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪৩ বৎসর পরেও বোধ হয় সেটি ব্যবহার করিতেছেন। তাহার হাত দুটির মাঝের সেলাইটা অবশ্য এখন আর নাই। কিন্তু আমার জন্য বাবা সেই প্রথমটি কিনিয়াছিলেন, তাহা ১০ম বর্ষ বয়সের পর আর ব্যবহার করিতে পারি নাই। দুইটির প্রত্যেকের দাম তখন ছিল ২৭ টাকা।

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মায়ের সঙ্গে বাবার সর্বদাই অনৈক্য হইত। কিন্তু ঝগড়াটা এক হাতের তালি, বাজিয়া উঠিতে পারিত না। কারণ মা অনেক কথা শুনাইয়া দিতেন, বাবা চুপটি করিয়া শুনিতেন, যেন সেগুলি তাঁহাকে বলাই হইতেছে না। এই নীরব অনাশ্লিষ্ট শ্রোতাটির উপর মায়ের রাগ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিত। যখন ভাষা ক্রমশঃ উত্তেজিত ও কণ্ঠস্বর খুব উচ্চগ্রামে চড়িয়া উঠিত, তখন বাবা পাখাখানি হাতে করিয়া নিজেকে বাতাস করিতে করিতে বাহিরের প্রকোষ্ঠে যাইয়া বড় একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন।

মানিকগঞ্জে আসার পর হইতে বাবার পশার খুব বৃদ্ধি পাইল। তিনি সেখানকার শ্রেষ্ঠ উকিল হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং গভর্নমেন্টের উকিল রূপে মনোনীত হইলেন। সে সময় খুব সুখেই গিয়াছে। মানিকগঞ্জে তখন দুধের সের দুই পয়সা। সাধারণতঃ মুসলমানেরাই দুধ বিক্রয় করিত। দুধে জল দেওয়ার পদ্ধতি তখনও প্রচলিত হয় নাই। মুসলমানেরা হিন্দুর জাতিবিচার মানিয়া দুধে জল মেশানো পাপের কার্য বলিয়া মনে করিত। মাছ খুবই শস্তা ছিল। আমাদের বাসায় রোজ একমন

খাঁটি দুধ আসিত, তাহার দাম এক টাকার কাছাকাছি ছিল। বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী দিগম্বসনী দেবী দুধের পুরু সর ঘিয়ে ভাজিয়া রাখিতেন। তিনি বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক জায়গা হইতেই কোন না কোন মিঠাই তৈয়ারী করার প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছিলেন,—তাঁহার হাতের বরফির মত বরফি আমি খাই নাই। তাহা ছাড়া 'বকুলচাকি', এবং নানা প্রকারের মালপো তৈয়ারী করায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নারিকেল ও দুধ দিয়া যে তিনি কতরূপ মিঠাই তৈয়ারী করিতে পারিতেন, তাহা আর কি বলিব! তাঁহার মত নারিকেলের সূক্ষ্ম চিড়া জিরা প্রস্তুত করিতে সে অঞ্চলে কেহ জানিত না। তিনি নারিকেল ও দুধ দিয়া মাছ, ময়ূর, গাছ—তাহার ডালে ডালে ফুল ও পাখী বসিয়া আছে—পদ্ম প্রভৃতি কত রকম জিনিস তৈয়ারী করিতে পারিতেন, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। সেগুলি মর্মরগঠিত মূর্তির ন্যায় কোন কোনটি সাদা ধব্‌ধবে করিয়া রচনা করিতেন, কোনগুলি বা নানা বিচিত্রবর্ণে—লাল, নীল, কালোর সুনিপুণ চিত্রণে—সখের খেলনার মত দেখাইত। একবার বাবার বন্ধু একটি মুন্সেফ (কলিকাতা অঞ্চলের) আমাদের সঙ্গে অনেকদিন ধরিয়া মিষ্টদ্রব্য উপহারের পাল্লা দিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহিণী ভাল মিঠাই তৈয়ারী করিতে পারিতেন। তাঁহাদের বাড়ী হইতে আমাদের বাড়ীতে উপহার আসিত, এবং আমরাও তাহার প্রতিদান পাঠাইতাম। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার হার হইয়া গেল, দিগম্বসনীর দিগ্বিজয়ী হাতের কাছে কোন ময়রার সাধ্য ছিল না দাঁড়ায়, অপরের কি কথা! তিনি এক একদিন শুধু কাশীর মিঠাই চালাইতেন, চম্‌চম্‌ দিয়া চমকাইয়া ফেলিতেন; কখনও বৃন্দাবনী পেড়া, বরফির বহর চালাইতেন। কিন্তু যখন তিনি নারিকেল ও দুধ দিয়া কারুকার্য করিতেন, তখন তো ইটালির ভাস্কর ও কৃষ্ণনগরের কুমার তাহার কাছে হার মানিয়া যাইত!

নিরামিষ রান্না যে তিনি কতরূপ রাঁধিতে জানিতেন, তাহা আর কি বলিব! সেরূপ রুচিকর জিহ্বার পরমসম্পদ আর কোথায় পাইব? মানিকগঞ্জে মাছ খুব শস্তা ছিল, কিন্তু সুয়াপুরে আরও শস্তা ছিল। সুয়াপুরের নিকটবর্তী রঘুনাথ-পুরের প্রকাণ্ড বিলে জেলেরা এক অদ্ভুত উপায়ে মাছ ধরিত। বড় একটা নৌকার গলুইয়ের উপর তারা দাঁড় দিয়া ঠক্‌ঠক্‌ একরূপ শব্দ করিত, তখনই চারিদিক হইতে লাফাইয়া মাছ আসিয়া নৌকায় পড়িত। সেই মাছ সংগ্রহের এক বিপদ ছিল,—বড় বড় মাছ জেলের ঘাড়ে পড়িয়া অনেক সময় জেলেকে একেবারে ঘায়েল করিয়া ফেলিত, তাহাদের কখনও কখনও ঐরূপ আঘাতে হাত পা ভাঙিয়া গিয়াছে। সুয়াপুর বসিয়া ।৽ আনা কি ।৴৽ আনা মূল্যে একটি প্রকাণ্ড রুই, (প্রায় ১৪।১৫ সের ওজনের) আমরা ক্রয় করিয়াছি। সাধারণতঃ দুই তিন পয়সার মাছ চাহিলে জেলে ছোট ছোট মাছে বড় একটি খালুই ভরতি করিয়া দিত, মাঝারি রকমের একটি পরিবার তাহা খাইয়া সাবাড় করিতে পারিত না। তৈলের সের ছিল ।৴৽ আনা; ঘি ৷৷৽ আনা (উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি)। আমাদের বাড়ীতে সাধারণতঃ ঘি কেনা হইত না, দুধের সর অনেক দিন সঞ্চয় করিয়া তাহা বাটিয়া ঘি করা হইত, তাহার সুমিষ্ট ঘ্রাণে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিত। এখন রাজা মহারাজারা যেরূপ খাইতে পান না (ভেজালের যন্ত্রণায় টাকা থাকিলেও ভাল খাদ্য জোটে না)—তখন যে সাধারণ গৃহস্থ সেরূপ আহারে পরিতৃপ্ত হইতেন!

আমার ছোটবেলাটা খুব আদরেই কাটিয়াছে। খেলার সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়ই আমাকে 'আদুরে ছেলে' বলিয়া ক্ষেপাইত। অতি শিশু বয়সে বাড়ীতে অত্যন্ত দুষ্টামি করিয়া পিতামাতার প্রশ্রয় পাইয়াছি, এমন কি আমার ৪।৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শুধু আমাকে দেখিবার জন্য দুইটি চাকর নিযুক্ত ছিল। লক্ষ্মী নাম্নী পরিচারিকার ক্রোড় হইতে নামিয়া যখন আমি হামাগুড়ি দিতে শিখিলাম, সেই সময় হইতে আমার জন্য সেই দুইটি চাকর নিযুক্ত ছিল। তাহার মধ্যে আমাদের গ্রামের রামদুর্লভ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র কোকা সিংহের কাজ ছিল আমার মারধর সহ্য করা। আমি রাগিয়া গেলে তাহার উপর উৎপাত করিতাম এবং তাহা তাহাকে সহ্য করিতে হইত। তাহার গায়ের চামড়ার উপর দাঁত বসাইয়া রক্ত বাহির করিয়া, তাহারই কাঁধে চড়িয়া, তাহার মাথার চুল ছিঁড়িতাম, সে একেবারে নিত্যানন্দমহাপ্রভুর মত 'মেরেছে কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না' এই নীতির অনুসরণ করিয়া আমার মারধর সহ্য করিয়া আদর করিতে থাকিত। এই মারধর করার স্বভাবটা আমার ৮।৯ বৎসর পর্যন্ত ছিল। আমার পরে মায়ের আরও দুইটি মেয়ে হইয়াছিল, তাহাদের একজনের নাম ছিল মৃন্ময়ী ও অপরের নাম ছিল কাদম্বিনী,—ফটোগ্রাফ নাই, তাহা না হইলে দেখাইতে পারিতাম মৃন্ময়ীর ডাগর চোখদুটির কি স্নিগ্ধ মহিমময় মাধুর্য ছিল এবং পাতলা ঠোঁট দুখানিতে কি মনভুলানো হাসি ফুটিয়া উঠিত! কাদম্বিনীর কালো চুলে যেন সত্যই মেঘের লহর ছড়াইয়া পড়িত। এই দুই ভগিনী যে আমার হাতে কত মারধর খাইয়াছে তাহা আর কি বলিব! বড় হইয়া সেই অপরাধের অনুতাপে আমি কত রাত্রি বিছানায় শুইয়া শুইয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছি। ইহারা আমার হাতের মারধর খাইয়া কিছু বলিত না, কারণ সেই বাড়ীর একচ্ছত্র ক্ষুদ্র সম্রাট আমিই ছিলাম। বহু ভগিনীর মধ্যে একমাত্র পুত্র হওয়ার সৌভাগ্যলাঞ্ছিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহারা জানিত, তাহাদের দাদার এই অধিকার ভগবানই দিয়াছেন। কিন্তু আমার মা আমাকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিলেও আমার এই সকল অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যেরূপ চক্ষের ভঙ্গীতে আমার প্রতি চাহিতেন, তাহাতে আমি ভয়ে কেঁচো হইয়া যাইতাম। কিন্তু আমার চক্ষে জল দেখিলে তিনি আমাকে কোলে করিয়া চুমো খাইতেন। আমার মারধরের চিহ্ন বা স্মৃতি এখনও সুয়াপুরে গ্রামের একটি লোক বহন করিতেছে। সে হইতেছে, আমার বাল্যকালের খেলার সাথী বনবিহারী সাহা, তাহার হাতে একটা দাগ এখনও আছে, আমি সেখানে তাহাকে একটা ছুরি দিয়া আঘাত করিয়াছিলাম। সে সেইটি দেখাইয়া এখনও স্নেহের গৌরব করিয়া থাকে। আমি জন্ম হইতেই এতদূর আদুরে হইয়াছিলাম যে, আমার সঙ্গে যে যমজ ভগিনী হইয়াছিল, তাহাকে 'বাঁদী' নাম দেওয়া ছিল। আমার সৌভাগ্য, সে এখনও জীবিত আছে, চিরকালের অভ্যাসবশতঃ এখনও 'বাঁদী' নামই মুখে আসে কিন্তু এই ভাবে ডাকার দরুন তাহার স্বামী আমার নিকট একদিন বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমি বাড়ীতে দৌরাত্ম্য করিতাম, কিন্তু বাহিরে গোবেচারী ছিলাম। আদুরে ছেলে বলিয়া কথায় কথায় আমার সহচর বন্ধুরা আমায় ঠাট্টা করিত। দুর্বল ছিলাম বলিয়া যে সে আমায় চড়-থাপড় মারিয়া যাইত—আমি তাহা কাহাকেও বলিতাম না। সেই সময়ে দু-একটি অশ্রু চোখের কোণে দেখা যাইত, তা এক হাতে মুছিয়া ফেলিতাম।

৬

শিক্ষাদীক্ষা

পাঁচ বছর বয়সে যথারীতি হাতেখড়ি হওয়ার পর, আমি সুয়াপুর গ্রামে বিশ্বম্ভর সাহার পাঠশালায় লেখাপড়া করিতে শুরু করিয়া দেই। ইহার পূর্বেই আমি রামায়ণের অনেকটা মুখস্থ বলিতে পারিতাম। অক্ষর-পরিচয় হইবার পূর্বেই আমার সেইটি হইয়াছিল। দিগ্বসনী দেবী শুধু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এমন নহে। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক বাংলায় সুপণ্ডিতা ছিলেন। বৈষ্ণব-পরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণববন্দনা প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ ছিল। সাঁঝের দীপ জ্বালিয়া শীতকালে ঘরের মধ্যে একটা আগুন করিয়া আমরা বসিয়া যাইতাম। তিনি ঐ সকল পুস্তক সুর করিয়া পড়িয়া যাইতেন। তাঁহার সুর কি মিষ্ট ছিল! এখনও আমার কানে তাহার রেশ জাগিতেছে। আশ্চর্যের বিষয়, যাঁহার সুর এরূপ মিছরির মত মিষ্ট ছিল, রাগিয়া গেলে তাঁহার সুর এমন রুক্ষ ও তীক্ষ্ম হইত যে তাহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ণ ভেদ করিয়া মর্মস্পর্শ করিত। তিনি পুঁতির নানারূপ ছড়ি ও খেলনা প্রস্তুত করিতে পারিতেন; তাহা ছাড়া জরির সুতা দিয়া রুমালের উপর নানারূপ কারুকার্য প্রদর্শন করিতেন।

রামায়ণ ও মহাভারত সাধারণতঃ পড়া হইত। আমার মনে আছে, অন্ধকার রাত্রি, ঘরের বাহিরে কালো শাড়ী পরিয়া অমাবস্যা নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের ঘরের সেই আগুনের দুই একটি শিখা জানালা-পথে প্রবেশ করিয়া যেন অমাবস্যার নিবিড়কৃষ্ণ কপালে একটি রক্তচন্দনের টিপ পরাইয়া দিতেছে। ঝিল্লির অবিরাম তানে আমাদের বাগানবাটী মুখরিত। রাত্রি হয়ত নয়টা, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের রাত্রি—চারিদিকে জনপ্রাণীর সাড়া নাই, দিদি পড়িয়া যাইতেন—

'মহা ভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
কুক্কুর গৃধিনী শিবা করে কোলাহল॥
হাতে মুণ্ড করিয়া নাচয়ে ভূতগণ।
শৃগাল করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ॥
রক্তের কর্দম নদী চলিতে না পারে।
শোকাকুল নারীগণ কাঁদে উচ্চস্বরে॥'

দিদির সুরে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভয়ের ঝঙ্কার জাগিয়া উঠিত। আমরা বসিয়া যেন স্পষ্ট দেখিতাম, হত সৈনিকের রক্তাক্ত মাথাটি বিকটাকৃতি কবন্ধেরা ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে; তাহারা এত কাছে, বোধ হইত যেন তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের গায়ে পড়িয়া সর্ব শরীরে একটা ভয়ের শিহরন জাগাইতেছে।

এইভাবে রামায়ণ-মহাভারত পড়া চলিত। তরণীসেনবধ পড়িতে পড়িতে দিদি কাঁদিয়া ক্ষণকালের জন্য পড়া বন্ধ করিতেন, আমরাও কাঁদিয়া চক্ষু মুছিয়া লইতাম।

এখন ভাবি, আমি তখন তিন চার বছরের শিশু, কিন্তু কৃত্তিবাস এমন ভাষায় রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, এবং পরবর্তী নকলকারীরা তাঁহার সহজ ভাষাকে কালে কালে এমনই সহজ করিয়াছিল যে আমি তখনই তাঁহার বেশীর ভাগ লেখাই বুঝিয়াছি—যেটুকু বুঝি নাই—তাহা কল্পনা আরও উজ্জ্বল সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে।

দিদির মুখে বৈষ্ণব গান শুনিয়া আমি যে আনন্দ পাইতাম—বোধহয় কোন কীর্তনীয়ার মুখে গান শুনিয়া সে আনন্দ পাই নাই। শিশুর কোমল হৃদয়ে প্রথম-জীবনের প্রভাব অপূর্বরূপে কাজ করে। আমার মনে হয়, শৈশবে যে সকল বিষয় লইয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, যৌবনে তাহাই আমাদিগকে উদ্দীপনা প্রদান করে এবং তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া আমরা শেষ জীবন কাটাইয়া থাকি। এই শৈশবই জীবনের প্রথম ক্ষেত্র, তখন যে সকল বীজ বপন করা হয়, দুঃখের হউক, সুখের হউক—শেষকালে সেই বীজসঞ্জাত ফসলই আমাদের ভাগ্যে ফলিয়া উঠে।

সুতরাং যখন বিশ্বম্ভর সাহার স্কুলে পড়িতে গেলাম, তখন রামায়ণ ও মহাভারতের কতক কতক অংশ আমার কণ্ঠস্থ। বিশ্বম্ভরের এক পা খোঁড়া ছিল। আমরা কলার পাতে লিখিতাম, বাড়ী হইতে কতকটা কলার পাতা ও একটা খাগের কলম ও দোয়াত সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত। আর একটা পাত্রে খানিকটা বালি থাকিত, উহা ব্লটিং কাগজের কাজ করিত। দোয়াতগুলি মাটির ছিল, তাহা সাধারণতঃ ত্রিকোণ হইত। প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া ছিদ্র থাকিত, সেই ছিদ্র-পথে সুতা গলাইয়া একটা শিকা-র মত তৈয়ারী করিয়া দোয়াতটি ঝুলাইয়া লইয়া যাইতাম। দোয়াতের মধ্যে খানিকটা নেকড়া থাকিত, কালি চলকিয়া উঠিয়া পড়িয়া যাইতে পারিত না। খাগের কলম সকলেই কাটিতে পারিত না, এক একজনের এ বিষয়ে অশিক্ষিতপটুতা ছিল, সেই সকল শিল্পীদের নিকট উমেদারী করিয়া কলম কাটিয়া আনিতাম। আমি এ বিষয়ে কখনই দক্ষতা লাভ করিতে পারি নাই। খাগের কলম এবং কিছুদিন পরে হংসপুচ্ছ কাটিতে যাইয়া আমি প্রায় সর্বদাই গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত কাটিতে কাটিতে সাবাড় করিয়া ফেলিতাম।

বিশ্বম্ভর সাহা খোঁড়া হওয়ার দরুন পা ততদূর না চলিলেও হাত খুব বিলক্ষণই চলিত। তিনি যখন ঠাট্টা তামাসা করিতেন, তখন যেমন পাঠশালা ঘর তরুণ কণ্ঠের হাসিতে উচ্ছ্বসিত মুখরিত হইয়া উঠিত, তেমনই আবার যখন মারধর শুরু করিয়া দিতেন, তখন কান্নার কলরবে পাড়া অস্থির হইয়া উঠিত। আমাদের পড়ার বই ছিল—'শিশু-বোধক'। এই কল্পতরুর নিকট চতুর্বর্গ ফল পাওয়া যাইত। 'নামতা' 'কড়াকিয়া' হইতে দাতাকর্ণের কবিত্ব, 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' হইতে স্ত্রী ও স্বামীর পত্র লেখার সেই অপূর্ব ধারা—'শ্রীচরণসরসী, দিবানিশি সাধন-প্রয়াসী মালতীমঞ্জরী দেবী' ও 'শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ' প্রভৃতি বিরহীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক নানা কথা আমরা একটি শব্দমাত্র না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়াছি। কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে আমাদের দেশ-সুলভ মোটা বেতের আঘাতে পৃষ্ঠদেশ কণ্টকিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের এনসাইক্লোপিডিয়ার এই ক্ষুদ্র সংস্করণে পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলি ও বিরহী-বিরহিণীর পত্র-ব্যবহার ছাড়া দাখিলা, আদালতে আরজি ও পিতার নিকট পত্র লেখার ধারা লিপিবদ্ধ ছিল। এই পুস্তক পড়া শেষ করিয়াই অনেক পড়ুয়া কর্মক্ষেত্রে নামিতেন—তাঁহারা কেহ হইতেন গ্রামের পাটোয়ারী তহশীলদার; এমন কি

কেহ কেহ পঞ্চায়েতের সর্দার হইতেন। এই শিক্ষার বলে কিছুতেই আটকাইত না। এই পুস্তকের কাটতি যে কত ছিল, তাহা লং সাহেবের ক্যাটালগ পড়িয়া হিসাব করিলে দেখা যাইতে পারে।

বিশ্বম্ভরের পাঠশালায় চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত শেষ করিয়া আমি মানিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে ভর্তি হইলাম। বিশ্বম্ভরের নিজের পড়াশুনার দৌড় ঐ চারুপাঠ পর্যন্তই ছিল—এমন কি চারুপাঠের শেষ পর্যন্ত অনেকটা তিনি নিজেই ভাল বুঝিতেন না—এজন্য উচ্চ ক্লাসের পড়ুয়ারা ঠকাইবার ইচ্ছায় যখন তাঁহাকে বিরক্ত করিত তখন একদিকে তিনি দমাদম কিল, চড় ও বেত মারিতে থাকিতেন, এবং অপর দিকে কঠোর শাসনসূচক বহুতর গালাগালি মুখ হইতে নিষ্ঠীবনের সঙ্গে অজস্র বাহির হইতে থাকিত। তিনি একাই যেন সব্যসাচী; স্বীয় শরীরের বিধিদত্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বাক্যবাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া এই ভাবে তিনি বিদ্রোহ নির্বাণ করিয়া ফেলিতেন। অভয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের বাড়ীর বাহিরে আটচালা ঘরটা বিশ্বম্ভরের এই লীলাভূমি ছিল। আমি ত্রিশ বৎসর পরে ১৯১৮ সনে সেই আটচালা ঘরের পড়ন্ত অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি; সাত বৎসরের শিশু তখন পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ।

মানিকগঞ্জে স্কুলে যখন প্রথম প্রবেশ করি, তখন প্যারীমোহন বাবু ছিলেন হেডমাষ্টার; বাহিরে নিরীহ ভাল মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, কিন্তু ছেলেদের ছিলেন তিনি কালান্তক যম। তিনি সহজে রাগিতেন না, শীত গ্রীষ্মে একটা ছিন্ন তালি-দেওয়া নীল রঙের র‍্যাপার গায়ে দিয়া চেয়ারের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া অনেকটা সময়ই ঝিমাইতেন। কিন্তু লঙ্কাধিপের দ্বিতীয় সহোদর-প্রতিম এই মহাত্মার যখন নিদ্রাভাব ঘুচিয়া চক্ষের রক্তবর্ণ ফুটিয়া উঠিত, তখন যে ছাত্র কোনরূপ ত্রুটি করিয়াছে তাহাকে শুধু-হাতে বিষম প্রহার করিতেন, তাঁহাকে আমরা বেত ব্যবহার করিতে দেখি নাই। কিন্তু এই রাগের তাণ্ডব বৎসরের মধ্যে দুই একবার হইয়াছে মাত্র। আমাদের সহাধ্যায়ী উমাচরণ ছিল, কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর পুত্র। উমাচরণ অতি দুষ্ট ছিল, একদিন প্যারীবাবু তাহাকে ধরিয়া টেবিলের পায়ের সঙ্গে চাদর দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উৎপাতের শান্তি হইল মনে করিয়া পা দুখানি বিশ্রামের ভাবে টেবিলের নীচে চালাইয়া দিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কিন্তু উমাচরণ তাঁহার শ্রীপদযুগল এমনই আঁচড়াইয়া দিয়াছিল যে, পা হইতে বেশ খানিকটা রক্ত বাহির হইয়া গেল। সেই দিন তাঁহার ঘুম একেবারে ভাঙিয়া যাওয়ায় স্কুলগৃহকে তিনি রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই দাসোড়া গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসেন। ইনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। ইনি জীবিত আছেন, বয়স প্রায় পঁচাত্তর হইবে—এখন তিনি গোঁড়া হিন্দু। তাঁহার স্কুলে আবির্ভাব হওয়ার পর প্যারীবাবু দ্বিতীয় শিক্ষক হইলেন। ইতিপূর্বে ছেলেরা এই স্কুলের অধ্যাপকগণের নামে যে ছড়া বাঁধিয়া তাঁহাদের গুণ-গরিমা অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছিল তাহা আমার বেশ মনে আছে। সেটি এই—

* * মাষ্টারের বড় রাগ।
সদাই যেন নেকড়ে বাঘ॥

* * মাষ্টার সিন্ধুঘোটক
সাত পুরুষে তার নাই চটক।
* * * পণ্ডিত অতি কুঁড়ে,
সদাই থাকেন চেয়ার জুড়ে
* * * * অতি চাষা,
ঐ পাড়ে তার ভাঙা বাসা।'

'ঐ পাড়ে' শব্দ বিশেষ অর্থ-বোধক,—মানিকগঞ্জ মহকুমার নিম্নে একটা খাল বহিয়া গিয়াছে। সেই খালের পশ্চিম পাড়েই অধিকাংশ অধিবাসীর বাস—'ঐ পাড়ে' অর্থ ভিন্ন পাড়ে—পূর্বদিকে।

পূর্ণচন্দ্র সেন একটু রাগী ছিলেন। প্যারী বাবুর ন্যায় তিনি বছরের মধ্যে দু-একবার রাগিতেন না, অনেক সময় রাগিয়াই থাকিতেন, ছেলেরা তাঁহাকে বড়ই ভয় করিত। একটুকু অতিরিক্ত ক্রোধ ভিন্ন তাঁহার আর সকলই সদ্‌গুণ ছিল। দীর্ঘ, গৌরবর্ণ মূর্তি, প্রশস্ত কপাল, চক্ষু দুটি জ্যোতির্ময়, কথা খুব তাড়াতাড়ি বলিতেন না, আস্তে আস্তে থমকিয়া কথা বলিতেন, কিন্তু যাহা বলিতেন তাহা গাঢ় অনুভব ব্যঞ্জনা করিত। তিনি প্রায়ই হেমবাবুর কবিতা ক্লাসে পড়িয়া শুনাইতেন। কবিতা পড়িবার সময় এমনই ধীরভাবে প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়া পড়িতেন যে শিশু-শ্রোতাদের মনে যেন ছাপ পড়িয়া যাইত। তাঁহাদের কাছে ইংরাজী প্রথম শিখিয়াছিলাম। দুই চার মাসের মধ্যে তিনি ইংরাজী ব্যাকরণের সূত্র আমাদের এমন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে তাহার পরে ব্যাকরণের খুব বেশী শিখিবার ছিল না। সভা হইলে তিনি প্রায়ই নীরব থাকিতেন। কারণ বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পরে তিনি মানিকগঞ্জে সর্বপ্রধান উকিল হইয়াছিলেন—তাহা বক্তৃতার ছটায় নহে। যেমন করিয়া তিনি আমাদিগের মনে কবিতার ছাপ মারিয়া দিয়াছিলেন, ইংরাজী ব্যাকরণের সূত্র গাঁথিয়া দিয়াছিলেন, অল্প কথায় সেই ভাবে তিনি হাকিমকে তাঁহার মক্কেলের জোরের কথাগুলি এমনই বুঝাইয়া দিতেন যে, প্রতিপক্ষের উকিলের ওজস্বিনী ভাষায় হাকিমের পূর্বসংস্কার কিছুতেই টলিত না। তিনি যদি জানিতে-পারিতেন— মক্কেলের মোকদ্দমা মিথ্যা, তবে কিছুতেই সে মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিতেন না।

পূর্ণবাবুর চরিত্র অতি বিশুদ্ধ—তাঁহার মত বৈষ্ণবশাস্ত্রের বোদ্ধা বঙ্গদেশে খুব কমই দেখিয়াছি। আমার যখন বার বৎসর বয়স, তখন আমি তাঁহার কাছে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদের ব্যাখ্যা প্রথম শুনিয়াছিলাম, তিনি প্রথম বিদ্যাপতির এই পদটি আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

'কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বরবিধু বদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ে ধরণী॥
বুঝায়ে কহয় তবে নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়ান॥

ইহবর শবদ পশিলু যবে শ্রবণে।
তব বিরহিণী ধনি পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুহু কানুক হাত।
যতনে ধরল ধনি আপনাক মাথা॥

কৃষ্ণ যে উপন্যাসের নায়ক নহেন—স্বয়ং ভগবান এবং রাধা যে সাধারণ প্রণয়িনী নহেন,—ভগবৎপ্রেমানন্দের স্বরূপ, তিনি সেই দিনই আমাকে তাহা এমন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার মুখোচ্চারিত ব্যাকরণের সূত্র যেরূপ আমার চিত্তে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছিল সেই ভক্তিব্যাখ্যাও আমার মনে সেইরূপই হইয়াছিল। আমি কখনই রাধাকৃষ্ণ-সম্বলিত পদাবলী সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমোপাখ্যানের মত আর পড়িতে পারি নাই। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির ভাব-সম্মিলন অর্থ শরীরের মিলন নহে; উহা হৃদয়ে ভগবৎসত্তার অনুভূতি; এজন্য সেই মিলনের উপচার ও অভ্যর্থনা কিছুই বাহিরের নহে; দেহ ভগবানের মন্দির; এবং সেই মন্দিরেই তাঁহার অভ্যর্থনার বেদী—

'পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।
আলিপনা দেওব মতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥'

বাহিরের আলিপনা দেওয়া নহে; বক্ষে তাহার জন্য বেদী তৈয়ারী হইল, মুক্তাহারেই সেই আলিপনা হইবে। স্তনদ্বয় মঙ্গলঘটস্বরূপ হইবে, এবং উন্মুক্ত সুদীর্ঘ কেশদাম দ্বারা ঝাঁটা প্রস্তুত করিয়া সেই বেদী পরিষ্কার করা হইবে। এখানে যিনি আসিতেছেন, তিনি বাহিরের পথ দিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে আসন গ্রহণ করিবেন না, এই দেহের মন্দিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইবে। সুতরাং এই দেহেই সমস্ত মঙ্গল আচারের ব্যবস্থা হইতেছে।

পূর্ণবাবুর গভীর ভক্তি আমাদিগকে এই সৎশিক্ষা দিয়াছিল। কিন্তু তখনও তিনি ব্রাহ্ম মত একেবারে ছাড়েন নাই। কেশব বাবু যখন ভগবৎ প্রেরণার দোহাই দিয়া কন্যা-বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন, এবং 'Am I not an inspired prophet?' বক্তৃতা দিয়া কলিকাতার টাউন হল কাঁপাইতেছিলেন, তখন এই ধর্মনিষ্ঠ পল্লীযুবক তাঁহার শিশুশ্রোতাদিগের নিকট অনেক সুগভীর পরিতাপসূচক আন্তরিক আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃদেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার স্বকৃত 'সত্যব্রতের পরীক্ষা' নামক কাব্যগ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছিলেন,—

'মৃৎস্তূপে বসিয়া যথা রাখাল বালক
গম্ভীর ভঙ্গীতে করে রাজাজ্ঞা প্রচার
বেদীর উপরে বসি তথা ছন্নমতি
ঈশ্বরোপলক্ষে করে আপনা প্রচার।'

এই 'ছন্নমতি' কেশবচন্দ্র সেন,— এবং এই 'ছন্নমতি' কথাটায় এইটি বুঝাইতেছে যে, কেশব বাবুর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইলেও পূর্ণবাবু তাঁহাকে প্রতারক মনে করেন নাই।

মানিকগঞ্জ স্কুলে পূর্ণবাবুর প্রভাব আমরা খুব বেশী অনুভব করিয়াছিলাম। আমরা একত্র পড়িতাম—প্রসন্ন গুহ, কেদার বসু, অবিনাশ, দুর্গাকান্ত ও আমি। প্রসন্ন গুহ খোলা মন,—উদার চরিত্র। কেদার সেই বয়সেই কতকটা বৈষয়িক—ক্ষীণ-দেহ। অবিনাশ ধীর গম্ভীর, শান্ত-শিষ্ট, মেয়েদের 'ভাল ছেলে'। দুর্গাকান্ত নেহাৎ গোবেচারী। আমরা বাজারের কাছে খোলা মাঠে ব্যাটবল খেলিতাম। আমাদের সঙ্গী আরও দুই জন ছিল—হেম নিয়োগী ও শশী নিয়োগী, ইহারা একটু নীচের ক্লাসে পড়িত, কিন্তু খেলায় আসিয়া যোগ দিত। শশী আমাদের অপেক্ষা বয়সে একটু ছোট ছিল, তাহার চোখ দুটি হরিণের মত ছিল, এজন্য আমরা তাহাকে 'হরিণ শিশু' বলিয়া ডাকিতাম। প্রসন্ন গুহ ও আমি গলায় গলায় থাকিতাম, আমাদের এত ভাব ছিল। তাহাদের ও আমাদের বাসাবাড়ী অতি কাছাকাছি ছিল, তাহার মায়ের সঙ্গে আমার মায়েরও খুব ভাব ছিল। উভয়ে এক হইলে কত ঘণ্টা সুখদুঃখের গল্পে কাটিয়া যাইত; প্রসন্নের মায়ের চেহারা ছিল শ্যামবর্ণ, তাঁহার একটা লক্ষ্মীশ্রী ছিল, সুরটি ছিল স্নেহময়, তিনি সকল ছেলেরই মায়ের মতন ছিলেন।

প্রসন্ন ও আমি সর্বদা একত্র থাকিতাম, খাইতে বসিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে অবিরত সে আমার সঙ্গী। বিধাতা আমাদের গান গাহিবার শক্তি দেন নাই, তবুও আমরা দুইজনে গানের যে বিকট চেষ্টা করিতাম, তাহাতে নূতন পুকুরের দুই ধারের প্রান্তর-ভূমি যেন সত্য সত্যই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। দুইজনে একত্র পূর্ণবাবুর হাতে কিলচড় খাইয়া মানুষ হইয়াছি। সে এখন ময়মনসিংহের জজ-আদালতের একজন ভাল উকিল—প্রসন্ন স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বিদ্যাসাগর, সি. আই. ই. মহাশয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল।

আমাদের দলের কেদারনাথ বসু মাইনর পাশ করিয়া আর বেশী উঠিতে পারে নাই। সে মোক্তারী পাশ করিয়া মানিকগঞ্জেই মোক্তারী করিত, তাহার পশার সকলের অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। একদিন গিরীশ পণ্ডিত তাহার মাথায় চড় মারিয়াছিলেন। সে সেইদিন পণ্ডিত মহাশয়কে যেরূপ ধমক দিয়াছিল, তাহা আমি এখনও পর্যন্ত ভুলি নাই। পণ্ডিতের দিকে ক্রুদ্ধ নেত্রে চাহিয়া সে বলিল, 'পণ্ডিত মহাশয়, ব্রহ্ম-তালুতে চড় মারছেন কেন? আর কি জায়গা নাই? দমাদম পিঠে মারুন না কেন! আমার মাথার অসুখ—আর আপনার একটা কাণ্ডজ্ঞান নাই?'

সেকালের মাষ্টার পণ্ডিতদের যে মারধর সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হাতী দেখিতে উঁকিমারার অপরাধে পূর্ণবাবু আমার নাকটা ধরিয়া এমন মলিয়া দিয়াছিলেন, যে পাঁচ ছয় দিন আমার নাকের ডগাটা লাল টকটকে হইয়াছিল।

দুই তিন বছর হইল কেদার মারা গিয়াছে। আমাদের সেই সময়ের আর দুই বন্ধু মানিকগঞ্জবাসী আজাহার ও তফিরুদ্দি উভয়েই মারা গিয়াছে। আজাহার ঐ সব্‌ডিভিসনে মোক্তারীতে খুব পশার জমাইয়া হঠাৎ সাত আট বৎসর হইল মারা গিয়াছে।

আজাহার দেখিতে বড় সুপুরুষ ছিল। মরিবার এক বছর পূর্বে সে কলিকাতায় আমার বাসায় হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া আসে। আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর তাহাকে দেখি নাই, কালো কুঞ্চিত দেশদামের পরিবর্তে এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল, দোহারা ক্ষীণ-কটি তরুণ মূর্তির পরিবর্তে বেশ মোটাসোটা, হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িওয়ালা চেহারা, রঙের সে ঔজ্জ্বল্য নাই, ফরসা ছিল—সেই ফরসা রং যেন বেগুনে রঙের বাটীতে গুলিয়া মাখানো হইয়াছে—কি করিয়া চিনিব? 'কে আপনি? এ যে বাটীর ভিতর' বলিয়া হঠাৎ রুক্ষস্বরে কথা বলিতে যাইয়া দেখিলাম, তাহার সঙ্গে সতের আঠার বৎসরের এক তরুণ সদ্য-যৌবন সুদর্শনমূর্তি! লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্ধারের ন্যায় এই তরুণ যুবককে বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে হইল; আমি সেই বালককে দেখিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান ভুলিয়া গিয়া বলিলাম 'আজাহার নয় কি?' প্রৌঢ় আমায় বলিল, 'ওটি আজাহার-তনয়, এই আমি হচ্ছি আজাহার, তোমাকে এই বাড়ীর মালিক বলিয়া না জানিলে কখনই বুঝিতে পারিতাম না, তুমি সেই দীনেশচন্দ্র, একেবারে বদলাইয়া গিয়াছ।'

তাহার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হইয়াছে, তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করিতে সে নিজে আসিয়াছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাকে ভর্তি করাইয়া দিলাম।

আমাদের খেলার সাথী সেই 'হরিণ শিশু' শশী নিয়োগী জলপাইগুড়ি জজ আদালতের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল হইয়াছিল। সেও আজ দশ বার বৎসর হইল মারা গিয়াছে। তাহার ভাই হেম নিয়োগী সব-জজ হইয়া বোধ হয় এতদিন পেন্সন নিয়া থাকিবে। দুর্গাকান্ত রায় হাওড়ায় সব-জজিয়তী করিতেছে।

মানিকগঞ্জ স্কুল হইতে আমরা পাঁচজন মাইনর পরীক্ষা দিয়াছিলাম, ইংরাজী ১৮৭৯ সনে। তাহার মধ্যে আমি, কেদার, প্রসন্ন ও দুর্গাকান্ত থার্ড ডিভিসনে পাশ হইয়াছিলাম। অবিনাশ সেবার ফেল করিয়াছিল। পূর্ণবাবু বলিতেন, আমি ইংরাজীতে ভালো, কিন্তু অঙ্কে আমার মাথা খেলে না, সেই কথাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়া এবং তাহাতে কতকটা গৌরব মনে করিয়া, সাহিত্যই পড়িতে আরম্ভ করি। গণিতকে তুচ্ছ করি। তাহার ফলে সত্যই আমি গণিতে কাঁচা রহিয়া গেলাম, কিন্তু এখন মনে হয় আমি পড়িলে গণিত আয়ত্ত না করিতে পারিতাম এমন নহে।

এই মাইনর পরীক্ষায় একটা বিভ্রাট হইয়াছিল। ইংরাজী পরীক্ষায় যে ছেলে মানিকগঞ্জ স্কুলে সর্বোচ্চ নম্বর পাইবে তাহার সেই বৎসর একটা রৌপ্য-পদক পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমি ইংরাজীতে ভাল ছিলাম—সুতরাং উক্ত পদকটি যে আমার প্রাপ্য ছিল তাহা সকলেই জানিতেন এবং আমিও পূর্বসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কয়েক মাস পরে ইন্‌স্পেক্টর-আপিসে অনুসন্ধান হইলে জানা গেল আমার ইংরাজীর কাগজখানি খোয়া গিয়াছে, অথচ আমি মাইনর পাশ করিয়াছি। সেকালে মোট নম্বরের একটা নির্দিষ্ট অংশ রাখিলেই পাশ হওয়া যাইত। সুতরাং ইংরাজীতে শূন্য পাইয়াও আমি পাশ হইয়া ছিলাম। বাবা যখন এ বিষয় লইয়া লেখালেখি করিতে লাগিলেন, তখন আর কোন ফল হইল না। আমি যে ইংরাজী কাগজ দিয়াছিলাম, তাহা প্রমাণিত হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর সাহেব দুঃখ করিয়া লিখিলেন, অনুসন্ধানটা খুব দেরীতে

হইয়াছে। তখন আর এ বিষয়ে কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না। বাবা লিখিলেন, 'যদি ইংরাজীতে শূন্য পাইয়াও মাইনর পরীক্ষা পাশ করা যায়, তবে মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কি তফাৎ থাকে?' ফলে সেই বৎসর নূতন আইন হইল যে মাইনর পাশ করিতে হইলে ইংরাজীর পরীক্ষায় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক নম্বর থাকা প্রয়োজন।

মাইনর পরীক্ষা পাশ হইবার পূর্বেই আমার দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। আমার শ্বশুর উমানাথ সেন কুমিল্লা কলেক্টরীতে হেড ক্লার্ক ছিলেন, তাঁহার পিতা সেখানে সর্বপ্রধান মোক্তার ছিলেন, এবং সেইখানেই আমার পিতার মাতুল চন্দ্রমোহন দাশ (যাঁহার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে) ওকালতী করিতেন। মানিকগঞ্জ স্কুলের শেষ সীমা অতিক্রম করার পর পিতা আমাকে কুমিল্লায় পাঠাইয়া দিলেন।

তখন আমাদের সংসারে দৈন্য ও রোগ ঢুকিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ সাভার ও তন্নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম মানিকগঞ্জ মহকুমা হইতে সরাইয়া লইয়া ঢাকার সদরের অন্তর্গত করা হইয়াছে। সাভার ধনী বণিকগণের একটা কেন্দ্র ছিল, এবং এই স্থানের সকল মোকদ্দমাই বাবা পাইতেন, ঐ গ্রাম এবং তন্নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম বাবার হাতছাড়া হওয়াতে তাঁহার পসার অত্যন্ত কমিয়া গেল। এই সময়ে বাবা বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হন, এবং তাঁহার দুইটি চোখেই ছানি পড়ে। আমাদের নানারূপ কষ্ট উপস্থিত হয়।

মা বড় কষ্টে আমাকে একাকী দূরে কুমিল্লায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন। আমার শিক্ষার উন্নতিকল্পে সর্বদাই মা অতি দৃঢ়চেতা ছিলেন। তাঁহার মত স্নেহময়ী, ত্যাগপরায়ণা রমণী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার সমস্ত আবদার ও বিরোধ ছিল আমার পিতার সহিত, কিন্তু অপর সকলের সঙ্গে তাঁহার কোন আবদারই ছিল না। যাহাকে তিনি প্রতি মুহূর্তে চোখে হারাইতেন, তাহাকে তিনি কৈশোরে সাত দিনের পথ দূরে পাঠাইয়া বৎসর ধরিয়া যে কি উৎকণ্ঠায় থাকিতেন, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারি। ইহার পর যখন আমি ঢাকায় পড়িতাম, তখন ছুটিতে আমি বাড়ী আসিতাম। ছুটি ফুরাইলে একটি দিনও বেশী বাড়ী থাকিতে পারিতাম না। আমার পড়ার কোন বিঘ্ন হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার এই ব্যবহার আমার নিকট নির্মম বোধ হইত। কিন্তু তাঁহার একমাত্র পুত্রের প্রতি অদম্য স্নেহ-প্রবাহকে যে তিনি কিরূপ সংযমের রাশ ধরিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেন—তাহার মধ্যে পুত্রের ভবিষ্যতের শুভ চিন্তা কতটা প্রভাব বিস্তার করিত—তাহা ভাবিয়া দেখিলে, তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে অনেক উচ্চস্থানে আসন দিতে হয়। আমি যখন ঢাকায় পড়িতাম, তখন যে আত্মীয়ের বাড়ী ছিলাম, তিনি প্রায়ই আমাকে অযথা কষ্ট দিতেন এবং তাঁহার আশ্রিত অপরাপর আত্মীয় বালক অপেক্ষা আমাকে অবহেলার চক্ষে দেখিতেন, আমাকে দিয়া অনেক ফরমাইস খাটাইতেন এবং প্রায়ই এ-ছুতা ও-ছুতা ধরিয়া গালমন্দ করিতেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে চোরের মত থাকিতাম, তাঁহার ছেলেদের সঙ্গে স্ফূর্তি করিয়া খেলিতে সাহস পাইতাম না। যখন উৎকট শারীরিক পরিশ্রমের দরকার হইত, তখন সর্বাপেক্ষা দুর্বল হইলেও সেই কাজের জন্য আমারই ডাক পড়িত। ছয় সাত মাস পরে ছুটিতে বাড়ী

আসিতাম। আমার প্রকৃতি নীরব ও সহিষ্ণু ছিল; বহু মনের কষ্ট আমি মুখ ফুটিয়া বলিতাম না। কিন্তু একদিন আমি নীরব রাত্রিতে ঝিল্লিনাদিত প্রকৃতির নিতান্ত আড়াল পাইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া আমার মনের দুঃখ তাঁহার কাছে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়াছিলাম। মা আমাকে দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 'ছিঃ! খোকা—তুই বড় তুচ্ছ কথা বড় করিয়া দেখিস। সে [আমার আশ্রয়দাতা আত্মীয়] কেন এমন করিতে যাইবে? এ তোর বুঝিবার ভুল! আর যদি দুই একটা কাজে সে তোকে লাগায়, তাহা করিতে অপমান কি? গুরুজনের সেবায় পুণ্য হয়। তাই ভাবিয়া সে সকল কাজ করিস। তুই কি সে বাড়ীর চাকর যে নিজেকে এত হীন মনে করিতেছিস?' এমনই দৃঢ়ভাবে তিনি কথাগুলি বলিলেন যে আমার সমস্ত আক্ষেপ অধরে মিলাইয়া গেল—সমস্ত অশ্রু চক্ষে শুকাইয়া গেল, বৃন্তচ্যুত ফুল যেরূপ আশ্রয় লাভের ব্যাকুলতায় পাথরে আছড়াইয়া পড়ে, আমি মায়ের নির্মম অন্তঃকরণের নিকট মাথা খুঁড়িয়া সেইরূপ বিড়ম্বিত হইলাম। তখন মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি, মাতা কতটা সংযম দ্বারা নিজের উদ্যত সহানুভূতির বাহ্যিক প্রকাশকে রোধ করিয়াছিলেন। তিনি যদি সাধারণ স্ত্রী-সুলভ ব্যাকুলতা দ্বারা আমার কথার প্রশ্রয় দিয়া কান্নাকাটি করিতেন, তবে আমার লেখাপড়ার সুবিধা চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইত। আমি সে বাড়ীতে আর থাকিতে পারিতাম না।

বাবা আমাকে কাছে বসাইয়া উপাসনা পদ্ধতি শিখাইতেন। ঠাকুর-দেবতা যে কিছু নয়, তাহা বুঝাইতেন; 'একমাত্র আরাধ্য ঈশ্বর—তাঁহার রূপ নাই। ছেলেরা যেমন পুতুল লইয়া ভাবে ইহারাই মানুষ, কাঠ পাথর ও মৃন্ময় বিগ্রহ লইয়া তেমনই লোকে ভাবে ইহারাই দেবতা। ছেলেরা যেমন পুতুলের বিবাহ দেয়, ইঁহারা তেমনই পুরাণ রচনা করিয়া এই সকল কাঠ পাথরের মূর্তিসমূহের জন্ম হইতে শুরু করিয়া বিবাহাদি সমস্ত বিষয়ে গল্প রচনা করিয়া পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।' পিতা যখন একা আমায় লইয়া এই সকল উপদেশ দিতেন, তখন মা হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত উপদেশ ওলটপালট করিয়া দিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে পিতাকে বলিতেন—'ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওর মাথাটি খেও না, তুমি জীবনভর আমায় এই সকল কষ্ট দিয়ে এসেছ, সাত নয় পাঁচ নয়, আমার একটা ছেলে, তাকেও একেবারে জাহান্নামে দেওয়ার পথ করছ। এরূপ করলে আমি তোমার পায়ের কাছে মাথা খুঁড়ে মরব, না হয় গলায় দড়ি দেব। বার মাসে তের পার্বণ করতে সকল কাজ আমাকে নিজে করতে হয়। বাড়ীতে দুর্গোৎসব। তাও পুরুত ডাকা থেকে বাজার করার ব্যবস্থা, এমন কি বাজনার বন্দোবস্তও আমায় করতে হয়। ভেবেছি খোকা বড় হলে সে এই সকল ব্যাপারে আমার সহায় হবে। তুমি ওকেও বিধর্মী করে তুলছ!' মায়ের কথার তোড়ে বাবা ভাসিয়া যাইতেন। আমি ইহার পরে প্রহারের ভয়ে আস্তে আস্তে তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া যাইতাম।

আমি যেবার এল. এ. পরীক্ষা দিব, তখন ফিলিপ টি. স্মিথ সাহেব একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন 'এপিফেনি'র এডিটর। ইনিই এই পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশ করেন। সাহেব আমাকে বড়ই ভালোবাসিতেন, ১৮৮২ সনের এপিফেনি কাগজে আমার অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। তিনি ঢাকায় আসিয়া শুনিলেন, আমি সুয়াপুর গ্রামে চলিয়া আসিয়াছি। তিনি আমায় লিখিলেন, 'অক্সফোর্ড

মিশনের ব্যয়ে তুমি ঢাকায় চলিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, নতুবা বল আমি তোমাদের সুয়াপুর গ্রামে যাইব।' বাবা পত্রখানি পড়িয়া খুসী হইয়া বলিলেন, 'বেশ তো সাহেব এ গ্রামে আসুন না, এখানে সভা করিব ও তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্ম-মতের পোষকতা করিয়া পাল্লা দিব।' কিন্তু মা এই কথা শুনিয়া বিষম চটিয়া গেলেন—'আমাদের সংসারটা কি ভূতের লীলার স্থান যে ব্রাহ্ম খৃীষ্টান সকলে মিলিয়া এখানে উৎপাত করিবে? উপলক্ষ তো একটা আধমরা ছেলে।' আমার দিকে ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন—'খোকা তুই লিখে দে—আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের মত শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নাই—আমরা খৃীষ্টানী মত শুনতে চাই না।' আমি স্মিথ সাহেবকে লিখিলাম, 'আমাদের গ্রামের লোক গোঁড়া হিন্দু। এখানে আসিলে আপনার ভাল লাগিবে না।'

আমার মাতার ধর্ম সম্বন্ধে মতের উদারতা না থাকিতে পারে, কিন্তু সকল বিষয়েই তাঁহার একটা প্রবল মত ছিল এবং তাঁহার মতানুসারেই আমাদের চলিতে হইত। পিতা তাঁহার ধর্মবিশ্বাস লইয়া যেন কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতেন, আমরা পূজার উৎসব ও বার মাসে তের পার্বণে হিন্দুধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ফিরিতাম।

৭

গৃহে হিন্দু ও ব্রাহ্মমত। পিতামাতা ও ভগিনীদের মৃত্যু

আমি ব্রাহ্ম ও হিন্দু—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা ভাল—তাহা সর্বদা চোখের সামনে দেখিয়াছি। আমার মাতা, মাতামহ ও বড়দিদি দিগ্বসনী দেবীর যে ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়াছি, দেবতার পূজায় যে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে হিন্দুর দেবতারা জীবন্ত। মাতামহ এত বড় তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন শুইয়া শুইয়া গাহিতেন 'আমার মন যদি রে ভোলে, তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে'—তখন তাঁহার দুই চক্ষের জল অজস্র পড়িত। যখন তাঁহার বিশাল দুর্গামণ্ডপে অতি বৃহৎ দশভুজা প্রতিমার আরতির সময় পুরোহিত-করধৃত পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিতে থাকিত, অগুরু ও ধূপের সুগন্ধে ও ধোঁয়ার মধ্য হইতে অদৃশ্য ও অব্যক্ত রূপের প্রকাশের ন্যায় মুকুট ও অঞ্চলের স্বর্ণবর্ণ ঝল্‌মল্‌ করিতে থাকিত; কিংবা পুষ্পপাত্রের ফুল ও চামর সেই বিরাট মূর্তির মুখের নিম্নে দুলিয়া দুলিয়া অরূপকে অপরূপ করিয়া দেখাইত, তখন মাতামহ গললগ্ন-উত্তরীয় অবস্থায় ও নগ্ন পদে দৈন্য জানাইয়া জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতেন—দুই গণ্ড ভাসিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইত। মা ধরনা দিয়া কাঁদিতে থাকিতেন, কখনও আহার নিদ্রা ছাড়িয়া মন্দিরদুয়ারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া প্রার্থনা জানাইতেন, তখন মাতামহ ও মাতার আরতি যে বিশ্বমাতার কাছে যাইয়া পেঁাছিত সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না এবং এখনও নাই। দিদি দিগ্বসনী দারুণ কাশি লইয়া শেষ রাত্রে নীচেকার একটা স্যাঁতসেঁতে ঘরে বসিয়া জপ করিতেন; যখন দাশদের বাড়ীর কুঞ্জ বেহাগ রাগিণী গাহিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রির অভ্যর্থনা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, তখন দিদির জপ আরম্ভ হইত এবং প্রভাতের কাক-কলধ্বনির সঙ্গে জপ শেষ করিয়া তিনি স্নানার্থে নদীতে যাইতেন। তথা হইতে আসিয়া একবার আমিষের ঘরে রান্না করিয়া পুনরায় নদীতে স্নান করিয়া নিরামিষ পাকে রান্না করিতেন। খাওয়াদাওয়ার পর আবার জপে বসিয়া রাত্রি নয়টা পর্যন্ত জপ করিতেন, অধিকাংশ সময়ই গায়ে 'একশত তিন' জ্বর থাকিত এবং প্রায়ই গলা হইতে রক্ত পড়িত। এ সকল কাজ তাঁহাকে আমরা কেন করিতে দিয়াছি, প্রশ্ন হইতে পারে। তাহার কারণ, তিনি যেটা করিবেন সেইটি করিবেনই। তিনি জেদ করিয়া বসিলে তাঁহাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছিলেন—'এতদিন এই যক্ষ্মা রোগ লইয়া এরূপ দুশ্চর তপস্যা করিয়া মানুষ যে কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমাদের শাস্ত্রে বলে না। তিনি যে তপস্যা করিতেছেন সেই তপস্যার শাস্ত্রই এই প্রহেলিকার মর্মোদ্ধার করিতে পারে।'

একদিকে হিন্দুধর্মের এই জ্বলন্ত বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অপর দিকে পিতৃদেবতার সৌম্য-দর্শন, শান্ত সমাহিত মূর্তি—জ্ঞানের যেন স্থির প্রদীপ। মন্দিরের আরতি হইতে তাহার প্রভাবও কম ছিল না। তিনি দিবারাত্রি প্রায়ই উপাসনায় কাটাইয়া দিতেন। তিনি কখনও অসত্য কথা বলিয়াছেন, এমন কেহ

বলিতে পারিবেন না। তাঁহার ক্রোধ দেখি নাই, তাঁহার চাঞ্চল্য বা মতের পরিবর্তন দেখি নাই, দুঃখশোকে তাঁহাকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখি নাই, তাঁহার আমার প্রতি অসীম ভালবাসায়ও কোন উদ্বেলতা বা উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই নাই, শুধু একদিন তিনি অধৈর্য হইয়াছিলেন—আমার মায়ের মুখে শুনিয়াছি। তিনি ভয় করিতেন নদীকে আর সাপকে। সাপের ভয়ে ঘরে ঘরে বড় খাট পাতা থাকিত ও চাঁদোয়া টাঙানো হইত; নানারূপ মশারির কায়দা করিয়া তিনি তোশকের নীচে রন্ধ্রমাত্র ফাঁক রাখিতে দিতেন না। সেই একদিনের কথা বলিতেছি। নদীতে ঝড়ের সময় নৌকায় থাকিলে তিনি ভয় পাইতেন, কিন্তু ভয়ের কোন বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া স্থির প্রস্তর-বিগ্রহের ন্যায় বসিয়া উপাসনা করিতে থাকিতেন, তাঁহার ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠাধর ও অর্ধনিমীলিত চোখের ভঙ্গীতে যেন বুঝিতাম—'রক্ষা কর', 'রক্ষা কর', এই প্রার্থনা ভাষায় ব্যক্ত না হইয়াও মনের মধ্যে চলিতেছে। একদিন নৌকায় মুহুরি বিপিন ঠাকুরের সঙ্গে তিনি আমায় ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর। সন্ধ্যাবেলা প্রবল ঝড় হয়, আমরা ঝড়ের উপক্রম বুঝিয়া একটা চড়ায় নৌকা নঙ্গর করিয়া ফেলি। বৃষ্টি ছিল না, শুকনা ঝড়, বিপিন ঠাকুরদা ও আমি সেই চড়ায় ধুলি খাইয়া নৌকায় আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিলাম। এরূপ ভারী নঙ্গর ছিল ও এরূপ শক্ত লোহের শিকলে তাহা আবদ্ধ ছিল যে নৌকা উড়াইয়া বা ভাসাইয়া লইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মায়ের কাছে শুনিয়াছিলাম, রাত্রে ঝড় উঠিলে পিতা পাগলের মত হইয়া 'আমিই খোকাকে মারিয়া ফেলিলাম, আমার খোকা কোথায় গেল? তাহাকে কে আনিয়া দিবে?' এই ভাবে বহু আক্ষেপ করিয়া সেই ঝড়ের মধ্যে লণ্ঠন লইয়া দুই মাইল দূরে আমার মাতুলালয় বগজুড়ী গ্রামে ছুটিয়া গিয়া আমার মাতুলাদিগের দ্বারা পরদিন অতি প্রত্যূষে ঢাকায় লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন।

কিন্তু এইদিন ছাড়া আর কখনও তাঁহার কোনরূপ ব্যাকুলতা দেখি নাই। আমি একবার রাত্রি নয়টার সময় মাতুলালয়ে ছিলাম, বাড়ী (সুয়াপুর) হইতে তখন এক লোক আসিয়া বলিল—'কর্তা (বাবা) মরণাপন্ন, আপনি এখনি চলুন।' আমি একটা ঘোড়ায় চড়িয়া সাত আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাড়ী আসিলাম। রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নাময়ী, পল্লীগুলি ছিল নিদ্রাবিষ্ট, নিঝুম,—কিরূপ দুর্ভাবনায় যে যাইতে-ছিলাম তাহা বলিয়া উঠা কঠিন। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, বেশ সুখকর বায়ু বহিতেছিল, কিন্তু আমার মনের মধ্যে ছিল হাহাকার।

ঘোড়ার বেগ শিথিল করিয়া রাত্রি প্রায় বারটার সময় বাড়ী পোঁছিলাম, গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাবা তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন 'একটা crisis (বিপদের অবস্থা) এসেছিল, দক্ষিণা (ডাক্তার, আমার ভগিনীপতি) এতক্ষণ ছিল, সে বলিয়া গিয়াছে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।' তখন তিনি স্থিরভাবে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন। আমার মনে যখনই তাঁহার কথা মনে হয়, তখনই তাঁহার সেই সৌম্য উপাসনার মূর্তি জাগিয়া উঠে—'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' এবং 'বয়ং তং স্মরামঃ, বয়ং তং ভজামঃ, বয়ং তং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ' মহানির্বাণতন্ত্রের এই পরিচিতি শ্লোকগুলি তাঁহার উপাসনার মন্ত্র ছিল। এইগুলি অর্ধস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করিয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছেন—

এই শ্লোকগুলি যেন তাঁহার পক্ষে আশ্রয়ের অটল হিমালয়, এখানে পেঁৗছিলে, যেন তিনি একেবারে অনড়, বিপদাতীত ও সম্যক্ নিরাপদ হইয়া যাইতেন।

কখনও দেখিয়াছি অতি প্রত্যূষে তিনি ফুলের বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে মৃদু স্বরে গাহিতেছেন, 'মন চল নিজ নিকেতনে'। তাঁহার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি সুরে যেন সেই 'নিজ নিকেতনে'র শান্তির প্রতি ইঙ্গিত করিত। শেষ জীবনে 'ইন্দ্রিয় দশ, হইতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরিয়ে' এই গান গাহিয়া নিত্যধামের যাত্রী হইতে যে তাঁহার বিলম্ব নাই, এই বুঝাইতেন। শেষকালটায় বাউলের গানের প্রতি তাঁহার একটা নেশা হইয়াছিল। আমাদের আঙ্গিনায় নালু গয়লা, কোকা, হরি সাহা প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় লোকেরা লম্বা লম্বা গৈরিকবর্ণের আলখাল্লা ও ফকিরী আসবাব, এবং একতারা প্রভৃতি লইয়া লাফাইয়া নৃত্য করিত ও গাহিত— 'বাঁশের দোলাতে চড়ে—কে হে বটে শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে'। সংসারলীলার অবসানে সেই বাঁশের দোলা অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির সমস্ত দেনা চুকাইয়া—প্রত্যেককেই শ্মশান-যাত্রী হইতে হইবে—সুতরাং প্রত্যেকের মনে এই সুর বৈরাগ্য জন্মাইত।

এই উপাসনার ভাবেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন সুয়াপুর গ্রাম বন্যা-প্লাবিত, কুত্রাপি চতুষ্পার্শ্বে একটু উঁচু স্থান নাই। কোথায় তাঁহাকে দাহ করা হইবে? ১৫ই ভাদ্র ১৮৮৬ সন, ঝরঝর করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, আমাদের একখানি বড় মেটে ঘরের প্রাচীরটা ঝুপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। মা বলিলেন 'ঐ ঘরখানা গেল' —বাবা ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'একথা এখন আমায় শুনাইয়া লাভ কি?' কালীর মাতা (বিধবা ও আমাদের আত্মীয়া) আসিয়া বাবাকে বলিলেন 'ঈশ্বর, কালী-দুর্গার নাম কর।' বাবা বিরক্তির সুরে বলিলেন 'যাহা কখনও করি নাই, আপনারা শেষ মুহূর্তে তাহা লইয়া আমায় কষ্ট দিতেছেন কেন?' এই বলিয়া উপাসনার ভাবে চক্ষু বুজিলেন এবং আর দশ পনর মিনিটের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। বড় কয়েকখানি নৌকা একত্র করিয়া তদুপরি স্তূপীকৃত মৃত্তিকায় শয্যা রচনাপূর্বক চিতা নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে দাহ করা হইয়াছিল।

আমার মা এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ৫ই ফাল্গুনে প্রাণত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর যে তিনি শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে শয্যা আর ত্যাগ করেন নাই। কেবল দেখিতাম সকালবেলা কাঁপিতে কাঁপিতে নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমার জন্য কিছু দুধ নিজে আনিয়া ক্ষীর করিবার জন্য কর্পূরা দিদিকে দিতেন এবং আমি যখন খাইতাম, তখন বিছানা হইতে আমার খাওয়া দেখিতেন। একবার ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া মা-বাবার কোলে ফিরিয়া কাঁদিয়া তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম; তখন মনে হইয়াছিল বিপদ কাটিয়া গেল—শান্তির স্থান পাইলাম। তাহার পর জীবনে যে কত দুঃখ কত ঝড় সহিলাম—হতাশ হইয়া কাহার কাছে যাইব—ব্যাকুল ভাবে খুঁজিয়াছি, তেমন নিরাপদ স্থান তো আর পাই নাই।

পিতামাতার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে আমার দুইটি ছোট ভগিনী মৃন্ময়ী ও কাদম্বিনী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। দুইজনের মৃত্যুই আকস্মিক, কাদম্বিনী সন্ন্যাস রোগে প্রাণত্যাগ করে, তখন তাহার ১৪ বৎসর বয়স। এই ঘটনার এক মাস পরে মৃন্ময়ী প্রথম সন্তান হওয়ার পর ধনুষ্টঙ্কার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহার বয়স ১৬ বৎসর। মৃন্ময়ীর সেই পদ্মপলাশনিভ চোখদুটি চিরদিনের জন্য

মুদিত হইল। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণদিকের পুকুরে যখন সে সাঁতার কাটিয়া জলক্রীড়া করিত, তখন পূর্বদিকের সূর্যালোক সেই চোখদুটির উপর পড়িলে তাহা পদ্মের মতই দেখাইত। কাদম্বিনীর সেই স্নিগ্ধ শ্যামাভ বর্ণ ও নিবিড় দীর্ঘ কেশদাম—যাহা মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার উচ্চাভিলাষ পোষণ করিত—তাহা শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ইংরাজী ১৮৮৬ সনে আমার পিতা মাতা ভগিনী সকলকে হারাইলাম, এবং বাতব্যাধি রোগে দক্ষিণাঙ্গ হীনবল হওয়ায় আমি শয্যাগ্রহণ করিলাম। দুর্গ্রহের রোষবহ্নি তখন ধক্ ধক্ করিয়া আমার উপর জ্বলিতেছিল, তাহা ভাবিতে এখনও শরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

৮

খেলাধ্লা

পড়াশ্নার কথা প্নরায় শ্র্ করিবার প্র্বে আমরা বাল্য ও কৈশোর জীবনে যে সকল খেলা খেলিয়াছি ও আমোদপ্রমোদ করিয়াছি তাহার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিব।

আমার বাল্য-লীলার কেন্দ্র ছিল তিনটি। একটি মানিকগঞ্জে, যেখানে আমার পিতা ওকালতী করিতেন, দ্বিতীয় মাতুলালয় বগজ্রী গ্রামে, যেখানে আমার জন্ম হয়, তৃতীয় স্য়াপ্র গ্রামে—আমাদের বাড়ীতে।

মানিকগঞ্জের খেলার সাথীদের কথা প্র্বেই লিখিয়াছি, আমার নিত্যসহচর ছিল প্রসন্ন গ্হ।

বাজারের নিকট খোলা মাঠে আমরা ক্রিকেট খেলিতাম; কখনও বা 'হা-ডু-ডু' খেলিতাম। 'হা-ডু-ডু' খেলিবার তিন রকম মন্ত্র ছিল। একটা নির্দিষ্ট স্থান হইতে 'ডু-ডু' শব্দ করিতে করিতে রওনা হইতে হইত। এক নিশ্বাসে—'ডু-ডু' শব্দ করিতে করিতে যাহাকে ছোঁয়া যাইত, সেই 'মরিত'। অর্থাৎ সে কিছ্কালের জন্য, অর্থাৎ সেই খেলোয়াড়ের আয়্ পর্যন্ত, খেলায় যোগদান হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিত। খেলোয়াড় এইভাবে 'ডু-ডু' শব্দ করিতে করিতে ইহাকে উহাকে ছ্ঁইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহার নিশ্বাসটা ফ্রাইয়া গেলে যদি কেহ তাহাকে ধরিত, তবে সে 'মরিয়া যাইত'। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সে এক নিশ্বাসের মধ্যেই একজনকে ছ্ঁইয়াছে, কিন্তু স্পৃষ্ট ব্যক্তি খেলোয়াড়কে সজোরে ধরিয়া ফেলিয়াছে, যদি এক নিশ্বাসে 'ডু-ডু' করিতে করিতে সেই ছেলেটির হাত হইতে বলপ্র্বক নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সে প্নরায় তাহার নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিত, তবেই তাহার জয়। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি তাহার নিশ্বাস টানা বন্ধ হইয়া যাইত, এবং তৎকর্তৃক স্পৃষ্ট ব্যক্তি যদি তাহার নিশ্বাস টানা বলপ্র্বক ধরিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিতে পারিত, তবে 'ডু-ডু' শব্দকারীর মৃত্যু এবং স্পৃষ্ট ছেলের জয় স্চিত হইত। এই 'ডু-ডু' ছাড়া এই খেলার আরও দ্ই রকম মন্ত্র ছিল, তাহা প্র্বেই লিখিয়াছি,—তাহার একটি ছিল 'কপাটি কপাটি ঢ্যাং' এবং আর একটি ছিল—'মড়ার খপর দেঙ্গে, তবলা বাজাওঙ্গে'—বলা বাহ্ল্য, এক নিশ্বাসে ঐ কথাগ্লি উচ্চারণ করিতে করিতে যতগ্লি ছেলেকে প্রধান খেলোয়াড় ছ্ঁইতে পারিত, তাহারা সবগ্লি মরিত এবং তাহার নির্দিষ্ট স্থলে পৌঁছিবার প্র্বে যদি তাহার নিশ্বাস ফ্রাইয়া যাইত অথবা তাহাকে তদবস্থায় কেহ ছ্ঁইয়া ফেলিত তবে সে মরিত।

আমি এই সকল খেলা ও ক্রিকেটে অতিশয় হীন স্থান অধিকার করিতাম। বড় বড় খেলোয়াড়দের আদেশান্সারে কখনও কখনও কানমলা, নাকমলা খাইতে খাইতে কোন একটি স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়াছি, তাহার উপর 'আদ্রে' ছেলে বলিয়াও নিগ্রহ সহ্য করিয়াছি, আমার ন্যায় দ্র্বল দলের ভিতর কেহ ছিল না।

কিন্তু প্রসন্ন ও আমি যখন ন্তন সড়কের উপর দিয়া গান করিয়া কিম্বা কথাবার্তা বলিতে বলিতে যাইতাম, তখন আমার স্ফ্র্তির অবধি থাকিত না। প্রসন্নের

দেশ হইতেছে বাখরগঞ্জের বানরীপাড়া। তাহাদের দেশে আমিন আসিলে ম্সলমান প্রজারা কিভাবে বিদ্রোহী হইয়া আমিনদিগকে আক্কেল দিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একটা গান সে খ্ব তারস্বরে নিত্যই গাহিত, আমিও তাহার দোহারগিরি করিতাম, যেমন গায়ক তেমনই দোহার। উভয়ের কণ্ঠ হইতে যে স্বর-লহরী উত্থিত হইত তাহাকে 'কাক-কোলাহল' ভিন্ন অন্য নাম দেওয়া যাইতে পারিত না। গানটার কিছ্ কিছ্ অংশ আমার এখনও মনে আছে। তাহা এই—

'শ্ন্ছনি ভাই সবারা চাঁদা মিঞা
যে খই পাঠাইছে।
লাল বলদ লাগিয়ে দেবে
যেতর বাড়ী আমিন আছে।'

এই গানটি রচিত ছিল 'সন্ধ্যা-ভাষা'য়। অর্থাৎ কতকগ্লি শব্দ তাহারা নিজেদের মধ্যে পারিভাষিক করিয়া ফেলিয়াছিল। উদ্ধৃত দ্টি ছত্রে 'খই' শব্দের অর্থ 'সংবাদ' এবং 'লাল বলদ' অর্থ 'আগ্ন'। চাঁদ মিঞা ছিল দলের নেতা, তাহার আজ্ঞা ছিল, যে যে বাড়ীতে আমিন আসিয়াছে, সেই সেই বাড়ীতে আগ্ন লাগাইয়া দিতে হইবে।

বাজারের কাছে কখনও কখনও খেমটা নাচ হইত, প্রায়ই বারোয়ারী প্জা উপলক্ষে। সে নাচ অতীব জঘন্য। কিন্তু আমার তখন আট নয় বছর বয়স—তখন তাহার কিছ্ ব্ঝিতাম না। খেমটাওয়ালীর অতি দ্ষ্ট অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া বহ্লোক —তাহার মধ্যে ভদ্রলোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না—যে কির্প উন্মত্ত উত্তেজনা দেখাইত, তাহা মনে পড়িলে আমার এখনও লজ্জা হয়। সেই সমবেত দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার অতি অশ্লীল মন্তব্য উচ্চস্বরে প্রকাশ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে উৎসাহ দিতে থাকিত, তাহাতে নর্তন-ভঙ্গীর ধৃষ্টতা আরও বাড়িয়া যাইত ও নর্তকীর ম্খে হাসির রেখা ফ্টিয়া উঠিত।

আমার যখন আট নয় বৎসর বয়স, তখন সেই আসরে এক বাঈজীর গান শ্নিয়াছিলাম, তাহার বয়স কুড়ি বাইশ বৎসর ছিল। তাহার বর্ণ ছিল কালো-আঁধারে আকাশে নবনীরদমালার ন্যায়, কালো হইলেও বর্ণটা ছিল স্নিগ্ধ, মনভুলানো। তাহার ম্খ ঘিরিয়া বক্রান্ত কেশদাম দ্লিয়া দ্লিয়া যেন ভ্রমরের মত খেলা করিতেছিল এবং পশ্চাৎ ভাগে অতি নিবিড় ও ঘন ম্ক্ত কেশরাশি যেন জমাট আঁধারের মত শোভা পাইতেছিল—'নবজলধর র্প বড় মনে লাগে, কত কেঁদে মরবি লো তুই শ্যাম-অন্রাগে। ভেবে ছিলি যাবে দিন তোর সোহাগে সোহাগে।' তাহার পর ব্ঝিয়াছিলাম সে কালেংড়া স্রে গানটি গাহিতেছিল। তাহার কণ্ঠ এমনই মধ্র ছিল এবং সে এমনই ভাবের আবেশে গানটি গাহিয়াছিল যে আজ ৪৩ বৎসর পরেও তাহার ম্র্তিটি ও কর্ণ স্র আমার যেন প্রত্যক্ষবৎ মনে হইতেছে। 'নবজলধরে'র কথা সে গাহিতেছিল—কিন্তু তাহার চেহারাটিও নবজলধরের মতই ছিল।

কখনও কখনও সেই আসরে যাত্রাগান হইত, তখনও যাত্রার বক্তৃতার ভাগ বেশী হয় নাই—গানের ভাগ বেশী ছিল। সে সকল গান আমি ভাল ব্ঝিতে পারি নাই,

কিন্তু 'সং' গুলির কথা বেশ মনে আছে, তাহারাই সেই আসর জমকাইয়া তুলিত। সং গুলির কথা প্রায়ই নীতিবিরুদ্ধ প্রেম লইয়া হইত। একটা ছোঁড়া একদিন রন্ধননিরতা একটি রমণীর উদ্দেশ্যে, রান্নাঘরের পার্শ্বে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাহিতেছিল—'নিতি নিতি ফিরি আমি তোমার কানাচে।'—ইহার মধ্যে সেই রমণীর স্বামীজী এক লগুড় লইয়া প্রেমিকটিকে তাড়া করিলেন। রমণীটির বোধহয় গানটি একেবারে মন্দ লাগে নাই—কারণ সে একটু আক্ষেপের ভাবেই স্বামীর কাণ্ডটি দেখিতেছিল। সং গুলির ব্যাপার প্রায়ই এইরূপ দুর্নীতি প্রেম লইয়াই হইত। আর একজন নিরাশ প্রণয়ীর গান আমার এখনও মনে আছে 'মজে শিমুলের ফুলে আমার একুল ওকুল দুকুল গেল।' কখনও এক পাগলা বামুন হাতে তুড়ি দিতে দিতে আসিয়া আসর জমকাইয়া গাহিত 'যা কিছু পাই তাইতে খুসী গো যা কিছু পাই—তাইতে খুসী,··· যদি লোকে করে পীড়াপীড়ি তবে পাগল হয়ে অমনি হাসি।··· তখন সাজিমাটি নিয়ে কাপড় ঘষি গো।' সে নাচিয়া গাহিয়া আসর মাৎ করিয়া দিত। বলা নিষ্প্রয়োজন—উদ্ধৃতাংশে গানের অশ্লীল ভাগ বাদ দিয়াছি। কিন্তু আমাদের সুয়াপুরে যাত্রা কিম্বা মঙ্গলগানের সং অশ্লীলতা-দুষ্ট হইত না, সে সকল সং আসিত ছেলেদিগকে হাসাইতে। অনেক সময়ই তাহারা মূল কাহিনীর অঙ্গীয় হইত, লবকুশের যুদ্ধের পালা একবার আমাদের বাড়ীতে হইয়াছিল —তাহাতে লবকুশের সঙ্গে বানরদিগের যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া এইভাবে হাস্যরস অবতারিত হইয়াছিল—'দাদাগো' বলিয়া লব কুশকে এক একটা বানর দেখাইয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিতেছিল—'দেখছ না—সে বেটা তো ছিল ভাল, আর এক বেটা আসছে দাড়িতে বেঁধে পলো।' এইভাবে এক একটা বানরের মূর্তি বর্ণনা করিয়া সে এমনই হাস্যরসের উদ্দীপনা করিয়াছিল যে, আমরা শিশুমণ্ডলী আমোদের চোট সামলাইতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছিলাম।

আমার মামার বাড়ীতে বাহিরখণ্ডে পূজার সময় যে কবিগান হইত তাহা মেয়েদের দেখিবার উপায় ছিল না। সে কবিগানের মত অশ্লীল কিছু মনে ধারণা করা যায় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্র হইয়া যেরূপ ভঙ্গীতে নাচিতে থাকিত, তাহা পুরী ও কণারকের মন্দিরের অশ্লীল মূর্তিগুলির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে—তফাৎ এই, সেই পাথরের খোদাই মূর্তিগুলি একেবারে নগ্ন, আর কবির দলের পুরুষ ও স্ত্রী বস্ত্র ত্যাগ করিত না। কতকাল যাবৎ যে মন্দিরপ্রাঙ্গণ এই যৌন-বীভৎসতাকে প্রশ্রয় দিয়াছে বলা যায় না, কিন্তু যদি প্রস্তর বা মৃন্ময় দেবতারা কথা কহিতে পারিতেন, তবে নিশ্চয়ই এই সকল বিকট উৎসব থামাইয়া দিতেন। যাঁহারা কথা কহিতে পারেন না, তাঁহাদের যে কত বিড়ম্বনা ও উৎপাত সহ্য করিতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, দেবতারাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না।

কিন্তু এই সকল ছাড়া কথকতা, কীর্তন, চণ্ডীমঙ্গল, রামমঙ্গল প্রভৃতিতে প্রকৃত ভক্তির উচ্ছ্বাস আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি। সুয়াপুর গ্রামে বৎসর বৎসর এক অধিকারী ঠাকুর (তাঁহার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি) রামমঙ্গল গান করিতেন, তাঁহার গান আমরা আগাগোড়া হাঁ করিয়া শুনিয়াছি। তিনি গানে গানে যেন ছবি আঁকিয়া যাইতেন। একটা চামর দোলাইয়া তিনি আসরের এদিক-ওদিক ঘুরিয়া গান করিতেন—একাই যেন একশ। তাঁহার সঙ্গের লোকেরা 'দোহার' হইত। তিনি একাই

রাম হইয়া বনবাস যাইবার প্রস্তাব করিতেন এবং সীতা হইয়া স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুনয় করিতেন, কৌশল্যা হইয়া বিলাপ করিতেন এবং দশরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। যখন সং দেওয়ার দরকার হইত, তখন দোহারদের মধ্যে হইতে একটা লোককে ধরিয়া আনিয়া আসরে তাঁহার সামনাসামনি দাঁড় করাইতেন এবং তাহার সহিত নানারূপ কৌতুকপূর্ণ বাদানুবাদ করিয়া আমাদিগকে হাসাইতেন।

কিন্তু এই সকল সাধারণ উৎসবে আমাদের আমোদের তৃষ্ণা মিটিত না। আমরা কতরূপ যে দুষ্টামি করিতাম তাহা ভাবিলে এখনকার বালকদিগকে নিতান্ত শান্ত-শিষ্ট বলিয়া মনে হয়। আমাদেরই বাড়ীতে আমার দলের বালকেরা ভাল আম-কাঁঠাল, খেজুর-রস, গোলাপজাম প্রভৃতি চুরি করিত। এ সকল কান্ড দ্বিপ্রহর রাত্রে হইত। আমি থাকিতাম পাহারা, অর্থাৎ বাড়ীর কেহ জাগিলে, দলের ছেলে-দিগকে সতর্ক করিয়া দিতাম। আমাদের বাড়ীতে খুব বড় একটা কড়াতে সর তৈয়ারী করিবার জন্য দুধ জ্বাল দেওয়া হইত। উনুনের আঁচ কমাইয়া দিয়া তাহার উপর প্রকান্ড কড়াটা রাখিয়া দিবাদ্বিপ্রহরে মা ঘুমাইয়া পড়িতেন। ঝি-চাকরেরা বাহিরে ঘুমাইত। এমন সময় আমরা দুই তিনজনে বাহির হইতে রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া সুদীর্ঘ পাকাটি চালাইয়া উহা কড়াটার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া সমস্ত দুধটা খাইয়া ফেলিতাম। শুধু সরটা কড়ার নীচে শুইয়া পড়িয়া থাকিত। এই সকল উপদ্রব শুধু কৌতুকের জন্যই বেশী করিতাম—ক্ষুধার তাড়নায় নহে। দ্বিপ্রহর রাত্রে নানা ফল ও খাদ্যদ্রব্য নিজেদের বাড়ী হইতে চুরি করিয়া আমরা পুকুরের ধারে বসিয়া সাবাড় করিতাম। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মুড়ি দিয়া এক একটি কাঁঠাল খাইয়া ফেলিত। এই ভাবে উদর পূর্ণ এমন কি অত্যধিক স্ফীত করিয়া আমরা সেই রাত্রিকালে পুকুরের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। শেষ রাত্রে আস্তে আস্তে বাড়ী ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। বগজুরী গ্রামে আমার মামাতো ভাই হীরালাল ও আমি গামলায় চড়িয়া পুকুরের জলে বেড়াইতাম। একটা বৈঠা ঘুরাইয়া জল কাটিয়া আমরা অগ্রসর হইতাম। গামলাটা আমাদিগকে লইয়া চরকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে চলিত। অবশ্য এক একটা গামলায় এক একজন মাত্র চড়িয়া এই জলকেলি করিতে পারিত। আমি ধলেশ্বরীর ন্যায় বড় নদীর উপর গামলার 'বাছ' দেখিয়াছি। ২০।২৫ জন গামলায় চড়িয়া দ্রুতবেগে নদী পাড়ি দিয়াছে। যে ব্যক্তি সকলের আগে যাইতে পারিয়াছে, সে পুরস্কার পাইয়াছে।

হীরালাল ও আমি দোতলার উপর একটা ছোট ঘরে বসিয়া কত ছবি আঁকিতাম, তাহা আর কি বলিব। হরিতাল গুলিয়া হলুদ রং করিতাম, সিন্দুর গুলিয়া লাল করিতাম। প্রতিমা গড়িতে গোলক দেউরী আসিত, তাহার কাছে অনেক চাহিয়া-চিন্তিয়া কিছু কিছু রং আদায় করিতাম, তখন অল্প দামের রঙের বাক্স সর্বত্র পাওয়া যাইত না। আমরা আঁকিতাম দশমুন্ড কুড়ি হস্ত রাবণ-রাজা ও লোলরসনা দিগ্বসনা কালীমূর্তি,— কখনও কখনও রাম-সীতা, বাঘ ও বিড়াল আঁকিতাম। 'নূতন পুকুরে'র পাড়ে বসিয়া মাটি ছানিয়া কত যে কালীমূর্তি ও সরস্বতীমূর্তি তৈয়ারী করিয়াছি তাহার অবধি নাই। সেই মূর্তি শুকাইলে তাহাতে রং চড়াইয়া তারপর পূজার ব্যবস্থা করিয়াছি। দুপুরের রৌদ্রে মাথার চাঁদি ফাটিয়া যাইতেছে,

আমরা দুই ভাই বসিয়া নিপুণভাবে ঐ সকল মাটির মূর্তি গড়িতেছি, এমন সময় আমার ছোট মাতুল শ্রীমোহন সেনের উচ্চ কণ্ঠ শুনিয়া পলাইয়া গিয়াছি। বস্তুতঃ তাঁহার তাড়নায় একদণ্ড স্থির হইয়া আমরা ছবি আঁকিতে পারি নাই, মাটির মূর্তি গড়িতে পারি না, 'কাশী'র গাছে চড়িয়া কুল খাইতে পারি নাই। প্রায়ই এই সকল গুরুতর কার্য অর্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া আমাদিগকে পলাইয়া যাইতে হইয়াছে। আজ আমার স্মৃতিতে ছোটমামার সেই স্নেহ-গঞ্জনার সুর মধু হইতেও মধুর বোধ হইতেছে। তাঁহাকে আর পাইব না, হীরালালও আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

একদা আমি মানিকগঞ্জে কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া অনেকগুলি মূর্তি তৈয়ারী করিয়া ফেলিলাম। সমস্ত রাম-বনবাসের পালাটা এইভাবে প্রস্তুত হইল। রাম গড়িলাম, দশরথ, সীতা, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ভরত প্রভৃতি সকলই তৈয়ারী হইল। দিব্য একটা 'কুঁজ' করিয়া মন্থরা প্রস্তুত করিলাম, এবং কাগজের সরু সরু স্তর কাটিয়া রামের জটা বানাইলাম। তাহার পর একটা বড় ঘরে খুব লম্বা একটা সুতা লট্‌কাইয়া তাহার উপর সেই কাগজে-কাটা মূর্তিগুলি ঝুলাইয়া পর পর সাজাইয়া রাখিলাম। সেই ঘরের দরজায় একটা লম্বা কাপড় টাঙ্গাইয়া সেই কাপড়খানি জলে আর্দ্র করিয়া অপর একটা দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিলাম, এবং একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া সেই কাপড়ের মধ্যে প্রতিফলিত মূর্তির ছায়া দিয়া ছায়াবাজী দেখাইতে লাগিলাম। লণ্ঠনটা কাছে আনিলে মূর্তিগুলির ছায়া খুব বড় হইত এবং দূরে নিলে ছায়াগুলি খুব ছোট দেখাইত। এই উৎসব দেখাইবার জন্য বহু বালককে নিমন্ত্রণ করিলাম, তন্মধ্যে বগজুরী হইতে হীরালাল আসিল। আমার বয়স তখন ৯, হীরালালের বয়স ৭। ইহার বহু বৎসর পরে H. L. Sen & Bros. (এইচ. এল. সেন এণ্ড ব্রস) নাম দিয়া হীরালাল কলিকাতায় ফটোগ্রাফের কারবার খোলে এবং সর্বপ্রথম সে-ই কলিকাতায় বায়স্কোপ আনাইয়া দেখায়। তাহার বায়স্কোপ কোম্পানির নাম 'রয়াল বায়স্কোপ কোম্পানি', এখন তাহার ভ্রাতা মতিলাল সেই কারবার চালাইতেছে। রয়াল বায়স্কোপ কোম্পানিই কলিকাতার আদি ও সর্বশ্রেষ্ঠ বায়স্কোপ কোম্পানি ছিল। হীরালালের মত ফটোগ্রাফ তুলিতে খুব অল্প ব্যক্তিই পারিতেন। সে নিজে ফিলিম আনাইয়া বায়স্কোপের দেশীয় কয়েকখানি ছবি উঠাইয়াছিল। তাহার কোম্পানির আয়ও বিস্তর হইয়াছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সমস্ত মাটি করিয়া ফেলিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যতদূর মনে পড়ে হীরালালের ভাগিনেয় ভোলা (আমার মামাতো ভগিনীর ছেলে) পার্শী ম্যাডানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে দিয়া নূতন বায়স্কোপ কোম্পানি স্থাপনের প্রস্তাব করে। এইভাবে ভুবনবিজয়ী 'এলফিনস্টোনে'র সূত্রপাত হয়। হীরালালের হাতে শিক্ষালাভ করিয়া ভোলাই ম্যাডান মহোদয়কে এই কার্যে নামায়, এবং তাঁহার কোম্পানির প্রাথমিক সফলতার কারণ হয়। হীরালালের প্রতিভা অনন্য-সাধারণ ছিল, সে ইংলণ্ড ও এমেরিকার ফটোগ্রাফ ও বায়স্কোপ-সাহিত্যের যেরূপ চর্চা করিয়াছিল. সেইরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিরল। সে শুধু ফটোগ্রাফি শিখিবার জন্য ১৪।১৫০০০্ টাকা খরচ করিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীতে তাহার যে স্টুডিও ছিল, তাহা এতদ্দেশে যে কোনো শিল্পীর গৌরবের কারণ হইতে পারিত। একদা তাহার চরিত্র তুষার-শুভ্র ছিল, কিন্তু কলিকাতায় থিয়েটারের পাল্লায় পড়িয়া নটরাজ বন্ধুবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সেই হীরালাল যেরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত

হইয়াছিল তাহা তদ্রূপ কুসংসর্গের পরিণামের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

হীরালাল একদিন আমাকে বলিয়াছিল 'দাদা, বল তো আমার যে চিত্রবিদ্যা, ফটোগ্রাফি ও বায়স্কোপের প্রতি এই একান্ত অনুরাগ ও ঝোঁক, তাহা কেমন করিয়া হইল?'

আমি বলিলাম,—'এইগুলি নিয়া সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে থাকিতে ঝোঁক হইয়াছে। এল. এ. পর্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়া দিলি, তারপর তো এই করিতেছিস—ঝোঁক এতেই হইয়াছে।'

সে বলিল, 'না দাদা—এই ঝোঁকের মূলে তুমি, তুমি যে আমাকে লইয়া ছবি আঁকিতে, সেই সময় ইহার সূত্রপাত, তুমি যেদিন আমাকে ছায়াবাজি দেখাইয়াছিলে, সেদিন যে আমার মনে যুগ উলটিয়া গিয়াছিল, তাহা তোমায় বলি নাই—কিন্তু সেই ছায়াবাজি দেখার কথা কৈশোর জীবনে প্রতিদিন আমার মনে পড়িয়াছে—উহাই এই রয়াল বায়স্কোপের ভিত্তি।' কেউ নিজ ঘরে বসিয়া এক টুকরা কাগজে আগুন ধরাইয়া যেরূপ অবহেলায় তাহা ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেয় এবং সেই জ্বলন্ত কাগজটা অপর একজনের ঘরের চালে পড়িয়া তাহা অগ্নিময় করিয়া ফেলে, ইহা হইতেছে সেইরূপ। হীরালালের মানসিক শক্তি ও রুচি ছিল এই কলাবিদ্যার দিকে, সুতরাং আমার কাছে যাহা ছেলেখেলা ছিল, তাহা তাহার প্রকৃতির প্রবর্তক হইয়া দাঁড়াইল। হীরালালের প্রকৃতি কল্যাবিদ্যার ক্ষেত্র ছিল—আমার খেলাধূলা যাইয়া সেখানে বেশ সোনার ফসল জন্মাইয়া ফেলিল—সে এজন্য আমায় যে গৌরব দিয়াছিল, তাহা আমার একেবারেই প্রাপ্য নয়।

আমাদের আর একটা খেলা ছিল, পুকুরে বা নদীতে যাইয়া পরস্পরের মুখে জল ছুড়িয়া মারা। এই জল ছুড়িয়া মারা কার্যে আমার মত দক্ষ কেউ ছিল না। আমি দুর্বল ছিলাম, কিন্তু জল ছুড়িয়া আমা অপেক্ষা বহু বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে আমি অন্ধের মত করিয়া ফেলিয়াছি, সে হাতড়াইতে হাতড়াইতে পলাইয়া নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়াছে। অনেক সময় পাঁচ ছয় জন একত্র হইয়া আমার মুখে জল ছুড়িয়া মারিয়াছে, আমি সব্যসাচীর ন্যায় একা তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি এরূপ ক্ষিপ্রভাবে জল প্রক্ষেপ করিয়াছি যে সপ্তরথীর মত তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়াছে। আমার সঙ্গে কতক সময় যুঝিতে পারিত একমাত্র নলিনী। তাহাও ১০।১৫ মিনিটের বেশী নয়। প্রাতে ৮টার সময় ধলেশ্বরীর শাখা গাজিখালী (কানাই) নদীতে এই ভাবে যাইয়া জলক্রীড়া করিতে শুরু করিয়াছি এবং বেলা তিনটার সময় চক্ষু দুটি রক্তজবার ন্যায় করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছি। কত দলকে যে এইভাবে ঘায়েল করিয়াছি, কত স্নানার্থীর দল যে এই সময়ে স্নান সমাধা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং আমি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কিরূপ অটুট বিক্রমে যুঝিয়াছি, তাহা আর কি লিখিব! আমার মাতা আমার এই সকল ব্যবহারে কিরূপ কষ্ট পাইতেন, তাহা বুঝানো শক্ত। কতবার লোক পাঠাইয়া হয়রান হইতেন, এবং শেষে ঘরে বসিয়া কাঁদিতে থাকিতেন। যখন তৃতীয় প্রহর বেলায় বাড়ী ফিরিতাম, তখন মা যেন আমায় হাঁটিয়া আসিতে দেখিয়াও আশ্চর্য হইতেন, এই অবস্থায় কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। ভগবান্ তাহার ফলে আমাকে এত অত্যাচারেও মারিয়া ফেলেন নাই—এই জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। এইরূপে ডান

হাতের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করাতে সমস্ত ডান দিকটা অবশ হওয়ায় আমি বাতব্যাধি রোগে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলাম। মাতা ইহারই আশঙ্কা করিয়া কত অশ্রু বিসর্জন করিতেন। হায় সেই মাতৃ-অশ্রু! তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার জীবনে যে কত কষ্ট পাইয়াছি তাহা লিখিবার শক্তি আমার নাই।

পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। যখন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম আসিলাম, তখন বারি-বিরল শুষ্ক নাগরিক দৃশ্য ও দুর্গন্ধ জঞ্জালপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবা আমার চক্ষু দুইটিকে যেন পীড়িত করিয়াছিল। কোথায় সেই অপর্যাপ্ত বন্যার জল-সঞ্চার! কোথায় সেই পূর্ণতোয় ধবল ফেনিল তরঙ্গ,—ফুল্লকুন্দ তুষারসদৃশ শুভ্র ধলেশ্বরীর শ্বেতাব্জ-সুন্দর বিরাট রূপ! কোথায় সেই উদ্দাম উত্তাল চক্রাকৃতি ঘূর্ণবায়ুসমুত্থিতঅট্টহাস্য-ময়ী মহামহিমান্বিত পদ্মা! কোথায় সেই অতলস্পর্শ সাভারের নদী! একদিকে বংশাই, একদিকে কানাই, ব্যাঘ্রী যেরূপ শাবকদ্বয় লইয়া আস্ফালন করে—সেইরূপ উৎকট ক্রীড়াশীলতার রূপ—আমার পক্ষে যুগপৎ ভৈরব ও সুন্দর! বন্যার জলে যখন গ্রাম ভাসিয়া যাইত, মাতার ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সেই অনন্ত জলরাশির অঙ্কে ছোট ছোট অট্টালিকা ও পর্ণকুটির কি সুন্দর দেখাইত! আমি আর অবিনাশ জ্যোৎস্না-ধবলিত রাত্রে ছোট একখানি ডিঙ্গিতে শুইয়া থাকিতাম, নৌকা ভাসিয়া নান্নারের বিলের দিকে যাইত। উপরের আকাশে তারা ও জ্যোৎস্না এবং নিম্নে হাট মাঠ ঘাট সমস্ত ডুবাইয়া বিশাল জলরাশিতে কত রক্তদল পদ্ম ও শুভ্রদল কুমুদ ফুটিয়া উঠিত। আমরা দুইজনে কতদিন ছবির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেখিয়াছি। পূর্ববঙ্গের বর্ষা যে না দেখিয়াছে, তাহার নিকট বরুণ দেবতা কি করিয়া পূজা পাইবেন? পদ্মার ক্রোড়ে যে ব্যক্তি জেলেদের মাছ ধরিতে না দেখিয়াছে সে কি করিয়া বুঝিবে সে দেশের জেলেরা কেন আপনাদিগকে 'গঙ্গাপুত্র' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে?

এই জলে দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমাবিসর্জন লইয়া কত না আমোদ গিয়াছে! মনসাদেবীর ভাসানগান উপলক্ষে 'নৌকা বাছ' লইয়া কত না উৎসব হইয়াছে! বন্ধুবর্গ সহ নৌকা বাহিয়া আমরা কত সুখে জ্যোৎস্না রাত্রি উপভোগ করিয়াছি। শিশুকালে আমরা একত্র মিলিয়া গাজিখালীতে কোন দরিদ্রের নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মধ্য গাঙ্গে উহা ডুবাইয়া দিয়া সাঁতার কাটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। পরদিন সেই দরিদ্রের আর্তনাদে কর্তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহারা সেই দরিদ্রকে ২৫।৩০্ গুনাগারি দিয়া আমাদিগের প্রতি চক্ষু রাঙ্গাইয়া কত ভৎসনা করিয়াছেন!

সেই সুয়াপুর গ্রামের স্মৃতি আমার নিকট কিরূপ মধুর, তাহা বলিবার ভাষা নাই। সে গ্রামের প্রত্যেক রমণীই যেন সেই শৈশবকালে আমাদের মাতা ছিলেন। যাহার বাড়ীতে রাত্রি হইয়াছে, তাহার বাড়ীতে শুইয়াছি। খাওয়ার সময় যে বাড়ীতে থাকিতাম, সেই বাড়ীতেই খাইয়াছি, বঙ্গপল্লীর সে আত্মপরবিরহিত ভ্রাতৃভাব এখন স্মৃতিতে পর্যবসিত! উহা দুঃস্বপ্নের মধ্যে একটুকু সুখস্বপ্ন, ভাঙ্গা কৃষ্ণবর্ণ ভয়াবহ মেঘের আড়ালে একখণ্ড ক্ষুদ্র চন্দ্রিকা।

আমরা সুয়াপুর শ্রীনাথ গুপ্তের বাহিরের ঘরে বসিয়া তাস খেলিতাম। আমার খেলার সাথী ছিল অবিনাশ, নলিনী, কুমুদিনী এবং মোহিনী (শেষোক্ত তিনজন সহোদর, সর্বজ্যেষ্ঠ মোহিনী)। আমাদের বাড়ী হইতে তাহাদের বাড়ী একটা পুকুরের

এপার ওপার। বর্ষাকালে আমরা নৌকাতে পার হইতাম। ছোট নৌকা ঘাটে দিনরাত বাঁধাই থাকিত, একটা লগি দিয়া নৌকা বাহিয়া পার হইতাম। তাসখেলা তিন রকমের ছিল—১. ডাকের খেলা, ২. দেখা-বিন্তি, ৩. বিন্তি বা গেরাবু। ডাকের খেলা তিনজনে, দেখা-বিন্তি দুইজনে এবং গেরাবু চারজনে খেলিতে হইত। ডাকের খেলারই প্রচলন বেশী ছিল,—একেবারে 'রং' শূন্য হইলে খেলোয়াড় 'বুরুজ' অর্থাৎ ফেল হইত। যে 'বুরুজ' হইত সে সকল খেলোয়াড়দের হাতে নাকমলা-কানমলাটা খাইত। আমি আদুরে ছেলে, সুতরাং আমাকে ক্ষেপাইয়া, মারিয়া, ভেংচাইয়া অপরাপর বালকেরা একটা ক্রূর আমোদ অনুভব করিত। ডাকের খেলায় আমি 'বুরুজ' হইলে একটা ছেঁড়া জুতার মালা আমার গলায় পরাইয়া দিয়া অপরাপর বালকেরা হাতে তালি দিয়া হাসিত এবং অন্দর হইতে মেয়েরা পর্যন্ত আমার সেই অবস্থা উঁকি মারিয়া দেখিয়া বেশ আমোদ অনুভব করিত, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে নালিশ করিবার জন্য আমার সর্বপ্রধান বিচারপতি মায়ের নিকট চলিয়া যাইতাম।

আমার যখন ১২ বৎসর বয়স, তখন আমাদের আত্মীয়দিগের এক বাড়ীতে তাঁহাদের নিকট-সম্পর্কীয় একটি মহিলা তাঁহার শিশুদিগকে লইয়া আসিয়া কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন। আমার বর্ণ শ্যাম হইলেও ছেলেবেলায় আমার চেহারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। চুলগুলি ছিল আমার কোঁকড়ানো, এবং চোখ দুটি আমি বাবার নিকট হইতে পাইয়াছিলাম, তাহা ছিল বড় এবং ভীত শঙ্কিত দৃষ্টি-পূর্ণ। সেই মহিলার একটি মেয়ে ছিল—তাহার নাম ন—। তাহার তখন বয়স ১০। সেই বাড়ীতে আমার একটি সহপাঠী ছিল, সে ছিল গৌরবর্ণ, সুশ্রী। ন— তাহাকে ছোট দাদা বলিয়া ডাকিত। ন—এর মূর্তিটি আমার এখনও বেশ মনে আছে। চোখ দুটি হরিণের মত, গণ্ডে কে যেন চাঁপার রং, মল্লিকার শুভ্রবর্ণ, যূথী-জাতীর স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিয়াছে, এলোমেলো চুলগুলি কখনও কপালের চারিদিকে ঝুলিয়া পড়িয়া সুন্দর দেখাইত, কখনও বহু বেণীতে বন্ধ থাকিয়া একটা কুণ্ডলাকৃতি ধূম্রের মত খোঁপা হইয়া যাইত, কখনও বা মেঘের একটি সূক্ষ্ম লহরের মত একবেণী হইয়া পিঠে দুলিতে থাকিত। তাহাকে কখনই আমি হাঁটিতে দেখি নাই, নীলাম্বরী কাপড়খানির আঁচল দোলাইয়া সে প্রায়ই ছুটিয়া চলিত, এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যে অধরযুগল প্রসন্ন করিয়া পলাইয়া যাইত।

একদিন তাহাকে বাড়ীর বড় বড় মেয়েরা ধরিয়া পড়িল—'ন— তুই বল্, কাকে বিয়ে করবি?' সে লজ্জায় বিরক্তিবোধক কতকগুলি গঞ্জনা করিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু সেই বাড়ীর একটি বউ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না, সে নির্জনে বহু মিনতি করিয়া অভয় দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'বল্ ন— তুই কাকে বিয়ে করবি! আমি কারুকে বলব না।' বহু সাধ্য সাধনায় এবং বারংবার প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হইয়া সে বউটির কানের কাছে মুখ রাখিয়া প্রাণের কথাটা অতি মৃদুস্বরে বলিল 'ঐ যে ছোট দাদার সঙ্গে বেড়ায়—নাম জানি না, ছোট দাদার মত ফরসা নয়, কিন্তু দেখতে ভারী সুশ্রী।' নাম সে জানিত না, আমি বলিয়া দিতেছি—সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের নাম দীনেশচন্দ্র।

এই কথা কৃতঘ্ন, অবিশ্বাসী বউটি সেই দিনই পাড়াময় রাষ্ট্র করিয়া দিল—

তারপর কয়েকদিন আর পাড়ায় বাহির হইতে পারি নাই। যে দেখিয়াছে সেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে 'কিরে ন— নাকি তোকে পছন্দ করিয়াছে?' আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। ন—ও তদবধি আমাকে দেখিলে ছুটিয়া পলাইত, কিন্তু চঞ্চল পাদক্ষেপে পলাইবার সময় হঠাৎ পিছন ফিরিয়া আমার দিকে তাহার সুন্দর চক্ষুর একটি দৃষ্টির ফুলবাণ নিক্ষেপ করিয়া যাইতে ভুলিত না।

তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবার নয়, কারণ আমাদের গোত্র ছিল এক। সেই রমণীর অদৃষ্ট অতি মন্দ, বিবাহের ছয়মাস পরে সে বিধবা হয়, তাহার স্বামী সেই বৎসর বি. এ. পরীক্ষা দেন। যদিও সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু গেজেটে ফল বাহির হইবার পূর্বেই যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি বিধবা পূজা-আহ্নিক ও নানা ধর্মানুষ্ঠানে দীর্ঘজীবন কাটাইয়া দিতেছেন। আমার সঙ্গে তাঁহার আর দেখা হয় নাই। কিন্তু গত বৎসর একজন আত্মীয়, যিনি ন—এরও আত্মীয়, আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট শুনিলাম—তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক কথা, এমন কি আমার চেহারা কিরূপ আছে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শিশুকালের কথাগুলি আজীবন মনে থাকে, এটি কি আশ্চর্যের বিষয় নয়? নতুবা সেই তাঁহার ১০ বৎসর বয়সের দুদিনের দেখা—একটা ছেলেখেলা বই কিছুই নয়, তাহার স্মৃতি আজ ৫০ বৎসর বয়সে বা তাঁহার মনে থাকিবে কেন এবং সেই কথা শুনিয়া আমার মনেই বা কালিদাসের 'মধুরাণি নিশম্য শব্দান্' শ্লোকের ন্যায় পূর্ব জন্মের স্মৃতি এরূপ অভাবনীয় মধুরালেখ্যের ন্যায় মনে পড়িবে কেন?

কৈশোরকালের ন্যায় কাল মানুষের জীবনে আর নাই। শিশু অজ্ঞান, কিন্তু কিশোরের জ্ঞান হইয়াছে। যুবক প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া উন্মত্ত, তাহার স্বীয় মত, স্বীয় চরিত্র দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু এই শৈশব-নিশার অজ্ঞাতলোকের এবং যৌবন-দিবসের সম্যক প্রবুদ্ধালোকের সন্ধিস্থলে যে কৈশোর-ঊষা তাহা বড়ই মনোরম। কিশোর পরের জন্য অনায়াসে জীবন দিতে পারে, প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে, প্রতিদানের কথা, হিসাবের কথা তাহার মনেই স্থান পায় না। এজন্য ভগবানের কিশোর-রূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারেরা প্রেমধর্ম বুঝাইয়াছেন।

৯

পড়াশুনা

পাঠকের মনে থাকিতে পারে আমি ১৮৭৯ সনে মাইনর পাশ করিয়া কুমিল্লায় পড়িতে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া গভর্নমেণ্ট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। তখন হেডমাষ্টার ছিলেন জগদ্বন্ধু ভদ্র—ইনি সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। মেঘনাদবধ-কাব্যকে ঠাট্টা করিয়া 'ছুছুন্দরী বধ' নামক যে অপূর্ব বিদ্রূপকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার লেখক ছিলেন এই জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়। এই কাব্যটি পুরাপুরি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে তখন ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের শীর্ষ স্থানে ছিলেন ঢাকা জেলার মত্তগ্রামনিবাসী উমাচরণ দাশ মহাশয়। তিনি যেমনই পণ্ডিত ছিলেন তেমনই সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় উমাচরণ বাবুর সাহায্য লইয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ প্রকাশ করেন। ইঁহাদের পূর্বে কোন আধুনিকতন্ত্রের লোক এইসকল পদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'বংশীধরে'র প্রসঙ্গে সর্বদা ঠাট্টাবিদ্রূপ প্রকাশিত হওয়ায় বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রতি শিক্ষিত সমাজের বরং একটা তীব্র ঘৃণার ভাবই ছিল। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বহুসংখ্যক বাবাজীর আখড়াতে ঘুরিয়া কি কষ্টে যে এই সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পদাবলীর ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনিই এইক্ষেত্রে প্রথম হলধর, ইট-পাথর ভাঙিয়া ইনিই এই ক্ষেত্র সর্বপ্রথম হলচালনার উপযোগী করিয়াছিলেন। ইঁহার পরে সারদা মিত্র মহোদয়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রমণী মল্লিক, অক্ষয়চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, নীলরতন, নগেন্দ্র গুপ্ত, সতীশ রায়, অমৃতবাজার পত্রিকার অধ্যক্ষেরা এবং অপর অপর শিক্ষিত লোক এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু এই পথের সর্বপ্রথম পথিক এবং নব্যতন্ত্রীদের মধ্যে এই বিষয়ের প্রথম দীক্ষিত ছিলেন ভদ্র মহাশয় ও উমাচরণ বাবু।

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের তৃতীয় কীর্তি, তাঁহার অসাধারণ সংগ্রহ-নৈপুণ্য ও বিরাট অধ্যবসায়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত 'গৌরপদতরঙ্গিণী'—সাহিত্য-পরিষৎ হইতে টাকির খ্যাতনামা জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম.এ. বি.এল. মহাশয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন ভদ্র মহাশয় স্বর্গত; অপর কোন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া এই দুর্লভ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় আসিয়াছে।

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় ছিলেন হেডমাষ্টার। আমি চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়া, আমি তাঁহার কাছে পড়ি নাই। কিন্তু তিনি যে মাথার উপর চাপিয়া ছিলেন, এ বিষয়ে তো সন্দেহ নাই। তাঁহার চেহারাটা ছিল ছোটখাটো, রোগা ও শ্যামবর্ণ, তিনি অতি নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন। যে যুগের শিক্ষকদের হস্তে বেত্র, চক্ষে রক্তিমা ও ভাষায় ভীতিপ্রদর্শন সর্বদাই যেন ছাত্রদের রক্ত শুষিয়া খাইত, অধ্যাপনার সেই নিদারুণ যুগেও জগদ্বন্ধুবাবুর হাঁকডাক আমরা কখনও শুনি নাই। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চা করিয়া প্রকৃতই বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন কবিগণের পদাঙ্ক

অনুসরণ করিয়া সময় সময় ব্রজবুলিতে পদ-রচনা করিতেন, তাহা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ভদ্র মহাশয় বড়ই পানের ভক্ত ছিলেন, তাম্বুলরসসিক্ত অধরপ্রান্ত তিনি রুমাল দিয়া মুছিতেন আর কথা কহিতেন। ইহার বহুদিন পরে তিনি ফরিদপুর জেলা-স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। তখন ইঁহার স্কুলে আর একটি ছাত্র ছিলেন, ছাত্রটি বোধ হয় তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেন। তিনি এখন বঙ্গদেশের নাতিক্ষুদ্র-অংশ লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া 'অবতার' রূপে গণ্য হইয়াছেন। তাঁহার নাম 'প্রভুপাদ জগদ্বন্ধু'। শুনিয়াছি সম্প্রতি তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে, কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, তাঁহার পুনরাবির্ভাব হইবে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নিদারুণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমি এক বৎসর ফরিদপুরে ছিলাম, তখন জগদ্বন্ধুবাবু অবসর লইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। আমি শয্যাশায়ী, সুতরাং যাইতে পারিতাম না। তিনি প্রায়ই আমাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার মত অমায়িক ও সাহিত্যপ্রাণ, ভক্তিপরায়ণ লোক একালে খুব অল্পই দেখা যায়।

দ্বাদশবর্ষ বয়সে কুমিল্লায় যাইয়া পড়িতে লাগিলাম। তখন ক্লাসে যে সকল ছাত্র ছিল তাহাদের মধ্যে একমাত্র ব্রজমোহনের অস্তিত্ব অবগত আছি। সে কুমিল্লার কোন মাইনর কি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছে। ক্লাসে আমার মত অল্পবয়স্ক ছাত্র কেহ ছিল না।

আমার আত্মীয় মুকুন্দ ও আমি এক বাসায় থাকিতাম। আমি উভচর জীবের ন্যায় চন্দ্রমোহন দাশ মহাশয় ও আমার শ্বশুর—উভয়ের বাড়ীতেই থাকিতাম। রাত্রি-যাপন হইত শ্বশুরবাড়ীতে—মুকুন্দের সহিত এক শয্যায়। আমাদের খট্টার পার্শ্বে মাদুর পাতিয়া শুইত মহিম চাকর। সে আধ্‌বয়সী ছিল, জাতিতে ভুঁইমালী। সে আমাদিগকে পতিতা রমণীদের সম্বন্ধে তাহার বিগত যৌবনের কত কেচ্ছা যে শুনাইত, তাহার সংখ্যা নাই। সেই তরুণ বয়সে ঐ সকল গল্প শুনিতে আমাদের খুব ভাল লাগিত, আরব্য-উপন্যাসের গল্পের ন্যায় সেগুলি কল্পনাকে মুগ্ধ করিত। শেষে সে প্রস্তাব করিল—আমাদিগকে গণিকাবাড়ী লইয়া যাইবে। মুকুন্দ সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় ছটফট করিতে লাগিল। আমার লোভও কম হয় নাই। আমি দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক ছিলাম, এবং মুকুন্দ ছিল চতুর্দশবর্ষ বয়স্ক। ইহার মধ্যে একদিন ঢাকা হইতে এক পত্র পাইয়া জানিতে পারিলাম যে আমার সহাধ্যায়ী প্রসন্ন গুহ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি একেবারে ক্ষেপিয়া গেলাম, 'তাহারা আমার এক বৎসর পূর্বে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিবে ইহা হইতেই পারে না। এখানে আমাকে কেহ তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশান দিবেন না, কারণ আমি ভাল ছেলে নই। এখান হইতে ঢাকায় গেলে মাইনর পাশের সার্টিফিকেট দেখাইলেই আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারিব।' তখন এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে যাইতে কোনরূপই আঁটাআঁটি কিছু ছিল না। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বাবাকে লিখিলাম—'আমাকে যদি কুমিল্লা হইতে লইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত এখনই না করেন, তবে আমি পলাইয়া যাইব।'

এই বয়ঃসন্ধির সংকটে ভগবান আমাকে রক্ষা করিলেন। মুকুন্দ দত্ত নানা কারণে অল্প বয়সেই লেখাপড়া অবসান করিয়া জীবনটা অকর্মণ্য করিয়া ফেলিল,

আমি তাহার কাছে থাকিলে তো আমারও সেই গতি হইত। আমাদের শৈশবের জীবনের প্রাক্কালে তো সেই হতভাগ্য মহিম মালী লালসার সলিতা জ্বালাইয়া আলেয়ার আলোর দিকে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, একজনকে সে প্রতারিত করিয়াছিল—আমিও তো সেই পথে যাইতাম। কিন্তু হঠাৎ ঢাকায় যাইবার জেদ আমার মনে কে দিল? বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পূর্ব-নির্দিষ্ট পথ ভাঙিয়া চুরিয়া—তিনি এইভাবে অপরিহার্য কর্মসূত্রের নিয়মে সকলকে স্বতন্ত্র এক পথে সরাইয়া—টানিয়া লইয়া যান, ইহাকেই 'দৈব' বলে। ইহা পুরুষকারকে সর্বদা পদদলিত করিয়া নিজের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া জীবজগতের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

যথাসময়ে আমার শৈশবের নিত্যসহচর, যাহার ঘাড়ে পিঠে ক্রোড়ে আমি সর্বদা বিহার করিতাম, যাহার চুল ছিঁড়িতাম, শরীরে কামড় দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিতাম, এবং যাহার স্কন্ধ হস্তের মুষ্টিবন্ধ হইয়া আকৃষ্ট হইতে হইতে কত রৌদ্রের পথ হইতে ছায়ার পথে, কত বৃষ্টি-ধারা হইতে গৃহের ছাদের নীচে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আনীত হইতাম, সেই দ্বারকা সিংহ, আমাদের বাড়ীর চির-বিশ্বস্ত শৈশবের চির-পরিচর আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুর-শাশুড়ীর চরণ বন্দনা করিয়া, ঠাকুরদাদা চন্দ্রমোহন দাশের অনুমতি লইয়া আমি ইংরাজী ১৮৭৯ সনের পৌষ মাসে ঢাকায় পুনরায় ফিরিয়া চলিলাম। তখন আমি গোঁড়া হিন্দু। পথে নারায়ণগঞ্জে, এক উকিল ভদ্রলোক আমার বাবার ছাত্র ছিলেন। বাবা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—'আমার ছেলে দীনেশ আমাদের একটি লোক লইয়া রাত্রে যদি নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হয়, তবে তুমি তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া বাসায় রাখিও।' আমার পিতার নির্দেশমত সেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যাকাল, বাবুটি আমাদিগকে খুব যত্ন করিলেন; অল্প সময়ের মধ্যে নানারূপ পরিপাটী রান্না হইল। আমরা খাইতে বসিয়া গেলাম। কিন্তু আমার মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া গেল। দেখিলাম একজন স্ত্রীলোক রান্না করিতেছে, তাহার আকৃতি ও ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণী বলিয়া বোধ হইল না। এই স্ত্রীলোকটি আমাদের সকলকে ভাত দিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম সেই বাড়ীর চাকরটা হেঁসেলে ঢুকিয়া খানিকটা নুন আনিল, তখন স্ত্রীলোকটি ব্যঞ্জন বাটিতে ঢালিতেছিল। ভৃত্য তাহাকে ছুঁইয়া নুন আনিল, তাহাতে স্ত্রীলোকটি কিছু বলিল না। তখন আমি নিশ্চিত বুঝিলাম, মেয়েলোকটি কখনই ব্রাহ্মণী নয়—নিশ্চয়ই শূদ্র-জাতীয়া। রাগে আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল ও দুঃখে আমার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই সময়ে সেই ভদ্রলোকটির একজন আত্মীয় আমাদের পাতে ঘি দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি বলিলেন 'দীনেশের পাতে বেশী করিয়া দাও।' আমার পাতে ঐ ব্যক্তি ঘি ঢালিতে লাগিলেন,—তিনি প্রায় আধ পোয়াটেক ঘি আমার পাতে ঢালিলেন, আমি হাঁ-না কিছুই বলিলাম না। ইহাতে সকলের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট হইল। ভদ্রলোকটি দেখিলেন, আমার চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া গণ্ডে পড়িতেছে। ইহাতে তিনি যারপরনাই অপ্রস্তুত হইলেন। একজন আগন্তুক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—'গাধা, আমি তোকে আগেই বলেছিলাম, ছেলেমানুষ হলেও তোর মত জাতখেকো তো সকলে নয়, তুই একদিন লজ্জা পাবি। দেখছিস্ না বাঁশের থেকে কঞ্চি দড়।' যাহা হউক ভদ্রলোকটি, আমি বালক হইলেও, জোড়হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমাকে তুলিয়া

লইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে নিকটবর্তী ব্রাহ্মণপাড়ায় এ খবর পৌঁছিয়াছিল। তাঁহাদের একজন বহুসমাদরে আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে নিয়া খাওয়াইলেন। বলা বাহুল্য যে, বাবার ছাত্র ভদ্রলোকটি চোরের ন্যায় আমার পাছে পাছে অপরাধ-অনুতপ্ত দৃষ্টি মৃত্তিকায় ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন; এবং আমার খাওয়া শেষ হইলে নিজে শেষে আসিয়া ভোজনে বসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'যে কারণেই হউক, আমি এখানে আসাতে আপনাদের মিছামিছি কতকগুলি মনঃক্ষোভ ও কষ্ট হইল, এজন্য লজ্জিত আছি।' তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু একথায় যে তাঁহার লজ্জা আরও বাড়িয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম।

জীবনে আর একদিন হিন্দুত্বের গোঁড়ামি দেখাইয়াছিলাম। আমার মা গোঁড়া হিন্দু হইলেও তাঁহার মনে সেইদিন আঘাত দিয়াছিলাম। আমি তাঁহার সঙ্গে ঢাকা হইতে সুয়াপুর চলিয়াছি, তখন আমার বয়স একাদশ বর্ষ, সে ১৮৭৮ খৃীষ্টাব্দ হইবে। মা আমার জন্য রান্না করিয়াছেন। ধলেশ্বরী দিয়া চলিয়াছি। বিস্তৃত নদীর অপর পাড় দেখা যাইতেছে না, একপাড়ের সিকতারাশি রোদে চিক্‌চিক্‌ করিতেছে—সেখানে বহুদূর পর্যন্ত লোকালয়ের চিহ্ন, কদলী কিম্বা অন্য কোন বৃক্ষের লেশ নাই। মা জেলে-ডিঙ্গি হইতে সদ্যধৃত ইলিশ মৎস্য কিনিয়াছেন, তাহারই ঝোল ও ভাজা রান্না হইয়াছে। আমি মায়ের সাথে বসিয়া খাইব—এই আশায় বসিয়াছিলাম। মা বলিলেন 'খোকা তুই খা।' আমি বলিলাম 'আমি তোমার সাথে খাইব।' উত্তরে তিনি জানাইলেন, তিনি নৌকায় কিছু খাইবেন না।

আমি—'কেন?'

মা—'কি করিয়া খাই বল্‌, দুটো মেটে হাঁড়িতে রান্না হয়েছে, তার একটা ফেটে গিয়েছে। নমঃশূদ্রের নৌকা, তাদের কাঁসার থালা ভাল করে ধুয়ে দিয়েছে। তাতে গঙ্গাজল দিয়ে আবার ধুয়ে তোকে পরিবেষণ করে দিচ্ছি। কলিতে ধাতু-নির্মিত পাত্রে দোষ নেই, তুই খা।'

আমি বলিলাম 'তুমি খাবে না কেন, তা বুঝিলাম না।'

মা—'আমি বুড়া হয়েছি, আমি ওদের থালায় কি করে খাব?'

আমি—'না, তুমি না খেলে আমি খাব না।' মা অত্যন্ত দুঃখ ও বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, 'দ্যাখ্‌ খোকা, তুই মিছে কষ্ট আমায় দিস্‌ না, ঝোড়ো হাওয়ায় উনুনের আগুন কতবার নিবে গেছে—নাকের জলে চোখের জলে এই রান্না হয়েছে। এত কষ্টের রান্না,—তুই ছেলেমানুষ, এতটা বাড়াবাড়ি কেন কচ্ছিস্‌?'

কিন্তু আমি সেই থালায় কিছুতেই খাইলাম না। মাঝিদের পাতা কাটিয়া আনিতে বলা হইল। তাহারা বলিল, 'মা-ঠাকরুন এখনই ঝড় আসিবে, এখনই যদি পাড়ি দিতে না পারি, তবে বৈকালে বিপদের আশঙ্কা আছে, এখন কলাপাতের খোঁজ করিতে গেলে দুই তিন দণ্ড দেরী হইবে। আমাদের কি? আপনার এক ছেলে তাহাকে যদি এই বিপদে ফেলিতে চান, তবে আমাদের প্রাণের মমতা আর কি? আমরা তো আপনাদের প্রজা, মরিতে বলেন, মরিতে পারি।'

মা ভয় পাইয়া কলাপাতা আনিতে লোক পাঠাইলেন না, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে চক্ষের জল মুছিতে লাগলেন। শেষে রাত্রি কতকটা হইলে যখন দেখিলেন আমি কিছুতেই খাইলাম না, তখন ক্রোধের সহিত মাঝিদিগকে সেই সকল ভাত

মাছ দিয়া বলিলেন, 'খোকা, বাড়াবাড়ি ভাল নয়, তুই যদি মোছলমানের ভাত না খাস্, তবে আমি বাপের বেটী নই, তোর অদৃষ্টে সকল অখাদ্যই একদিন খেতে হবে, এইটি মনে রাখিস।' সে সকল আমার অদৃষ্টে হইয়াছে কিনা বলিতে চাই না, যদি ঘটিয়াই থাকে, তবে তাহা মাতৃ-অভিশাপের ফলে—আমার কোন হাত নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু যাহা পারেন নাই, দুর্লঙ্ঘ্য কর্মফল ঠেকাইব, এমন সাধ্য আমার কি থাকিতে পারে?

মায়ের মনে যে আমি কতরূপে কত আঘাত দিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। মা বাংলা বই বেশ পড়িতে পারিতেন, কিন্তু তিনি লিখিতে পারিতেন না। একখানি চিঠি লিখাইবার জন্য যে তিনি আমাকে কত অনুনয় করিতেন, তাহা ভাবিতে আমার চোখের জল আসে। 'আমি এখন পারব না' এইরূপ হঠকারী ভাবে উত্তর দিয়া জেদ বজায় রাখিতাম। মা সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া আসিতেন—হয়ত সে সময় কাহাকেও পাইলেন না, যে যাহার কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। দিদি হয়ত তীর্থদর্শনে বৃন্দাবন অঞ্চলে গিয়াছেন। এক ঘণ্টা পাড়া ঘুরিয়া কাগজ খানি হাতে করিয়া আমার খট্টার পার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। ইচ্ছা যে তাঁহার পুত্র অনুতপ্ত হইয়া বলিবে—'মা, কেন কষ্ট ক'চ্ছ? আমি লিখে দিচ্ছি।' কিন্তু আমার মত হতভাগ্য এমন কেহ আছে? আমি মায়ের এই সামান্য কষ্টটুকু দূর করিতে চেষ্টা করি নাই। কখনও কখনও বড় দুঃখে তাঁহার মুখ হইতে রূঢ় কথা বাহির হইয়াছে, 'এতটা গর্ব ঠিক নয়! যিনি হাতের শক্তি দিয়েছেন, তিনি সে শক্তি ফিরিয়ে নিতে পারেন।' একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত এই সামান্য দুটি কথা যে আমার পক্ষে বজ্রাঘাতের ন্যায় হইয়াছে তাহা যদি মা জানিতেন, তবে এই কথাগুলি তিনি কিছুতেই বলিতেন না। জীবনের প্রায় ছয়টি বৎসর আমি অশক্ত দক্ষিণ হস্তে একটি পঙ্‌ক্তি লিখিতে পারি নাই। একখানি পত্র লিখাইতে হইলে পথ হইতে মানুষ ধরিয়া আনিতে হইয়াছে, তখন কিরণ ও অরুণ অতি শিশু। মৃত্যুর সময় নিদারুণ হাঁপানি রোগে তিনি একদিন বড় কষ্টে বলিয়াছিলেন,—'বোধ হয় "কুষ্মাণ্ড খণ্ড" খাইলে একটু আরাম বোধ করিতাম।' তখন আমি বি. এ. পড়ি। আমার ধনশালী আত্মীয়েরা মায়ের কোন খোঁজ তখন নেন নাই। এই আক্ষেপ মনে হইতেছে, আমি কুলি হইয়া, মজুর হইয়া কেন কুষ্মাণ্ড খণ্ড কিনিয়া দিলাম না? ঢাকায় বড় বড় এক রকমের গোল বেগুন বাজারে পাওয়া যায়, তাহা বড় সুস্বাদু, তাহাকে 'লাফা-বেগুন' বলে; আমার বাবা তাহা খাইতে ভালবাসিতেন। আমি যতবার ঢাকায় গিয়াছি ও আসিয়াছি, তিনি প্রতিবারই বলিয়া দিতেন 'দীনেশ, যদি পার, তবে কয়েকটা লাফা-বেগুন আমার জন্য আনিও' সেই দুই-চার পয়সার জিনিসও আনিতে আমি প্রতিবারই ভুলিয়া গিয়াছি। আমি বাড়ী গেলে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইত, আমি খানিকক্ষণ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকি; কিন্তু আমি এক মুহূর্ত বসিয়া চলিয়া যাইতাম। তিনি অতিশয় সংযমী ছিলেন; আমার ব্যবহারে কষ্ট পাইলেও মুখে কোনদিন কিছু বলেন নাই। জীবনে যে সকল কষ্ট পাইয়াছি ও পাইতেছি তাহা আমার যোগ্য না হয়, আর কাহার যোগ্য? তাঁহাদের স্নেহের কথা কি বলিব? সে অনন্ত স্নেহ কি করিয়া বুঝাইব! সমুদ্রের পরপার কে দেখাইবে? পদ্মার জল মাপিয়া তাহা কতখানি, কে বুঝাইবে? সে সকল কথা না বলাই ভাল। আমার অশ্রুর ঘন প্রাচীরে আমার

অনুতাপ ও দুঃখ চিরকাল আবৃত হইয়া থাকুক, আমার মনের ব্যথা যেন ভাষায় ব্যক্ত না হয়। সে পবিত্র ব্যথার প্রবাহে আমার সমস্ত পাপ ধুইয়া যাউক। বাহিরে তাহা বলিয়া হা-হুতাশ করিলে আমার তপস্যা নষ্ট হইয়া যায়। এখন দেবতা দর্শনের জন্য কেন লোকে পুরী যায়, কেন মুমূর্ষ ব্যক্তি সর্বস্ব পণ করিয়া তীর্থের দিকে ছোটে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। মনে হয় যদি এক মুহূর্তের জন্য মাতাপিতার চরণপদ্ম আবার দেখিতে পাইতাম তবে আমার চক্ষু ধন্য হইয়া যাইত। কোন কথা বলিয়া সেই মুহূর্তের সাক্ষাৎকারকে অযথা বাচালতার দ্বারা বিড়ম্বিত করিতাম না। কেবল তাঁহাদের শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়া শ্রীমুখদ্বয়ের শোভা দেখিতাম, হরগৌরীর রূপ দেখিতাম, এবং অজস্র চক্ষুজলে যাহা বলিবার তাহা সকলই বলিতাম; যত দুঃখ সহিয়াছি—তাঁহারা ছাড়িয়া যাওয়ার পর—সেই স্নেহের সহস্রাংশের একাংশও যে কোথাও পাই নাই, তাহা অশ্রুবিন্দুর দ্বারা নিবেদন করিতাম এবং যাহা কাচের ন্যায় অবহেলা দ্বারা উপেক্ষা করিয়াছি তাহা যে এখন আমার কাছে কৌস্তুভ কোহিনুর হইতে কত বেশী মহার্ঘ হইয়াছে তাহা বুঝাইতাম। ইহার নাম 'দর্শনানন্দ'—এই দর্শন কি আর কোন জন্মে আমার ভাগ্যে ঘটিবে?

ঢাকায় আসিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হইলাম। তখন কলেজিয়েট স্কুল নামডাকের—অনেক ভাল ছেলে আমাদের সাথে পড়িত। সর্বাপেক্ষা ভাল ছিল ললিত, তাহার চেহারাটি বেশ সুশ্রী ছিল, বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার। সে যে ইউনিভারসিটিতে প্রথম হইবে ইহা সকলেরই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া তাহার চরিত্রে দোষ ঘটে। সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া মাত্র দশ টাকার একটি বৃত্তি পাইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে বিপিন চক্রবর্তী পড়িত, এরূপ ভাল ছেলে বড় দেখা যায় না। কৈলাসবাবু হেডমাষ্টারের বাড়ীতে বহু লোকের রান্না করিয়া সে তাহার উদর-সংস্থান করিত ও বিধবা মাতার খরচ চালাইত। তাহার চেহারাটি ছিল প্রকৃতই ব্রাহ্মণের মত—প্রশান্ত, ধীর, কামনা-বর্জিত, গৌরবর্ণ। সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পায়। আমি বি. এ. পর্যন্ত তাহার সঙ্গে একত্র পড়িয়াছি, তাহার পিঠে কত কিল চড় মারিয়াছি, কিন্তু সে কথাটি বলে নাই। সে যখন নিবিষ্ট হইয়া অঙ্ক কষিতে থাকিত, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত বলিয়া মনে হইত না। বি. এ. খুব ভালভাবে পাশ করিয়া সে রুরকীতে যাইয়া ইঞ্জিনিয়ারীং পড়ে, তথায় সে এত বেশী নম্বর পাইয়া প্রথম হইয়াছিল যে, রুরকীর ইতিহাসে এরূপ নম্বর আর কেহ পায় নাই। কাশীতে সে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া 'রায়বাহাদুর' উপাধি পায়—তথায় সে সর্বজনপ্রিয় ছিল। আমার ভগিনী দিগ্বসনী দেবী তখন কাশীতে ছিলেন, কোন প্রয়োজনে আমি বিপিনকে লিখিয়াছিলাম দিদির সঙ্গে দেখা করিতে। সে এমনই অনাড়ম্বর ও নিরীহ ভাল মানুষ ছিল যে, দিদি তাহাকে পনের কুড়ি টাকা মাহিয়ানার কেরানী বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। বিপিন অকালে প্রাণত্যাগ করে। কলেজিয়েট স্কুলে কয়েক দিনের জন্য অন্নদাচরণের সঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন এবং কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। তিনি ত্রিপুরার মহারাজার মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং অনেক দিন ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইবার আমার কোন কালেই সুবিধা হয় নাই। আমার আর এক সহাধ্যায়ী মনোমোহন। সে ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের

এস্টেটে সর্বেসর্বা হইয়া ন্যাশনাল কলেজ স্থাপনের কল্পনায় ব্যস্ত ছিল। তাহার বিশ্বাস, বিধাতা বিশ্বের সমস্ত বুদ্ধি তাহার মাথায় দিয়াছেন। একদিন সে আমায় বলিয়াছিল—'আমরা ছিলাম ক্লাসে ভাল ছেলে, তুই সকলের পিছনে পড়ে থাকতিস, কি আশ্চর্য তুই নাম ও খ্যাতি লাভ করলি, আমরা ভাল হয়ে সেরূপ পারলাম কই?' দীনবন্ধু মজুমদার আমার আর এক সহাধ্যায়ী—ইহার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণী হইতে বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছি। কালো চেহারা. মস্ত মস্ত দুটি চোখ, কথাবার্তা মেয়েলী ঢঙের। এক জোড়া ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়া সে এল. এ. বি. এ. ক্লাসে চিরকাল যাতায়াত করিয়াছে এবং পদ্য লিখিয়া আমার সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিয়াছে, সেও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিল। এখন সে ইম্পিরিয়াল সেমিনারির হেডমাষ্টার—আমার প্রবর্তনায় সে এবার বাংলায় এম. এ. দিতেছে। কলেজিয়েট স্কুলে আমার বেশী দিন পড়া হইল না। কারণ আমার পিতার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার এক ছাত্র ধামরাই নিবাসী অনাথবন্ধু মল্লিক. জগন্নাথ স্কুলের কর্তৃপক্ষ ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে একটি ফ্রি-স্টুডেণ্টশিপ্ পাইয়া আমি জগন্নাথ স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইলাম।

তখন মাতুলালয়ে থাকিতাম, আমার মাতামহের নামে তখন আমাদের সম্মানের অবধি ছিল না, স্বয়ং গনি মিঞা আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীর উৎসব উপলক্ষে আদর ও স্নেহ দেখাইতেন।

জগন্নাথ স্কুলে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল কুমুদিনী বসু। তাহার চেহারাটি মেয়েলী ধরনের ছিল, রংটা খুব গৌরবর্ণ ছিল না. কিন্তু বড় স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময় ছিল! আমাকেও লোকে মেয়েলী চেহারার ছেলে বলিয়া ঠাট্টা করিত। কুমুদিনী ও আমি ছিলাম সকলের অপেক্ষা বয়সে ছোট ও আমাদের পরস্পরের মধ্যে খুব ভাব ছিল; আমি এগারটি বোনের মধ্যে এক ছেলে, তাও আবার যমজ এক ভগিনীর সঙ্গে—সুতরাং আমার মুখে কতকটা মেয়েলী ভাব থাকা আশ্চর্য নহে। কুমুদিনী আমার অপেক্ষা চার ছয় মাসের বড় ছিল। আমি ও সে—এই দুই জন বহু ছাত্রের লক্ষ্য ছিলাম, তাহারা যে আমাদের কাছে কি চাহিত তাহা ভাল বুঝিতাম না। কিন্তু তাহারা লম্বা লম্বা চিঠি লিখিয়া জ্বালাতন করিত, কাছে আসিয়া ঘেঁষিয়া বসিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত ও মুখের দিকে নির্বাক হইয়া তাকাইয়া দেখিত। দু-একজন আবার নির্জনে পাইলে এরূপ সকল কথা বলিত যেন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে কিম্বা আয়েষা জগৎসিংহকে বলিতেছে। এই উৎপাতে কুমুদিনী ও আমি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। ইহার মধ্যে এক দাড়ি-গোঁফওয়ালা ছেলে একদিন আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল 'আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি।'

একদিকে এই উৎপাত, অপর দিকে বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতের চড় ও বেত্রাঘাত—আমাকে বড়ই বিড়ম্বিত করিয়া তুলিল।

মোটকথা জগন্নাথ স্কুলের ছেলেরা ভারী দুষ্ট ছিল; সেই স্কুলের দোতলা হইতে **বাজারের ত্রিতল, চৌতল, দীর্ঘরথাকৃতি বাড়ীগুলির ছাদ দেখা যাইত। সেই ছাদে মেয়েরা স্নানান্তে কাপড় শুকাইতে দিত কিম্বা সিক্ত কাপড় ছাড়িয়া শুষ্ক শাড়ী পড়িত—আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে অনেকে তখন জানালায় ভিড় করিয়া ঐ সকল মেয়েদের দেখিত ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। আমি ও কুমুদিনী—সে সকল

হাসির অর্থ বুঝিতাম না, কিন্তু ছেলেরা যে দুষ্টামি করিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া উহাদিগকে ঘৃণা করিতাম। আমাদের সঙ্গে পড়িত শিবপ্রসন্ন ও রাসবিহারী। রাসবিহারী এখন কোথায় ওকালতী করিতেছে। দিগিন্দ্র হাজরার চেহারাটা ছিল ধবধবে মহাদেবের ন্যায়—সে ক্লাসে পড়িয়া কেবলই ঘুমাইত। রজনী পণ্ডিত তাহার উপাধি দিয়াছিলেন'Lion of Sleep'(নিদ্রাসিংহ); সে এখন ঢাকা জজ্ আদালতে ওকালতী করিতেছে। ক্লাসে ভাল ছেলে ছিল পূর্ণ রাউত, সে সকল বিষয়েই ভাল ছিল; কিন্তু অঙ্কে ছিল বিশেষরূপে ভাল। আমি যে এন্ট্রান্স পাশ করিব, এমন সন্দেহ কেহ ক্ষণকালের জন্যও পোষণ করে নাই, যেহেতু আমি এক শত নম্বরের মধ্যে অঙ্কে তিন চার নম্বর পাইতাম। কুমুদিনীর নম্বরও প্রায় সেইরূপ উঠিত; কিন্তু আমরা দুই জনই ইংরাজীতে বেশ ভাল নম্বর পাইতাম।

কুমুদিনী একদিন আমায় বলিল 'পূর্ণ এমন কি ভাল ছেলে? আমি আর তুই যদি অঙ্ক ভাল করিয়া কষিতে থাকি, তবে কি পারিব না, আচ্ছা, সেই চেষ্টা করা যাক।' এই বলিয়া সে দিনরাত ধরিয়া অঙ্ক কষিতে শুরু করিয়া দিল, তারপর যে সাপ্তাহিক পরীক্ষা হইল তাহাতে সে ক্লাসে অঙ্কে তৃতীয় হইল। ছাত্র ও শিক্ষকগণ অবাক হইলেন। টেস্ট পরীক্ষায় কুমুদিনী অঙ্কে প্রথম ও পূর্ণ রাউত দ্বিতীয় হইল, আলাদিনের প্রদীপ ঘষিয়া অট্টালিকা উঠাইবার মত এই কাণ্ডটা আশ্চর্যজনক হইয়া গেল।

ইহার পর কোন অভাবনীয় ঘটনায় কুমুদিনীর সঙ্গে আমার ভাবান্তর হইল—তাহার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিলাম। কুমুদিনী পূর্ণকে পরাজিত করিয়া এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পনর টাকা বৃত্তি পাইল—পূর্ণ পাইল দশ টাকা। তাহার পর কুমুদিনী ঢাকা ছাড়িয়া অন্যত্র পড়িতে গেল, তদবধি তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, শুনিয়াছি সে সব-জজিয়তী করিতেছে।

এখন আমার অবস্থা বলিতেছি। আমি কুমুদিনীর দেখাদেখি অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিলাম। অঙ্কে আমিও এমন পারদর্শিতা দেখাইলাম যে তাহা যদিও কোন অদ্ভুতরূপ বিস্ময়কর ঘটনা হয় নাই, তথাপি ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে তাহা লইয়া বেশ একটা আন্দোলন হইয়াছিল। একটা ক্লাস-পরীক্ষায় আমি ত্রিশ পাইলাম। অঙ্কের শিক্ষক শরৎচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে বলিলেন 'তুমি নকল করিয়াছ।' আমি বলিলাম 'আমি নেহাৎ খারাপ ছেলে নহি, যদিও আপনার বিষয়ে দুই তিনের বেশী নম্বর পাই না। পূর্ণ আমার খুব বিশেষ বন্ধু, তাহার পার্শ্বে বসিয়া চিরকাল আমি দুই তিন পাইয়া আসিয়াছি—যদি নকল করিবার প্রবৃত্তি থাকিত,তবে চিরদিনই বেশী নম্বর পাইতাম।' আমাদের সঙ্গে রসিক বসু নামক এক ছাত্র শার্টের ইস্তিরি করা প্লেট ও কাফের মধ্যে ইতিহাসের সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়া তাহার উপর কোট ঝুলাইয়া আসিত। 'বড্ড গরম' বলিয়া কোটের বোতাম খুলিত ও হাত হইতে কাফ বাহির করিয়া অবাধে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া যাইত। এই সকল কারণে কিছু কিছু অবিশ্বাসের কারণ না হইতে পারিত, তাহা নয়।

যাহা হউক যে ভাবে অঙ্কের চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তাহাতে টেস্ট পরীক্ষার পূর্বেই বেশ যোগ্যতা লাভ করিতে পারিতাম সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সাফল্যের একটা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

১০

ঢাকায় ওলাউঠা

১৮৮১ সন। ঢাকায় তখন যেরূপ ওলাউঠার প্রকোপ হইয়াছিল, সেরূপ উৎকট অবস্থা বড় দেখা যায় না। প্রথমতঃ তাঁতীবাজারের পথে যাইতে 'হরিবোল' শব্দে বহু মৃতব্যক্তিকে লইয়া যাইতে দেখিতাম, তখন মড়াটা ডানদিকে কি বামদিকে দেখিলাম, তাহাই লইয়া মনে বিতর্ক করিয়া যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয় করিতাম। কচি প্রাণে তখনও ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। তখন থাকিতাম বাবুরবাজারে দীননাথ মুন্সীর হাবিলিতে মেস করিয়া। সেই মেসে মামাদের গ্রামের বহু ছেলে থাকিত, অবনীশ, মহেন্দ্র, অবিনাশ প্রভৃতি। মহেন্দ্র এখন ঢাকা জেলা কোর্টের ফৌজদারী বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল। আমাদের বাড়ীর কাছে ছিল রমাপ্রসন্ন রায়ের বাসা। তিনিও আমাদের গ্রামের লোক, ডেপুটি-ম্যাজিস্টেটি করিতেন। তাঁহার ছোট ভাই উমাপ্রসন্ন আমাদের সঙ্গে জগন্নাথ স্কুলে পড়িত, তাহার চেহারা ছিল কালো খর্ব স্থূল। কলেরা তাঁতীবাজার হইতে শুরু করিয়া ধীরে ধীরে বাবুরবাজার মুখে রওনা হইল। স্কুলে যাইয়া দেখিতাম ক্রমশঃ ছেলে কমিয়া যাইতেছে, তাহারা ভয়ে ঢাকা ছাড়িয়া যাইতেছে। পথে দোকানপাটে শুষ্ক ভীতনেত্র লোকগুলি দাঁড়াইয়া কেবল ঐ ব্যারামের কথাই বলিতেছে—সেরূপ ভয় কলিকাতার মত স্থানে হইতেই পারে না। কলিকাতায় কোথায় কি হইতেছে—কে খবর রাখে? শুধু সংবাদপত্র পড়িয়া জানা। কিন্তু ঢাকার মত ক্ষুদ্র শহরে সে যে কি ভয়—তাহাও কলেরা আবার সংক্রামক! সমস্ত শহরটির উপর একটা মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছিল—সকলের মুখে কালিমা। একদিন সন্ধ্যাকালে মেসে বসিয়া আছি, উমাপ্রসন্ন আসিয়া বলিল, 'আমাদের বাড়ীর পায়খানাটা ভাল নয়, তোদের এখানে যাব।' সে ঘটী হাতে গেল; কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিল না দেখিয়া আমরা যাইয়া দেখি, সে পায়খানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া আছে, তাহাকে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া আনিয়া বাড়ীতে পোঁছাইয়া দিলাম। আমরা সারা রাত্রি তাহার সেবা করিতে লাগিলাম; রাত্রি একটা দুইটা পর্যন্ত, কাগজী লেবু, ঔষধ, বরফ প্রভৃতির জন্য বাজারে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিলাম। তাহার পরদিন ভয়ে আমরা কিছু খাইলাম না, বেলা ৪টার সময় উমার অবস্থা অতি খারাপ হইল, একে তো সে কালো ছিল, তাহার উপর চোখ দুটি শিবচক্ষুর মত হইল, চুলগুলি চাঁছিয়া ফেলা হইল, গণ্ডের কংকাল উঁচু দেখা যাইতে লাগিল, একটি নেংটি পরা—সে কি ভয়ানক দৃশ্য। আজগর মিঞা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থায় ফুট-বাথের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু, যেই তাহার পা-দুখানি গরম জলে ডুবানো হইল অমনই প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল। সে কি শোকাবহ দৃশ্য! তাহার মাতা প্রায় /৫ সের পরিমিত বরফখণ্ড হাতে লইয়া উন্মত্তভাবে আজগর মিঞাকে ছুঁড়িয়া মারিতে যাইতেছেন--আজগর মিঞা কোটের বোতাম খুলিয়া উন্মুক্ত বক্ষে বলিতেছেন —'মা, মারুন,—আমি আপনার ছেলের প্রাণের জন্য দায়ী, আমাকে মারিয়া যদি শোক নিবারণ হয় তাহাই করুন।' উমাপ্রসন্নের মাতা তখন বরফখণ্ড ছুঁড়িয়া ফেলিয়া

অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আমরা উমাকে দাহ করিয়া রাত্রি ১১টার সময় মেসের বাসায় ফিরিলাম, সেদিন কেহ জল-স্পর্শ করি নাই। রাত্রি দুইটার সময়—অবনীশ কাঁদিয়া উঠিল, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম কি হইয়াছে, সে বলিল 'কলেরা'। 'কিরূপে হইল, তাহার তো কোনো লক্ষণ দেখিতেছি না?' সে কাঁদিয়া বলিল, 'আমি সারাদিন কিছু খাই নাই, তবু পেটের মধ্যে কেমন অসোয়াস্তি বোধ করিতেছি।' আমি হাসিয়া উঠিলাম। আমরা কেহই এখন পর্যন্ত ঘুমাই নাই, ঘুমের ভান করিয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া ছিলাম, প্রত্যেকের মনে হইতেছিল 'আমার কলেরা হইল' —কারণ পেটের ভিতর একটা অসোয়াস্তির ভাব সকলেই অনুভব করিতেছিলাম। রাত্রি কোনরূপে কাটিয়া গেল। পরদিন বেলা ৮টার সময় তৈল গায়ে মাখিয়া আমরা বুড়িগঙ্গায় স্নান করিতে গেলাম। সেইখানেই নৌকা করিয়া সুয়াপুর রওনা হইয়া যাইব, নৌকাতে রান্না করিব, এই সংকল্প করিলাম। কিন্তু নদীর ঘাটে যাইয়া দেখিলাম, ঢাকা হইতে সুয়াপুরের ভাড়া ২৲ টাকা ২৷৷০ টাকার স্থলে ৩০৲।৪০৲ টাকা হইয়াছে। ভীত সন্ত্রস্ত বহু শহরবাসী নদীর ঘাটে হাজির হইয়াছে ও প্রাণ লইয়া পলাইতেছে; নৌকা আর পাওয়া যায় না; আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। শেষে ঠিক করিলাম, ৩০৲।৪০৲ টাকা দিয়াই নৌকা ভাড়া করিব। এমন সময় বাহির হইতে বুড়িগঙ্গা বাহিয়া একখানি নৌকা আসিল, মাঝিরা শহরের এই উৎপাতের কথা জানিত না। আমরা সাগ্রহে সুয়াপুর যাইতে ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, ৩৲ টাকা। আর দরদস্তুর না করিয়া তখনই মেসের বাড়ীতে তালা লাগাইয়া সকলে একত্র নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে কোথা হইতে শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় আমার ভগিনীপতি নব রায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দীনেশ, আমি তোমাকে কিছুতেই বাড়ী যাইতে দিব না, চল আমাদের বাসায়। এবার তোমার পরীক্ষার বৎসর।' আমার বয়স তখন চৌদ্দ। কাঁদিতে কাঁদিতে নব রায়ের বাড়ীতে তাঁতীবাজার গেলাম, পথে বলিলাম 'রায়জী আপনি কি জানেন না, আমি মা বাপের এক ছেলে?' তিনি তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি বাহির করিয়া উপেক্ষাভরে হাসিলেন। আমি ভাবিলাম 'মরিবার সময় মায়ের কাছে শুইয়া মরিতে পারিব না, এই আমার অদৃষ্টের লেখা।' সে দিন যে কিভাবে কাটিল, তাহা আর কি বলিব? একটা উৎকট দুঃস্বপ্নের মত দিনটা চলিয়া গেল। স্কুলে গেলাম, দেখিলাম সহপাঠীরা প্রায় সকলে পলাইয়া গিয়াছে, মাষ্টারবর্গও প্রায়ই অনুপস্থিত। রাস্তা দিয়া আসিতে পথে পথে কেবল 'হরিবোল', কান্নার রোল, অনাথ ছেলেমেয়েদের চিৎকার, দোকানপাট বন্ধ। 'বলহরি' মিষ্ট কথাটা বুকের মধ্যে বজ্রনিনাদের মত বাজিতে লাগিল। সন্ধ্যায় মনে হইত সমস্ত শহরটি ঘিরিয়া ছায়ার মত কে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ দেখিয়া ভূত বলিয়া ভয় হইতে লাগিল। রাত্রে আসিয়া বাসায় দেখিলাম কৈলাসবাবু চিৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, তিনি 3rd year-এ পড়িতেন, নব রায়ের আত্মীয়। এখন তিনি ফরিদপুর জেলা কোর্টের উকিল-সরকার। নব রায়ের ভৃত্য ডেংগু ও দাসী বামা আমার ও কৈলাসবাবুর কাছেই দুইটি পেয়ালা ভাঙের সরবৎ লইয়া আসিল। কৈলাসবাবু এক পেয়ালা খাইলেন, নব রায় এক পেয়ালা পূর্বেই খাইয়াছিলেন। আমি ব্রাহ্মের পুত্র, বলিলাম—'ভাঙ বা কোন নেশা প্রাণান্তেও খাইব না। কলেরা হইলেও নয়।' বাহিরে এই বিক্রম দেখাইয়া মাঝের ঘরটায় একা

শুইয়া পড়িলাম। তখন আমার ভগিনী সেখানে ছিলেন না। রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাশের বাড়ীতে উৎকট 'বলহরি' চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভয়ে আমার ঘুম হয় নাই, একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল মাত্র। আমি সেই তন্দ্রার মধ্যে স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, নেংটি পরিয়া উৎকট শিবনেত্রে, মুণ্ডিত মস্তক দোলাইয়া একটা আঙুল নির্দেশ করিয়া গাঢ় কৃষ্ণ ছায়ার মত উমাপ্রসন্ন আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়াছে ও বলিতেছে 'দীনেশ, চল্ আমার সঙ্গে যাবি?'

নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলাম, আমার সমস্ত শরীর হিমের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, ভয়ে বাক্‌রোধ হইয়াছে, হাত-পা নাড়িবার শক্তি নাই। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হাতে পায়ে একটু শক্তি হইলে আমি হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে নব রায়ের ঘরের দরজায় কড়া নাড়া দিয়া তাঁহাকে জাগাইলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং কৈলাসবাবুর ঘরে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিজে শুইয়া পড়িলেন। কৈলাসবাবু দেখিলেন—আমার হাত্ পা একেবারে ঠাণ্ডা, আমার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না, জিভটা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে। তিনি লেপ মুড়ি দিয়া আমার হাতে পায়ে নিজের হাত পা ঘষিয়া গরম করিলেন। প্রভাত বায়ুর স্পর্শে আমি যেন নূতন জীবন পাইলাম এবং সেই দিনই সুয়াপুর রওনা হইয়া গেলাম। বুড়িগঙ্গার হাওয়ার স্পর্শে আমার সমস্ত ভয় দূর হইল। পল্লীমায়ের অঞ্চলের বাতাস আমার গায়ে লাগিল।

সুয়াপুর আসিয়া ভয় দূর হইল, খুব স্ফূর্তির সঙ্গে কয়েক দিন কাটিল। পূজার কিছু পূর্বে ঢাকার চিঠিতে জানিলাম, ঢাকায় কলেরার প্রকোপ কমিয়াছে। টেস্ট পরীক্ষা নিকটবর্তী, উহা তখন পূজার পূর্বেই হইত। সুতরাং ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে হইল, কিন্তু ঢাকায় আসিয়া কলেরার ভয় আবার আমায় পাইয়া বসিল, 'হরিবোল' শব্দ রাস্তায় শুনিলেই চমকিয়া উঠিতাম, পেটের ভিতর সর্বদাই একটা অসোয়াস্তির ভাব অনুভব করিতাম এবং রোজ সন্ধ্যার পর শুইয়া মনে হইত, সেই রাত্রেই কলেরা রোগে মরিয়া যাইব। এই ভয়ে দিনরাত ঔষধ খাইতাম। সালফিউরিক এসিড ডিল্. পকেটেই থাকিত, শিশির ছিপি খুলিয়া ঔষধ পড়িয়া আমার অনেক আল্‌পাকা ও গরদের জামা জ্বলিয়া গিয়াছে। শুধু সালফিউরিক এসিড নয়, পিপারমেণ্ট, বিসমাথ, ভুবনেশ্বর, ক্লোরোডাইন, স্পিরিট ক্যাম্ফার প্রভৃতি ঔষধ খাইয়া এমনই পেটের অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে প্রায়ই আমার কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকিত। এইভাবে ২।৩ বৎসর ঢাকায় কাটাইয়া আমার শরীর একেবারে মাটি করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভয়-জনিত মস্তিষ্কের বিকার, স্নায়বীয় দুর্বলতার দরুন শিরঃপীড়া ও বাতব্যাধি শেষে আমার জীবনটাকে অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। ঢাকায় তখন জলের কল ছিল না, কূপের জল খাইতে হইত; তাহাতে গলগণ্ড জন্মিত, এবং সেই জলের গুণে বার মাস কলেরা ঢাকায় লাগিয়াই থাকিত। ঢাকার নামে আমার সেই শৈশবের ত্রাস এখনও আছে। ছোট ছোট দুর্গন্ধ গলি; বৃষ্টি হইলে কলিকাতার গলিতে জল দাঁড়ায়, ঢাকায় সুরকি ও নানা আবর্জনা পচিয়া একটি ক্বাথের মত পদার্থ প্রস্তুত হয়, পদব্রজে চলিলে হাঁটু পর্যন্ত সেই ক্বাথে লিপ্ত হয়। ঢাকায়ই আমার স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য হারাইয়া আসিয়াছি। এখন শুনিয়াছি জলের কল হওয়ায় কলেরা কমিয়াছে, কিন্তু অলিগলির নরকে বোধ হয় যমরাজ তেমনই জোরে

প্রভুত্ব করিতেছেন।

১৮৮১ সনের কলেরার মহামারীতে আমার অঙ্কের চর্চা বেশী দূরে অগ্রসর হয় নাই। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অঙ্কে তিন নম্বর কম হইয়াছিল, শুনিলাম, তজ্জন্য ৩০ নম্বর অপরাপর বিষয় হইতে কাটা হইয়াছিল এবং এইজন্য আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ হইয়াছিলাম।

১১

সাহিত্য-সেবা : কৌতুক ও উৎসব

আমার সাহিত্য-জীবন অতি শৈশবেই আরম্ভ হইয়াছিল। যখন আমার ৭ বৎসর বয়স, তখন আমি পয়ার ছন্দে সরস্বতীর এক স্তব লিখিয়াছিলাম। তৎপর কত যে কবিতা লিখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ক্লাসে ভাল ছাত্র না হইলেও পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া বাহিরের সাহিত্য-চর্চায় আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না। আমাদের সুয়াপুর গ্রামের নিকটবর্তী নান্নার গ্রাম হইতে কৈবর্ত-জমিদার অম্বিকাবাবু 'ভারত-সুহৃদ্' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। আমার যখন ১০ বৎসর বয়স, তখন সেই পত্রিকায় 'জলদ' নামক এক কবিতা লিখিয়া পাঠাই। তাহাতে যাহা যাহা লেখা ছিল তাহার মর্ম এই :—হে মেঘ, তুমি একটুকু কালের জন্য বায়ুর কৃপায় উঁচু জায়গায় উঠিয়াছ বলিয়া এত স্পর্ধা করিয়া ষণ্ডের ন্যায় চিৎকার করিতেছ কেন? পরের কৃপার উপর নির্ভর করিও না। যে বায়ু খেলার পুতুলের মত তোমায় কিছুকালের জন্য উঁচু জায়গায় ধরিয়া তুলিয়াছে, সেই বায়ুই তাহার খেয়াল ছাড়িয়া গেলে তোমাকে ঘাড় ধরিয়া মাটিতে নামাইয়া দিবে, সুতরাং পরের আশ্রয়ে এতটা স্পর্ধা ভাল নহে।'

দশ বৎসর বয়সের পক্ষে এ লেখাটা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। এই দশ বৎসর বয়সে মাইনর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি বাজে বই অনেক পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস, হেমবাবুর কবিতাবলী, নবীন সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রভৃতি পুস্তকে আমি কৃতবিদ্য হইয়াছিলাম। আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল স্বর্গীয় দীনেশচরণ বসু মহাশয়ের 'কবিকাহিনী'—দীনেশ বসু মহাশয় তখন ঢাকা জেলার খ্যাতনামা কবি ছিলেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার কবিতার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। দীনেশ বসু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সুহৃদ্ ছিলেন এবং উক্ত সাহিত্যরথীর সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। মাইনর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিবার সময় ক্লাসে প্রথম হওয়ায় আমি দীনেশ বসু মহাশয়ের 'কবিকাহিনী' এবং স্যার ওয়াল্টার স্কটের 'গ্র্যান্ড ফাদারস্ টেল্স' এই দুই বই পুরস্কার পাইয়াছিলাম। এই বই দুইখানি দশ বৎসর বয়সে আমি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলাম। কবিকাহিনী বেশ বড় কবিতার পুস্তক, ইহার প্রত্যেকটি কবিতা আমার মুখস্থ ছিল। তাহা ছাড়া রামায়ণ-মহাভারত তো আমার জিহ্বাগ্রে ছিল।

ভারত-সুহৃদে 'জলদ' কবিতা ছাপা হইলে আমি যশের মুকুট মাথায় পরিয়া যেরূপ গৌরব বোধ করিয়াছিলাম তাহা বলিবার নহে। ভারত-সুহৃদের সেই সংখ্যাটি দুই বৎসর পর্যন্ত আমার পকেটে পকেটে ঘুরিত। পকেট হইতে পত্রিকার একটা অংশ আমি ইচ্ছাক্রমে বাহির করিয়া রাখিতাম—উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য। যাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে তাহারই দৃষ্টি যে প্রকারে উহাতে পড়িতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়াছি। যখন কোন ভদ্রলোক আমার নীরব আগ্রহে প্রদত্ত পত্রিকাখানি হাতে লইয়া পাতা উলটাইয়া শেষে আমার কবিতাটির নিকট

পৌঁছিতেন, এবং আমার নাম দেখিয়া 'এ কি? এটা কি তুই লিখিয়াছিস্?' বলিয়া সাগ্রহে পড়িতে শুরু করিয়া দিতেন। তখন আমি গৌরবে আকাশে যেন মাথা ঠেকাইয়া চুপ করিয়া স্বমহিমায় স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া থাকিতাম।

ইহার পর বিস্তর কবিতা লিখিয়াছি, নিঝুম রাত্রে দিদি 'মুক্তালতাবলী' পড়িয়া শুনাইতেন। মুক্তা না দেওয়াতে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ মায়াপুরী নির্মাণ করিয়া বিরহী রাধার স্পর্ধা ভাঙিয়া দিয়াছিলেন। স্বর্ণবেত্র হস্তে রাধার অপেক্ষা রূপলাবণ্যশীলা রাজ-কুমারীরা নিথর রাত্রিতে তাঁহাকে গঞ্জনা ও ঠাট্টা করিয়া অনুতাপ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি দিদি এমনই করুণকণ্ঠে সুর করিয়া পড়িতেন, যেন আমার চক্ষে ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিত। রাধার দুঃখে শিশুহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। সেই স্মৃতি হইতে ৪২ বৎসর পরে আমি গত বৎসর 'মুক্তাচুরি' বহি লিখিয়াছিলাম।

তারপর মাইনর ক্লাসে উঠিয়া আমি বাইরনের 'চাইল্ড হেরল্ড' ও 'ডন জুয়ান' প্রভৃতি পাঠ করি। সকলাংশ না বুঝিলেও যেটুকু বুঝিতাম, তাহাতে আমার কল্পনা আমাকে অনেক দূর লইয়া যাইত। আমি খাতার পর খাতা পূর্ণ করিয়া কবিতা লিখিয়া তৃপ্তি বোধ করিতাম। আমার মনের উপর যে পুলকের বোঝা চাপিয়া থাকিত, তাহা কবিতা রচনা করিয়া নামাইতে পারিলে যেন আরাম অনুভব করিতাম।

দশ বৎসর বয়সে অবিনাশ এবং আমি একদা আমাদের বাড়ীর ধারে চড়ক-উৎসবের খোলা মাঠটায় দাঁড়াইয়া—জীবনে কে কি করিব তাহাই আলোচনা করিতে-ছিলাম। অবিনাশ বলিল, 'আমি জমিদার হইব, শত শত লোক আমার পাছে পাছে ছুটিবে, আমরা এককালে বড় জমিদার ছিলাম, আমি সেই নষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্ধার করিব।' আমি বলিলাম, 'আমি কবি বা গ্রন্থকার হইব, কুঁড়ে ঘরেও যদি থাকি, তবে সেই কুঁড়ে ঘরের নিকট যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মাথা নোয়াইবেন।' তাহার পর প্রায় ৪২ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। অবিনাশ হেমনগরের (ময়মনসিংহ জেলায়) জমিদারের নায়েব হইয়াছে। সে বি. এ. ফেল করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়। হেমনগরের জমিদারের আয় বাৎসরিক চারি লক্ষ টাকা। অবশ্য শত শত লোক নায়েব মহাশয়ের পাছে পাছে ঘোরে, এবং যখন জমিদারের প্রতিনিধি হইয়া সে মফঃস্বলে যায় তখন প্রজাদের নিকট রাজ-সম্মান পাইয়া থাকে।

অবিনাশের সঙ্গে সেদিনও দেখা হইয়াছিল। আমাদের দশ বৎসর বয়সের সে কথাগুলি তাহার বেশ মনে আছে। সে তাহা উল্লেখ করিল।

যদিচ জীবনের নানা পথ অভীপ্সিত মত হয় নাই, কিন্তু যাহা শিশুকালে ভাবিতাম—এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই মূল লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি ফেল হইলে বাগ্মিতা শিখিব। এই জন্য দাশোড়ার খালের পাড়ে সন্ধ্যাকালে একা একা বেড়াইতাম ও ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করিতাম; নিজেকে ডিমস্থেনিসের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া হস্তের ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের কায়দা অভ্যাস করিতাম। যখন সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ি তখন একটা নোটবুকে এই মর্মে লিখিয়াছিলাম 'বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলায়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রম-লব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কাহার সাধ্য?'

জীবনের একটা ধারা কৈশোর হইতে একভাবেই চলিয়া আসিয়াছিল। কাব্যানুরাগ দিদি দিগ্‌বসনী দেবী আমায় দান করিয়াছিলেন। তিনি যখন বৈষ্ণবপদ মৃদু স্বরে গাহিতে থাকিতেন, তখন আমার মনে যে আনন্দ হইত, তাহা শুধু অশ্রুজলপ্লাবিত হইয়া ভাসিয়া যাইত না, তাহা আমার কল্পনার ঘরে আরতির ঘৃতের বাতি জ্বালাইয়া দিত। তাঁহার কণ্ঠের সেই মধুর 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমি ঝিমি শবদে বরিষে' গান আমার চক্ষে বর্ষাকে এক নূতন সজ্জায় সাজাইয়া উপস্থিত করিত।

আমি আমার মাতুলালয়ে এক প্রকোষ্ঠে বহু কাগজপত্র বিছানায় স্তূপীকৃত করিয়া কবিতা লিখিতে থাকিতাম। হীরালালকে পড়িয়া শুনাইতাম, কিন্তু আমার প্রধান ভক্ত ও শ্রোতা ছিল আমার মাসতুতো ভাই দুইটি—গিরীশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। আমি যাহা লিখিতাম তাহাই তাহারা অবাক হইয়া শুনিত; কিন্তু আমার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, আমার অপর এক মামাতো ভাই ইন্দ্রমোহন। সেও আমার মত কাগজপত্র ছড়াইয়া হাঁসের পাখার কলম ধরিয়া কবিতা লিখিবার জন্য শুভ-মুহূর্তের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। সে হংস-পুচ্ছটি মাঝে মাঝে দাঁতে কামড়াইত এবং এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারা কবিতার ভাবকে ঘনীভূত ও সচেষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। বাড়ীর অপরাপর ছেলেরা তাহার প্রকোষ্ঠের জানালায় উঁকি মারিয়া তাহার এই সকল ভাব লক্ষ্য করিয়া চাপা হাসিতে পেট ফাটিয়া মরিবার দাখিল হইত। কারণ সে টের পাইলে রক্ষা ছিল না। আমার মাতুলেরা আমায় বলিতেন 'তুই ইন্দ্রমোহনের মাথাটা একেবারে খেয়ে ফেল্‌লি।' আমার যে কি অপরাধ তাহা আমি কিছুই বুঝিতাম না।

ইন্দ্রমোহনের কবিতার পদ প্রায়ই খোঁড়া হইয়া যাইত, অর্থাৎ হয়ত চৌদ্দ অক্ষর হইত না, তাহা না হইলে শেষের অক্ষরের সংগে উপরকার ছত্রের শেষাক্ষরের মিল অদ্ভুত রকমের হইত। সে একটিও বিমুগ্ধ শ্রোতা পাইত না এবং তাহার কবিতা শুনিলে সকলেই হাসিত। তাহার পিতা—আমার বড় মাতুল—আনন্দমোহন সেন উন্মাদ ছিলেন, সুতরাং তাহারও মাথার কোন জায়গার একটি কল জন্ম হইতেই বিগড়ানো ছিল। ইহার মধ্যে একদিন তাহার সামান্য সর্দিজ্বর হইল। অমৃত কবিরাজ মহাশয় তাহাকে সাতটি মহালক্ষ্মীবিলাসের বড়ি দিয়া বলিলেন 'একটি খেয়ে ফেল, যদি জ্বর না ছাড়ে তবে আর একটা খেও।' ইন্দ্রমোহন ঔষধ খাওয়ার জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া একটি তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া প্রথমত একটি বড়ি খাইল, এবং দশ মিনিটের পর নিজের নাড়ী টিপিয়া কি বুঝিল সেই জানে, তার পরে আর একটা বড়ি খাইল এবং মিনিট পনর পরে আর একটা খাইল। এইরূপে দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সে সাতটা বড়ি শেষ করিয়া ফেলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী এই কাণ্ডটি দেখিয়াছিল—সে তাহার মাতাকে জানাইল। মাতা ঘুরিয়া কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। তিনি বলিলেন, 'আজ সারা রাত্রি উহাকে পুকুরে স্নান করাও, দুই তিনটা লোক যেন ধরিয়া রাখে ও অবিরত মাথায় জল ঢালিতে থাকে, তাহা হইলে বাঁচিলে বাঁচিতেও পারে, কিন্তু অন্য যদি কিছু হয়, তবে আমি আর কি করিব?' সেইরূপ করা হইল, তাহার জীবন রক্ষা হইল, কিন্তু সে একেবারে উন্মত্ত হইয়া সকলকে মারধর করা শুরু করিয়া দিল।

এতদবস্থায় তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠানো হইল এবং ২৩।২৪ বৎসর বয়সে সেই গারদেই তাহার মৃত্যু হইল।

আমার প্রথম কবিতা-রাজ্যের শিষ্যটির উপর মাতা সরস্বতী এই বর দিয়াছিলেন। ক্লাসে এবং পরীক্ষার ফল সম্পর্কে আমার খ্যাতি যেরূপই থাকুক, ঢাকা ছাত্রসমাজে শীঘ্র সকলে জানিতে পারিল—আমি ইংরাজী কবিতা ও বৈষ্ণব-পদ ইত্যাদি এত পড়িয়া ফেলিয়াছি, যে কেহই আমার সঙ্গে এই সকল বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ফার্স্ট-ইয়ার হইতে সেকেণ্ড-ইয়ারে আমি ঢাকা কলেজে ইংরাজী-সাহিত্যে প্রথম হইলাম, এবং তাহার পর যে সকল সাহিত্যিক সমিতি হইত, তাহাতে আমি শেক্সপীয়র ও মিলটন প্রভৃতির বিদ্যা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতাম। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমি এতটা কাঁচা রহিয়া গেলাম যে, আমি যে পরীক্ষা পাশ করিতে পারিব, তাহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না।

বাড়ীতে বাজে বই পড়া এবং কবিতা লেখা চলিতে লাগিল। আমাদিগকে ফারসী শিখাইবার জন্য আমার মাতুল চন্দ্রমোহন সেন একজন মৌলবী রাখিয়া-দিয়াছিলেন। সারাদিন স্কুলে থাকিয়া এবং নানারূপ সাহিত্য-সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতার আলোচনা করিয়া বাড়ীতে আসিয়া একটু মনের মত আনন্দে কাটাইব, তখন আসিয়া দেখি, লম্বা লম্বা সাদা দাড়ি দোলাইয়া ফারসী পড়াইবার জন্য মৌলবী সাহেব বসিয়া আছেন—বড়ই বিরক্তি বোধ হইত। এক মাস দুই মাস ফারসী পড়ার পর দেশে মাতুলালয় বগজুরী গ্রামে গেলে মাতামহ বলিলেন, 'নিয়ে আয় বই, তোরা ফারসী কি শিখেছিস্, দেখব।' সশঙ্ক অবস্থায় হীরালালকে অগ্রে করিয়া আমি গেলাম, কারণ হীরালাল ছিল তাঁহার খুব প্রিয়, ঝড়ঝাপটা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহা হীরালালের উপর দিয়া মন্দীভূত অত্যাচারে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, এবং আমি তাহার আড়ালে থাকিয়া নিজে ত্রাণ পাইব। এইভাবে তাঁহার কাছে গেলে তিনি প্রথমতঃ বলিলেন 'পড়'। হীরালাল পড়িতে শুরু করিল 'আলেফ্ জবর আ, আলেফ্ জের এ, আলেফ্ পেষ ও'—অমনই মাতামহ রাগিয়া বলিলেন, 'এ কি হইতেছে? এ উচ্চারণ তো কিছুই হইতেছে না'—এই বলিয়া গলার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য আটকাইয়া গেলে কিম্বা তালিসাদি চূর্ণ খাওয়ার পর কাশিগ্রস্ত রোগীর গলায় যেরূপ আওয়াজ হয়, সেইরূপ একটা বিকটধ্বনিপূর্বক—সেই কণ্ঠধ্বনিকে সুর করিয়া তালব্য ধ্বনিতে পরিণত করিয়া তিনি এমনইভাবে পড়িতে লাগিলেন যে মৌলবীর সাধ্য কি তাঁহার কাছে অগ্রসর হয়! ফারসী খুব ভাল জানেন বলিয়া তাঁহার একটা খ্যাতি ছিল, সেই পাণ্ডিত্য-মূলক খ্যাতি আমাদের নিকট বিশেষরূপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি যে গলা দিয়া কতরূপ আওয়াজ বাহির করিতে লাগিলেন, তাহা কি বলিব! কেহ যদি একটা ঢাকের চামড়া দিয়া হারমোনিয়াম তৈয়ারী করে এবং মধ্যে চরকা ঘোরানোর শব্দ করে তবে বোধ হয় সেইরূপ একটা অদ্ভুত সুরের কতকটা নকল হয়। কিন্তু ঐ অপূর্ব আবৃত্তি শোনাই আমাদের চূড়ান্ত বিপদ নয়, যদিও হাসি চাপিয়া রাখিতে আমাদের প্রাণান্ত হইতেছিল। ইহার পরে তিনি হীরালালকে সেই সুর নকল করিয়া 'আলেফ্ জবর আ' প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে বলিলেন। হীরালাল যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাঁহার রাগ বাড়িয়া চলিল; কারণ বুঝিলাম তরুণকণ্ঠে ফারসীর আবৃত্তি হইতেই

পারে না। যদি আমার মাতামহ মুন্সী মহাশয়ের সাধা গলার আওয়াজটাই ঠিক হইয়া থাকে তবে হীরালালের মিহি সুর কি করিয়া সেই উদাত্ত স্বরের নকল করিবে? যদি কেহ তাহার কণ্ঠ সজোরে চাপিয়া ধরিত তবু না হয় কিছু হইতে পারিত। দুই তিনবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর মুন্সী মহাশয় তাঁহার চটি হাতে লইলেন। চটি জোড়ার দাম বিয়াল্লিশ টাকা, তাহার মধ্যে অনেক জড়োয়া কাজ ও পাথর ছিল। সেই চটির কয়েক ঘা হীরালালের পিঠে পড়িল। আমার বয়স তখন ১৫, হীরালালকে প্রহার করিতে যাইয়া তিনি এক একবার আরক্ত নয়নে আমার প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমি বিপদ দেখিয়া দে ছুট্। হীরালালও এক লাফে তাঁহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেল। প্রহার তো কিছুই নয়, কারণ সেরূপ কোমল চটির আঘাত, উহা তো একরূপ সুখ, এবং যিনি আঘাত করিতেছিলেন, তাঁহার বয়স তখন ৮৫, তাঁহার লোলচর্ম ও জীর্ণ দেহে বা কতটা বল থাকিবে যে তিনি আমাদের মত স্ফূর্তিমান তরুণদিগকে ঘায়েল করিবেন? কিন্তু মারধর যাহাই হউক, অপমান তো বটে। আমাদের সমস্ত রাগ হইল মৌলবী বেচারীর উপর। ইহার পরে ঢাকায় যাইয়া তাঁহাকে যেরূপ নাকাল করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে মৌলবী সাহেব নিজের নাক-কান নিজে মলিয়া 'বিসমিল্লা' বলিয়া 'এরূপ ছাত্র প্রাণ গেলেও আর পড়াইবেন না'—ইহা সঙ্কল্প করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। হাড় জুড়াইল, কিন্তু মনে হয়, তখন যদি ফারসী পড়িতাম, তবে শেষে কাজ দেখিত। বাড়ীতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন মুন্সী মহাশয় রৌপ্য পিকদানিটা সামনে করিয়া বসিয়া কাশিতে কাশিতে আমাদিগকে অনেক গালমন্দ করিলেন এবং ফারসীর মত যে এমন আশ্চর্য জিনিস জগতে কোথাও নাই, তাহা বুঝাইতে যাইয়া নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিয়া হাফিজ হইতে

'ময় খোর্ মোসাহেফ বসোজ অন্দর কাবাজান,
সাকিনে বুৎখানা বস্ মর্দম আজারি মকুন।'[১]

প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন।

ঢাকার বাসায় আমাদের পড়িবার আড্ডাটা কম জমকালো ছিল না। বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের আমরা যেরূপ চর্চা করিয়াছি, সেকালের ছাত্রদের মধ্যে কেহই সেরূপ করে নাই। প্যারাডাইস লস্টের অনেকগুলি ক্যান্টো তো আমাদের একেবারে মুখস্থ ছিল। আমার মাসতুতো ভাই জগদীশবাবু ছিলেন এ সকল বিষয়ে আমাদের পালের নেতা। তিনি আমার মত বাহিরের বই তত পড়েন নাই সত্য, কিন্তু যে সকল বই তিনি ক্লাসে পড়িয়াছিলেন. তাহা কমা-সেমিকোলন সুদ্ধ তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি উত্তরকালে অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। সংস্কৃতেও তিনি প্রথম হইতে পারিতেন, তাঁহার সে বিষয়েও এতটা দখল ছিল। তিনি যখন দিনাজপুর এণ্ট্রান্স স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেন তখন আমি মানিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম। সেই সময় তিনি অভিধান খুঁজিয়া শব্দচয়নপূর্বক নানারূপ ফ্রেজ লাগাইয়া চারি পৃষ্ঠার

[১] মদ খাও, কোরান পুড়াইয়া ফেল, কাবামন্দিরে আগুন জ্বালাইয়া দাও, যেখানে পৌত্তলিকগণ থাকে, সেইখানে বাস কর; কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃকরণে কষ্ট দিও না।

এক ইংরাজী চিঠি আমাকে লিখেন। আমি বহু চেষ্টা করিয়া তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই। মা জিজ্ঞাসা করিলেন 'জগদীশ কি লিখিয়াছে?' আমি তো শুধু—'জগদীশচন্দ্র সেন' ও 'মাই ডিয়ার দীনেশ' এই দুইটি কথা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মায়ের প্রশ্নে মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিলাম—'লিখিয়াছে, ভাল আছে।' মা বলিলেন 'এত লম্বা চিঠিতে কি কেবল আমি ভাল আছি, এইটুকু লিখিয়াছে?' আমি বলিলাম, 'উহাতে আমাদের পড়াশুনা ও বইয়ের কথা আছে—তুমি বুঝিবে না।'

জগদীশদাদা ভবভূতির 'স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাং' এবং 'কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগাৎ' প্রভৃতি যখন পড়িতেন, তখন আমাদের মনোবীণার তার সবগুলি যেন তাঁহার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিত। শকুন্তলা তো তাঁহার ছিল জিহবাগ্রে—'গচ্ছতি পুরঃশরীরং ধাবিত পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ' প্রভৃতি শ্লোক আওড়াইয়া তিনি এমনই একটা ভাবের আবেশ দেখাইতেন যে, শ্লোকগুলি তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়াই আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আবার অঙ্ক কষিবার সময় গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেন 'মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং'। সমস্ত গীতগোবিন্দখানি তাঁহার মুখস্থ ছিল। আমরা তো কথায় কথায় 'Takes away the rose from love's forehead and sets a blister there', কিম্বা 'All hopes abandon ye who enter here' প্রভৃতি শেক্সপীয়ার এবং ডান্টের পদ দিনরাত কথায় কথায় উদ্ধৃত করিতাম। শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, কিং লিয়ার —এই চারিখানি নাটক আমার প্রায় আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। ইহা ছাড়া বেন জনসন্, শার্লি, জন ওয়েবস্টার, ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার, ফোর্ড প্রভৃতি এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারদের সঙ্গেও বিশেষ রূপে পরিচিত হইয়াছিলাম। আমাদের কলেজে সাহিত্য-সভায় এবং ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া যখন আমি হলিনশেডের ক্রনিকল এবং মারলোর *Edward II* -এর নিকট শেক্সপীয়ার কত খানি ঋণী তাহা বুঝাইতাম, তখন আমি ক্লাসে ভাল ছেলে না হইলেও আমার প্রতি সহপাঠীদের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। দিনরাত্রি ইংরাজী কবিতা পড়িতাম। চ্যাটারটনের *Death of Charles Badwin* হইতে আরম্ভ করিয়া টেনিসন ও ব্রাউনিং পর্যন্ত আমি কিছু বাদ দেই নাই। ভিকটর হিউগো হইতে আরম্ভ করিয়া ডাউডনের *Shakespeare's Mind and Art* প্রভৃতি শেক্সপীয়ার-সংক্রান্ত সাহিত্য আমাদের নখাগ্রে ছিল। আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, তখনই টেইন্ দুই তিন বার পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম এবং তাঁহারই মত অথচ প্রাচ্য আলোর নূতন রেখাপাতে উজ্জ্বল করিয়া একখানি ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিব, একদা এই সংকল্প করিয়া নোট সংগ্রহ করিতেছিলাম। এই সময়ে আমার এক অভিন্নহৃদয় সুহৃদ জুটিল, তিনি জগদীশদাদারও প্রিয়তম বন্ধু হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নাম রামদয়াল মজুমদার। ঢাকা কলেজে তখন অধ্যাপক ছিলেন—নীলকণ্ঠ মজুমদার এম. এ., পি. আর. এস.। তিনি আমাদিগকে কবিতা পড়াইতেন। আমার এত কবিতা পড়া ছিল যে, ক্লাসে আমি তাঁহাকে কতবার শুধু বিস্ময়াবিষ্ট নহে, একটু বিরক্তও করিয়াছি। তিনি মনে ভাবিতেন আমি তাঁহাকে উপেক্ষা করি, এজন্য একদিন বলিয়াছিলেন—'your little head is full of conceit,' 'তোমার ছোট্ট মাথাটি অহমিকায়

পূর্ণ,' এ বলা সত্ত্বেও কিন্তু কবিতার পরীক্ষায় তিনি আমাকে প্রায়ই প্রথম করিতেন। নীলকণ্ঠবাবু ছিলেন স্থূলদেহ, ধীর-গম্ভীর প্রকৃতির, চোখে কালো চশমা পরিতেন। তাঁহার ছোট ভাই রামদয়াল Uberbeg's *History of Philosophy* হাতে করিয়া একদিন পটুয়াটুলি দীনবন্ধুর কাগজের দোকানের সামনে হাসিয়া হাসিয়া নিজে যাচিয়া আমার সহিত আলাপ করিল। তদবধি দিন নাই, রাত নাই, আমরা একত্র থাকিতাম। আমার মাসীমা—জগদীশবাবুর মাকে—রামদয়াল মা বলিয়া ডাকিত, এবং আমাদের পরিবারের সেও একজন হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা এতটা উন্মত্ত হইয়া যাইতাম যে রাত্রি ১টা পর্যন্ত কখন কখনও বুড়িগঙ্গার পাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একবার উত্তর হইতে দক্ষিণে আরবার দক্ষিণ হইতে উত্তরে উত্তেজিতভাবে কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিতাম। ফরাসী লেখক ইউজুন সুর *The Wandering Jew*-এর মাদার বাণ্ডের চরিত্র লইয়া আমাদের মধ্যে কত তর্কবিতর্ক গিয়াছে, লনশ্লেটকে ভালবাসিয়া গুইনিভির ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন, শিলারের 'দি রবার্স্'-এর দস্যু-চরিত্র কি পাঠককে উন্নত করে অথবা নিচু করে, ইত্যাদি কত রকম আলোচনা যে আমাদের মধ্যে হইত, তাহার ঠিক নাই। তখন আমরা সাহিত্যকে যেরূপ প্রাণের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এখনকার ছেলেরা তাহার সিকি অংশও করে কিনা সন্দেহ। এখন বঙ্গীয় যুবকের রঙ্গমঞ্চ হইতেছে কার্যক্ষেত্র, কর্ম-জীবনের বিরাট আদর্শ তাহাদের সামনে। আমাদের সময়ে সাহিত্য-চর্চাই সেই স্থান লইয়াছিল।

আমি যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন অক্ষয় সরকারের 'নবজীবন' প্রথম প্রকাশিত হয়। সে বোধ হয় ১৮৮৩ সন হইবে, তখন আমার বয়স ১৫। সেই বৎসরই আমার একটা কবিতা—'পূজার কুসুম'—'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়। তখন নীলকণ্ঠবাবু 'নবজীবনে' লিখিতেন। ঢাকার এক পঞ্চদশবর্ষীয় বালক এরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন পত্রিকায় লিখিতেছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঢাকা কলেজে পড়ার সময় আমি এত কবিতা লিখিয়াছি এবং তাহার গোড়া এত লোক ছিল—যে আমার অতিরঞ্জিত ভাবী সাফল্য সম্বন্ধে আমার ভাই গিরীশ ও হেম যেরূপ স্বপ্ন দেখিত, দয়াল ও সহাধ্যায়িগণের অনেকেই উহা সেইরূপ বিশ্বাস করিত। ইতিমধ্যে রামদয়ালকে আমি উস্কাইয়া তাহার এক কবিতা পুস্তক 'সখিনা' প্রকাশিত করাইয়াছিলাম। কারবালা ক্ষেত্রের বর্ণনাটি বড় সুন্দর হইয়াছিল। সখিনা বাঙালী-ঘরের মৃদু-স্বভাবাপন্ন লাজুক মেয়েটির মত চিত্রিত হইয়াছিল এবং কাশিমের সঙ্গে তাহার প্রেম ঈষৎবিকশিত কুন্দকোরকের ন্যায় অন্তর্নিহিত সুবাস লইয়া যেন আত্মপ্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছিল। 'সখিনা' এখন সব ফুরাইয়া গিয়াছে। রামদয়ালকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে বলিল তাহার কাছেও একখানি নাই।

আমি ইংরাজী সাহিত্যের যে ইতিহাস লিখিবার পরিকল্পনা করিতেছিলাম, তাহা এই জন্য যে বিলাতী আদর্শটার প্রাচ্য আদর্শের দ্বারা তুলনামূলক বিচার আবশ্যক। সাহেবেরা আসিয়া তো সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের বিচার মাথা পাতিয়া নেন না। তাঁহারা বুঝুন, আর না বুঝুন, খুব স্পর্ধার সঙ্গে আমাদের বড় বড় কবিদিগের টিকি ধরিয়া নাড়া দিতে ছাড়েন না, এমন কি কবিগুরু বাল্মীকির কথা লইয়াও কত অহমিকাপূর্ণ আলোচনা করেন; বিলাতী মাপকাঠি লইয়া আসিয়া

আমাদের ঘরের ঠাকুরদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন। চৈতন্যকে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করেন—আমাদের বিরাট অলঙ্কারশাস্ত্রের রীতি ও নীতির আদর্শ আয়ত্ত করিয়া বুঝিবার যোগ্য তাঁহাদের মাথাই বা কোথায়, অবসরই বা কোথায়? যা তা সমালোচনা করেন এবং তাহাই আমরা বেদ-কোরান বলিয়া মানিয়া লই। কিন্তু তাঁহারা যখন শেক্সপীয়ার ও মিল্টনের ডঙ্কা বাজাইয়া যান, আমরা তো তখন মশগুল হইয়া তুড়ি মারিয়া তাল রাখি। আমি মনে করিয়াছিলাম—তাঁহাদের সাহিত্যের আলোচনা আমি আমাদিগের দিক হইতে করিব। তাহার উদ্দেশ্য নয় প্রতিহিংসা-বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদিগকে খাটো করিবার চেষ্টা। আমাদের দেশ তো সাহিত্য সম্বন্ধে অন্তত পাঁচ-সাত হাজার বৎসর চিন্তা করিয়াছে, আমাদেরও তো একটা আদর্শ আছে। তাহাদের সাহিত্যে যাহা কিছু হইবে—যত কিছু আবর্জনা ও সরস্বতীর পাদপীঠের উপর দৌরাত্ম্য সমস্তই আমরা 'বিশ্ব-সাহিত্য' বলিয়া মানিয়া লইব এবং আমাদের জিনিস না বুঝিয়া সেগুলি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির কথা বলিয়া উড়াইয়া দিব—এটা কখনই সমীচীন নহে। ধরুন আমি Lord Byron-এর মধ্যে এমন অনেক জিনিস পাইতেছি যাহা তাঁহার সমস্ত অসংযম ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য হইতে, ঘন-নিবিড় মেঘব্যূহের মধ্য হইতে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত তাঁহার প্রকৃতি-গত ধর্ম-প্রাণতা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতেছে। প্রকৃতির সেই সাধুত্ব, আত্মার সেই উজ্জ্বল গৌরব,—তাঁহার কবিতার ফোট-ফোট অবস্থায় আছে, তিনি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে না পড়িলে বোধ হয়, সেই জিনিসটা সম্যক বিকাশ লাভ করিতে পারিত। চাইল্ড হেরল্ডে এমন কি ডন জুয়ানের মধ্যেও আত্মার মহান্ শক্তির সুস্পষ্ট ইঙ্গিতময় বহু কথা আছে। মানুষের মনই যে প্রেমের চক্ষে চাহিয়া রূপ গড়িয়া লয়, বাস্তবিক রূপবান্ কি রূপসীর দেহে তাহা নাই—কিম্বা যেটুকু আছে, তাহা ক্ষুদ্র উপলক্ষ মাত্র, এই কথা কেমন সুন্দর করিয়া চাইল্ড হেরল্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে; ডন জুয়ানের নানা কুরুচিপূর্ণ অসঙ্গতির মধ্যেও সন্ধ্যাবর্ণনায়, আত্মার শক্তি যে কত বড়, মানবাত্মা যদিও ক্ষুদ্র বারিবিন্দুর ন্যায়—তাহা যে বিশাল বারিধিরই স্বরূপ দেখাইতেছে, তাহা তিনি এমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন যে আমার মনে হয় তাঁহার লেখায় প্রাচ্যমনের যে সাড়া পাওয়া যায়, তাহাতে আমরাই সেই সকল অংশের ভাল সমালোচনা করিতে পারিব। অথচ এই সকল বিষয়ে তাঁহার ইংরেজ সমালোচকগণ প্রায় নির্বাক, তাঁহারা বেশী বুঝিয়াছেন বাইরনের সেই দিকটা, যাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভিব্যক্তি, সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ চোখরাঙানি এবং অকুণ্ঠিত একান্ত নির্ভীকতা। সুতরাং আমরা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিলে তাহা যে সেই জিনিসটাকে খাটো করিয়া দেখাইবার চেষ্টায় পর্যবসিত হইত তাহা নহে, অবশ্য শেক্সপীয়ার যে তাঁহার হ্যামলেট নাটকের শেষাঙ্কে একত্র ছয়-সাতটা হত্যা করিয়া গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের রীতি রক্ষা করিলেন, এবং কিং জন্-এ যে বালক আর্থারের চক্ষু দুটি উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা তুলিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যোগ চলিল তদ্দ্বারা নাট্যসম্রাট বৃথা শোক উদ্দীপনার চেষ্টা করিলেন, এ সকল হয়ত আমরা প্রশংসা করিতে পারিতাম না। কারণ যে দুঃখ মনে শুধু ঘা দেয়, কিন্তু চিত্তকে উন্নত করে না, যে দুঃখ ত্যাগের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া নাই, এমন দুঃখ বর্ণনা করা আমাদের সাহিত্য-নীতির বিরুদ্ধ। যাহা হউক যখন ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস

আমি লিখিলাম না, তখন এ সকল কথার প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন।

একদিকে লেখাপড়ার এই ঐকান্তিকী চেষ্টা ও অপরদিকে বাড়ীতে নানারূপ দুষ্ট বুদ্ধির প্রণোদনে অশিষ্টাচরণ—পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে একেবারে সম্পর্করহিতত্ব—এই ছিল আমার কলেজ-জীবনের ইতিহাস। আমাদের এই সকল দুষ্ট ব্যবহারের উদ্ভাবনী শক্তি জোগাইত, মহেন্দ্র-প্রতিভা। মহেন্দ্র আমার মামাতো ভাই। আমাদের ঢাকার বাসায় শশাঙ্কমোহন নামক এক কায়স্থ যুবক থাকিত, সে একটু পাগলাটে ছিল এবং অল্পেই এমন ক্রুদ্ধ হইত যে, সে আমাদের আমোদের একটা কেন্দ্রস্থান হইয়া পড়িয়াছিল, আমাদের দুষ্টামির দুর্গোৎসব হইত তাহাকে লইয়া। মহেন্দ্র একদিন একটি গল্প তৈয়ারী করিল এবং সেটি এমন প্রত্যক্ষ ঘটনার ন্যায় বর্ণনা করিতে লাগিল যে, কথাটা একান্ত অদ্ভুত রকমের হইলেও বাহিরের লোক তাহা বিশ্বাস করিতে লাগিল ও শশাঙ্ক তাহাতে চটিয়া প্রায় ক্ষেপিয়া যাইবার মত হইল।

ঘটনাটা এই, একদিন বৈঠকখানা ঘরে অতি বিমর্ষভাবে মহেন্দ্র বসিয়া ছিল। বাহিরের লোক একজন আসিয়া তাহাকে সেইরূপ বিমর্ষ থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন শশী (শশাঙ্ক) ও আমরা সেইখানে বসিয়াছিলাম।

মহেন্দ্র বলিল 'মহাশয়, দুঃখের কথা কি বলিব! আমার একটা পোষা শালিক ছিল, সে এতটা পোষ মানিয়াছিল, যে আমি পড়িতে বসিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম, সে ডানা দুইটা বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে উড়িয়া আমার বাহুমূলে, কাঁধের উপর এবং মাথার উপর বসিত। দুই চারিটা ধান কি চাল ছড়াইয়া দিলে সে মাথা নাড়িয়া আমাকে দেখিত ও লাল দুটি ঠোঁট দিয়া তাহা কুড়াইয়া খাইত ও এমন চমৎকার শিস্ দিতে থাকিত, যে তাহা শুনিলে আমি তাহাকে আস্তে ধরিয়া ঠোঁটে চুমু খাইতাম, এমন কি কুকুরের মত সে আমার পিছন পিছন হাঁটিয়া চলিত, আমি ফিরিয়া ফিরিয়া সেটাকে দেখিতাম। তখন আমার মনে যে কি আনন্দ হইত তাহা আর কি বলিব! পাখীটা আমার প্রাণ ছিল।' মহেন্দ্র এইখানে চক্ষু মুছিবার ভান করিল, খানিকটা চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিতে লাগিল। 'গত শনিবার বৃষ্টির পর একটু ঠাণ্ডা হয়, তারপর রৌদ্র উঠিলে আমি পায়খানার সংলগ্ন উত্তর দিকের ছাদটার উপর খাঁচাটা-সুদ্ধ পাখীটাকে রাখিয়া যাই। একটু রোদ লাগিলে পাখীটা আরাম পাইবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। মহাশয় কি বলিব! প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ২টার সময় বাড়ী আসিয়া দেখি খাঁচা খালি, শালিকটা নাই। খাঁচার দুয়ার বন্ধ ছিল। বিড়ালে লইয়া যাওয়ার যো ছিল না। আর পাখীটা এত পোষা যে উড়িতে ভুলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহার নিজে উড়িয়া যাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আমি পাগলের মত বাড়ীর ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কেহই কিছু সন্ধান দিতে পারিল না। তবে দুর্গাদাস মজুমদার মহাশয় বলিলেন, 'বাপু আমি পায়খানায় গিয়াছিলাম, তখন পাখীটিকে খাঁচায় দেখিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে টের পাইলাম, শশী একটা ঝড়ের মত পায়খানার পাশ কাটাইয়া ছাদে চলিয়া গেল এবং তাহার পর একটা চিঁচিঁ, চিঁচিঁ শব্দ হইল। পাখীটা প্রাণান্ত কষ্টে চিৎকার করিতেছিল, আমি যখন বাহিরে আসিলাম, তখন দেখিলাম, ছাদের উপর খালি খাঁচাটা পড়িয়া আছে ও শশী দ্রুতবেগে পালাইয়া যাইতেছে, তাহার ঠোঁটের কাছে পাখীটার একটা পালক লাগিয়া ছিল।' বলা বাহুল্য গল্পটি আগাগোড়া তাহার তৈয়ারী। গল্পটি বলিয়া মহেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস

ফেলিয়া বসিয়া রহিল। শশীর চোখের রক্তিমা গাঢ় হইতেছিল। সেই ব্যক্তি বলিলেন, 'শশীবাবুর মাথাটা চিরকালই একটু গরম, তাই বলিয়া কি পাখীটার কাঁচা মাংস উনি খাইয়া ফেলিলেন? বায়ুরোগ—তোমার লীলা আশ্চর্য!' এই কথা শুনিয়া হঠাৎ একটা লাফ মারিয়া শশী মহেন্দ্রের গণ্ডদেশে একটা চড় মারিল। মহেন্দ্র ও আমরা ভয়ে পালাইয়া গেলাম। কিন্তু সেই দিনই আমাদের জিন্দাবহরের গলিতে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে শশী শালিক মারিয়া খাইয়াছে। এ বিষয়ের প্রকৃত মর্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সরল বিশ্বাসে শশীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন 'সত্য সত্য কি তোমার বুদ্ধিটা লোপ পাইয়াছিল—এমন কাণ্ডটা করিয়া ফেলিলে?' শশী তখন লগুড় লইয়া প্রশ্নকারীদিগকে তাড়া করিয়া ছুটিল।

শশী কচ্ছপকে জন্মাবধি ঘৃণা করিত। জিন্দাবহরের গলিতে আমার মাতুলালয়ের একটা জায়গায় বরিশাল-নিবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বড়ই কচ্ছপমাংসপ্রিয় ছিলেন। কচ্ছপের মাংস ও ডিম তুলিয়া লইয়া তাঁহারা সেই জীবের খোলসটা এবং নাড়ীভুঁড়ি-সুদ্ধ মাথাটা ফেলিয়া দিতেন। একদা মহেন্দ্রের শিক্ষাক্রমে জগদীশদাদা সেই মাথা সমেত নাড়ীভুঁড়িটা শশীর পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। শশী বাহিরে গিয়াছিল, পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আলনায় ঝুলানো কোটটা অতিরিক্ত ভারী দেখিয়া পকেটে সেই বীভৎস দ্রব্যটা আবিষ্কার করে। অমনই 'চক্ষু ঘোরে যেন নাট, হাত নাড়া ঘন ডাক, চমকে সকল পুরজন' অবস্থাটি হইল। সে একহাতে সেই অস্পৃশ্য বীভৎস-দর্শন বস্তুটা এবং অপর হস্তে লগুড় লইয়া দাদাকে যেভাবে তাড়া করিয়াছিল, তাহা না দেখিয়াই কাশীদাস কিরূপে লিখিয়াছিলেন—'পৃথিবী বিদার হয় চরণের ভরে। ক্রোধ দৃষ্টিতে যেন জগৎ সংহারে।. গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি'—সেইটি আশ্চর্য বটে।

এই সকল দুষ্টামিতে আমরা নিত্য নিযুক্ত ছিলাম। বগজুরীর মাতুলালয় অতি প্রকাণ্ড ছিল, খুব বড় কোন রাজবাড়ীর মত। বাড়ীটি ৩০।৪০ বিঘা লইয়া, তন্মধ্যে প্রায় ৪।৫ বিঘা শুধু ফুলবাগানই ছিল। অনেকগুলি মালী সেই ফুলবাগানে কাজ করিত। প্রাতঃকালে বাগানে গেলে ভ্রমরের ডাকে কানে মধুবর্ষণ করিত, সদ্যপ্রস্ফুট নানাজাতীয় গোলাপের লাল রঙে চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। তিন দিকে দীঘি, জল কাকচক্ষুর ন্যায় কালো ও স্বচ্ছ, নহবৎখানায় উৎসব উপলক্ষে সানাইয়ের ভ'য়রো পূরবী প্রভৃতি নানা রাগের আলাপন হইত। দক্ষিণদিকের দোতালার বারান্দা মস্তবড়, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ। সেই বারান্দার নীচে দুই দিকে দুই প্রকাণ্ড ঘর--তাহার একটা পশুশালা আর একটা চিড়িয়াখানা। পশুশালায় বড় বড় হনুমান প্রভৃতি থাকিত, চিড়িয়াখানায় প্রায়ই তিন চারিটি ময়ূর থাকিত। সদর দরজার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ পথ; ভাহার দুইদিকে চেয়ারের মত হেলান-দেওয়া পাকা গাঁথুনির সুদীর্ঘ বেড়া—তন্মধ্যে বসিবার আসন, তারপর আর একটা বড় গেট্, তাহার দুইদিকে রাজপুত ও মুসলমান সর্দার, হস্তে ঢাল ও তরোয়াল, তথায় প্রাচীরের গায়ে সেকালের নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত অস্ত্র। এই সমগ্র বাড়ীটা আমার মাতামহ গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী মহাশয় একটা হাঁক দিলে যেন কাঁপিয়া উঠিত। দুইজন চাকর শুধু তাঁহার গোঁফের তোয়াজ করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত, তাহারা সেই গোঁফের লহরী নানারূপ মালমসলা দিয়া তৈয়ারী করিত, সেই লহরীর উপর গোঁফের চুল

লতার কায়দায় হেলাইয়া দিয়া অগ্রভাগ ছুঁচের মত সূক্ষ্ম করিয়া গণ্ডের উপর কুণ্ডলী করিয়া লগ্ন করিয়া দিত। সেই গোঁফে তা দিয়া তিনি যখন তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতেন, তখন নায়েব, খোসামুদে, মোসাহেব প্রভৃতি সকলে তাঁহার চেহারার তারিফ করিত। 'গনি মিঞার ঘাড়, নীলাম্বরের বাড়, গোকুল মুন্সীর গোঁফে তা। গল্প শুনবি তো নীলাম্বর মুন্সীর কাছে যা।' এই কবিতা ২৫ বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র প্রবাদবাক্যের ন্যায় ছিল। আমি সিলেট, ত্রিপুরা প্রভৃতি যে অঞ্চলে গিয়াছি সর্বত্রই মাতামহের নাম করিয়া সম্মান লাভ করিয়াছি—'গোকুল মুন্সীর গোঁফে তা'—সকলের মুখেই শুনিয়াছি। তাঁহার নাটশালার মত এরূপ বড় নাটমন্দির বঙ্গদেশে খুব অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার দুর্গামণ্ডপ যেরূপ সারি সারি নানারূপ মুসলমানী ও প্রাচীন হিন্দুশিল্পের কায়দায় প্রস্তুত স্তম্ভ দ্বারা সজ্জিত হইয়া একটা জমকালো ভাব দেখাইত, সেরূপ হয়ত মফস্বলের কোন কোন রাজ-বাড়ীতে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই দুর্গামণ্ডপে দুর্গাদেবীর যে মৃন্ময়ী-মূর্তি গোলক দেউরী তৈয়ারী করিত, অত বড় বিরাটমূর্তি বঙ্গদেশের কোথায়ও দেখিতে পাই না। একশ ভরির সোনার মুকুট মাথায় পরিয়া যখন ডাকের সাজে সাজিয়া সেই মূর্তি সপ্তমীর দিন বোধনের সময় সমবেত বহুশত লোকের চক্ষুর সামনে দাঁড়াইতেন, তখন শুম্ভনিশুম্ভ-বিজয়ী, পাশাঙ্কুশ, ঘণ্টা, খেটক, শরাসন, অসি, চক্র, শূল, শর হস্তে যেন সত্যই জগন্মাতা আমাদিগকে দেখা দিতেন। আরতির ধোঁয়ায়, ধূপ ও অগুরুর সুগন্ধে, একশত পঁচিশ বাতি-ঝাড়ের আলোকে সেই মূর্তির উজ্জ্বল স্বর্ণবিন্দুমাখা উত্তরীয়-অঞ্চল যেন ঝলমল করিতে থাকিত। নর্তকী, বাদ্যকর, কাঁসরবাদক যেন তাহাদের জন্মাবধি অর্জিত নৈপুণ্য শুধু জগন্মাতাকে দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে প্রাণপণে লাগিয়া যাইত। নর্তকীর অঙ্গভঙ্গী, বাদ্যকরের বাদ্য শুধু সেই বিগ্রহকেই লক্ষ্য করিত। মানুষকে দেখানো যেন তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়। সেরূপ দেব-নৃত্য ও দেব-সঙ্গীত, সেরূপ ঐকান্তিকী ভক্তি আর কোথায় দেখিব! এই যুগ হইতে তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

দোলের সময় ফাগ লইয়া যে ঘটা হইত, তাহাও একটা বর্ণনীয় বিষয় বটে। আমরা ফাগ লইয়া যে কত লোকের চক্ষে মারিয়াছি তাহার অবধি নাই। একবার পুলিশের কতকগুলি লোকের উপর ফাগ লইয়া অত্যাচার করাতে তাহারা আমাদের ভয় দেখাইয়াছিল। তাহাতে আমাদের লোকের হাতে তাহারা ভয়ানক মার খাইয়াছিল, কিন্তু নালিশ করিতে সাহস পায় নাই, শুধু মাতামহের ন্যায় প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারের ভয়ে নহে—সেকালে দোলের ফাগ খাওয়া একটা রীতি ছিল—এই রীতির বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিতে চাহিত না এবং এতৎসম্বন্ধে বিপক্ষতা করিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হইত। দোলের সময় মনে পড়ে আমরা বাহিরখণ্ডের সুবৃহৎ হল্ ঘরটায় ২০।৩০টি ছেলে সকালে শুইয়া আছি, চাকরেরা নেকড়া ও জলের ঘটি লইয়া প্রত্যেকের চক্ষু খুলিয়া দিতেছে। কারণ পূর্বদিন ও পূর্বরাত্রে এত ফাগ আমাদের চোখে পড়িত যে পরদিন চোখের দুটি পাতা একেবারে আটকাইয়া যাইত। ভৃত্যদের সাহায্যে চক্ষু না খুলিলে চোখ বুজিয়া থাকিত। মহেন্দ্রদা ফাগ নিক্ষেপে ওস্তাদ ছিল। আমার চক্ষে যে সে কতবার ফাগ মারিয়াছে,—যাহাতে আমি পৃথিবীটা প্রায় গোলকধাঁধার মত দেখিয়া নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া

মাটিতে পড়িয়া গিয়াছি—তাহার অবধি নাই। কিন্তু আমি যদি যাচিয়া ভাব করিয়াছি, তবে সে আর আমার প্রতি ফাগ ছুঁড়িয়া মারে নাই। তথাপি তাহার পূর্বকৃত অত্যাচারের কথা মনে করিয়া আমি ও হীরালাল তাহাকে সর্বদা জব্দ করিবার সন্ধানে থাকিতাম। তাহার সঙ্গে বাহ্যিক ভাব করিয়া পিছন হইতে যাইয়া হঠাৎ চোখে ফাগ ছুঁড়িয়াছি, কিন্তু সে এমনই চালাক ছেলে যে, আমাদের ফাগ কোন কালেই তাহার চোখের উপর যাইয়া পড়িত না, চোখের পাশ কাটিয়া গণ্ডের উপর শুধু ক্ষণস্থায়ী রক্তিমায় পুষ্পবৃষ্টি করিয়া যাইত। কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের প্রতিহিংসায় তাহার চোখ দুটি বাঘের চোখের ন্যায় জ্বলিতে থাকিত, এবং আমরা তাহাতে প্রমাদ গণিতাম। কারণ যেরূপ সাবধানতার সহিতই না কেন তাহাকে এড়াইতে চেষ্টা করিতাম, কোনরূপ ফাঁক পাইয়া সে চিলের মত ছোঁ মারিয়া হঠাৎ চোখে এমনই জোরে ফাগের অগ্নিবাণ মারিয়া যাইত যে, প্রকৃতই যেন ক্ষণকালের জন্য চোখ দুটি আগুনের তাপে জ্বলিতে থাকিত। হীরালাল ও আমি মহেন্দ্রদার হাতে যে কত কষ্ট পাইয়াছি, তাহা লিখিয়া উঠিতে পারিব না। যখন 'লক্ষ্মী-জনার্দন' (মাতুলালয়ের বিগ্রহ) 'গস্ত ফিরিয়া' (গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া) বাড়ীতে আসিতেন, তখন শত শত লোক যে কি আনন্দ করিত, তাহা আর কি বলিব! ফাগে আকাশ লাল হইয়া যাইত, ধূসর-বরণা সন্ধ্যা যেন আপাদমস্তক লাল চেলীতে আবৃত হইয়া থাকিতেন। যখন 'লক্ষ্মী-জনার্দনের' সিংহাসন ধাতু-নির্মিত সুন্দর স্তম্ভযুক্ত চৌদোলার উপর চড়াইয়া লোকেরা স্কন্ধে বহন করিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিত, তখন আবীর-রঞ্জিত দেহে শত শত লোক হাত উঁচু করিয়া গাহিত 'জয় দে লো রাণীর মা তোর গোপাল এল ফিরে। এগিয়ে বরিয়ে গোপাল নিয়ে যাও ঘরে।' 'বরিয়া' অর্থ বরণ করিয়া। সে যে কি আনন্দ তাহা মুখে বলার নহে, লেখনীতে লিখিবার নহে! অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকেরা জয়-জয়কার দিতেছেন, শঙ্খ নিনাদ করিতেছেন, নহবৎ বাজিতেছে, বাড়ীর সকলেই মনে করিতেছে, গোপাল সত্যই ফিরিয়া আসিতেছেন। ঘরের বিগ্রহ দুই এক ঘণ্টার জন্য বাহিরে যাওয়াতে যেন মায়েরা উৎকণ্ঠায় চোখ-দুটি পথের পানে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। আবীর-রঞ্জিত চৌদোলার কার্নিসের পার্শ্বে লাল পতাকা দেখিয়াই তাঁহারা যেন প্রাণ পাইলেন এবং আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। এখন যদি আমাদের বাড়ীতে এরূপ কোন উৎসব হয়, তাহা হইলে মেয়েরা হয়ত সেলাইয়ের কলের কাছে বসিয়া শেমিজে লেস্ লাগাইতে থাকিবেন এবং উৎসব সম্বন্ধে একেবারে অনাশ্লিষ্ট থাকিবেন—এটি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহা বিচার করিবার শক্তি আমার নাই, কিন্তু দেশ হইতে যে একটা প্রকাণ্ড আনন্দ চলিয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। দুর্গোৎসব-দোলোৎসব তাড়াইয়া দিয়াছি—এই যুগের শিক্ষায় পূর্বসংস্কার ও রুচি নষ্ট করিয়াছি সত্য, কিন্তু সেই সকল উৎসবের জায়গায় আর কোন আনন্দ দিতে পারিয়াছি কি? আনন্দ ভিন্ন যে জাতীয়জীবনের মূল শুকাইয়া যাইতেছে।

১২

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে সর্বপ্রথম দেখিয়াছিলাম। সেবার লর্ড রিপন বিদায় লইতেছেন। সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়িয়া তাঁহার বিদায়সভা চলিতেছে। সেইরূপ এক সভা ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের একটি সুদীর্ঘ গৃহে আহূত হইয়াছিল। বক্তা আনন্দ রায় প্রভৃতি, কিন্তু সভার সর্বপ্রধান আকর্ষণ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বক্তৃতা করিবেন, এই সংবাদ। কারণ বহুদিন তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন নাই। ইহার কিছু পূর্বে কৃষ্ণানন্দ স্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়—হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের পাল্লা দিয়া ঢাকার সভাগৃহগুলিকে খুব সরগরম করিয়া গিয়াছিলেন। কোন লোক কালীপ্রসন্ন বাবুকে যদি যাইয়া বলিতেন 'মহাশয় হিন্দু ও ব্রাহ্মদলের বক্তৃতার চোটে আকাশ ফাটিয়া যাইতেছে। আপনি এত বড় বক্তা, আপনি চুপ করিয়া আছেন কেন?' তিনি তাহার উত্তরে উপেক্ষার ভাবে তাঁহার অভ্যস্ত জাঁকালো ভাষায় বলিতেন 'কাক-কোলাহল'।

সেইদিন বোধ হয় ১৮৮১ সন হইবে, আমি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে প্রথম দেখিলাম। আনন্দ রায় প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়া গেলেন, তাঁহারা সরল ভাষায় লর্ড রিপন আমাদের জন্য কি কি করিয়াছেন, আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিতে যাইয়া তাঁহার স্বদেশীয় লোকদের হাতে কিরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছেন, এই সকল বলিয়া—তাঁহার ভারত পরিত্যাগের জন্য দুঃখ করিলেন। সোজা ভাষায় সহজ ভাবে বক্তৃতাগুলি মন্দ লাগিল না। কিন্তু সর্ব শেষে উঠিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ, তখনও তিনি 'রায় বাহাদুর', 'সি. আই. ই.', 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি পদবী পান নাই। তখন শীতকাল, মোটা পাড়শূন্য একটা বেগুনে রঙের বনাত তাঁহার গায়ে ছিল। তিনি যখন বক্তৃতা-মঞ্চের টেবিলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন দেখিলাম সুদীর্ঘ সুন্দর নাসিকা, উজ্জ্বল গন্ড, বৃহৎ চক্ষুদ্বয়ে যেন প্রতিভা জ্বলিতেছে। যেমন দীর্ঘ তেমনি স্থূল, বরং স্থূলতার জন্য একটু খর্ব বলিয়া মনে হয়। বিশাল গোঁফের অন্তরালে দুটি রক্তিম অধর, দেখামাত্র মনে হয়, সেই অধর কথা কহিবার দক্ষতা লইয়াই সৃষ্ট হইয়াছে, উদ্যত করতলটি পদ্মাভ—বর্ণ গৌর, খুব উজ্জ্বল গৌর নয়, সেই বেগুনে রঙের বনাতখানি মর্মরমূর্তিতে যেরূপ বস্ত্রাদির ভাঁজগুলি দেখায়, সেইরূপভাবে বিন্যস্ত হইয়া একটা দিক দিয়া যেন বক্তৃতা-মঞ্চটি ছুঁইয়া আছে। সেই বেগুনে রঙের দীপ্তিতে তাঁহার গৌরবর্ণ যেন ঈষৎ শ্যামল হইয়াছে। যখন দাঁড়াইলেন, তখনই মনে হইল—এ ব্যক্তি শক্তিশালী। তারপর যখন মৃদুস্বরে দুই একটা কথা বলিয়া হঠাৎ ভাষায় অপূর্ব উদ্দীপনা অবতারণা করিলেন, তখন সভাগৃহটি একেবারে নীরব ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। ভাষা ওজস্বিনী, বাক্যগুলি প্রকান্ড প্রকান্ড, সমাস-বদ্ধ, কিন্তু তাহার কোন অংশ হীনবল নহে, এ যেন অর্জুন গান্ডীবধনু হইতে শর নিক্ষেপ করিতেছেন—সে গান্ডীব আর কাহারও ব্যবহার্য নহে,—মেঘনাদবধ কাব্যের মত উন্মাদনাময়ী ভাষা। ২০ মিনিট কাল শ্রোতারা যেন এক মহাকাব্য শুনিল, সেই কাব্যের শেষভাগ করুণরস-মধুর। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমরা সেই বক্তৃতাটি

শুনিলাম, বঙ্গভাষায় যে কি ভয়ানক শক্তি সেদিন বুঝিলাম। তারপর তো কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কত মনস্বী বাগ্মীর বাংলা বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু সেরূপ পাহাড়পর্বত নিক্ষেপকারী দেবাসুরের ক্রীড়ার মত, অবাধস্রোতা ঐরাবতীবিজয়ী দুর্জয় গঙ্গার মত, বিপুল দম্ভময় মেঘগর্জনের মত, শিবের প্রণব-ধ্বনির মত, বিজয়দুন্দুভির মত—বঙ্গভাষার ধ্বনি আর কোথাও শুনি নাই। বৈষ্ণব কবিতার মাধুরীতে যে বঙ্গভাষাকে এলাইয়া পড়িতে দেখিয়াছি, কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় সেই ভাষাকে জয়শ্রীমণ্ডিতা সম্রাজ্ঞীর মত দেখিয়াছি। বঙ্গভাষা যে জগজ্জয়ী হইবে, সেই শিশুকালে একটা অস্পষ্ট আভাসের ন্যায় তখন তাহা মনে হইয়াছিল।

আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া এপিফেনিতে প্রবন্ধ লেখার জন্য স্মিথ সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্মিথ ছিলেন অকস্‌ফোর্ড মিশনের মিশনারী, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সেই মিশনের কাজ খুব জাঁকাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সহকারী ছিলেন ব্রাউন ও ডগ্‌লাস। এই ডগ্‌লাস এখন বেহালায় স্কুল খুলিয়া খুব জোরের সহিত প্রচারকার্য করিতেছেন।

কিন্তু ইঁহাদের প্রেরণা দিয়াছিলেন স্মিথ ; ইনি খাটো, এবং শীর্ণদেহ ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই ইনি প্রাণত্যাগ করেন। স্মিথ সাহেবের ইচ্ছা হইল, আমি ভাল করিয়া বাইবেল পড়ি। তিনি আমার চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধাদি পড়িয়া আমার একটু পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার কেন জানি একটি বিশ্বাস হইয়াছিল যে আমি বাইবেল ভাল করিয়া পড়িলে হয়ত খ্রীষ্টান হইতে পারি। এই ভরসায় ও বিশ্বাসে তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া ধরিলেন যে আমাকে বাইবেল পড়িতেই হইবে। হীরালাল বলিল 'ক্ষতি কি? তুমি লিখে দাও—তুমি কবুল আছ।' স্মিথ ঢাকার চ্যাপ্‌লেন্‌ আলিয়েট সাহেবকে আমায় বাইবেল পড়াইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন: সময়ে সময়ে আমি তাঁহার মেমসাহেবের নিকটও পড়িয়াছি। আলিয়েট সাহেব খ্রীষ্টান ধর্মে অতিশয় ভক্তিমান্‌ ছিলেন। তিনি বাইবেলের প্রতি অক্ষর ঈশ্বরের হাতের লেখা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। জন্‌ই লিখুন, আর লুকই লিখুন, সুসমাচারের প্রত্যেক কথায় ঈশ্বরের অনুজ্ঞা আছে—এই কথা আমাকে বুঝাইতেন। সুতরাং প্রতিটি ছত্রের প্রতি তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস এত থাকিত যে বাইবেল পড়া যে খুব অগ্রসর হইত তাহা নহে। একদিন তিনি ইউকারিস্ট বুঝাইতে যাইয়া সেই দিনের রুটি খ্রীষ্টের পবিত্র মাংস ও মদ তাঁহারই রক্ত—এই ব্যাখ্যা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে কি কান্না! সুতরাং এই ভক্তির অসম্ভব দুর্যোগ, ঝড়বৃষ্টি ঠেলিয়া আমার বিদ্যাতরণী মোটেই অগ্রসর হইল না, ঘাটেই নোঙ্গর করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যখন পড়ি, তখন আলিয়েট সাহেব একদিন আমায় বলিলেন, 'কাল লর্ড বিশপ ঢাকায় আসিবেন তুমি শুনিয়াছ?' আমি বলিলাম 'শুনিয়াছি।'

'কেন আসিবেন, জান?'

'আমি কি করিয়া জানিব?'

'তাঁহার অবশ্য অনেক কাজ আছে, কিন্তু একটি হইতেছে, তোমাকে পবিত্র ধর্ম দান করা।'

আমি তো এ কথায় অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম 'আমি খ্রীষ্টান হইব, এ কথা কাহাকে কবে বলিয়াছি?'

'তবে এই দুই বৎসর যে তোমার পাছে হয়রান হইলাম, সে কি সকলই মিথ্যা? আমি যখন আমাদের শাস্ত্র তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছি, তখন তো তুমি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া শুনিয়াছ. তুমি যে ক্রাইস্ট সম্বন্ধে ইংরাজী কবিতাটি লিখিয়াছিলে তাহার ভাব তো ভারী চমৎকার। তুমি যে আমাদের শাস্ত্রে বিশেষ ভক্তিমান, তাহা তো তোমার বাইবেল পড়িবার আগ্রহ দেখিয়া. আমার ব্যাখ্যার সময় তোমার চক্ষু ও মুখভঙ্গী দেখিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আমার স্ত্রী ও আমি তোমার ধর্মপ্রাণতার কত প্রশংসা করিয়া থাকি। জল, ঝড়, দুর্যোগের মধ্যেও তুমি বাইবেল পড়িতে আমাদের এখানে আসিয়া থাক—এ সকল কথা আমি রিপোর্ট করিয়াছি—ইহা করা কি আমার অন্যায় হইয়াছে? যাহা হউক তুমি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ কর আর না কর, লর্ড বিশপের সঙ্গে পরশ্ব তারিখে ৮টার সময় সরকারী চার্চে দেখা করিও, নতুবা আমি বিশেষ অপ্রস্তুত হইব। আমি বহুদিন তোমায় পড়াইয়াছি—তাহার এই দক্ষিণাটুকু চাই যে লর্ড বিশপের নিকট যেন আমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন না হই, আমি সরলভাবে যাহা বিশ্বাস করিতাম তাহাই লিখিয়াছিলাম, এখন তোমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি।'

বিস্ময় যে শুধু তাঁহারই হইয়াছিল এমন নহে, আমার হইয়াছিল ততোধিক। যাহা হউক, আমি লর্ড বিশপের সঙ্গে দেখা করিব, ইহা স্বীকার করিলাম এবং বলিলাম, যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিষয় লইয়া পাদ্রীলাটের কোন অপ্রীতিকর ভাব না হয়, আমি তাহা করিব। বিদায়কালে আলিয়েট সাহেব আমায় বলিলেন 'লর্ড বিশপ তোমার ন্যায় বালককে দীক্ষা দিলে জীবন ভরিয়া তুমি এ বিষয় লইয়া গৌরব করিতে পারিবে। এ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিও।'

পরদিন সকালে মহেন্দ্রদের (মহেন্দ্রলাল রায়, ঢাকার উকিল) মেসে যাইয়া তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। সে বলিল 'তোমার প্রকাশ্যভাবে আলিয়েট সাহেবকে পূর্বেই বলা উচিত ছিল যে তুমি খ্রীষ্টান হইবে না, সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনার জন্য বাইবেল পড়িতেছ, তাহা হইলে সাহেব কখনই তোমাকে বাইবেল পড়াইতেন না, তাঁহার মনেও তোমার খ্রীষ্টান হওয়া সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হইত না। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত সরলচিত্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব বা অনুচিত হয় নাই।' আমি বলিলাম 'যদি সরকারী চার্চে পাইয়া আলিয়েট সাহেব জোর করিয়া আমাকে জর্ডনের জল খাওয়াইয়া দীক্ষা দেন, তাহা হইলে কি করিব? মহেন্দ্র বলিল, 'তুমি নিতান্ত পাগল, তাঁহার মত পদস্থ ব্যক্তি এরূপ কার্য করিবেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।'

আমি আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম—কিন্তু এ বিষয়টি আর কাহাকেও জানাইলাম না। পরদিন প্রাতে ৭৷৷৹টার সময় চার্চে গেলাম। সেখানে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের ছেলেরা উপাসনা করিতেছিল, একটি বাঙালীর ছেলেও ছিল না। ৮টার সময় ভজনকার্যের অবসানের পর সেই ছেলেগুলি আমাকে নানারূপ উৎপাত করিতে লাগিল; কেহ আসিয়া কানের কাছে শিস দিতে লাগিল, কেহ আমার কোঁচা ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ বিকট মুখভঙ্গী করিয়া আমাকে ভেংচাইতে

লাগিল, কেহ বা লাফ দিয়া আমার গায়ের কাছে আসিয়া ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহারা মারধর করিবার উপক্রম করিবে এমন সময় আমি বলিলাম, 'আমি আলিয়েট সাহেবকে বলিয়া তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়াইব' এই কথা বলিতে না বলিতে দেখি আলিয়েট সাহেব উপস্থিত, তাঁহাকে দেখিয়া ছোঁড়াগুলি কেঁচো হইয়া গেল। তিনি আমাকে লইয়া গিয়া লর্ড বিশপের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং চিনাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

লর্ড বিশপ আমার সঙ্গে এক ঘণ্টা আলাপ করিলেন। দেখিলাম লোকটি অতি ভদ্র ও বুদ্ধিমান, তিনি বলিলেন 'স্মিথ সাহেবের নিকট তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছি, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তুমি যে সকল পত্র লিখ তাহা খুবই ভাল; অবশ্য আলিয়েট সাহেব বলিয়াছেন, তুমি দীক্ষা লওয়ার জন্য সম্ভবত প্রস্তুত আছ। আমরা এ সকল বিষয়ে সর্বদা তোমাকে খুব আন্তরিক সহায়তা দিব কিন্তু এই কার্যে লওয়াইবার জন্য কোন জোর করিব না।' আমি বলিলাম—'আলিয়েট সাহেব আমাকে খুব যত্নপূর্বক পড়াইয়াছেন। হয়ত আমার ব্যবহার এমন হইয়াছে, যে তিনি সহজেই ভাবিতে পারিতেন যে আমি দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু আমি সত্যসত্যই প্রস্তুত হই নাই। আমি এখনও বালক, এত বড় একটা ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার মত চিন্তার বিকাশ আমার হয় নাই।'

এইরূপে নানা কথা বলিয়া বিদায় লইলাম, বোধ হইল লর্ড বিশপ আমার কথাবার্তায় প্রীত হইলেন। ইহাতে বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইলাম।

এই ঘটনাটি বাড়াইয়া কলিকাতার শ্রীনাথ সেন নামক একজন স্বর্ণবণিক-কুলজাত মারচেন্ট্, যিনি বেশ শিক্ষিত ও প্রাচীনবয়স্ক ছিলেন এবং ঢাকায় একটা বড় রকমের দোকান খুলিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্নবাবুকে বলিলেন। তিনি এইভাবে ঘোষ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, বলিব কি? একটি বেশ মনস্বী বাঙালী ছেলে খ্রীষ্টান হইতে চলিয়াছে।' কালীপ্রসন্নবাবু উত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'ছেলেটিকে আমার নিকট একবার পাঠিয়ে দেবেন তো।' শ্রীনাথ সেন মহাশয় আমাকে ধরিয়া বসিলেন—'চল, তোমাকে কালীপ্রসন্নবাবু দেখা করিতে বলিয়াছেন।'

ইহার পূর্বেই আমি কালীপ্রসন্নবাবুর 'বান্ধবের' রীতিমত পাঠক ছিলাম। তাঁহার 'প্রভাত চিন্তা' 'নিভৃত চিন্তা' ভাল করিয়া পড়িয়াছিলাম এবং তাঁহার লর্ড রিপনকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে সেই শ্রুতির অমৃত, ভাষার অপূর্ব বিলাস, ওজস্বিনী বক্তৃতাটি শুনিয়াছিলাম। এত বড় লোকের কাছে যাইতে ভয় হইল এবং একটা গৌরবও বোধ করিলাম।

তিনি আমাকে বলিলেন, 'সত্যি, তুমি এতটুকু ছেলে, হিন্দু ধর্ম ছাড়িবে? যে ধর্ম তপস্যালব্ধ—'

আমি বাধা দিয়া বলিলাম 'আপনি ভুল শুনিয়াছেন, আমি হিন্দুই আছি, হিন্দুই থাকিব, কয়েকটা দিন বাইবেল পড়িয়াছিলাম।'

তাঁহার সেই রক্তিম অধরের অন্তরালে সুশ্রেণীবদ্ধ দন্তপঙক্তি হাসির ছটায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'সে ভাল, বাইবেল পড়িবে তাহাতে দোষ কি? অধ্যয়নই চিরজীবনের ব্রত হওয়া দরকার। কেহ বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, কেহ বা

গণিত পাঠ করেন, কিন্তু সকলেই আনন্দের উৎসের সমভাবে সন্ধান পান।'

আমি বলিলাম 'এইটি আমাকে বুঝাইয়া দিন। আমাদের ক্লাসে পূর্ণ রাউত সারাটি দিন গণিত লইয়া ব্যস্ত, সে কি আমি 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্য পড়িয়া যে আনন্দ পাই, তেমনই আনন্দ পায়? লগারিথ্‌ম কি তাহাকে সেই আনন্দ দিতে পারে, যাহা মিলটনের কবিত্বে পাওয়া যায়? নিউটন কি সেই আনন্দ পাইয়াছিলেন যাহা বাল্মীকি বা কালিদাস আস্বাদ করিয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন?'

তাঁহার সে ওজস্বিনী ভাষার পুনরাবৃত্তি করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইব না। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম এই: 'যে বিষয়ে যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহারা কল্পনাবলে একটা আনন্দের রাজ্যে আরোহণ করেন। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—প্রত্যেকেরই সে রাজ্যে তুল্যাধিকার। মনে করিয়া দেখ যেদিন নিউটন একটা আপেলকে গাছ হইতে পড়িতে দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় একটা বিশ্বব্যাপী সূত্র আবিষ্কার করিলেন সেদিন তাঁহার মনের কি ভাব! সেই ছোট ফলটিকে যে শক্তি মাটিতে টানিয়া আনিল, সেই শক্তি মেঘলোক হইতে বৃষ্টিকে ধরাতলে লইয়া আসে, পর্বতের শৃঙ্গ ভাঙিলে সেই শক্তি তাহাকে ঝুঁটি ধরিয়া ধরণীগহ্বরে ফেলে, সর্বত্র সেই মহাশক্তি দশদিক ব্যাপিয়া দুর্জয়ভাবে ক্রীড়াশীল। ক্ষুদ্র একটা জলবিন্দুর উপর যেরূপ সমস্ত বিশ্বের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন তথ্যটির উপর সেইরূপ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের মূল-শক্তির ইঙ্গিত। সেদিন নিউটন যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, যোগী-ঋষির ব্রহ্মানন্দের তাহা প্রায় কাছাকাছি।' আমি তাঁহার উদ্দীপনাময় ভাষা ও চোখের দীপ্তির একটা স্মৃতি লইয়া বাড়ীতে ফিরিলাম।

আমি আর বাইবেল পড়িতে যাই নাই। কিন্তু ইহার ছয় সাত মাস পরে একদিন পটুয়াটুলিতে ঢাকার বড় পোস্টাফিসে উপুড় হইয়া একখানি পত্র ডাকবাক্সে ফেলিবার সময় একটা ঠাণ্ডা সরীসৃপের স্পর্শের ন্যায় স্পর্শ অনুভব করিলাম, তখন শীতকাল। চমৎকৃত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, আমার পশ্চাতে দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণদেহ আলিয়েট সাহেব আমার কাঁধে তাঁহার অকোমল ঠাণ্ডা হাতখানি রাখিয়াছেন। চারি চক্ষের মিলন হইলে তিনি রূঢ় ভাষায় বলিলেন 'Naughty boy, the Oxford Mission has taken a very bad notice of your conduct' 'দুষ্ট ছেলে, তোমার ব্যবহারে অক্সফোর্ড মিশনের ধারণা তোমার উপর খারাপ হইয়াছে।'

ইহার পর আলিয়েট সাহেবের সঙ্গে আমার জীবনে আর দেখা হয় নাই। স্মিথ সাহেব মরিয়া যাওয়াতে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমার সমস্ত কারবার চুকিয়া গেল।

১৩

পরীক্ষা-সমস্যা

আমার গণিতের প্রতি চিরবিমুখতার দরুন এল. এ. পরীক্ষা যে কোন কালেই পাশ করিতে পারিব কেহই তাহা বিশ্বাস করিতেন না। সমস্ত পাঠ্যপুস্তকের প্রতিই আমি নিতান্ত নিশ্চেষ্ট উদাসীনতা দেখাইয়াছি। বুথ সাহেবের (গণিতের অধ্যাপক) ঘণ্টায় আমি ও ইয়াসিনউদ্দিন গ্যালারীর সর্বোচ্চমঞ্চে বসিয়া ছবি আঁকিয়াছি। ইংরাজীর অধ্যাপক এস. সি. হিল সাহেব আমায় বড় ভালবাসিতেন, আমি ক্লাসে সর্বাপেক্ষা ছোট ছিলাম, তিনি আমাকে কত রকমের রহস্য করিতেন। আমাদের অধ্যাপক সারদারঞ্জন সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গবর্নমেণ্টের কাজ ছাড়িয়া দিয়া মেট্রোপলিটনের অধ্যাপক হইলেন। কলেজিয়েট স্কুলের প্রসন্ন পণ্ডিত কলেজের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইয়া রঘুবংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় পড়াইতে লাগিলেন। একদিন ক্লাসে গোলমাল করাতে তিনি আমার কান মলিয়া বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিয়া গর্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'কলেজে পড়ছিস্ বলে ভেবেছিস্ আমার মারধরের হাত এড়িয়েছিস্! এর পরে একখানি ভাল বেত নিয়ে আস্‌ব।' ফাস্ট ইয়ারের কোন ছেলেকে এখন এইরূপ ব্যবহার করিলে সেটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড হইত। আমি ক্লাসে খুব ছোট থাকাতে আমার এইরূপ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইত। আমাদের সংস্কৃতের সিনিয়র অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, লজিকের অধ্যাপক মিঃ পি. কে. রায় অতিশয় দয়ালু ছিলেন—ইঁহারা ক্লাসের ছেলেদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেন না।

পরীক্ষা নিকটে আসিল। আমি আমার চিরন্তন রীতি অনুসরণ করিয়া পরীক্ষার ঠিক একমাস পূর্বে পাঠ্যপুস্তক হাতে লইলাম। দুই-চারি দিনের মধ্যে ইংরাজী পড়িয়া ফেলিলাম। কারণ ইংরাজীতে আমি শেক্সপীয়র, শেলী, বাইরন, টেনের ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি বড় বড় বই পড়িয়া ফেলিয়াছি; এল. এ. পরীক্ষার পাঠ্য আয়ত্ত করিতে সময় লাগিল না। ট্রিগোনোমেট্রি ও গণিতের অন্যান্য পুস্তকের কতক অংশ কপাল-ঠোকা ভাবে মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম। সেই সকল জায়গা হইতে প্রশ্ন আসিলে পারিব, না হইলে নয়। গ্যানোর ফিজিক্স ভারী বই, উহা আমার ছিল না, ইতিপূর্বে উহার আকারটা দেখিয়াছিলাম মাত্র, কোনদিন পাতা উল্‌টাই নাই। উহাতে ১০০ নম্বর ছিল, ১৫-এর নীচে পাইলে নম্বর গোণা হইত না, পাশ সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।

ইংরাজীর পরীক্ষা হইয়া গেল; গণিতের পরীক্ষা দিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম—পাশের নম্বর থাকিবে। কিন্তু গ্যানোর ফিজিক্সের ১৫ নম্বর না থাকিলে পাশ হওয়া যায় না। তখন প্রত্যুষে পরীক্ষা হইত। গণিতের পরীক্ষা শেষ হইলে আমি বেলা ১০টার সময় বাড়ী আসিয়া আহার সমাধা করিলাম, পরদিন ৬৷৷টায় পরীক্ষা। শুধু নাম শুনিয়াছি—তখনও চোখে দেখি নাই—গ্যানোর সঙ্গে প্রায় এবম্বিধ পরিচয়। ১০টার পর মহেন্দ্রলাল রায়দের মেসে গেলাম, সে ফাস্ট ইয়ারের ভাল ছাত্র। আমি তাহাকে বলিলাম, 'তোরা গ্যানোর কতদূর পড়িয়াছিস?' সে বলিল 'অর্ধেকটা'।

গ্যানোর দুই পেপার। পুরো বইতে ১০০ নম্বর, এবং এক একটা পেপারে ৫০। আমি মহেন্দ্রকে বলিলাম 'তুই চল্, আমার সঙ্গে তোর গ্যানো নিয়ে।' মহেন্দ্র গ্যানো লইয়া আমাদের বাসায় আসিল—সে ঐ বই ভাল করিয়া পড়িয়াছিল, উহার প্রায় তিন শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রথমার্ধ, দ্বিতীয়ার্ধও তদ্রূপ। সে পড়িয়া যাইতে লাগিল, এবং যেখানে আমার খট্‌কা লাগিল তাহা বুঝাইয়া বলিল। অধিকাংশ যন্ত্রাদির কথা। আমি নিজে নিজে চেষ্টা করিলে যেটি বুঝিতে দুই ঘণ্টা লাগিত, তাহা তাহার সাহায্যে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম। এইভাবে বেলা বারোটা হইতে রাত্রি নয়টার মধ্যে প্রথমার্ধ পড়া শেষ হইল। তারপর সে বিদায় লইল। আমি নয়টা হইতে দুইটার মধ্যে সেই অংশ আবার নিজে পড়িয়া ফেলিলাম। তারপর ২টা হইতে ৪টার মধ্যে আর একবার পড়া হইল এবং ছয়টার সময় কলম ও ছুরি লইয়া পরীক্ষা দিতে গেলাম। প্রশ্ন পড়িয়া দেখিলাম, সকলটিই জানি, খুব আনন্দের সহিত উত্তর করিলাম। বাসায় আসিয়া দেখি প্রায় সব উত্তরই ভুল হইয়াছে। অর্থাৎ যন্ত্রগুলির ভারী গোলমাল করিয়া বসিয়াছি। হাইড্রলিক প্রেসের বৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া অপর কোন এক যন্ত্রের কথা লিখিয়াছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে নামগুলি ঠিক মনে রাখিতে পারি নাই। হিসাব করিয়া দেখিলাম, ৫০-এর মধ্যে ১২ পাইব, আর সকলই ভুল হইয়াছে। তখন ভাবিলাম, যদি আর একটি দিন হাতে পাইতাম, তবে হয়ত ৫০-এর মধ্যে ৫০ই পাইতাম। কারণ বুঝিবার বা শিখিবার কিছু বাকী ছিল না।

সেদিন শনিবার, ভাবিলাম যাহা হউক এক পেপারে ১২ পাইব, আর এক পেপারে ৩ পাইলেই তো ১৫ হইবে, তাহা হইলে তো নম্বর গণনার মধ্যে থাকিবে। সেদিন শনিবার, অর্ধদিবস পাইলাম, শনিবারের রাত্রি, পুরো রবিবারটা ও রবিবারের রাত্রিটা। এতটা সময়ে কি ৫০-এর মধ্যে ৩ পাইবার উপযুক্ত পাঠ প্রস্তুত করিতে পারিব না? পূর্বের পরীক্ষায় তো আধ্ দিনে ও একটা রাত্রের পরিশ্রমের ফলে ৫০-এর মধ্যে ১২ পাইয়াছি।' অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া ১১টার সময় ঘুমাইয়া পড়িলাম। একটার সময় ঘুম ভাঙিলে মহেন্দ্রের গ্যানোখানি লইয়া বসিয়া গেলাম। কিন্তু এক বিপদ, সেদিন বুঝাইয়া দিবার কোন লোক ছিল না। মহেন্দ্র প্রভৃতি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা শুধু অর্ধেক বই পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় বার্ষিকের ছাত্রেরা পরীক্ষায় ব্যস্ত, তৃতীয় বার্ষিকের লোকেরা গ্যানো পড়েন নাই।

সুতরাং পুস্তক একাই পড়িয়া বুঝিতে হইবে, দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই চক্ষুর বিবরণ, কিরূপে চক্ষুতে দৃষ্টি সঞ্চার হয়, কোন্ স্নায়ু ও উপস্নায়ু যোগে চোখের পর্দায় কিভাবে দৃষ্টি জন্মিয়া থাকে—এই সকল কথা। আমি তিন ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও তিন পাতা বুঝিতে পারিলাম না। ভয়ে শরীরে ঘাম বাহির হইতে লাগিল। পূর্বদিনের যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্যম ছিল, তাহা কোথায় চলিয়া গেল। যতই বুঝিতে চেষ্টা করি ততই যেন সব আরও বেশী গুলাইয়া যাইতে লাগিল। প্রায় সারা রাত্রি চেষ্টা করিয়া বিফল হইলাম। উদ্যম-হীন দেহ, নিষ্প্রভ চক্ষু লইয়া যেন চারিদিকে আঁধার দেখিতে লাগিলাম। যদি গণিতে ফেল হইতাম, তবে আক্ষেপ থাকিত না। গ্যানোর প্রথমার্ধে যদি কিছ না পাইতাম তথাপি আক্ষেপ থাকিত না, কিন্তু শুধু তিন নম্বরের জন্য সমস্ত মাটি হইল, এই জন্য বড়ই আক্ষেপ হইল।

আমি হতাশ ভাবে অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন বেলা দশটার সময় ঘুম ভাঙিল। কোনো মতে কিছু উদরস্থ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এবার দৈবের উপর নির্ভর করিব। প্রায় তিন শত পৃষ্ঠার মধ্যে, প্রথম বিষয়টা চক্ষু-সম্বন্ধীয় ১০-১২ পৃষ্ঠা। স্থির করিলাম, এই ১০-১২ পৃষ্ঠা একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিব। ইহা হইতে কোন প্রশ্ন আসিলে পারিব, না হয় ফেল হইব। একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়। সুতরাং প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা পড়িয়া সেই ১০-১২ পাতা একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম। পরদিন প্রাতে সেই মুখস্থ জিনিসটাকে পুনরায় আবৃত্তি করিয়া লইয়া পরীক্ষা-গৃহে গেলাম। প্রশ্ন হাতে লইয়া দেখিলাম, প্রথম প্রশ্নটি সেই অধ্যায় হইতেই আসিয়াছে এবং তাহার নম্বর পাঁচ। আর আমার পাশ ঠেকায় কে? এখানে বলা প্রয়োজন, তখনকার দিনে পাশ করাটা খুব সোজা ছিল না। পরীক্ষকেরা ছাত্রদের ঘায়েল করিবার জন্যই যেন অস্ত্র শানাইয়া বসিয়া থাকিতেন।

১৪

সাহিত্যিক বন্ধুগণ, বিপদ ও গৃহত্যাগ

এইভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে এল. এ. পরীক্ষা পাশ করিয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। আর কিছু না হইলেও আমি ইংরাজী সাহিত্যে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিলাম। তখন ইংরাজীতে যাহারা এম. এ. পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেক সময়ে আমার সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্য-বিচারে আমাকে পরাভূত করিতে পারিতেন না।

তখন ইংরাজী সাহিত্য যে আগ্রহে পড়িয়াছিলাম, তাহা কতকটা অদ্ভুত রকমের বটে। একটু দূরে থাকিলে রামদয়ালের সঙ্গে চিঠি-ব্যবহার চলিত। সে সকল চিঠি এক একটা অজগরপ্রবন্ধ। তাহাতে কত যে ইংরাজীর 'ফ্রেজ' লাগাইবার চেষ্টা, কথায় কথায় বড় বড় কবিগণের লেখা হইতে ছত্র তুলিয়া বাহাদুরী নেওয়া, জীবন-মরণের কত সমস্যার সমাধান, কত প্রণয়ী-প্রণয়িনীর প্রণয়, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব থাকিত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রামদয়াল ইহার মধ্যে আবার বার্কলির থিওরির বুকনি দিত এবং 'পারমেনেন্ট গ্রুপস অব সেন্সেশনস্' ও শঙ্করের মায়াবাদ লইয়া তর্ক তুলিত। ইউবারবেগ, মিল ও স্পেন্সারের মত শুনাইয়া দিত। আমরাও তখন বি. এ.-তে ফিলসফি পড়িতাম, সুতরাং যদিও রামদয়াল তখন ফিলসফিতে এম. এ. পাশ করিয়াছিল তথাপি আমি তাহার বক্তৃতাগুলির নীরব শ্রোতা ও পাঠক হইয়া থাকিতাম না. কখনও শিলার যে কিরূপে শৈশবে গাছে চড়িয়া বিদ্যুৎ আকাশের কোন্ ছিদ্র দিয়া বাহির হয়, তাহাই আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেন সেই প্রসঙ্গ লইয়া পত্রে কবিত্বের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতাম। কখনও বা, বাইরনকে তাঁহার পত্নী কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন—সেই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাইয়া আঁধারে ঢিল ছুড়িতাম। রামদয়াল ও আমি একত্র হইয়া তখন কত যে বৈষ্ণবপদ পড়িয়াছি এবং বঙ্গীয় রমণী-রচিত সংস্কৃত মাধবীলতা সম্বন্ধীয় 'শান্তিময়ি ত্বং মাং কথয়েদম্' প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছি—তাহার লেখাজোখা নাই। কিন্তু তখন রাজনৈতিক বিষয় লইয়া ছাত্রের দল বড় মাথা ঘামাইত না। সে বিষয়টা ইংরেজ শাসকগণেরই প্রায় একচেটিয়া বিষয় ছিল।

ইহার মধ্যে দীনেশচরণ বসু মহাশয় 'ঢাকা-প্রকাশ'এর সম্পাদক হইয়া আসিলেন। যে দীনেশ বসুর 'কবিকাহিনী' শৈশবে আমাকে কবিত্বের স্বপ্নলোকে লইয়া গিয়াছে, যাঁহার 'তুই কি জানিবি সখি, মরমের বেদনা?' এবং 'কখনও রন্ধনশালে করিছ রন্ধন, দ্বিগুণ শোভিত মুখ লোহিত বিভায়' প্রভৃতি কবিতা শৈশবে রাত-দিন আওড়াইতাম, তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া অতিশয় আগ্রহে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম, ইসলামপুরে দ্বিতল বাড়ীর ছোটো একটি ঘরে চারি দিকে কাগজের স্তূপ, 'ঢাকা-প্রকাশ' আপিসে বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স তখন ৩৪, আমার বয়স ১৭।১৮—ঠিক অর্ধেক। বসু মহাশয়ের চক্ষু দুইটি বড় বড়, রংটি ফরসা, অতি মৃদু এবং অল্পভাষী। তাঁহার তেজ, বিক্রম কিছুই দেখিতে পাইলাম না—খাটো চেহারাটি। কেবল শান্ত দুইটি চোখের অলস মধুর

দৃষ্টিতে যেন করুণ কবিত্বের আভা বিকীর্ণ করিতেছিল। কানে একটু খাটো, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের মত নহে—যাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে হইলে রীতিমত ঢাক বাজাইতে হইত। কতকটা 'হিমালয়'-এর জলধরদার মত।

দীনেশ বসু মহাশয়ের সঙ্গে শীঘ্রই আমার বেশ ভাব হইয়া গেল, তিনি ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার ইংরাজী লেখার প্রণালীটিও সুন্দর, বিশুদ্ধ ছিল। আমার শত শত কবিতা তাঁহাকে পড়িতে দিয়াছিলাম এবং 'ঢাকা-প্রকাশ'-এ আমি কয়েকটি গদ্য সন্দর্ভও লিখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন 'তোমার কবিতা মাঝে মাঝে দুই একটি ভাল হয়, কিন্তু তাহা তোমার গদ্যের সঙ্গে তুলনীয় নহে—আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতেছি, তুমি গদ্য লিখিয়া যশ অর্জন করিবে।' ইহার কিছু পরে আমি সাতপৃষ্ঠাব্যাপক একখানি চিঠিতে আমার বাল্যজীবনের একটা ইতিহাস লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা পড়িয়া তিনি এত খুসী হইয়াছিলেন যে আমাকে তখনই বঙ্গীয় গদ্য লেখকদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট আসন দেওয়ার অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন বসু মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আমি ঢাকা কলেজের হস্টেল দেখিতে গিয়াছিলাম, কলেজের ছেলেরা তাঁহাকে নানারূপ মিষ্টান্ন ও ফুলের মালা প্রভৃতির দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

ঢাকায় আমি ছাত্রমহলে কবি ও সাহিত্যিক নামে ইহার মধ্যেই পরিচিত হইয়াছিলাম। তাহারা জানিত আমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করি। আমার দীর্ঘকেশ, সংসারানভিজ্ঞতা, পাঠ্যপুস্তকের প্রতি বিরাগ—সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারের উপর অশ্রদ্ধা এ সকলই তাহারা কবিত্বের লক্ষণ মনে করিত ; এমনকি আমার বড় বড় দুটি চোখ এবং ভূলুণ্ঠিত উত্তরীয় ও অনির্দিষ্ট ভাবে পথে পদচারণ ও দিবারাত্রি ভেদজ্ঞানহীন তর্কানুরাগ—এ সমস্তই নাকি তাহাদিগকে সেই কথাই বুঝাইয়াছিল। আমি যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলাম, হেম-গিরীশ ছাড়াও এখন তাহার বিস্তর বিস্ময়-বিমূঢ় ভক্ত শ্রোতা জুটিয়া গিয়াছিল।

এইখানে আমার ঢাকা-জীবনের শেষ হইবে।

ইহার পর পিতামাতা ও ভগিনীদের মৃত্যুতে আমার বুকের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গেল, সমস্ত আশা ও উদ্যমের দীপ নিবাইয়া দিয়া গেল। আমার ভগিনীপতি নব রায় মহাশয়ের বাসা ছিল ঢাকা শাঁখারী বাজারে। আমি ঝগড়া করিয়া তাঁহার বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। একদিন সেই বাড়ীর সংলগ্ন একটা মেসে আমার সহাধ্যায়ী একজনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কথাবার্তা বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিব, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, নব রায় মহাশয়ের বাড়ীর একটা খড়খড়ির পাখী খুলিয়া আমার চতুর্দশবর্ষবয়স্কা ভগিনী তাহার শান্ত সুন্দর দুইটি চোখ দিয়া সতৃষ্ণ ভাবে আমায় দেখিতেছে, তাহার নিবিড় কেশরাশি কপালের কাছে দুলিয়া দুলিয়া এক একবার মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মনে হইল একবার যাই দেখিয়া আসি, কিন্তু নব রায়ের সঙ্গে ঝগড়ার কথা মনে হওয়ায় গেলাম না। এই ঘটনার পর পাঁচ দিন পরে একদিন বেলা পাঁচটার সময় সেই বাড়ী হইতে একটা লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, আমার ভগিনী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই জ্ঞান হইতেছে না। আমি, হেম, গিরীশ ও জগদীশ দাদার সহিত গিয়া দেখিলাম, কাদম্বিনী

যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, নবযৌবনফুল্ল সুস্থ দেহ যে মৃত্যুর কবলিত তাহা তখন বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই। সন্ন্যাসরোগে সে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল।

তার পর বগজুরী গেলাম। মা কন্যার শোকে কাতর, মৃন্ময়ী মায়ের কাছে আছে, আমি সন্ধ্যার সময় রোজ মত্তগ্রামে গিয়া যাদবানন্দ দাশগুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে গল্পের আড্ডা দিতাম। জমিদার প্রসন্নকুমার সেনের নির্জন বাগান-বাড়ীতে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলাপ করিতাম। যাদবানন্দ 'ভারতী'তে লিখিতেন—তিনি সাহিত্য-প্রসঙ্গ পাইলে গল্পে মজিয়া যাইতেন। তিনি আর আমি প্রায়ই গল্প করিতে থাকিলে রাত্রি ১১টা বাজিয়া যাইত। তাঁহার বাড়ী অতি কাছে। আমি পল্লীগ্রামের সেই নিঝুম মেঠো পথ দিয়া একা চলিয়া যাইতাম। আঁধার পথ, চারিদিকে জঙ্গল, তখন আষাঢ় মাস—পথে সর্পভীতি, মা এবং আমার সেই ষোড়শবর্ষীয়া ভগিনী মৃন্ময়ী ঘুমাইতেন না, তাঁহারা পথের ধারে দাঁড়াইয়া আমি আসিতেছি কি না দেখিতেন। কতবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেটের কাছে পায়ের শব্দ পাইলে মিছির দারোয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, খোকা আসিয়াছে কি?

এই সকল বৃথা কষ্ট আমি মাকে দিয়াছি।

ইহার একমাস পরে মৃন্ময়ী ধনুষ্টংকার রোগে প্রাণত্যাগ করে, তিনদিন সে রোগে কষ্ট পাইয়াছিল। তাহার ফুল্ল পদ্মকোরকতুল্য সুন্দর বড় দুটি চোখ চিরদিনের জন্য নিমীলিত হইয়া গেল। তাহার সেই দুটি চোখের কথা মনে পড়িলে এখনও আমি আমার চোখের জল সংবরণ করিতে পারি না। হিরন্ময়ী প্রতিমা 'মৃন্ময়ী'র মূর্তি আজ ৩৫ বৎসর পরেও আমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখিতে পাই।

পিতা ওকালতী ছাড়িয়া বাড়ি আসিলেন। মা, আমি—আমরা সকলেই সুয়াপুর আসিলাম। ইহার মধ্যে বাতব্যাধি হওয়ায় আমার দক্ষিণাঙ্গ অবশ হইয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে বহুদিন বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া বাবা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং তাহার ৫ মাস পরে হাঁপানি রোগে মা-ও তাঁহার কাছে চলিয়া গেলেন। যিনি জীবন ভরিয়া বাবার সঙ্গে কলহ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি যেরূপ শোকাকুলা হইয়াছিলেন, সেরূপ শোক সচরাচর দেখা যায় না। স্বামী-শোক তিনি দীর্ঘকাল সহিতে পারিলেন না।

ফাল্গুন মাসে আমাদের বাড়ী খালি হইয়া পড়িল, বসন্তের হাওয়ায় আমার নষ্টস্বাস্থ্যের উদ্ধার হইয়াছিল। আমার দক্ষিণাঙ্গ সবল হইয়াছিল। সাভারের বিখ্যাত গুরুচরণ কবিরাজ আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

বাড়ীতে দিদি দিগম্বসনী ও স্ত্রী রহিলেন। আমি বগজুরী মাতুলালয়ে চলিয়া আসিলাম। সেই সময় জীবনে কি অসামান্য দুঃখই না পাইয়াছিলাম। সারা রাত্রি কাঁদিয়া চক্ষু দুটি জবাফুলের মত করিয়া ফেলিতাম, কখনও কবিতা কখনও গদ্য লিখিতে থাকিতাম. চোখের জলে কাগজ ভাসিয়া যাইত। কখনও কাগজকলম ছুড়িয়া ফেলিয়া আত্মহত্যার জন্য দাড়ি খুঁজিতাম। পূজার সময় আসরের আনন্দ আমার নিরানন্দই বেশী জাগাইত. ঢাকঢোলের বাদ্য অপেক্ষা সদ্য বলি দেওয়ার জন্য যূপকাষ্ঠে বদ্ধ ছাগশিশুর তীব্র আর্তনাদ আমার মর্মবেদনার অনুকূল হইত। আমি একা—এক বিছানায় শুইয়া সেই বলির পাঁঠার সুরের সঙ্গে সুর মিশাইয়া

মা বলিয়া কাঁদিতাম। একদিন 'প্রভাস' যাত্রা হইতেছিল, যশোদা কোনরূপে দ্বারীদের নিকট প্রবেশপথ পাইলেন না। কৃষ্ণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার হাত হইতে স্রুক্ পড়িয়া গেল, তাঁহার যশোদার আঙিনার কথা মনে পড়িল, অমনই বলাই দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গাহিলেন 'দাদা বল বল, আমার দুঃখিনী মা কোথায় গেল'। তখন মা-যশোদা দ্বারীর নিষ্ঠুরতায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সুরে আমার সমস্ত শরীর যেন কাঁপিয়া উঠিল, আমি কাঁদিয়া আসর ত্যাগ করিলাম এবং সে রাত্রির মধ্যে চোখের জল একবারও শুকাইল না। মায়ের একমাত্র ছেলে যাহারা তাহারা মাতৃহারা হইলে মায়ের অভাব এমনই করিয়া বুঝিয়া থাকে।

পড়াশুনা ত্যাগ হইল। বাড়ীতে যে দুইটি প্রাণী ছিলেন এবং আমাদের বহুকালের প্রজা ও পরিচারিকা কর্পূরা দিদি—ইহাদের ভরণ-পোষণের ভার আমার উপর। আমি ঢাকা হইতে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জে চলিয়া আসিলাম, আমার মাতুল এত বড়লোক, আমার অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখ করিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে একটি লোক দিলেন না। আমি ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৮৭ সনে হবিগঞ্জে রওনা হইলাম। তখনও আমি খুব গোঁড়া হিন্দু—জাহাজে কিছু খাইলাম না। সারাদিন উপবাস করিয়া জাহাজে নীরবে মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, কে-ই বা মাতৃহারা বালকের খোঁজ রাখে! আমার অশ্রুর সাক্ষী শীতলাক্ষ ও ব্রহ্মপুত্র এবং আশ্বিনের সেই শারদীয় আকাশ, যাহা দিয়া হু হু শব্দে বায়ু বহিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যাকালে লালুয়ার টেক নামে এক জায়গায় জাহাজ হইতে নামিলাম। একখানি নৌকা আমার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাহাতে উঠিয়া বিল পাড়ি দিতে লাগিলাম ও মাঝিদের উনুন গোময় দ্বারা শুদ্ধ করিয়া হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া দুটি আলুভাতে দিলাম। সেই বিলে দুরন্ত হাওয়া—তাহারা ৪৯ ভাই, দুরন্ত শিশুর ন্যায় ছুটা-ছুটি করিতেছিল, তাহারা আমার উনুনের আগুন ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিতেছিল। দুই ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া যাহা নামাইলাম, তাহা শুধুই চাল ও ধোয়া আলু—একটুও সিদ্ধ হয় নাই। তখন একদিন যে মাতার রান্না সদ্য-ধরা ইলিশের ঝোল ও মাছ-ভাজা এবং গোপালভোগ চালের ভাত—যাহা ঝরা শিউলি ফুলের মত দেখাইতেছিল—নৌকায় তাহা উপেক্ষা করিয়া যে তাঁহার প্রাণে ব্যথা দিয়াছিলাম তাহা মনে পড়িয়া ঝরঝর করিয়া চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। ভাত ও আলু ফেলিয়া দিলাম। শুধু চাল কেমন করিয়া খাইব ! মুখ ধুইয়া মাঝিদের দেওয়া একখণ্ড সুপারি চিবাইতে লাগিলাম ও একহাতে চোখের জল মুছিতে লাগিলাম—যেন মাঝিরা টের না পায়।

১৫

হবিগঞ্জ

তখনও স্কুল বন্ধ হয় নাই, আমি ৪০ টাকা বেতনে হবিগঞ্জ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। হেডমাস্টার ফণিভূষণ সেন বি. এ. (এখন ইনি মিনিস্টার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ছেলেদিগকে পড়াইতেছেন) আমার সম্পর্কে মামাতো ভাই, দ্বিতীয় শিক্ষক শ্যামচাঁদ বসাক বি. এ. আমার সহাধ্যায়ী ; ইনি গৌহাটী অঞ্চলে অনেক দিন রাজকীয় উচ্চ কাজ করিয়া এখন পেন্‌সন লইয়া ঢাকায় আছেন। আমি ফণীবাবুর বাসায়ই আশ্রয় লইলাম।

ফণীবাবুর পিতা হরিদাস সেন মহাশয় (আমার মাতুল) রোজ সন্ধ্যাকালে বাড়ীর ভিতর আসর জমকাইয়া বসিয়া কত গল্প করিতেন। তিনি রূপকথার রাজা ছিলেন, কত 'বেজান' শহরের কথা, রাজকুমার ও রাজকন্যার, পরী ও দৈত্যের কথা তিনি হাত নাড়িয়া বলিয়া যাইতেন। দাদা, ছোট ভাই বিধু, বউদিদি ও আমি তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। খোয়াই বা ক্ষেমঙ্করী নদীর পাড়ে ছিল আমাদের বাসা, নদীটি পর্বতদুহিতা, ছোট হইলেও দুর্জয় শক্তিময়ী, আমরা তাহার স্রোতে এক মুহূর্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতাম না। আমরা রোজই শুনিতাম, আঁধারে গা ঢাকা দিয়া কে একজন নৌকা বাহিয়া যাইত—তাহার পুঁজি একটিমাত্র গান ছিল—'মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারি না।' কি মিষ্টি সুর! যেন ১৪।১৫ বৎসরের কোনো কিশোরীকণ্ঠ হইতে সেই অমৃতসঙ্গীত ধ্বনিত হইত। গানটি বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া আমাদের বাসার কাছ দিয়া দূর-দূরান্তরে চলিয়া যাইত। আমরা মনে ভাবিতাম, গায়ক কেমন সুন্দর ; কেহ বলিতেন, 'ও কোন ১৬।১৭ বয়সের বামুনের ছেলে, বর্ণ তপ্ত সোনার ন্যায়' কেহ বলিতেন, 'ছেলেটি নিশ্চয়ই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—ঠিক কৃষ্ণঠাকুরের মত'। তাহার সেই সন্ধ্যার অভিসারকে প্রেমবৈরাগ্য কল্পনা করিয়া আমরা তাহার সম্বন্ধে কত তর্কবিতর্ক ও জটলা করিয়াছি। একদিন হাটের বার, আপিস-ইস্কুল ছুটি, হঠাৎ বেলা দ্বিপ্রহরে আমাদের বাড়ীর কাছে শুনিলাম 'মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে'—সেই চির পরিচিত মিষ্ট সুর—রোজ যাহা সন্ধ্যায় শুনিতাম। বউদিদি, দাদা, বিধু, এমনকি হুঁকা হাতে করিয়া মামা পর্যন্ত হুড়মুড় করিয়া আমরা খোয়াই নদীর পাড়ে গায়ককে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিলাম, গায়ক আমাদের কাছ দিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল, দেখিলাম সে জরাজীর্ণ কৃষ্ণকায় একটি বৃদ্ধ, একটি কাঁথা গায়ে দিয়া গান করিতে করিতে বৈঠা বাহিয়া চলিয়াছে। আমরা এইরূপ সকল বিষয় লইয়া হবিগঞ্জে আমোদে থাকিতাম।

দাদা মাহিয়ানা পাইতেন ৮০ টাকা। মামার ছিল খুব খরচের হাত ; তিনি দশ-পনের দিনের মধ্যে সমস্ত খরচ করিয়া ফেলিতেন। দাদা মামাকে খুব ভয় করিতেন, কিন্তু এইরূপ অতিরিক্ত খরচের জন্য আমার কাছে প্রায়ই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।

একদিনের কথা মনে আছে, দাদা সেই দিন মাহিয়ানা পাইয়া টাকা মামার হাতে দিয়াছেন। মামা বৈকালে 'ফুকাই' চাকরকে সঙ্গে করিয়া বাজারে গেলেন। সন্ধ্যার পর দেখিলাম, ফুকাই-এর মাথায় একটা গন্ধমাদন-প্রতিম বোঝা চাপাইয়া মামা হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন; তিনি উঠানে বোঝা নামাইবার আদেশ দিয়া দাদাকে বলিলেন, 'দেখ এই চিতল মাছটা, তুমি ইহার পেটিটা ভালবাস, শস্তায় পাইয়াছি, মাত্র ২ টাকা হইয়াছে। আর একটা ডেগ আনিয়াছি ৭৷৷৹ টাকা, বউমা মেটে হাঁড়িতে রান্না করিতে কষ্ট পান'। মামার সাগ্রহ বর্ণনায় বাধা দিয়া দাদা বলিলেন 'একদিনেই যদি এত খরচা করিয়া ফেলিলেন, মাসের বাকিটা কি করিয়া চলিবে?' এই কথায় মামার সমস্ত আগ্রহ জুড়াইয়া গেল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ফুকাই-এর দ্বারা এক ছিলিম তামাক সাজাইয়া দাওয়ায় বসিয়া টানিতে লাগিলেন।

রান্না হওয়ার পর খাবার ডাক পড়িল। মামা বলিলেন, 'ক্ষুধা নাই'। বউদিদি যাইয়া মামাকে ডাকিতে লাগিলেন, একই উত্তর 'ক্ষুধা নাই'। মামী যাইয়া পীড়াপীড়ি করিলেন, বিধু যাইয়া বলিল, 'বাবা, আসুন, খাই গিয়ে'। কিন্তু তাঁহার সেই একই উত্তর। দাদা তখন বলিলেন, 'সংসারে ধারকর্জ হইলে শেষে মুশকিল হইবে, এজন্য কি-একটা কথা বলিয়াছি যে, তাহার জন্য এমন করিতেছেন? আমায় না হয় মাফ করুন।' কিন্তু মামা কপট সারল্য দেখাইয়া বলিলেন, 'না সত্যিই বলছি আমার ক্ষুধা নাই'—এই বলিয়া কৃত্রিম ঢেকুর তুলিয়া বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে লাগিলেন; ফুকাই ক্রমাগত তামাক জোগাইতে লাগিল এবং তিনি ক্রমাগত সেইভাবে গুড়ুক টানিতে লাগিলেন। আমাকে মামা বড়ই ভালবাসিতেন, সবাই তাঁহাকে সাধিল, কিন্তু আমি সাধি নাই। যখন সকলে হতাশ হইয়া বলিলেন, 'কি হইবে? উনি যখন খাইবেন না, চল আমরা যাইয়া খাই, এবং আমার ডাক পড়িল, তখন আমি বলিলাম, 'মামা খাইবেন না?' উত্তরে শুনিলাম তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। তখন আমি বলিলাম, 'আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না'। আমাকে জনে জনে আসিয়া সাধিতে লাগিলেন, আমি সেই একই উত্তর দিলাম। তখন দেখি মামা স্বয়ং হুঁকা হাতে আসিয়া আমায় বলিলেন, 'সে কি কথা, এমন সুন্দর চিতল মাছটা আনিয়াছি, তুমি খাইবে না?' আমি বলিলাম, 'আপনি না খাইলে আমি খাইব না।' অনেক কথা কাটাকাটির পর আমার জয় হইল। তিনি খাইলেন। খাওয়ার পর ফুকাই-এর হাতের তৈয়ারী আর-একবার গুড়ুক টানিয়া বেজায় স্ফূর্তির সহিত বলিলেন, 'একটা শহর, তার মানুষ পাথর, গাছ-পাতা পাথর, গরু-ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তু পাথর, পাখী পাথর, পিঁজরায় দেওয়া জল ও চাল সকলই পাথর, সেই শহরের নাম 'বেজান শহর'...'ইত্যাদি।

এইরূপ নানা ভাবের তরঙ্গে দিন কাটিয়া যাইত। রাত্রি হইলে কবিতা লিখিতাম, ইংরাজী বই পড়িতাম; রাত্রি যতই নিঝুম হইত, ততই মায়ের জন্য, বাবার জন্য প্রাণটা ছটফট করিয়া উঠিত, চক্ষে অবিরলধারে জল পড়িত। দাদাকে যখন মামী 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন, তখন আমায় যিনি ঐরূপ ভাবে ডাকিতেন, তাঁহার কথা মনে করিয়া কষ্টে অশ্রুজল সংবরণ করিতাম। কতদিন গভীর রাত্রে উঠিয়া খোয়াই নদীর পাড়ে পদচারণা করিতে থাকিতাম, এবং একবার মনে করিতাম, 'এই তেজস্বিনী

নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ি, ইনি মাতৃহারা বালককে আশ্রয় দিবেন।' ঢাকায় থাকিতেই গোঁড়ামি ছাড়িয়া কয়েক দিন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়াছিলাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'যোগ যোগ যাহা শুনি, উহাই কি ভগবানকে পাইবার উপায়?' গোস্বামী মহাশয় তখন অনেকটা হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—'যোগ সাংসারিক বিষয় লইয়াও হইতে পারে—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এইরূপ একটা প্রশ্ন বশিষ্ঠকে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ উত্তর না দিয়া বলিলেন—মহারাজ, ঐ যে অদূরে বৃহৎ গাছটি আছে, উহা মূল সুদ্ধ তুলিয়া ফেলিতে আদেশ করুন, কিন্তু সাবধানে কোদাল চালাইতে হইবে, উহার নীচে একটা মানুষ আছে, তাহার গায়ে যেন আঘাত না লাগে। সেইভাবে গাছটি উৎপাটন করিয়া সত্যসত্যই তাহার অনেকটা নীচে একটা জড়বৎ অজ্ঞান মানুষ বাহির হইল। বশিষ্ঠ যাইয়া নিজের হাত সেই লোকটার মুখের ভিতর দিয়া জিভটাকে টানিয়া সোজা করিয়া দিলেন, সে লোকটা জ্ঞান পাইল ও লাফাইয়া উঠিয়া রামচন্দ্রের কাছে যাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'মহারাজ, বকশিশ দিন'। রামচন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বশিষ্ঠ বলিলেন—'এই লোকটা যোগ অভ্যাস করিয়া কুম্ভক করিতে শিখিয়াছিল—শুধু অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে। এ ব্যক্তি কুম্ভক করিয়া অনেকটা ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিত এবং নীচে নামিয়া পড়িলে দলের লোকেরা জিভ টানিয়া সোজা করিয়া দিলেই আবার জ্ঞান লাভ করিত। এই অবস্থায় একদিন লোকটি ঊর্ধ্বদেশ হইতে এক জলাশয়ে পড়িয়া যায়—সঙ্গীরা ইহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া চলিয়া যায়। তারপর বহু যুগ চলিয়া গিয়াছে, জলাশয়ের জল শুকাইয়া তাহার উপর এই প্রকাণ্ড বৃক্ষটি হইয়াছিল, নিঃশ্বাস রোধ করিয়া জিভ ব্রহ্মতালুতে ঠেকাইয়া থাকাতে উহার দেহ অবিনশ্বর হইয়াছিল। এখন আমি উহার জ্ঞান দিয়াছি। এ ব্যক্তি মনে করিতেছে, আপনি সেই রাজা, যাঁহার নিকট আকাশে উঠিয়া তামাশা দেখাইয়াছিল—এজন্য বকশিশ চাহিতেছে, তারপর যে কত যুগ চলিয়া গিয়াছে তাহা উহার জ্ঞান নাই।'

এই বলিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, 'যোগ তাঁহাকে পাইবার পথও হইতে পারে; সাংসারিক সুখভোগ, ঐশ্বর্যলাভ প্রভৃতির উপায়ও হইতে পারে—উহা কতকটা শক্তিলাভ মাত্র, অভ্যাস দ্বারা উপার্জন করা যায়—ব্রহ্ম লাভের সঙ্গে উহার অপরিহার্য সাহচর্য নাই।'

ইহার পর ঢাকায় রামকুমার বিদ্যারত্ন আসিলেন, ইনি একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ছিলেন। ইঁহার মূর্তি একবার 'সাহিত্যে' বাহির হইয়াছিল। এত বড় লম্বা দাড়ি খুব কমই দেখা যায়। বিদ্যারত্ন মহাশয় ছাত্রদের জন্য একটা 'সঙ্গত' সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, আমাদের তাঁহার কাছে রোজ কি করি তাহা লিখিয়া দেখাইতে হইত। কি কি পাপ চিন্তা করি, কি কি কাজ করি, সকলই লিখিতে হইত। এই নির্লজ্জতা আমি পছন্দ করি নাই। সুতরাং কতক দিন মাত্র তথায় যাইয়া আমি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিয়া দিয়াছিলাম।

খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকলের সঙ্গে মিশিয়া দেখিলাম, শান্তি তো কোথাও পাওয়া গেল না। হবিগঞ্জে বসিয়া অনেক সময় একটা শান্তির স্থল খুঁজিতে থাকিতাম। কোথায় কে আছে, আমার মা যেমন ছিলেন, বাবা যেমন ছিলেন, এমন

কি কেউ নাই? যিনি ইঁহাদিগকে দিয়াছিলেন, তিনি কি আমায় ছাড়িয়া দিলেন? এত আদর দেখাইয়া হঠাৎ আমাকে পথের ছেলের মত অনাথ করিয়া ফেলিলেন?

তার পরের বছর পূজায় বাড়ী আসিলাম, একজন বলিলেন, 'ওরে বি. এ. পরীক্ষাটা দিলি না?' আমি বলিলাম 'দেব', প্রশ্নকারী অবজ্ঞার ভাবে বলিলেন 'আর দিয়াছিস্!' সেই অবজ্ঞা আমার মনে বড়ই লাগিল। আমি সেই দিনই থ্যাকার স্পিংকের বাড়ীতে অর্ডার দিলাম। বই আসিল, ইংরাজীতে অনার্স্ দিব, স্থির করিলাম। কিন্তু ইংরাজীর ছয় খানি বই পাইলাম না।

অপরাপর বই যে দিন পাইলাম, তার পর দিন হবিগঞ্জ রওনা হইলাম। হবিগঞ্জ আসিয়া আমার জ্বর হইল—বড় প্রবল জ্বর—কারণ আমি জীবনটাকে বৃথা মনে করিয়া স্বাস্থ্যের কোন নিয়মই পালন করি নাই। এক মাস জ্বরে ভুগিয়া প্রায় মৃত্যুর সন্নিহিত হইলাম, তখন সুয়াপুর হইতে দিদি এবং স্ত্রী আসিলেন। আরও এক মাস পরে জ্বর ছাড়িয়া গেল, তখন পরীক্ষার দেড় মাস বাকী, আমি ফি দিলাম। দাদাকে বলিলাম, ইংরাজী ও ইতিহাসে, কিছু না পড়িলেও পাশ করিব—শুধু পলিটিকাল ইকনমিক্সটি পড়িব, এইটি নূতন—এই দেড় মাস স্কুলে পড়াইয়া 'ফসেট' খানি ভালো করিয়া পড়িলাম। তারপর পরীক্ষা দিতে গেলাম। ইংরাজীর ছয় খানি বই চক্ষে দেখি নাই, বাকী গুলি দুই চার দিন পড়িয়াছি, তথাপি ইংরাজী ও ইতিহাসে আমার এমন সাধারণ জ্ঞান ছিল যে আমি ভয় পাইলাম না।

পরীক্ষা দিয়া হবিগঞ্জে ফিরিলাম, যথা সময়ে কয়েকজন পাশ হইয়াছেন এই টেলিগ্রাম আসিল। আমার বিস্তর বন্ধু ও আত্মীয় ছিলেন, নিশ্চয়ই পাশ হইলে তাঁহারা টেলিগ্রাম করিতেন। এমন কি অনেকের খবর চিঠিতেও পাওয়া গেল, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম ফেল হইয়াছি। ফল ভাল না হইলেও কোনো পরীক্ষায় এ পর্যন্ত ফেল হই নাই। গণিতের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া ভাবিতাম, ইহার হাত এড়াইলে তো হাসিয়া খেলিয়া পরীক্ষায় পাশ হইব, কিন্তু কি দুর্দৈব যে, গণিত-শূন্য বি. এ. পরীক্ষায় ফেল হইতে হইল। যে দিন অনেকের পাশের খবর চিঠিতে আসিল, তার পর দিন পোস্ট আফিসে গিয়া একটা টেবিলের উপর পড়িয়া রহিলাম। পোস্ট-মাস্টার মথুরবাবু আমাদের বন্ধু, তিনি কত আদর করিলেন, দাদা আসিলেন—তথাপি আমি টেবিল-শয্যা ত্যাগ করিলাম না, স্কুলে গেলাম না। যখন খাওয়ার জন্য বড় বেশী রকমের পীড়াপীড়ি চলিল, তখন হঠাৎ খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া অনির্দেশে একদিকে চলিতে লাগিলাম। বেলা সাড়ে এগারোটার সময় বাহির হইয়াছিলাম, কতদূর গেলাম তাহার ঠিক নাই; কত পল্লী, কত কৃষক, কত হাটের লোক, ঘাটের লোক দেখিতে দেখিতে চলিলাম তাহার ঠিকানা নাই। এক একবার মনে ভাবিলাম হয়ত কোন পল্লীতে যাইয়া দেখিব, আমার নৈশ-খাদ্যের থালা হাতে করিয়া মা আমাকে ডাকিয়া খাওয়াইতে বসাইবেন, আমি আবার তাঁহার হাতের রান্না খাইব। এই ভাবিতে চোখের জলে গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সারাদিন উপবাস, অন্ধকার রাত্রি—কোথায় চলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই, একটা জায়গায় পোঁছিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। রাত্রি ১১টার সময় বাসায় ফিরিলাম; দেখি, মামা, মামী, দাদা, বিধু, বৌ-দিদি, সকলেই আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন,

কত স্থান খুঁজিয়াছেন। আমার প্রত্যাগমনে তাঁহারা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। ১২ ঘণ্টা হাঁটিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমি মড়ার মতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আহারান্তে আঁচাইতে খোয়াই নদীর ঘাটে গেলাম, তখন বেলে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। খোয়াইর জলের প্রতি আমার একদা দুর্নিবার লোভ ছিল, যখন কোথাও খুঁজিয়া মাতৃক্রোড় পাইলাম না, তখন একদিন ঐ নদীর জলে যাইয়া চরম শান্তি খুঁজিব। সে দিনও আঁচাইতে আঁচাইতে ভাবিতেছি—'এই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে হয় না?' এমন সময় দাদা আমার দেরী দেখিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন। ঘরে ঢুকিব এমন সময় দেখি পোস্টমাস্টার মথুরবাবুর বড় ছেলে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া "দীনেশবাবু বাড়ীতে আছেন?—সুখবর" —বলিয়া চেঁচাইতেছে। রামদয়াল কলিকাতা হইতে চিঠি লিখিয়াছে, আমি ইংরাজীতে অনার্স্ সহ বি. এ. পাশ করিয়াছি।

১৬

কুমিল্লার চাকুরী

যাহা হউক একরকম পাশ হওয়া গেল। ইহার পরে কুমিল্লা শম্ভুনাথ ইন্স্টিটিউশনে ৫০ টাকা মাহিয়ানার হেডমাস্টারি পদ খালি হইয়াছে বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিলাম। কুমিল্লায় আমার শ্বশুর উমানাথ সেন এবং আমার পিতার মাতুল চন্দ্রমোহন দাশ ছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সে জায়গাটার উপর আমার একটা লোভ ছিল। কাজ জুটিয়া গেল। যে দিন নিয়োগ-পত্র পাইলাম, সেই দিনই কালবিলম্ব না করিয়া পত্নী ও সদ্য-জাতা প্রথমা কন্যা মাখনবালাকে লইয়া হবিগঞ্জ ত্যাগ করিলাম।

কুমিল্লার জীবন স্মরণ করিতে এখনও আমার হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপিয়া উঠে। কত দুঃখই না সহিয়াছি! আমার গ্রহগণ সকলেই তখন আকাশ হইতে বোধ হয় এক যোগে আমার দিকে ক্রুদ্ধ নেত্রে তাকাইতেছিলেন। প্রথম হইতেই ঝগড়া, আত্মীয়েরা পর হইলেন, যে দুই এক জনকে যথাসর্বস্ব হারাইয়া একমাত্র আশ্রয়ের ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, তাঁহারা পর হইলেন। শ্বশুর-শাশুড়ী পর হইলেন। চন্দ্রমোহন দাশ আমার প্রতি বিমুখ হইলেন, এবং আমার বড় ভগিনী দিগম্বসনী দেবী ঝগড়া করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাশী চলিয়া গেলেন।

নিজেকে তেমন একা আর কখনও মনে করি নাই। মনে কেবল এক ইচ্ছা জাগিতেছিল, কি করিয়া প্রাণত্যাগ করা যায়। কত দিন মনে ভাবিয়াছি, কাহাকেও বাঘের মুখ হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া যদি নিজে প্রাণ দিতে পারিতাম, কোন শিশুকে জলমগ্ন হওয়া হইতে বাঁচাইতে গিয়া যদি মরিতে সুযোগ পাইতাম,—প্রাণ তো দিবই কিন্তু কাহারও মূল্যবান জীবনের পরিবর্তে যদি আমার এই ছার প্রাণটা দিতে পারিতাম, তবে মৃত্যু সার্থক হইত! আঁধার রাতে দুর্গম পথে চলিয়া গিয়াছি, নিবিড় মেঘগর্জনের সঙ্গে মন হইতে আর্তনাদ উঠিয়াছে, আমি সেই সর্প-বহুল জঙ্গলের পথে এত অন্ধকারে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া চলিয়াছি, কিন্তু আর আমার মা নাই, যিনি উৎকণ্ঠিত চক্ষু দুটি আমার পথের দিকে ফেলিয়া রাখিবেন। বিদ্যুৎ দেখিলে ছাতা খুলিয়া মাথায় দিয়াছি, শুনিয়াছিলাম, ছাতার লৌহ বিদ্যুৎ আকর্ষণ করে—অন্ধকারে যেখানে জঙ্গল বেশী সেই পথে চলিয়াছি, কিন্তু উরগ জাতীয় কোন বন্ধু আমার ভবপারের কাণ্ডারী হইয়া দর্শন দেয় নাই।

কুমিল্লা আসার পর আমার শ্বশুর মহাশয় ও ঠাকুরদাদা চন্দ্রমোহনবাবু বলিলেন, "তুমি কিছু না জানিয়া দরখাস্ত করিয়াছ। শম্ভুনাথ স্কুল স্কুলই নহে। ভিক্টোরিয়া স্কুলের কয়েকটি বিদ্রোহী ছাত্র একটা স্কুল খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। শম্ভুনাথ নামক এক ধনী হিন্দুস্থানীর নামে স্কুলটা হইয়াছে; কিন্তু তিনি কয়েকদিনের জন্য ছেলেদিগকে স্কুল করিবার জন্য কয়েকটি তাঁবু দিয়াছিলেন—বাড়ী নির্মাণ কি অন্য কোন বিষয়ে কিছুই সাহায্য করেন নাই। এখন কয়েকটা ভাঙা খড়ো ঘরে স্কুল বসে, মাস্টাররা মাহিয়ানা পান না, তাঁহাদের গুণপনাও কিছুই নাই, অম্বিকাবাবু সেক্রেটারি, তাঁহার খুব আগ্রহ আছে—কিন্তু পয়সাকড়ি নাই, তিনি কি করিবেন?"

চন্দ্রমোহনবাবু বলিলেন—"একবার আমাদের জিজ্ঞাসা করিলে না, অমনি দরখাস্ত করিয়া বসিলে?" শ্বশুর-বাড়ীর সম্মোহন-আকর্ষণ যে আমাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া টানিয়া আনিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে কি করিয়া বলিব! সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম।

যাহা হউক স্কুলে যাইতে লাগিলাম। দেখিলাম মাস্টাররা যখন ইচ্ছা আসেন, যখন ইচ্ছা যান, আমি কৈফিয়ৎ চাহিলে মুচকি হাসিয়া পাশ কাটাইয়া যান। কেহ একটায় আসেন, দুইটায় যান, কলেজের প্রফেসারদের মত—গুণপনাও সেইরূপ। একজন একটি ছাত্রকে দাঁড় হইবার জন্য বারংবার বলিতেছিলেন 'Stood up', 'stood up', আর একজন ইতিহাস পড়াইবার সময় একটি ছত্র পাইলেন, 'Babar founded the Mogul Empire' অমনই চিৎকার করিয়া টিপ্পনি করিতে লাগিলেন, 'find, found, found, এই তিন রকম পদ ব্যাকরণ-শুদ্ধ, কিন্তু এখানে লেখক founded লিখিয়াছেন, সাহেব কি না, যাহা ইচ্ছা লিখিয়া পার পাইলেন, বাঙালী হইলেই তাহার টিকিতে হাত পড়িত।'

আমি আমার আত্মীয় ইন্‌স্পেক্টর দীননাথ সেন মহাশয়কে লিখিলাম, "শম্ভুনাথ ইন্‌স্টিটিউশনের এ্যাফিলিয়েটেড হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা?" তিনি অতি স্পষ্ট করিয়া একবারে নির্লজ্জ অকপটতার সহিত আমাকে জানাইলেন—কোন সম্ভাবনা নাই—কারণ ইঁহাদের ফণ্ডে কোন অর্থই নাই, যদ্দ্বারা একটা এন্ট্রান্স স্কুল চলিতে পারে।'

অম্বিকাবাবু কিন্তু আমার বেতনটি মাসের প্রথম তারিখেই জোগাইতেন। স্কুল এ্যাফিলিয়েটেড হইলেই অপর সকলকে মাহিয়ানা দিবেন, এই ভরসায় তাঁহাদিগকে খাটাইতেছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের গুণপনা ও ব্যবহারের কোন শৃঙ্খলা বা শোভা ছিল না। কিন্তু ছাত্রগণ ভিক্টোরিয়া স্কুলের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিল, বর্ষাকালে ছেঁড়া ছনের ছাউনির মধ্য দিয়া ঘরে বেশ খরপ্রবাহে জল পড়িয়া তাহাদের মাথার চুলে শিবজটাবদ্ধ গঙ্গার ন্যায় আটকাইয়া যাইত, তাহা তাহারা মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করিত না। বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিলে দুই তিন জন ছত্রধরের ন্যায় আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইত, আমার মাথা জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য। সেই ভাঙা কপর্দকশূন্য নিরাশ্রয় স্কুলটির প্রতি তাহাদের মমতা দেখিলে আমার বড় কষ্ট হইত। ইহার মধ্যে তাহারা খুব বড় একটা সভা করিল, তাহাতে আমি ইংরাজীতে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যশস্বী হইয়া পড়িলাম। জেলা স্কুল, এমন কি ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতেও ছাত্রগণ আমার কাছে পড়া বুঝিয়া লইবার জন্য এবং আলাপ দ্বারা আপ্যায়িত হইবার জন্য আসিত।

আমি আমার শ্বশুর ও ঠাকুরদাদার তাড়নায় একদিন বাধ্য হইয়া ভিক্টোরিয়া স্কুলের স্বত্বাধিকারী জমিদার আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাকালে দেখা করিতে গেলাম। ভিক্টোরিয়া স্কুল তখন খুব জাঁকের স্কুল—জেলা স্কুলের মতই তাহার প্রতিপত্তি।

আনন্দবাবু এমন ভাব দেখাইলেন যে তিনি যেন আমার প্রতীক্ষা করিয়াই বসিয়াছিলেন। আমার অধ্যাপনা প্রভৃতির সুযশ তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছিল, তিনি

বলিলেন,—'আমার এখানেই আপনার স্থান, আপনি ওখানে থাকিতে পারিবেন না, তাহা আমি পূর্বেই জানিতাম।' আমি প্রথম দিনেই তাঁহার বন্ধু হইলাম, তিনি প্রথম হইতেই আমার বন্ধু হইলেন। আমার বহু কষ্টের মধ্যে একমাত্র সহৃদয় উপদেষ্টা তিনি ছিলেন, তাঁহার দুঃখের সময় আমি সর্বদা পার্শ্বচর ছিলাম। কুমিল্লা-জীবনের নিবিড় ঘনান্ধকারে তাঁহার বন্ধুত্ব আমার পক্ষে একমাত্র আলোক-সঞ্চারী বিদ্যুল্লেখা।

কয়েক বৎসর হইল 'রায় বাহাদুর আনন্দচন্দ্র রায়' স্বর্গীয় হইয়াছেন। ইঁহার মত মহাপ্রাণ লোক সংসারে বড় সুলভ নহে।

ইহার পরে স্কুলের আয়ব্যয় ও শিক্ষকদের ব্যবহার লইয়া আমার সঙ্গে অম্বিকা-বাবুর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। দাদামহাশয় চন্দ্রমোহন দাশ বলিলেন, 'তুমি কিছুতেই শম্ভুনাথ স্কুলে থাকিতে পার না, স্কুলটি তো তাসের ঘর। এখানে পুতুল-খেলা করিয়া নবযৌবনের প্রথম উদ্যমটা নষ্ট করিয়া ফেলিবে? এই স্কুল তো কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতে স্থান পাইবে না, তাহা তো বুঝিতে পারিয়াছ, এখানে কেন পড়িয়া থাকিবে?'

সমুদ্রে পড়িয়া লোকে যেমন তৃণ আশ্রয় করিয়া থাকে, অম্বিকাবাবু কিন্তু তেমনই আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ছাত্রগণ আমার প্রতি অনুরাগী ছিল, ইন্‌স্‌পেক্টর দীনুবাবু আমার আত্মীয় এই ভরসায় তিনি আমাকে অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। আমি দাদামহাশয়কে বলিলাম—'এই ব্যক্তির আহ্বানে আমি হবিগঞ্জ হইতে চলিয়া আসিয়াছি, ইনি রীতিমত আমার বেতন দিয়া আসিতেছেন, ইঁহাকে ছাড়িয়া গেলে কি আমার পাপ হইবে না?' দাদামহাশয় ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'তুমি যদি এতটা জ্ঞানী হইয়া থাক, অম্বিকাবাবুকে বল তিনি তিন বছরের গ্যারাণ্টি দিন— যদি স্কুল না থাকে, তবু তোমার মাহিয়ানা তিন বছর চালাইবেন। নতুবা যে ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সে ঘরে বসিয়া থাকা ঠিক বুদ্ধিমানের কর্ম হইবে না।'

অম্বিকাবাবু তিন বৎসরের গ্যারাণ্টি দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু দাদামহাশয় বলিলেন, 'আপনি নিঃসম্বল ব্যক্তি, আপনার গ্যারাণ্টির মূল্য কি? আপনি আপনার নিকট-আত্মীয় আনন্দ বর্ধন মহাশয়ের সই আনুন, তবে সেই গ্যারাণ্টি আমরা স্বীকার করিয়া লইব।' 'তাহাই আনিব'—বলিয়া অম্বিকাবাবু চলিয়া গেলেন। আনন্দ বর্ধন লিখিলেন, 'দীনেশবাবু লাগিয়া থাকিলে স্কুলটি দাঁড়াইতে পারিবে। তখন অম্বিকার বেতন চালাইতে কোন কষ্ট হইবে না, কিন্তু দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতে পারিব না।' অম্বিকাবাবু আমাকে অনুনয়বিনয় করিয়া অনেক কহিলেন, তাহার পর যখন দাদামহাশয়ের প্ররোচনায় আমি আনন্দ বর্ধন মহাশয়ের স্বাক্ষরের জন্য জেদ করিতে লাগিলাম, তখন তিনি দু' একদিনের মধ্যে উহা আনিয়া দিবেন বলিয়া ভরসা দিলেন—আনন্দবাবুর দস্তখত আনিবার মেয়াদ আরও বাড়াইয়া লইলেন, কিন্তু শেষে বুঝিলাম, এ সম্বন্ধে কোন আশাই নাই।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ আমায় ধরিয়া বসিল, 'সার, আমাদের বলুন, এ স্কুল হইতে আমরা এ বৎসর পরীক্ষা দিতে পারিব কি না?'

সেইদিন আত্মীয় স্বজনের পীড়াপীড়িতে ঠিক করিলাম, শম্ভুনাথ স্কুল ছাড়িয়া

দিব। তখন বেলা ১১টার সময় স্কুলে গেলাম। অম্বিকাবাবু পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেদিন তিনি মনের দুঃখে স্কুলে আসিলেন না।

আমি ছাত্রগণকে বলিলাম, 'আমি অনেক চেষ্টা, অনেক লেখালেখি করিয়া দেখিয়াছি, ইন্স্পেক্টর কিছুতেই স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবেন না। সুতরাং তোমাদিগকে আমি আর মিথ্যা ভরসায় রাখিব না। আমি এই স্কুল ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেডমাস্টারি গ্রহণ করা ঠিক করিয়াছি, এখন তোমরা যাহা ভাল বোঝ তাহাই কর।'

ছাত্রগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইল। অধিকাংশ ছাত্র বলিল, 'আমরা ভিক্টোরিয়া স্কুলের বিদ্রোহী ছাত্র। কিন্তু আমাদের দর্প টিকিল না, আপনি যখন যাইতেছেন তখন আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব।'

আমি বলিলাম, 'আমার সঙ্গে তোমাদের যাওয়া ভাল হইবে না, এই স্কুল আপনা হইতে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহার ছাত্রমণ্ডলী লইয়া আমি প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুলে গেলে আমার পক্ষে শোভন হইবে না।'

তাহারা বলিল, 'আপনি যান। আমরা যাহা উচিত বোধ করি, করিব।'

তখন আমি ধীরপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ভিক্টোরিয়া স্কুলের দিকে চলিলাম। অম্বিকাবাবুর কথা মনে করিয়া আমার মনে অত্যন্ত দ্বিধার ভাব হইতেছিল; তিনি তাঁহার স্কুলের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য, প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুলের উপর জয়-পতাকা তুলিবার জন্য বড় আশা করিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন, আমাকে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি বৈষয়িকতায় প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার পতনোন্মুখ ঘরখানি ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম। অন্তর হইতে আত্মাপুরুষ যেন ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, 'শরণাগতকে আশ্রয় দিবার জন্য কত লোক জীবন বিসর্জন করিয়া থাকে, আর তুমি একান্ত বিপন্ন ব্যক্তিকে—তোমার নিয়োগকর্তাকে একেবারে বিপদের চূড়ান্ত সীমায় রাখিয়া, তাঁহার সনির্বন্ধ বান্ধবতার মাথায় লগুড়াঘাত করিয়া চলিয়া আসিলে!' আমি শুষ্ক মুখে বিবেকের তাড়িত বক্ষের দ্রুত স্পন্দন শুনিতে শুনিতে ভিক্টোরিয়া স্কুলের গেটের নিকট উপস্থিত হইলাম, কিন্তু সবিস্ময়ে ও আতঙ্কিত চক্ষে দেখিলাম—শম্ভুনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রায় অধিকাংশ ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া আমা হইতে অনতিদীর্ঘ ব্যবধানে ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে আমাকে অনুগমন করিয়া আসিতেছে। ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রেরা পূর্বেই খবর পাইয়াছিল, আমি তাহাদের হেডমাস্টার হইয়া আসিতেছি। আমাকে দূর হইতে দেখামাত্র তাহারা সকলে আমাকে অভিনন্দন করিবার জন্য স্কুলঘর হইতে বাহির হইয়া যে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল তাহা আমার এখনও মনে আছে। শম্ভুনাথপ্রদত্ত তাঁবুতে কয়েক মাস শম্ভুনাথ স্কুল বসিয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, এজন্য ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রেরা বিদ্রূপ করিয়া শম্ভুনাথ ইন্স্টিটিউশনের নাম দিয়াছিল 'তাম্বুনাথ ইন্স্টিটিউশন'। আজ আমাকে এবং আমার পশ্চাতে শম্ভুনাথ স্কুলের ছাত্রগণকে দেখিয়া তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া বলিল, 'ভাঙ্ল রে তাম্বুনাথ'। এই চিৎকার শুনিয়া শম্ভুনাথ স্কুলের ছাত্রগণ মাথা হেঁট করিয়া সজল চক্ষে এক মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া ধীরে ধীরে ভিক্টোরিয়া স্কুলের মুক্ত তোরণ দিয়া স্কুলগৃহে প্রবেশ করিল। আমি এত ক্ষুব্ধ হইলাম যে, তাহা বলিতে পারি না।

কেন যেন মনে হইল, আমি ভয়ানক অপরাধ করিয়াছি। আমার দাদামহাশয়, শ্বশুর-মহাশয় এবং অপরাপর আত্মীয়গণ সকলে একবাক্যে বলিলেন, 'বেশ করিয়াছ'। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তরে যে বিচারক আছেন, তিনি অবিরত ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, 'কাজ ভাল হইল না।' প্রায় এক মাস কাল বিলুপ্ত শম্ভুনাথ ইন্‌স্টিটিউশনের স্মৃতি সিন্ধবাদের স্কন্ধাবলম্বী বৃদ্ধের ন্যায় আমার উপর চাপিয়া রহিল। আমি দূর হইতে অম্বিকাবাবুকে দেখিলে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় পলাইয়া যাইতাম। দু' একবার কোন কোন স্থলে একথা শুনিয়াছি, 'দীনেশবাবু, কি কাজটাই করলে, আরে, ছ্যাঃ এমন বিশ্বাসঘাতকতাও করতে হয়!' এ কথার কোন জবাব না দিয়া আমি অতি ক্ষুব্ধচিত্তে বাড়িতে ফিরিয়া না খাইয়া মড়ার মতন পড়িয়া থাকিতাম।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া আমি কাজে বেশ সাফল্য দেখাইলাম। প্রথম বৎসরেই আমার স্কুল হইতে একজন কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পাইল, অঙ্কে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইল, সংস্কৃত ও ইংরাজীতেও তাহার নম্বর খুব উঁচুতে উঠিয়াছিল। চট্টগ্রাম ডিভিসনে ইহার পূর্বে কেহ কুড়ি টাকা বৃত্তি পায় নাই, ছেলেটির নাম ছিল 'ঝাড়ু মিঞা'। সে একটি গরীব কৃষকের ছেলে ছিল, আমি তাহাকে স্কুল হইতে চার টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া পড়াইয়াছিলাম। সে পরীক্ষাগুলি পাশ করিয়া 'এস্‌কেন্দার আলি' নাম গ্রহণ করে, এবং ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া শেষে পাগল হইয়া যায়।

ইহার পরের বৎসরও আমাদের স্কুল হইতে একজন চাটগাঁ ডিভিসনে প্রথম হয়, এবং ছোটোলাট ইলিয়ট সাহেব আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যান যে, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুল যখন এরূপ ভাল হইয়াছে, তখন এখানে গভর্নমেন্ট স্কুল থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।

গৃহের অশান্তি, শোক, দুঃখ আমার উদ্যমকে দমাইয়া দিতে পারে নাই। আমি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলাম। আমার একখানি কাব্য 'কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ' কুমিল্লার এক প্রেস হইতে বাহির হইল। যেদিন স্তূপাকৃতি করিয়া মুদ্রিত পুস্তকগুলি আমাদের বাহিরের ঘরে রাখিলাম, সেই রাত্রিতে আগুন লাগিয়া প্রায় সমস্ত বই পুড়িয়া গেল, দুই চারিখানি বহু কষ্টে বাহির করিতে পারিয়াছিলাম। বোধ হয় একখানি আমার বাড়ী খুঁজিলে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। 'কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ' কাব্যের ঘটনাটি এই—গিরিবর্ম্মের বৃদ্ধ রাজা যুবরাজ ভূপেন্দ্র সিংহকে একটি মর্মর প্রস্তরের নির্মিত রমণী-মূর্তির প্রতি নির্দেশ করিয়া মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি কোন দৈব-বলে জানিতে পারিয়াছিলেন, ঐ মূর্তির মত রমণী-দ্বারাই তাঁহার রাজত্বের ধ্বংস সাধন হওয়ার সম্ভব। যুবরাজ যদি তদ্রূপ কোন রমণী দর্শন করেন, তাঁহাকে যেন স্পর্শ না করেন, স্পর্শ করিলে অচিরে রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কুমার ঘটনাক্রমে সেইরূপ রমণীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন, উক্ত রমণী এক রাজকুমারী। যুবরাজকে দর্শনমাত্র তিনিও তাঁহার অনুরক্ত হন। যুবরাজ একদিকে ঐকান্তিক রূপপিপাসা, অন্যদিকে মৃত রাজার নিদারুণ অনুজ্ঞা—এই দুই বিরুদ্ধভাবের মধ্যে পড়িয়া সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপস্থিত হন। বহুদিন মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি একদিন মোহান্ধ হইয়া

নিদ্রিতা রূপসীর কপোলে একটি মাত্র চুম্বন অংকিত করিয়া দেন। সেই ঘটনার অল্প সময় পরে সংযমন সিংহ নামক শত্রু কর্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হয়। কুমার ভূপেন্দ্র একবার এই শত্রুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলবিক্রমশালী হইলেও এবার বিমূঢ় ও ভয়বিহ্বল হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টায় এক কূপোদকে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কুমার সেই রূপসী ললনাকে দূরে রাখিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তি বারংবার তাঁহাকে কুমারের সম্মুখে উপস্থিত করিল। অবশেষে জুলিয়া যেরূপ ডনজুয়ানকে সামনে রাখিয়া নিজ হৃদয়ের বল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল, কুমারও সেইরূপ তাঁহার হৃদয়রাণীকে স্বীয় প্রাসাদের সংলগ্ন এক গৃহে রাখিয়া দূর হইতে প্রাণের পিপাসা মিটাইতে চাহিতেন ; কিন্তু হৃদয় লইয়া এই লুকাচুরি বেশী দিন চলিল না, একদিন সত্যসত্যই তিনি নিয়তির বশবর্তী হইয়া পরীক্ষায় হার মানিলেন। সেই রাত্রির বর্ণনাটা তুলিব :—

(১)

'আকাশে ফুটেছে তারা রাশি রাশি।
মধ্য নভে চন্দ্র যায় হাসি হাসি॥
সাদা সাদা যথা যূথিকা-সুন্দর।
ফুটিয়াছে জ্যোৎস্না ধরার উপর॥
মধুর সে আলো পড়েছে কাননে।
ফুল কলিকার সলজ্জ বদনে॥
গোলাপের মুখে বল্লরীর গায়।
গবাক্ষে পড়িয়া চুমিছে নেশায়॥
সুপ্ত সুন্দরীর ঘুমন্ত অধরে।
ফুটেছে সে জ্যোৎস্না নীলিম অম্বরে॥

(২)

সেই জ্যোৎস্না মাঝে একাকী কুমার।
ভ্রমিছে নীরবে, পৃষ্ঠদেশে তাঁর॥
ধনুসহ শর ঝুলিছে হেলায়।
শিরোরত্ন হ'তে মণি উজলায়॥
ভ্রমিছে কুমার ব্যথিত হৃদয়।
চিত্তের উদ্বেগ নাহি শান্ত হয়॥
কভু দেখে চন্দ্র জ্বলে ঊর্দ্ধে দূরে।
কভু দেখে সেই স্তব্ধ রাজপুরে॥

জ্বলিছে দেউটী, নিভিছে দেউটী।
প্রহরীর স্বর মিশে নভে উঠি॥

(৩)

'চিত্ত ভার তার লাঘব না হয়।
উদ্বিগ্ন কুমার ব্যথিত হৃদয়॥
সতেজ জ্বলন্ত যেন হুতাশন।
ভালবাসা তার দহিতেছে মন॥
পশিল যুবক চিন্তিত হৃদয়ে।
রাজপুরী পার্শ্বে দ্বিতল আলয়ে॥
করাঘাতে মুক্ত হল গৃহদ্বার।
সম্ভ্রমে প্রহরী করে নমস্কার॥
পশিল ভূপেন্দ্র অট্টালিকা শিরে।
সুদীর্ঘ সোপান শ্রেণী ভাঙ্গি ধীরে॥
ছাদ লগ্ন গৃহ, খুলি ধীরে দ্বার।
পশিয়া দেখিল বিস্ময়ে কুমার॥

(৪)

শুভ্র ফেণনিভ শয্যায় পড়িয়া।
সুষুপ্তা সুন্দরী রয়েছে লুটিয়া॥
রমণীর তপ্ত কাঞ্চন-বরণে।
পড়েছে জোছনা, সুন্দর বদনে॥
ঘোরি চুল জাল রয়েছে জড়িয়ে।
ধীরে বাতশিশু খেলে তা লইয়ে॥
ছিন্ন ভিন্ন যথা ফুলহার হায়।
শৈবালে কমল জড়িত হেলায়॥
স্তূপে স্তূপে ফুল্ল ফুল রাশি মত।
ঘুম ভুজবল্লী যেন অসংযত॥
এমন সুন্দর এমন কোমল।
নবনীতে যেন গাঁথা ফুল দল॥'

ইহার পরে স্পর্শ হইতে আটকাইল না। তারপর অনেক অঘটন ঘটিল। বহু কষ্টের পর কুমার মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি।

উপসংহার ভাগ এইরূপ :—

(১)

'কিন্তু এখন(ও) জনশ্রুতি আছে,
সন্ধ্যার আঁধার বন-তরু কাছে,
কৃষ্ণ হয়ারূঢ় যুবক মুরতি।
কুপিত নয়নে জ্বলে উগ্র দ্যুতি॥
রুক্ষ শির-কেশ অসংলগ্ন বেশে।
রাজপুত্র লয়ে ছুটে অশ্ব হ্রেষে॥
চমকি গৃহস্থ জাগি দেখে বীরে।
অশ্বের উপরে দূরে তরুশিরে॥
খেলিয়া ফিরিতে গৃহেতে সন্ধ্যায়।
শিশু পথে তাহা দেখি ভয় পায়॥
প্রহরী একাকী নৈশ অন্ধকারে।
রাজপথে তারে সভয়ে নেহারে॥

(২)

যুবা অশ্বারোহী সুন্দর বদন।
বিষাদব্যঞ্জক সুতীক্ষ্ম নয়ন॥
ছুটিতেছে জ্যোতিঃ নিরাশ শোকেতে।
গিরিবর্ত্ম রাজ্য হেরিছে কোপেতে॥
কভু পথ ভুলে ভ্রমিয়া পথিক।
শুনে দূর বনে আহ্বানে সৈনিক॥
কূপোদক হ'তে সে তীব্র চিৎকার।
ভেদে বায়ুস্তর, নৈশ অন্ধকার॥
এখন(ও) সে বনে চলে না পথিক।
সশস্ত্র তথাপি শিহরে সৈনিক॥
শীতরাত্রে শিশু আগুন ঘিরিয়া।
শিহরে ভয়ের কাহিনী শুনিয়া॥'

কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ আমার ১৯ বৎসর বয়সের লেখা। ১৮৮৬ সনে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল। ইহার ২।৩ বৎসর পরে ছাপা হইয়া অগ্নিদাহে অধিকাংশ পুস্তক বিনষ্ট হইয়া যায়।

এইভাবে আমার গৃহভারতীর অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেল। আরও এক কারণে দেবীর বেদী, কবিত্বের শতদল, আমার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা পাইতে পারিল না। সে

কথা লিখিবার পূর্বে আমার ১৯ বৎসর বয়সের লেখা একটা ব্যঙ্গকবিতা, যাহা একটা খাতায় কতকটা ছিল, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিব।

পশুপতি ন্যায়রত্ন

(১)

ন্যায়রত্ন মহাশয় নিমন্ত্রণ খেয়ে,
উদর করিয়া স্ফীত, গিন্নি কাছে ঘেঁসে
হুকা হাতে উপবিষ্ট। ধোঁয়া ঘর ছেয়ে
উড়িতেছে, মরি যথা সুন্দরীর কেশে
বেণীর লহরী, কিংবা বাষ্পযান সাথে
চলে যথা ধূমপুঞ্জ, গিন্নি ভুগি রোগে
সবে উঠেছেন মাত্র, শাঁখা ক্ষীণ হাতে।
এদিকে একান্ত মনে খড়িকা সংযোগে
দন্তলগ্ন পর্ণঅংশ করি নিষ্কাশন,
ন্যায়রত্ন করিছেন ধীরে রোমন্থন।

(২)

কথা নাই কোন পক্ষ, প্রকৃতি পুরুষ
পাশাপাশি, কথা নাই, কোন কার্য নাই।
ন্যায়রত্ন অতিরিক্ত ভোজনে বেহুঁস,
গিন্নি দূরগত পুত্র, ভাবিছেন তাই।
হেনকালে স্বপ্নভঙ্গ করি উভয়ের,
উপস্থিত হইলাম সম্মুখে তাঁদের।

(৩)

বলিলেন ন্যায়রত্ন, 'এস পুরন্দর
বহুদিন দেখি নাই'—হামাগুড়ি দিয়া
শয্যার একটি ভাগ করি অবসর,—
বসিতে কহিলা মোরে,—আমিও সরিয়া
একধারে বসি দেখি পণ্ডিতের পাছে।
উড্ডীন টিকিটি দ্রুত বায়ুভরে নাচে।

(৪)

বলিলাম, 'মহাশয় কয়টি গভীর
আধ্যাত্মিক প্রশ্ন মনে হয়েছে উদয়।
মীমাংসা তাহার চাই,—প্রভুর শরীর
ভাল ত এখন?—কিছু হতেছে সংশয়!'
হাই তুলি তুড়ি মারি বলিলেন প্রভু,
'বলে যাও, ইতস্ততঃ করিও না কভু।'

(৫)

'ধর্ম কি'? শুধানু যবে,—বাঁকা করি আঁখি
চাহি মোর প্রতি ন্যায়রত্ন মহাশয়
বলিলেন,—'শুন বৎস কহি ধর্ম কি,
প্রশ্নর উত্তরগুলি অতি সূক্ষ্ম হয়।
সলিলের ধর্ম এই সিক্ত করে দেহ।
আগুনের ধর্ম পুড়ে যাহা কিছু ধরে।
মৎস্যের সাঁতার ধর্ম, মার ধর্ম স্নেহ।
জীবের প্রকৃতিধর্ম জন্মে আর মরে।'

আমার শত শত কাব্যের পাণ্ডুলিপি, যাহা কুমিল্লা ছাড়িবার সময় আমি একটা বৃহৎ সিন্দুকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা তথা হইতে হারাইয়া গিয়াছে। আমি আর কিছুতেই সে সকলের সন্ধান পাইলাম না। তাহা ছাপা হইলে আধখানা ওয়েবস্টার-এর তুল্য আয়তনের হইত। শৈশব ও কৈশোরে যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম—সাহিত্য হিসাবে হয়ত তাহার কোন মূল্যই নাই—কিন্তু আমার বহু আরাধনার জিনিসগুলি আমার প্রিয় ছিল। আমার নিত্যকার সুখ-দুঃখ বিজড়িত সেই খাতাগুলি দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে কোথা হইতে কে আসিয়া আমার ভারতীর সেবার পথে এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত করিল।

ইংরাজী সাহিত্যের একখানি ইতিহাস—ভারতীয় আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া বাংলা ভাষায় লিখিতে শুরু করিব, এই সংকল্প করিতেছিলাম। এমন সময় কলিকাতার প্রেস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর নোটিশ পড়িলাম, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে গবেষণামূলক সর্বোত্তম প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিচারক হইবেন—চন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত গুপ্ত।

আমি বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া এতদিন ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছিলাম—সুতরাং এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইলাম। এই সময় আমি 'নবজীবন,', 'জন্মভূমি', 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন 'দাসী' নামক এক পত্রিকা প্রকাশিত করেন, আমি তাহার রীতিমত লেখক ছিলাম। আমার প্রবন্ধের সর্বত্রই আদর হইতেছিল। এমন কি 'জন্মভূমি'

পত্রিকার সম্পাদক আমার প্রবন্ধগুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অযাচিত ভাবে কয়েক-বার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাহিরের পাঠকদের মধ্যেও অনেকে প্রশংসা করিয়া চিঠি লিখিতেন—'অনুসন্ধানে' আমার 'জন্মান্তরবাদ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কবি হেমচন্দ্রের ভ্রাতা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদককে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অজস্র প্রশংসাবাদ ছিল, সে প্রবন্ধের নীচে আমার নাম ছিল না। পিস্ অ্যাসোসিয়েশন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য মনে করিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম। কুমিল্লায় হাকিমদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু জুটিয়াছিল, তন্মধ্যে স্বর্গীয় স্ট্যাটুটারি সিভিলিয়ান সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নাম সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। তিনি তখন মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করিতে-ছিলেন। তিনি কুমিল্লায় একটি সাহিত্য-সমিতি গঠন করেন, আমি তাহার সম্পাদক হইয়াছিলাম। বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সুদীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ ছিলেন; তাঁহার সুবৃহৎ চক্ষে, তিলফুলের মত সুগঠিত নাসিকায় ও উজ্জ্বল কপোল হইতে যেন প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইত ; তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হাতের আঙ্গুল-গুলি জন্মাবধি পরস্পর সংলিপ্ত ছিল ও সেগুলি পূর্ণগঠিত ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই হাত লইয়া তিনি এত দ্রুতভাবে লিখিয়া যাইতেন, যেন মুক্তাহারের সৃষ্টি করিয়া যাইতেন। কি ইংরাজী, কি বাংলায় তাঁহার মত ক্ষিপ্র কবিত্বময় ওজস্বিনী ভাষায় লিখিতে আমি অল্প লোককেই দেখিয়াছি। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার একটি সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভাষা এরূপ ওজস্বিনী, রচনা এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণময়ী এবং ইংরাজী এরূপ বিশুদ্ধ, যে, রমেশ দত্ত মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিয়া যে ধারণা হয়, এই অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাহা হইতে অনেক বেশী জ্ঞান জন্মে। ইনি ঠিক সাহেবের চালচলনে থাকিতেন। যত জজ ম্যাজিস্ট্রেট আসিতেন, সকলের অপেক্ষা তিনি পাণ্ডিত্যে, কর্মঠতায়, এমন কি ইংরাজী ভাষার জ্ঞানেও উৎকৃষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা এমন কি ভয় করিতেন। সাহেবী কায়দা এতটা চালাইতেন যে সবজজগণ কার্ড দিয়া বসিয়া থাকিতেন, অবসরক্রমে অল্প সময়ের জন্য দেখা করিতেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে আদৌ মিশিতেন না। কিন্তু সাহিত্যিক বন্ধু পাইলে যেন তাঁহার গোচারণের মাঠ মনে পড়িত। রাজবেশ, রাজভাষা ভুলিয়া যাইতেন, এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত মেলামেশা করিতেন।

এই 'মিত্র-সাহেবের' আরও অনেক মূর্তি আমি দেখিয়াছি। শারদীয় পুজা উপলক্ষে কুমারটুলীর বাড়ীতে তিনি যখন দুর্গাপ্রতিমার সম্মুখে—পিতা বেণীমাধববাবুর পদপ্রান্তে গরদের উত্তরীয় গলায় পরিয়া নগ্নদেহে বসিয়া শ্লোক পড়িতেন, তাঁহার রচিত 'জগদ্ধাত্রী' ও 'মানুষ মেষ' কবিতা আবৃত্তি করিতেন—তখন তাঁহার গম্ভীর ও ওজস্বী কণ্ঠের আবৃত্তির ঝংকারে পুজামণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিত—সেরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাস, কবিত্ব ও প্রবাসে সাহেবী কায়দা—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় আমি কিছুতেই করিতে পারিতাম না। আমি যখন অতি দুঃসময়ে

পড়িয়া পীড়িত ও নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁহার নিকট আমার করুণ কাহিনী বলিয়াছিলাম, তখন ঝর ঝর করিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িয়াছিল—তাঁহার দয়া সেই অশ্রুতেই পর্যবসিত হইয়া যায় নাই। তিনি যে জেলায় গিয়াছেন, সেই জেলা হইতেই আমার জন্য মাসে মাসে দুই তিন শত টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন।

এরূপ পিতৃভক্ত লোকও আমার চক্ষে বড় পড়ে নাই। বেণীবাবুর নিকট এই প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র—একটি অপোগণ্ড শিশুর মত দেখাইত; এত বড় পণ্ডিত, এত বড় সাহেব—শিষ্যের মতন কৌতূহলের সহিত পিতার নিকট আধ্যাত্মিক নানা প্রশ্ন করিতেন, এবং প্রতিটি উত্তর মানিয়া নেওয়ার যেন গর্ব বোধ করিতেন; শিশুর ন্যায় পিতার নিকট আবদার করিতেন, এবং পিতার কথা কখনই লঙ্ঘন করিতেন না। বরদাবাবুর মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং একটি প্রতিভাবান তরুণ পুত্র, তাঁহার মৃত্যুর চার পাঁচ দিন পূর্বে অকালে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় পুত্র-শোকাপেক্ষাও পিতৃশোকই তাঁহাকে বেশী বিহ্বল করিয়াছিল। আমি বরদাচরণের মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে কুমারটুলীর বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ভ্রমক্রমে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "বোধ হয় আপনার পিতার শোকটা আপনার বড্ড লাগিয়াছে"। এই কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অজস্র জল পড়িতেছে ও কথা বলিবার চেষ্টায় কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার পীড়ার তখন উৎকট অবস্থা, আমি অত্যন্ত ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া অন্য কথা পাড়িতে লাগিলাম, কিন্তু তাঁহার সেই শোক কিছুতেই প্রশমিত হইল না। আমি বুকে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাঁহার পিতার প্রায় ৯২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। এরূপ পিতৃ-স্নেহ হিন্দুর ঘরেও আমি খুব অল্পই দেখিয়াছি।

আমার কুমিল্লার আর এক সঙ্গী ছিলেন ডেপুটি রসিকলাল সেন, বিটসন বেল সাহেব ইঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একবার ইঁহার বাহুমূলে সন্ধির অস্থিটির স্থান বদলাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন, এবং সাহিত্যিক ব্যাপারেও ইঁহার সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য ছিল। আমি রাতদিন ইঁহার সঙ্গে থাকিতাম। কিন্তু সকলের চাইতে—ডেপুটি ছিলেন, আমার খুল্লতাত কালীশংকর সেন; লম্বায় ইনি ছিলেন সাত ফুট, বর্ণ ছিল গাঢ় কৃষ্ণ, বাংলা দেশে এত কালো রং বড় দেখা যায় না। ঠোঁট দুখানি ছিল পুরু। বোধ হয় নীল নদের তীরে জন্মিলেই ঠিক হইত, যেন পথ ভুলিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র হইলেও জ্যোতিষ্মান্ ছিল। প্রচলিত সমাজনীতি, ধর্মনীতি ইনি প্রতি-দিন ডিঙাইয়া চলিতেন, এবং এরূপ যদৃচ্ছাক্রমে জীবন চালাইতেন যে তিনি পরের হাঁটাপথে চলিবেন না, এই সংকল্প করিয়াই যেন জীবনযাত্রা শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহার রীতিনীতি এত মৌলিক ছিল যে, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমি দুই একজন অশীতিপর বৃদ্ধ মোক্তারকে ইঁহার খাস কামরায় কোমর দোলাইয়া খেমটা নাচ নাচিতে দেখিয়াছি। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িয়া ইনি পড়া সাঙ্গ করেন এবং শুধু কপালের লেখা ও দৈববলে ডেপুটিগিরি লাভ করেন। যদিও ইংরাজী খুব ভাল লিখিতে পারিতেন না এবং বড় বড় রিপোর্টগুলি আমি ও রসিকবাবু মাঝে

মাঝে লিখিয়া দিতাম, তথাপি ঐ রিপোর্টে যদি কোন অসঙ্গতি থাকিত, তাহা তাঁহার চক্ষে অমনই ধরা পড়িত। তিনি নিজ হাতে না লিখিলেও রিপোর্টটি যে পর্যন্ত মনের মতন না হইত, সে পর্যন্ত লেখক অব্যাহতি পাইতেন না। সেই সকল রিপোর্টের কৃতিত্বও সর্বাংশে তাঁহারই থাকিত, এমন কি রিপোর্টের ভাষার অসঙ্গতি পর্যন্ত তাঁহার কান এড়াইত না। তিনি নির্ভীক ও একান্ত উদারপ্রকৃতি ছিলেন। সাত দিনের মধ্যে মাহিয়ানার ৮০০ শত টাকা ফুরাইয়া ধার করিতে বসিতেন। তাঁহার মনস্বিতা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি যে কাজ উতরাইতে পারিতেন, এরূপ আর কোন ডেপুটির সাধ্য ছিল না, এজন্য কটন প্রভৃতি বড় বড় সিভিলিয়ানেরা তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। নিজের কৃষ্ণবর্ণ ও বিরূপ চেহারা লইয়া যে তিনি নিজেই কত ব্যঙ্গ করিতেন, তাহা আর কি লিখিব? একদিন আমায় বলিলেন, "দীনেশ! আমি যে কত কালো তা তোরা বুঝিস নাই, আমি আজ বুঝিয়াছি। আজ জজ-সাহেবের মেম আমায় পথে বলিলেন 'মিস্টার সেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমাদের বাসাবাড়ীর কাছ দিয়া তুমি যাবে কি?' আমি অতিশয় ভদ্রতা করিয়া তাঁহাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। তাঁহার হাত দু'খানির ঠিক পাশেই আমার হাতখানি ছিল, আমার মনে হইল খুব সাদা কাগজটার এক প্রান্তে যেন কে কতকটা কালি ঢালিয়া ফেলিয়াছে—আমি যে এত কালো, মেম সাহেবের হাতের কাছে আমার হাত না থাকিলে তাহা বুঝিতেই পারিতাম না।"

সন্ধ্যাকালে কুমিল্লায় আমরা একটা আড্ডা দিতাম। কালীশংকরবাবু, রসিকবাবু, প্রসন্ন গুপ্ত ও সত্যবাবু মুন্সেফ-দ্বয়, গোপাল বসু সবজজ, নগেন দত্ত ডেপুটি, কান্তিবাবু ইন্সপেক্টর, হেমচন্দ্র খাস্তগির ডেপুটি প্রভৃতি এই আড্ডার রীতিমত সদস্য ছিলেন। গোপাল বসু ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, concatenation, troglodyte প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কথায় তাঁহার বক্তৃতা চলিত, তিনি অভিধানের সাহায্যে চিঠি লিখিতেন, অভিধানের সাহায্যে কথা বলিতেন, অভিধানের সাহায্য ব্যতীত তাহার অর্থ স্ফুট করে, কাহার সাধ্য? কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ডেপুটি ক্ষেত্রগোপাল রায়, হারমোনিয়াম বাজাইয়া "বাঁশী বাজাও না শ্যাম" গান ধরিতেন এবং প্রসন্ন গুপ্ত মুন্সেফ নানারূপ বিদ্রূপ ও হাসিঠাট্টায় আড্ডাটা মুখরিত করিয়া ফেলিতেন। আমাদের বিদ্রূপ প্রায়ই কালেক্টরীর সেরেস্তাদার চন্দ্রকুমার বাবু ও তাঁহাদের থিওসফির দলের উপর প্রযুক্ত হইত। আমরা রহস্য করিয়া ভোট লইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতাম। পুলিশ ইন্সপেক্টর কান্তিবাবু চোর ধরার জন্য একবার বাটি চালান দিয়াছিলেন। কালীশংকর বাবু বলিলেন, 'শোন কান্তি, আমরা হচ্ছি ঘটিরাম ডেপুটি, তুমি হচ্ছ বাটিরাম ইন্সপেক্টর।' ইহার কিছু পরে প্রকাশচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র সিংহ (রায় বাহাদুর) এবং মিঃ এ. কে. রায় ডেপুটি হইয়া কুমিল্লায় আসিলেন। বাংলা কথার মধ্যে ইংরাজি বুকনি দিলে প্রতিটি কথায় এক টাকা জরিমানা দেওয়ার কড়ার করিয়া আমরা অনেক কৌতুক ও আমোদের সৃষ্টি করিয়াছি।

ইহার মধ্যে ডিক্রুজ নামক একজন টেলিগ্রাফ-মাস্টার আসিয়া জুটিল। সে ফিরিঙ্গী হইলেও খাঁটি ইংরাজের মত তাহার চেহারা ছিল, তাহার ছোট ছোট দুই তিনটি সন্তান ছিল, একজন ছিল চার্লি (Charles) । মেয়েটির নাম ছিল ম্যাগি

(Margaret); এই হতভাগ্যের স্ত্রী বাঁচিয়া ছিলেন না। ডিক্রুজ দিনরাত আমার কাছে পড়িয়া থাকিত। শেষে বাজারে বেড়াইতে গিয়া গোলাপী নাম্নী এক স্ত্রীলোকের কুহকে পড়িয়া সে সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। ছেলেমেয়ে যে কি কষ্ট পাইত, তাহা আর কি লিখিব? তাহাকে তাহার সাহেবসমাজ ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করে। আমি তাহাকে ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু গোলাপী তাহাকে ভেড়া বানাইয়া ফেলিয়াছিল। সাহেবেরা চক্রান্ত করিয়া উপরে চিঠি লিখিয়া তাহাকে বদলী করাইলেন—একেবারে পঞ্জাবে। গোলাপী বুঝিয়াছিল, ইহার হাতে আর কপর্দকও নাই। তখন সাহেব তাহার পায়ের উপর একদিন একরাত্রি পড়িয়া ছিল। কিন্তু সে কিছুতেই বাংলা দেশ ছাড়িয়া পঞ্জাবে যাইতে স্বীকৃত হইল না। যে দিন যাইবে, সে দিন অপরাহ্ণে আমাকে একটা নির্জন জায়গায় লইয়া গিয়া সে যে কি কান্নাটা কাঁদিয়াছিল—কত আক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা আমি ভুলি নাই। স্ত্রীলোকের কুহকে যে মানুষ কতটা বিড়ম্বিত হইতে পারে, ডিক্রুজ-গোলাপী অধ্যায় আমার নিকট তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ হইয়া আছে।

একদিন আমি বাড়ীতে বসিয়া আছি, এমন সময় আমার প্রতিবাসী বন্ধু প্রকাশচন্দ্র সিংহ ডেপুটি মহাশয় তাঁহার আত্মীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। খর্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ, রোগা চেহারা, লক্ষ্য করিবার মধ্যে বড় দুটি উজ্জ্বল চক্ষু এবং হাসির ছটায় মধুর ঠোঁট দু'খানি। কৈলাসবাবু ঐতিহাসিক বলিয়া তখন সর্বত্র পরিচিত, তখন তিনি 'রাজমালা' নামধেয় ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত লিখিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপটা খুব জমিয়া গেল। প্রকাশবাবু বদলী হইয়া গেলেন, তখন হইতে কৈলাসবাবু কুমিল্লায় আসিয়া আমার বাড়ীতেই থাকিতেন। তখন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিরুদ্ধে ভয়ানক একটা দল বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, কৈলাসবাবু সেই দলের একজন নেতা হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক কেলেঙ্কারীর কথা কৈলাসবাবু তাঁহার ইতিহাসে স্থান দিয়াছিলেন; আমি তাঁহাকে এ পক্ষের ওকালতি করিয়া অপর পক্ষকে নিতান্ত হীনভাবে চিত্রিত করার পক্ষে উৎসাহ দিতাম না, কিন্তু তিনি এবং তাঁহার দলের লোকেরা বলিলেন, 'সত্যের অনুরোধে এ সকল লিখিতে হয়'। আমি বলিলাম, 'পৃথিবীর যত কেলেঙ্কারী ও নিন্দাবাদ তো সত্যের অনুরোধে বলা হয় বলিয়াই নিন্দাবাদীরা প্রচার করিয়া থাকেন, লোকে যে রাগে অন্ধ হইয়া গালি দিতে থাকে, তাহা তলাইয়া দেখিলে অনেক সময় সত্যকে অতিক্রম করে না। পরের গ্লানি করিয়া সত্যের ধুয়া ধরিলেও সমর্থনযোগ্য নহে। যেহেতু মনু একথা বলেন নাই যে সত্য অপ্রিয় হইলে সে কথা বলিতে হইবে।'

কৈলাসবাবু আমার বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ ও মৌলিক চেষ্টা দেখিয়া সুখী হইলেন, যেহেতু আমি তখন সর্বপ্রথম বাংলা পুঁথি সংগ্রহকার্যে অনুরাগী হইয়াছিলাম। আমাদের হেড পণ্ডিত চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ আমাদের বাড়ীর এই গৃহটির ক্ষুদ্র তর্কবিতর্কে আসিয়া যোগ দিতেন। আমি দিনের পর দিন কেবলই চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া যাইতাম, মনে হইত, তাঁহারা আমার ব্যাখ্যায় খুব প্রীত হইতেন। আমি অনেক সময় চণ্ডীদাসের কবিতা ইঁহাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছি।

এই কবির বর্ণিত রাধা এবং বিদ্যাপতির রাধা—দুইটি ভিন্ন সামগ্রী। একজন

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাণ্ডার হইতে সাজসজ্জা আনিয়াছেন—অপরা বঙ্গদেশের ভক্তি ও ভাব-সম্পদের মূর্তি। একজনের অপাঙ্গদৃষ্টি, যৌবনোদ্গম, রহস্যপ্রিয়তা, এমন কি অব্যক্ত অস্ফুট কোরকের ন্যায় অধরপ্রান্তের হাসিটুকুও অলংকারশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী—সামান্য নায়িকার লক্ষণাক্রান্ত। অপরার বসনাঞ্চল ধূলায় লুণ্ঠনশীল, তাঁহার নায়কের মনচোরা অপাঙ্গ দৃষ্টি নাই, ধ্যানশীলার ন্যায় মুগ্ধ ঊর্ধ্ব দৃষ্টি। তিনি সমস্ত অলংকার খুলিয়া ফেলিয়া প্রেমের আবেশ দেখাইতেছেন, "বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে"। তিনি আবন্ধ বেণী মুক্ত করিয়া চম্পকমাল্য খসাইয়া ফেলিয়া স্বীয় কুন্তলদামের কৃষ্ণ-শোভা নিরীক্ষণ করেন। ময়ূরময়ূরী-কণ্ঠে সেই কৃষ্ণোজ্জ্বল স্নিগ্ধ বর্ণ, মেঘেও সেই কৃষ্ণবর্ণ, আজ তাঁহার এলায়িত কৃষ্ণ কুন্তলেও তাহাই, সুতরাং নিজদেহে এবং বাহিরে তিনি কৃষ্ণকে খুঁজিয়া আবিষ্কার করিয়া ধ্যানশীলা।

এই ধ্যানের রূপ আর কোনও কবির কাব্যে নাই—ইহা গৌরাঙ্গপ্রভুর পূর্বাভাস; চৈতন্য যদি স্ত্রীলোক হইতেন, তবে চণ্ডীদাস-বর্ণিত এই রাধার অনুরূপা হইতেন।

"ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়।"

চণ্ডীদাস রাধার এই বিভ্রান্তরূপ আঁকিয়াছেন, তারপর গৌরাঙ্গের রূপ ধ্যানে লাভ করিয়া রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেনঃ—

"আজু হাম কি পেখিনু নবদ্বীপ চন্দ
করতলে করই বয়ান অবলম্ব।
পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর-পন্থ
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ।"

বঙ্গদেশের প্রেমের বইয়ের এক পিঠে রাধা, আর এক পিঠে গৌরাঙ্গ। একজন প্রেমসাধনা-দীপ্ত কল্পনায় দৃষ্ট মানসী প্রতিমা, আর একজন সহস্র ভক্তকণ্ঠের জয় জয় শব্দে অভিনন্দিত, খোল-করতাল-সংগীত-বন্দিত ঐতিহাসিক চিত্র। সাধনা-রাজ্যের এই দুইখানি চিত্রপট। যে ব্যক্তি শতদলকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার নীচের পাঁক দেখিয়া ফিরিয়া যায়, সে নিতান্তই হতভাগ্য; তাহার আলোচনার মসীতে সে নিজে কলঙ্কিত হয় মাত্র; কিন্তু পদ্মের নিশ্বাস-সুরভি তাহার ভাগ্যে লাভ হয় না।

চণ্ডীদাস কৃষ্ণের প্রেম বর্ণন করিতে যাইয়া পর পর কতকগুলি ছবি দিয়া গিয়াছেন। প্রথম চিত্রে, কিশোরী বিদ্যুতের মত চাহনি ক্ষেপিয়া চলিয়া গেল, "নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরী, চমকি চাহিয়া গেল"। বিদ্যাপতি এই পদের উপসংহারে লিখিয়াছেন—"মেঘমালা সঙে তড়িতলতা জনু, হৃদয়ে শেল দেই গেল"।

দ্বিতীয় ছবি, দুই সখী পরস্পরে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া যাইতেছেন—

"পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী
সখির সহিত যায়।"

এই ছবি দেখিয়া কৃষ্ণের রাধাকে প্রাণ নিবেদন করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা হইল। কৃষ্ণ বলিলেন, যদি কেউ সহায় হয়, আর এমনই সৌভাগ্য হয়—তবে—"তা সনে করি যে লে" ; লে অর্থ স্নেহ।

তৃতীয় ছবি ; রাধা ফুল দিয়া 'বল' তৈয়ারী করিয়া উর্ধ্বে ছুঁড়িতেছেন, আবার হাত বাড়াইয়া ধরিতেছেন—যেন জীবন্ত আনন্দের চিত্রপট। "ফুলের গেরুয়া" ধরিবার সময় "বসন ভেদিয়া—রূপ উঠে গিয়া"—এই মোহিনী ছবি দেখিয়া কৃষ্ণ মুগ্ধ হইলেন। আবার যখন সে মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল তখন কৃষ্ণ বিমূঢ় হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য স্নানের ঘাটে। কিশোরী স্নান করিতেছেন, যমুনার তীরে অলক্ত-রঞ্জিত কোমল পা আর একখানি পদ্মপ্রভ অলক্তরঞ্জিত পায়ের উপর রাখিয়া রাই অঙ্গ-মার্জনা করিতেছেন।

"শুনহে পরাণ—সুবল সঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা।"

পঞ্চম দৃশ্য রাই স্নান করিয়া ফিরিতেছেন—

"চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

পর পর এক একটি ছবি কবিতায় ফুটিয়া উঠিতেছে। গায়ক এই সকল গান আখর দিয়া গাহিয়া এক পেলবকোমল অপূর্ব নারীশিরোমণিকে উপস্থিত করেন। তারপর যখন এই সুন্দরীকে প্রেমাভিষিক্ত করিয়া নয়নাসারে সিঞ্চিত করিয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত করেন, তখন মধুর ও করুণ রসের অভূতপূর্ব মিলন হয়। কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই তিনি সংজ্ঞাহীনা—"যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়। পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতলী যেন ধূলায় লুটায়।"

কেমন করিয়া চণ্ডীদাস জানিয়াছিলেন, অর্ধশতাব্দী পরে এক সোনার প্রতিমা নয়নজলে ভাসিয়া কৃষ্ণনাম শুনিবেন এবং যার তার পায়ে পড়িয়া কাঁদিবেন, সেই গূঢ় রহস্য কি করিয়া বলিব? পার্থিব কোন কাব্যে একথা নাই যে, শুধু নাম শুনিয়া প্রেমিকা বিহ্বলা হইয়া পড়েন। তখনও চোখের দেখা হয় নাই। সেই নিগূঢ় প্রেমসাধন-তত্ত্ব চণ্ডীদাসের মানসপটে একখানি ছবির ন্যায় স্পষ্ট হইয়া জাগিয়াছিল, তাই বুঝি বিধাতা তাঁহার যাদুকাঠি দিয়া ছুঁইয়া সেই ছবিখানি "নদের সোনার মানুষে" পরিণত করিয়া কবিকে স্রষ্টার সমকক্ষ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

চন্দ্রকুমার ও কৈলাস সিংহের নিকট শুধু এই কবিতাগুলি পড়িয়া ক্ষান্ত

হইতাম না, সমস্ত বৈষ্ণব-কবিতা চৈতন্যপ্রভুর দ্বারা অধিকৃত দেখিতে পাইতাম। মনে হইত, ভগবৎপ্রেমই কখন মানের মূর্তি ধরিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিত, ভগবৎপ্রেমই অপোগণ্ড শিশুর মুখে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য ও শক্তি আবিষ্কার করিত। প্রভাত-সায়াহ্নে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদ, ধূপ-অগুরুর সুগন্ধ, পদ্মবনের ঈষদুন্মিভন্ন রক্তিম রাগ—সমস্তই যেন বঙ্গদেশের পল্লীর হাটে, মাঠে, ঘাটে, পথে ভগবদ্ভক্তির আবেশ ছড়াইয়া রাখিয়াছে। আমি মাতৃভূমির প্রতি পল্লীর ধূলিরেণু পবিত্র মনে করিতে লাগিলাম। ইহা আমার জাতীয়তা, স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতির কিছু নহে, ইহা আমার ইংরাজীর নকল-করা কোন ভাব নহে। প্রকৃতই এই ভূমির প্রতি রেণু আমার চক্ষের জলের দাবী করিত। এক অব্যক্ত আকর্ষণে আমি বঙ্গদেশের মায়ায় পড়িয়া গেলাম।

ফিরিয়া ফিরিয়া চণ্ডীদাসের গানের দিকে সমস্ত প্রাণ উন্মুখ, উৎকণ্ঠিত হইয়া ছুটিত। কোথায় গেল আমার টিনটার্ন অ্যাবি, এমন কি এত সাধের "চীনাংশুক-মিবকেতোঃ"। কখনও পড়িতাম—"অবলা এমন তপ করিয়াছে কবে?" কৃষ্ণ স্বয়ং পরশমণি, যাহা শ্রীকরে ছুঁইয়া ফেলেন, তাই তো সোনা হইয়া যায়, তবে "কি লাগিয়া ধরে সখি চরণে আমার" তিনি "একবার যাই" বলিয়া আমায় কত আদর করেন, বারংবার বিদায় চান—অর্ধপদ যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কাতর হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, আমার হাতে হাত রাখিয়া শপথ দেন যেন আবার দেখা হয়, পুনরায় দেখা পাওয়ার অনুমতির জন্য কত মিনতি করেন—

"পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বলে।"

এই সকল কবিতা সকালে-বিকালে পড়িতাম, দিনরাত্র পড়িতাম, এই কবিতাগুলি নির্জনে একা একা আওড়াইয়া আনন্দ পাইতাম।

চণ্ডীদাসের কবিতার একটি প্রকৃতি এই যে, পর পর ছবি দিয়া কবি এক একটি রস জাগাইয়া তোলেন। ধরুন তাঁহার মানের পালাটি; প্রথম ছবি মাধবীতলাতে রাই চিবুকে হাত দিয়া বসিয়া আছেন—কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না!

"এক নব রামা আছে রাধা সঙ্গে
তা সনে না কহে বোল।"

নিজের মনঃকষ্ট বুকের ভিতর রাখিয়া সঙ্গিনী সহ রাই একান্ত নিঃসঙ্গীর ন্যায় বসিয়া আছেন, আর তাঁহার মর্মবেদনাকে যেন রাগিণীর ছন্দ দিয়া একটি কোকিল সেই মাধবীর ডালে বসিয়া ডাকিতেছে।

"মাধবী ডালেতে এক পিক আসি
কহত পঞ্চম বোল।"

দ্বিতীয় দৃশ্য—কোকিলের সেই গান শুনিতে শুনিতে রাধার ভাল লাগিল না। রাই কোকিলকে—

"করতালি দিয়া, দিয়া উড়াইয়া"

আবার বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য—শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূতী আসিতেছেন—

"দূর হতে দেখি, দূতীর গমন
করিলা শ্রীমুখ বঙ্ক।"

দূতী আসিয়া অনেক সাধিল। সে বলিল, 'যাঁর জন্য তুমি ঘন ঘন পথের দিকে চাহিয়া রাত্রি জাগরণ কর, যাঁর জন্য তুমি কত যত্নে বেণী বাঁধিয়া খোঁপা কর, কালো বর্ণে প্রীত হইয়া কালো ফিতা দিয়া কেশ-সজ্জা কর, যাঁর স্পর্শ তোমার কাছে লক্ষ চন্দ্র স্পর্শ হইতেও শীতল, তাঁকে কি দোষে ত্যাগ করিলে, বল?'

দূতীর কথা শুনিয়া রাধিকা কিছু বলিলেন না, মাধবীতলা হইতে একটি তীব্র কটাক্ষ তাঁর দিকে নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। তারপর খানিকটা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, কৃষ্ণ কি করিতেছেন—সেটা জানা চাই, তাই চোখ মেলিয়া বলিলেন, "কেন আসিয়াছ? কি বলিবে বল।"

তখন কতকগুলি ছবি একে একে অবতারিত হইল, দূতী বলিলেন—

"তোমার বেণী হইতে যে ফুলটি পড়িয়াছিল, তাহা কুড়াইয়া কৃষ্ণ হাতে রাখিয়াছেন, তাঁহার চোখের জলে সে ফুলটি ভিজিয়া গিয়াছে।

"তাকে দেখিবে তো আমার সঙ্গে চল, মরকত-মণির মত সে ধূলায় লুটাইয়া আছে। তাঁর মালতীমালা-বিজড়িত চূড়া কোথায় পড়িয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই, তাঁর নূপুর ও বলয় কোথায়, কে তার খোঁজ লয়? পীত ধড়ার আঁচল ধূলায় লুটাইতেছে, নবমঞ্জরীর দল ধরিত্রীর বক্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে।" পর পর এই ভাবের ছবি দিয়া চণ্ডীদাস একটা গাঢ় অনুভূতির রাজ্যে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছেন।

তাঁর প্রেমের কবিতা—এক আনন্দ-লোকের জিনিস। চির-বিরহী জন যদি অভীপ্সিতকে পায়, তবে জিহ্বা কথা বলিতে পারে না, তার অভিব্যক্তি হয় শুধু অশ্রুতে। সারা জীবনের আরাধনার পর যদি কোন ভক্ত ভগবানকে দর্শন করে, তবে তাহার ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে না, সে চোখের জল ছাড়া আর কিছু দ্বারা আনন্দ ব্যক্ত করিতে পারে না। একমাত্র শিশু হারাইয়া যে জননী উম্মত্তাবস্থায় জীবন কাটাইয়াছেন, দেবপ্রসাদে যদি সেই বালক সহসা মাতৃবক্ষে ধরা দেয়, তখনকার আনন্দ অনির্বচনীয়, তাহার ভাষা চোখের জল ছাড়া আর কিছু নহে, ভাষার কি সাধ্য তাহা প্রকাশ করে?

চণ্ডীদাসের কবিতা সেই অশ্রুরাজ্যের। এখানে এক একটি কথা, ক্ষুদ্র অশ্রু-বিন্দুর ন্যায়, তাহা বহু ব্যথা-জাত আনন্দের অভিব্যক্তি—"যথা তথা যাই আমি কত দূর চাই। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলকে জুড়াই।" অতি সহজ সরল কথায় সেই চিরবিরহমথিত দর্শনানন্দের কথাই বুঝাইতেছে। "এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ। মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদ মুখ।"—সেই একই কথা কত

ভঙ্গীতে বলা। মুমুর্ষু একবার দর্শনানন্দের জন্য তীর্থে যায়—এই কবি সেইরূপ তীর্থযাত্রী। যে আনন্দ-নিলয়ে গেলে ভাষা পাছে পড়িয়া থাকে, ভাব একাকী চলিয়া যায়, চক্ষু অশ্রু লইয়া অর্ঘ্য সাজায়—এই কবিতা সেই স্বর্গীয় রাজ্যের। এখানে কবিত্বের বৈদ্যুতিক আলোকে স্বর্ণবর্ণ উজ্জ্বল রেখা জ্বলে না, এখানে পবিত্র ঘৃতের সলিতায় অলংকার-বিরল মৃন্ময় পাত্রের আরতির দীপ মন্দিরটি সুগন্ধ ও উজ্জ্বল করিয়া রাখে।

চণ্ডীদাসের কবিতার যে জিনিসটা কতকটা শীলতাকে ডিঙাইয়াছে, তাহা কৃষ্ণ-কীর্তনেই বেশী, তাহা জয়দেব এবং পূর্বসূরিদিগের শিষ্যত্বের প্রেরণা প্রমাণ করে। কিন্তু পাঁকের উপর পদ্ম জন্মিয়াছে। তাঁহার আত্মনিবেদনের পদগুলি পৃথিবীটাকে শুধু একটা রেখায় ছুঁইয়া আছে মাত্র, বিদ্যুল্লেখার ন্যায়। কিন্তু বসুধাতল হইতে সে স্বর্গীয় জিনিসটা আসে নাই, তাহা জয়দেবী প্রেরণা নহে, তাহা দৈব-প্রেরণা—তাহা চেষ্টা করিয়া অনুকরণ করিয়া কেহ পায় না, হঠাৎ দেব-প্রসাদে যেমন কেহ কৌস্তুভ মণিটি পাইয়া বসে, এ সেইরূপ পাওয়া।

এই প্রেমকে তিনি অখণ্ড রূপে দেখিয়াছিলেন। পিতৃস্নেহ, সখ্য ও যৌন প্রেম, সেই অখণ্ডকে ভাঙিয়া চুরিয়া ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখায়, কিন্তু যিনি পূর্ণ-ভাবে উহা পাইয়াছেন তাঁহার চক্ষে সেই অখণ্ড জিনিসটার মধ্যে দাস্য, বাৎসল্য প্রভৃতি সকল ভাবই আছে, এজন্য তিনি রামীর মধ্যে পিতামাতা ও সমস্ত দেবতাকে পাইয়াছিলেন। এই প্রেম পাইয়া তিনি মানুষকে দেবতাদের অপেক্ষা বড় মনে করিয়া বলিয়াছিলেন, 'শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' এই প্রেমের ধ্বংস তিনি স্বীকার করেন নাই—এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন, 'পিরীতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন-অঙ্গ পায় না সে' এই মানুষ-প্রেম সাধনা না করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না চিনিতে পারে, প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে, সেই সে চিনয়ে তারে।' এই সাধনার পথে ইন্দ্রিয় অন্তরায়, ইহা বুঝাইতে তিনি কহিয়াছেন—প্রেম সাধনা করিতে হইলে দেহকে 'শুষ্ক কাষ্ঠসম' করিতে হইবে। প্রেমের মর্ম যে না জানে তাহাকে তিনি মন্দিরের বাহিরে থাকিতে বলিয়াছেন। প্রকৃত ধর্মব্যাখ্যায় তাঁহারই অধিকার, যিনি মর্ম বুঝিয়াছেন, শুধু সূত্রব্যাখ্যা করেন না। যাঁহার বাহিরে ইন্দ্রিয় খোলা রহিয়াছে, ভিতরকার সত্য তাঁহার নিকট ধরা পড়িবে না।

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি, তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে,
ভিতর দুয়ার খোলা।"

এই চণ্ডীদাসের পুঁথি হাতে করিয়া চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থের সনির্বন্ধ অনু-রোধে, কৈলাসবাবুর উৎসাহে—আমার অন্তরের দেবতা যে পূজা চাহিতেছিলেন,

তাহার নৈবেদ্য তৈয়ারী করার আন্তরিক ইচ্ছায় আমি পুঁথি সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমার পুঁথি খোঁজার ইতিহাসটা একটা অদ্ভুত গোছের। সংস্কৃত পুঁথিরই লোকে সন্ধান করিত; বাংলা পুঁথির কোন খোঁজই কেহ লইত না। ১৮৯০ সনেও আমরা আত্মীয়স্বজনের নিকট ইংরাজীতে চিঠি লিখিতাম। তার পূর্বে বাবাকে যত চিঠি লিখিয়াছি, তাহার বোধ হয় সকলগুলিই ইংরাজীতে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ আমি খুব আনন্দের সঙ্গে পড়িতাম বটে, কিন্তু বাংলা পুঁথি যে পল্লীতে পল্লীতে তুলট কাগজের খনি খুঁজিলে পাওয়া যায়, একথা তখন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। হঠাৎ একদিন কে আমায় 'মৃগলুব্ধ' নামক একখানি প্রাচীন হাতের লিখিত পুঁথির খোঁজ দিয়া গেল। সেই পুঁথিখানি সংগ্রহ করিতে যাইয়া জানিতে পারিলাম, সেরূপ আরও অনেক অপ্রকাশিত পুঁথি ত্রিপুরা জেলায় আছে। তখন আমি এই কাজে আমার প্রকৃতির সমস্ত ঝোঁকের সঙ্গে লাগিয়া পড়িলাম। একজন খবর দিয়া গেল, 'পরাকলি' মহাভারত নামক একখানি বই সেই জেলায় প্রচলিত ছিল। কাশীদাসী মহাভারতের পূর্বে লোকে সেই মহাভারত পড়িত। আমি বুঝিলাম 'পরাকালি' 'পরাকৃত' বা 'প্রাকৃত' কথার বিকৃতি, ভাবিলাম প্রাকৃত ভাষায় একখানি মহাভারত পাইলে ভাষাতত্ত্ব হিসাবে সে আবিষ্কার মহামূল্য হইবে। বহু অনুসন্ধানের পর 'পরাকলি' মহাভারতের খোঁজ পাইলাম, কিন্তু দেখিলাম তাহা লৌকিক প্রাকৃতে রচিত মহাভারত নহে—উহা পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের বিরচিত মহাভারত। এই মহাভারতের এতদূর প্রচলন ছিল যে, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ এমন কি বর্ধমান হইতেও ইহার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহার পূর্বে সঞ্জয়-রচিত মহাভারত পাইলাম। এইভাবে যখন প্রায় ১০০ শত অপ্রকাশিত বাংলা পুঁথির সংগ্রহ হইল, তখন মাসে মাসে তাহার বিবরণ-সম্বলিত সন্দর্ভ 'সাহিত্যে' প্রকাশিত করিতে লাগিলাম এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আমাকে উৎসাহ দিয়া পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন।

আমি এই পুঁথি ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, এসিয়াটিক সোসাইটির ডাঃ হোর্নলি মহাশয়কে চিঠি লিখিলাম। তিনি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর ভার দিলেন। একদিন সকাল বেলা একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ হাতে করিয়া গৌরবর্ণ, ঈষৎ গুম্ফরেখালাঞ্ছিত শ্রীমুখ-শালী, ফিট্ বাবুর মত পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যৌবন বিনোদের দেহে যে শ্রী দিয়াছিল, এখন আর তাহা নাই। তাঁহার দিব্য সেই নধর কান্তি এখন স্ফীতোদর খর্ব ছন্দ ধারণ করিয়াছে, সে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য আর নাই, সংসার-তাপদগ্ধ হইয়া ম্লানতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন বিনোদ আর আমি পল্লীতে পল্লীতে পুঁথি খুঁজিয়া ঘুরিয়াছি। বিনোদের বাড়ী ভাটপাড়া, সেখানে সংস্কৃত শকুন্তলার অভিনয় হইত, বিনোদ দুষ্মন্ত চরিত্রের অভিনয় করিত। মাঠে মাঠে ঘুরিবার সময় বিনোদ কি মিষ্ট স্বরে "তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মি-ত্বমিন্দোদ্বয়মেবা যথার্থং গচ্ছতি মদ্বিধেষু" প্রভৃতি শ্লোক আওড়াইয়া যাইত। কখনও হাত নাড়িয়া "কুসুমমিব যৌবনং অঙ্গেষু সন্নদ্ধং" প্রভৃতি বলিয়া অধর-প্রান্তে হাসির রেখা টানিয়া কোন পল্লীললনার সৌন্দর্যের প্রতি সশ্রদ্ধ ইঙ্গিত

করিত। পুঁথি খোঁজা ব্যাপার লইয়া আমাদের যুব-চিত্তের কতই না নিগূঢ় নিভৃত কক্ষ পরস্পরের নিকট উদ্ঘাটিত হইত। সেই হাটে মাঠে ঘাটে, পদ্মপলাশ লীলাময়ী বাপী, কুন্দ-কোরকের মৃদু নিশ্বাস-বাহী সুগন্ধি বায়ু, স্নানরতা পল্লীললনার অসম্বৃত ভাবে বস্ত্র-বিক্ষেপকারী অঞ্চলাশ্রিত দুরন্ত শিশু, হল-হস্তে বিস্ময়-চকিতদৃষ্টি কৃষক, রন্ধনশালার ধূম-জড়িত দেবী-প্রতিমার ন্যায় সুদর্শন গৃহ-লক্ষ্মীর উনুন জ্বালাইবার চেষ্টা, পদ্মপ্রভ কোমল শ্রীপদে নিপীড়িত ঢেঁকির দ্রুত উত্থানপতন ও অবগুণ্ঠনবতীদের মৃদু মৃদু আলাপ ও ভূষণ-গুঞ্জন, গ্রাম্য বৃদ্ধের চোখের দুলাল শিশুদের কাকলী, কত দৃশ্য, কত মূর্তি আমাদের চক্ষের নিকট বায়োস্কোপের ছবির ন্যায় চলিয়া গিয়াছে; কখনও কল্পনায় দীপটিকে একটু উস্কাইয়া দিয়া গিয়াছে, কখনও চক্ষু দুটি বিমুগ্ধ করিয়াছে, কখনও পরের বাড়ীতে লক্ষ্মীর পদাঙ্ক কতকটা ঈর্ষার উদ্রেক করিয়াছে। বিনোদ ছিল ২১।২২ বৎসর বয়স্ক, আমি ছিলাম ২৪।২৫, সুতরাং আমাদের বন্ধুত্বের রাজযোটক হইতে কোন বাধা হয় নাই।

বিনোদ মাঝে মাঝে আসিয়া ২।৩ মাস থাকিয়া চলিয়া যাইত, আমি বছর ভরিয়া পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতাম। সেটা হইল আমার নেশার মত। বাংলার পল্লী আমায় টানিত। মনে হইত পল্লী-লক্ষ্মী কখনও তাঁহার মালতী ফুল জড়ানো খোপার বেণী খুলিয়া, কখনও আলতা-পরা পায়ের পদ্মপ্রভায় আকর্ষণ করিয়া, কখনও কুসুম-বিজড়িত রৌদ্রাংশুর চুমকি পরানো শ্যাম আঁচলের অসম্বৃত শোভায় মুগ্ধ করিয়া, কখনও নিবিড় মেঘোপম একরাশ চুল দেখাইয়া, কখনও আঙিনায় পুঞ্জীকৃত সোনার ফসলের দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া, কখনও বাপীনীরে পদ্মবন-সমাবৃত পদ্মোপম শ্রীমুখের শোভা দেখাইয়া ও স্ফুরদধরান্তরালে ফুল্লকোরকের হাসির দীপ্তি উদ্ভাসিত করিয়া আমাকে ভুলাইয়া ফেলিতেন। পুঁথি খুঁজিতে যাইয়া আমি কখনও বৈষ্ণব সাজিয়াই জুতা পিরান প্রভৃতি একটা চাকরের হাতে দিয়া, তুলসীর মালা গলায় পরিয়া, কৃষ্ণনামের ছাপে কপাল ও বক্ষ লাঞ্ছিত করিয়া, খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের দলে মিশিয়াছি। কখনও "বড্ড পিপাসা"র ভাণ করিয়া কোন ছুতার, ধোপা প্রভৃতি জাতীয় লোকের বাড়ীতে যাইয়া পৈতাপ্রকটিত নগ্নদেহে সটান একটা মাদুরের উপর শুইয়া পড়িয়া তাহাদিগের কৃপা ও ভালবাসার উদ্রেক করিয়াছি, ভদ্রলোক সাজিয়া গেলে অনেকস্থলে পল্লীর আতিথ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় নাই। আমি চাষীদের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসিতাম; বাংলা পুঁথি প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে বেশী পাওয়া যায়। আমার খুল্লতাত কালীশংকর বাবু অনেকদিন সেট্লমেন্ট অফিসার ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কখনও ক্রমাগত হাতীতে ঘুরিয়াছি, কিন্তু সরকারী পিয়নদের চাপরাস প্রভৃতি আসবাব দেখিলে গ্রামবাসীরা ভীত হইত। তাহাদের দ্বারা বরং পুঁথি-সংগ্রহের বাধা হইত, এজন্য আমি একা যাইতাম। কখনও পার্বত্যদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গিয়াছে, নিবিড় অন্ধকারে কখনও জল-ঝড়, কখনও ভীষণ বনজঙ্গল ভেদ করিয়া অসীম সাহস সহকারে রাত্রিকালে চলিয়া গিয়াছি। প্রাণের ভয় ছিল না। মরিলে আবার মাতৃকোল পাইব, এই কল্পনায় আঁধারে বনজঙ্গলের পথে চলিতাম। আমার মত দুর্ভাগা না হইলে কেহ আমার মত আগ্রহে প্রাণের আশা বিসর্জন দিয়া পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিতেন

না। আমি রাস্তায় যাইতে কত চোট পাইয়াছি, আহত স্থানে হাত বুলাইতে যাইয়া চোখের জলে ভাসিয়াছি। স্মৃতিতে একখানি কোমল শীর্ণ, স্নেহশীতল হাতের কথা মনে পড়িয়াছে যাহা আমার ব্যথিতস্থানে হাত বুলাইয়া আমার সমস্ত ব্যাধির পক্ষে অমৃত ও আরোগ্যের নিদান স্বরূপ ছিল।

একদিনের কথা মনে আছে। শহর হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরে এক বাড়ীতে গেলাম। শুনিয়াছিলাম, সে বাড়ীতে একখানি বড় পুঁথি ছিল। তখন বেলা একটা, কিছু খাওয়া হয় নাই। এক গয়লানী কুমিল্লায় আমাকে দুধ জোগাইত। তাঁহারই নাম করিয়া তাহার আত্মীয়-গোপের গৃহে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সেই বাড়ীর পুরুষেরা বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। একটি বৃদ্ধা ও তাহার একটি তরুণী নাতনী সেই বাড়ীতে ছিল। সেই মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ হইবে। তাহার মূর্তিটি পল্লীরাণীর ন্যায়, কি সুন্দর দুটি ডাগর চোখ! কি সুন্দর তাহার বর্ণ—সে আমার সঙ্গে ঘোমটা খুলিয়া অবাধে কথা কহিতে লাগিল, বুঝিলাম সে-বাড়ীর মেয়ে।

বুড়ী বলিল, 'বাবু, বাড়ীতে আমার ছেলে নাই—পুঁথি এখন দেখাইবে কে?' সেই মেয়েটি বলিল, 'উনি ১৩ মাইল হেঁটে এসে বুঝি এই দেড়টার সময় এমনই ফিরে যাবেন! দেখছ না? ওঁর মুখ শুকিয়ে গেছে, কিছু খান নি!' বৃদ্ধা তরুণীর উক্তিতে পরাস্ত হইল; সে বলিল, 'বাবু কিছু খাবেন কি?' তাঁহার প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য দেখিলাম মেয়েটি তাহার ডাগর চোখ দুটি আমার মুখের দিকে উৎসুকভাবে ন্যস্ত করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি সে আতিথ্য উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'তোমাদের ঘরে কি আছে, আমি কি খাইতে পারি?' বৃদ্ধা বলিল, 'গাছের ভাল পাকা চাটিম কলা আছে, গয়লার ঘরে ঘন আউটান দুধ আছে, চিঁড়ে আছে, আর খেজুরে গুড় আছে।' সেই বিগত মধ্যাহ্নে, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত আমার নিকট খাদ্যের ফর্দটা বেশ উপাদেয়ই বোধ হইল। তখন সেই মেয়েটি কত যত্নে আসন পাতিয়া দিল, একটা গ্লাস খুব ভাল করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করিয়া দিল; কড়া হইতে একটা বড় পুরু সর কলার পাতে করিয়া তুলিয়া আনিল এবং চিঁড়ে গুড় ও দুধ, কলা উপচার লইয়া আতিথ্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধার এ সকল আগ্রহপূর্ণ আতিথ্য ভাল লাগিতেছিল কিনা জানি না, কিন্তু সে আমার গলার পৈতা দেখিয়া ভয় খাইয়া গিয়াছিল। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে সে আমার খাওয়ার জন্য ব্যস্ততাই দেখাইতে লাগিল।

তরুণী আমার ভোজনান্তে একটা উঁচু মাচা দেখাইয়া বলিল—ঐ দেখুন ঐ মাচার উপর বইখানি রহিয়াছে। দেখিলাম কাষ্ঠের পাটায় আবদ্ধ বড় পুঁথি, চন্দন-লিপ্ত দেহ ও বহু শুষ্ক বিল্বপত্র সমন্বিত হইয়া ঊর্ধ্বে মঞ্চোপরি বিরাজ করিতেছে। একখানি মই লাগাইয়া সেখানি পাড়িলাম। কিন্তু যখন বই নীচে নামাইলাম, তখন ভূতাশ্রিত ব্যক্তি রোজা আসিলে যেরূপ চিৎকার করিতে থাকে, বৃদ্ধা সেইরূপ হাঁকডাক পাড়িতে লাগিল। "ও হচ্ছে আমাদের সাত পুরুষের পুঁথি, উহা কখনও নামানো হয় না, শনি মঙ্গলবার ফুল ও বেলপাতা, ও চন্দন ছড়াইয়া উহার পূজা করিয়া থাকি। ঐ পুঁথির ডুরি কখনও খোলা হয় না; আপনার গলায় পৈতা, তাহা খুলিতে পারেন, কিন্তু যেমন ভাবে আছে, ঠিক তেমনই ভাবে রাখিতে হইবে" ইত্যাদি। আমি তখন পুঁথি পাইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছি। এমন কি আমার পার্শ্ব-

বর্তিনী বিলোল-লোচনার কথাও আমার মনে নাই। ডুরি খুলিয়া দেখিলাম পুঁথিখানি একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ। যাহা হউক নূতন কিছু পাইলাম না বলিয়া আক্ষেপ হইলেও যাহা কিছু প্রয়োজনীয় মনে করিলাম, তাহা নোট করিয়া লইলাম।

কিন্তু সেই ডুরি ফিরিয়া বাঁধিবার সময় হইল মুশকিল। গোপকুলের দুগ্ধাদি খাইয়া কৃষ্ণ এতদূর বলবান হইয়াছিলেন যে তিনি অনায়াসে অঘাসুর বকাসুরকে বধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৭।৮ পুরুষ পূর্বে যে আহির-সন্তান এই পুঁথি ডুরি দিয়া বাঁধিয়াছিল তাহার বোধ হয় শাল-প্রাংশু মহাভুজ ছিল। যেরূপ কষিয়া আঁটিয়া পুঁথিখানি বাঁধা হইয়াছিল, তাহার ঘায়ে কাঠের আধ ইঞ্চি ক্ষয় পাইয়া দাগ হইয়া গিয়াছিল। ধন্য সেই দড়ি! তাহা নারিকেলের ছোবড়া, শণ কি যমকিঙ্করের দাড়ি দিয়া তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা জানি না, কিন্তু সার্ধ তিন শত বৎসর পরেও সেই দড়ি এত শক্ত ছিল যে, তাহা বল-প্রয়োগে কাটা যাইতে পারিত, কিছুতেই ছেঁড়া যাইত না। বুড়ী চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'যেমন করিয়া বাঁধা ছিল তেমন করিয়া বাঁধা'—আমার গায়ে কি অসুরের বল যে সেরূপ আঁটিয়া বাঁধিতে পারিব? তথাপি প্রাণপণে দড়ি শক্ত করিয়া আঁটিয়া বাঁধিতে লাগিয়া গেলাম, বুড়ী ক্রমাগত "হইল না" বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া "হায় হায়" করিতে লাগিল। আমার হাত লাল হইয়া গেল, তারপর দুই একটি স্থান হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সেই সময় তরুণী আসিয়া বলিল, "ও কি? আপনার হাত দিয়া যে রক্ত বাহির হইতেছে! একটা দিক দিন আমাকে, আমি গয়লার মেয়ে, আমার হাত আপনার অপেক্ষা শক্ত", এই বলিয়া সে আসিয়া দড়ির এক দিক ধরিল। দুইজনে দড়ি টানিতে লাগিলাম। মাথা নীচু করিয়া খুব জোরে দড়ি টানিবার সময় দুই একবার তাহার কপালের সিন্দুর আমার হাতে লাগিল। তাহার সেই পবিত্র চিহ্নের দাগ হাতে করিয়া আমি পুঁথির শেষ ডুরি বাঁধিয়া ফেলিলাম। মেয়েটি আসিয়া বলিল, 'উঃ আপনার হাতে কত রক্ত!' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'সবগুলি রক্ত নয়।' সে সিন্দুর চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইল। আমি যখন বাড়ী ফিরিব, তখন প্রায় তিনটা। মেয়েটি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের বাড়ীর পূর্বদিকের রাস্তা পর্যন্ত আসিল, তাহার পর যতই আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই সে একখানি ছবির মত বৃক্ষান্তরালে মিলাইয়া গেল।

এই সময় রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আমার সর্বদা পত্রব্যবহার চলিতেছিল। তিনি সর্বদাই আমাকে খুব উৎসাহ দিতেছিলেন। আমার কাজের অন্ত ছিল না। যে কয়দিন পুঁথি খুঁজিয়া বেড়াইতাম, সে কয়দিন ত' আহার-নিদ্রার ঠিক ছিল না, "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর"—এই অবস্থায় নৌকায়, তাঁবুতে, পর্ণকুটিরে যেদিন ভগবান যেরূপ জুটাইতেন, সেইভাবে আড্ডা করিয়া লইতাম। কিন্তু যখন বাড়ীতে থাকিতাম, তখন সন্ধ্যায় মেটে প্রদীপের ম্লান দীপ সম্মুখে করিয়া বসিতাম—কারণ কেরোসিন আমার চক্ষে সহ্য হইত না, সারা রাত মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখা পয়সায় কুলাইত না। সলিতাটি কাঠি দিয়া মাঝে মাঝে উস্‌কাইয়া দিয়া, গলিত তাম্রকূটপত্রের ন্যায় প্রাচীন পুঁথির পাতাগুলি ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পড়িতে থাকিতাম। এক একখানি পাতা পড়িতে দুই ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, কারণ যত রূপ পাখী ও চতুষ্পদের পা, ঠোঁট প্রভৃতি আছে, তত প্রকারের অদ্ভুত লিপি সেই সকল পুঁথিতে পাওয়া যাইত। আমি পড়িতাম

ও নোট করিয়া যাইতাম, রাত্রি আড়াইটা বাজিলে আমার স্ত্রী চারটি পোলাও চড়াইয়া দিতেন, কিছু কিছু মাংস পূর্বেই রাঁধা থাকিত। তিনটার সময় পুঁথি বন্ধ করিয়া চারিটার মধ্যে ঐ রান্না খাইয়া শুইয়া পড়িতাম। আর বেলা সাড়ে আটটার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া বাহির ঘরে আসিয়া দেখিতাম বহুলোক অপেক্ষা করিতেছেন, কারণ সেখানে আমার খুব নাম পড়িয়া গিয়াছিল—আমি একজন ভালো জ্যোতিষী, কোষ্ঠী দেখাইবার জন্য ও নূতন কোষ্ঠী করিবার জন্য বহু লোক আসিতেন, তাহার মধ্যে ডেপুটি সবজজ ও মুন্সেফেরা এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিতেন। তাঁহাদের বান্ধবতার ঋণ শোধ করিতে আমার কম শ্রম স্বীকার করিতে হইত না। ইহা ছাড়া ইংরাজীতে রিপোর্ট ভাল লিখিতে পারি বলিয়াও আমার একটা নাম পড়িয়া গিয়াছিল, যেহেতু আমি খুড়া কালীশংকরবাবুর সেটেলমেণ্টের রিপোর্ট লিখিয়া দিতাম। কাহারও কাজ গিয়াছে, কাহারও কাজ চাই, কাহারও কৈফিয়তের জবাব দিতে হইবে, কাহারও বা সরকারী কার্যোপলক্ষে ভ্রমণবৃত্তান্ত-আদি দাখিল করিতে হইবে, এইভাবে রিপোর্ট লিখিবার উমেদার আমার নিকট অনেকে আসিতেন। তাঁহাদের পদধূলির সম্মান রাখিতে যাইয়া অনেক সময় আহারের অবসর পাইতাম না, স্কুলে যাইবার সময় তাঁহারা পায়ে পায়ে হাঁটিতেন। এইরূপ বিচিত্র রকমের কাজের তাড়ায় আমি এতটা ব্যস্ত হইয়াছিলাম এবং গৃহে নানারূপ কলহ ও অশান্তিতে এতটা বিরক্ত থাকিতাম, যে আমার শরীর যেন কাজের বোঝা আর বহন করিতে চাহিত না।

ইহার মধ্যে আমার মাতুলেরা বহু ঋণগ্রস্ত হইয়া সর্বস্বান্ত হইবার মধ্যে আসিলেন। মাতুল চন্দ্রমোহন সেন মহাশয় ঢাকা জেলা কোর্টে নামেমাত্র ওকালতি করিতেন ; তাঁহার অর্থ উপার্জনের কোনই প্রয়োজন ছিল না ; যদি সম্পত্তির সামান্য একটু অংশ ছাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন এবং তাহাতে সম্পত্তির যেটুকু ক্ষতি হইত তাহা এত ক্ষুদ্র যে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু জমিদারীর কোনো অংশ বিক্রয় করার পরামর্শ দিলে তিনি বলিতেন, 'তোমরা অঙ্গচ্ছেদ (amputation) করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে চাও, আমি তাহাতে রাজি নই'। এক একবার জমিজমা বিক্রয় করিবেন বলিয়া বাহিরে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহা শুধুই মৌখিক। এইরূপ এক মুহূর্তে তিনি আমায় লিখিয়া পাঠান, 'তুমি শীঘ্র ছুটি লইয়া আসিবে, এবং ভাওয়াল এস্টেট আমার জমিদারীর কতকটা অংশ ক্রয় করিতে সম্মত হন কিনা, এবং দর সম্বন্ধে তোমার চেষ্টায় আমার পক্ষে কিছু অনুকূলতা হয় কিনা, কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা সেই চেষ্টা করিয়া দেখিবে।' ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তখন জয়দেবপুরে ছিলেন, আমি আমার পাঁচ বৎসরের শিশু কিরণচন্দ্রকে লইয়া ঢাকায় রওনা হইলাম। কিরণকে কালীপ্রসন্নবাবু ক্রোড়ে লইয়া 'অধ্যাপক' উপাধি দিয়াছিলেন, ইহা তাহার অবশ্যই স্মরণ নাই, কিন্তু তাহার জীবনে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

মাতুলের যে এরূপ সুমতি হইয়াছে ইহাতে আমরা আনন্দিত হইলাম। জয়দেবপুরে বেলা ৯টার সময় পৌঁছিলাম। রায়বাহাদুর বহু যত্ন করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন, দিনের বেলায় কাজকর্মের ভিড়। রাত্রে তাঁহার সঙ্গে সব বিষয়ে

আলাপ হইবে, এই ঠিক করিলেন। রাত্রি ৮টা হইতে প্রায় ২টা পর্যন্ত আমরা কথোপকথন করিয়াছিলাম। বাংলাদেশে তাঁহার মত কথাবার্তা বলার প্রতিভা আমি আর কাহারও দেখি না, তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মী ছিলেন, কথা বলিবার সময় মনস্বিতায় তাঁহার বৃহৎ চোখ দুটি যেন জ্বলিয়া উঠিত; দুইটি সুন্দর ঠোঁট উৎসাহিত ভাবে কথা বলিবার সময় যেন একটু একটু কাঁপিত, কোন বেগবান নদী-স্রোত পুষ্পিত লতার উপর বহিয়া গেলে যেরূপ কাঁপে। যাহা বলিতেন তাহা বড় বড় সমাসবদ্ধ শব্দে ঠিক পণ্ডিতের লিখিত ভাষার মত শুনাইত, প্রভেদ এই যে তাহা প্রাণের আবেগ বহন করিত। আভিধানিক শব্দগুলি তাঁহার ক্রীড়াকন্দুকের মত ছিল। তাঁহার ধনুতে জ্যা দিবার শক্তি অন্য কাহারও ছিল না; গাণ্ডীব যেরূপ পার্থের, বীণা যেরূপ নারদের, তাঁহার ভাষা সেইরূপ তাঁহারই ছিল। তাহা অনুকরণকারীর নৈরাশ্য ও শ্রোতার চির-বিস্ময়। মাতুলের সম্পত্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিয়া তিনি সাহিত্যের কথা পাড়িলেন। চৈতন্য সম্বন্ধে বলিলেন, 'মানুষ স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাসে, সেই ভালবাসায় ছন্ন হইয়া যায় তাহা দেখিয়াছি, কাব্য-নাটকে নায়ক নায়িকার প্রেম নানা সৌন্দর্যজালে জড়িত করিয়া কবিগণ উপস্থিত করেন, দেখিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরকে, অদৃশ্যকে যে মানুষ সেই স্ত্রীপুত্র হইতে শতগুণ বেশী ভালবাসিতে পারে, ইহা একমাত্র চৈতন্যদেব জগতে প্রমাণ করিয়াছেন।' এই কথা তিনি "ভক্তির জয়" পুস্তকে শেষে লিখিয়াছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি এত অনুরাগী কিসে হইলে?'

আমি বলিলাম, 'বৈষ্ণব কবিদের মানের পালা শুনিয়াছেন, তাহা প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গীত হইয়া থাকে। কলহান্তরিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, মাথুর, অভিসার, পূর্বরাগ ইহার প্রত্যেকটি এক-একটি সুদীর্ঘ পালা। অন্যান্য কবিরা নায়ক-নায়িকার কলহ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নিছক ক্রোধের অভিনয়। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর যখন পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা দেখাইয়াছেন, প্রেমে পড়িয়া পরস্পরকে খুন করা যায়, অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা যায়। সুতরাং সেই সকল কাব্যের প্রেম-দেবতা অনেক সময় ভূতাশ্রিত হন।

কিন্তু বৈষ্ণব কবি-বর্ণিত প্রেমে ক্রোধ মানরূপে ধরা দেয়। উহাতে প্রেমই ক্রোধের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়, উহা যতটা আঘাত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইতে অধিক আঘাত নিজে পায়, উহার প্রধান অস্ত্রশস্ত্র ফুল দিয়া গড়া। বৈষ্ণব কবি-বর্ণিত প্রেমে চির পরিত্যাগের নাম মাথুর, উহাতে নাকি প্রেমকে যত পুষ্ট করে, এরূপ আর কিছুতেই করে না। বৈষ্ণব কবির প্রেমে ক্রুর ঠাট্টা ও ব্যঙ্গোক্তির অভাব নাই, কিন্তু সে যেন ফুল দিয়া শূল তৈয়ারী করা। এক কথায় বৈষ্ণবের কাব্যে রাগ, দ্বেষ, কলহ, পরিত্যাগ সকলই আছে, কিন্তু তাহা পার্থিব রাজ্যের নহে; তাহা ঊর্ধ্বলোকের। সেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়—প্রেমের স্বগণ, সেগুলি অসুর-প্রকৃতি ভুলিয়া দেব-প্রকৃতি হইয়াছে। এই পালাগুলির মধ্যে নাট্য শিল্প, কলাকৌশল, সমস্তই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, কিন্তু তাহাতে হিংসা, দ্বেষ, দেনাপাওনার হিসাব প্রভৃতি 'বাজারে' রকমের কিছু নাই। এ যেন যুঁথি, জাতী, কুন্দ, বেলী ও মালতীর বাগান, বিচিত্রতায় সুন্দর; কোনটি শ্বেত, কোনটি লাল, কোনটি নীলাভ, কিন্তু সবগুলি ফুল। কাহারো গন্ধ

তীব্র, কাহারো গন্ধ মৃদু, কিন্তু সবগুলি ফুল—এরূপ নিছক প্রেমের রাজ্য আর কোন্ সাহিত্যে আছে কিনা, তাহা আমি জানি না।'

কালীপ্রসন্নবাবু আমার কথায় সুখী হইলেন। তারপর বঙ্কিমবাবুর কথা পাড়িলেন এবং বলিলেন, "দেখ—আমি পূর্ববঙ্গের লোক বলিয়া ওদিককার সমস্ত লেখকই আমাকে ঈর্ষা করিতেন। কেবল বঙ্কিমবাবু আমার প্রতি উদার ভাব দেখাইতেন। কিন্তু তাও প্রথম প্রথম। 'বান্ধবের' যশ-বিস্তার হইলে তাঁহার সাহিত্য-চক্রে ভ্রমণশীল জ্যোতিষ্কগণের প্ররোচনায় তিনিও শেষটা আমার প্রতি বিরুদ্ধ হইলেন। একবার আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম, তখন ইঁহারা দস্তুরমত আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রটি পাকাইয়া তুলিয়াছেন। আমার লেখার প্রণালী—যাহাতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশী থাকে—তাহা লইয়া আমাকে জব্দ করিবার অভিসন্ধি হইল। বঙ্কিমবাবু আমাকে একটা নির্দিষ্ট দিন প্রাতে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সেখানে যাইয়া দেখি, চন্দ্রবাবু, চন্দ্রশেখরবাবু, মাস্টার হরপ্রসাদ (বোধ হয়, বয়সে অল্প থাকার দরুন শাস্ত্রীমহাশয়কে ইনি প্রায়ই আমাদের কাছে 'মাস্টার' বলিয়া উল্লেখ করিতেন) প্রভৃতি অনেক সাহিত্যিক বসিয়া আছেন। আমি বুঝিলাম, বাঙালের বিরুদ্ধে দস্তুরমত একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছে। আমি যাওয়ার পর বঙ্কিমবাবু একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, 'এইটিতে স্বাক্ষর করুন'। আমি দেখিলাম, সেইটির নীচে অপরাপর সাহিত্যিকদের সহি রহিয়াছে। আমি উহা পড়িয়া দেখিলাম, তাহাতে লিখিত আছে 'সর্বসাধারণ যেরূপ লেখা বুঝিতে পারে, সেইরূপ লেখাই যুক্তিযুক্ত'। আমি বলিলাম, 'ইহাতে আমি কি করিয়া সহি করিব? ধরুন, যদি দার্শনিক কথা লিখিতে হয়, তবে তাহার পরিভাষা আছে, তাহা সর্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে না। কেহ যদি বেদ সম্বন্ধে লিখেন, কিংবা অলংকারশাস্ত্র লইয়া বই লেখেন, তবে কি তাহা শিশুর বোধগম্য হইবে?' এই বলিয়া তাঁহাদের কাগজটায় আমি আর একটি সূত্র লিখিলাম—'উদ্দিষ্ট বিষয়ের অনুযায়ী ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করা উচিত।' এবং সেই লেখাটার নীচে সকলকে স্বাক্ষর করিতে আহ্বান করিলাম, একটা তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল ও গোলমালে সভাটি ভাঙিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে বঙ্কিমবাবু আমাকে বলিলেন 'ওহে, তুমি যে পদ্মাপার হইতে আসিয়া এত শীঘ্র আমাদের দুর্গটা জয় করিয়া যাইবে, ইহারা তাহা হইতে দিবে না।'

আমি জয়দেবপুর হইতে কুমিল্লা হইয়া ঢাকায় চলিয়া আসিলাম। আমার মামাত এক ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম সরোজিনী। তাঁহার মত সুন্দরী মেয়ে বাংলাদেশে অল্পই ছিল, আমি তো এ পর্যন্ত দেখি নাই। কীর্তিপাশার জমিদার অনারেব্‌ল বিনোদকুমার সেন সেই মেয়েকে দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন বিনোদের বয়স ১৯।২০; তাঁহাদের পরিবারে কুলীন ছাড়া অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহাদি হইত না। আমার মামারা কুলীন ছিলেন না, কিন্তু বিনোদ সুন্দরী খুঁজিয়া বাংলাদেশময় ঘুরিতেছিলেন, সরোজিনীর মত সুন্দরী তিনি দেখেন নাই। তাঁহার সম্পত্তির আয় বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা। তিনি এরূপ সকল সংকল্প প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার গুরুজনেরা শেষে এই বিবাহে রাজী হইয়াছিলেন।

১৭

কলিকাতায় এক মাস

এই বিবাহোপলক্ষে আমাকে বরিশাল যাইতে হইয়াছিল। তাহার পর কলিকাতা হইয়া কুমিল্লা ফিরিয়া আসি। কিন্তু এক মাস কাল কলিকাতায় ছিলাম, সে ১৮৯১ সনে। তখন জ্যৈষ্ঠমাস; আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে কোন কাজ পাই কিনা, এই চেষ্টায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। বাদুড়বাগানের বাড়ীতে মাঝের একটা দ্বিতল ঘরে, চারিদিকে পুস্তকের আলমারি, মধ্যে একখানি টেবিল, তাহার ধারে খানকতক চেয়ার, বিদ্যাসাগর তাহার একখানিতে বসিয়া মাথা গুঁজিয়া কি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। আমার মামাতো ভাই মতিলাল ও আমি দুজনে গিয়াছিলাম। আমরা দু'জনে তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে গেলাম, তিনি যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইতে লাগিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই আমাদের পায়ের ধুলা লওয়া হইয়া গিয়াছে। আমরা তরুণ যুবক, তাঁহার মুখে 'তুই' সম্বোধন মিষ্ট লাগিল। বলিলেন, 'কি চাস্?' আমি চাকুরি প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'বাড়ী কোথায়?' ঢাকা জেলায় বাড়ী শুনিয়া বলিলেন, 'তাই তো তুই যে বাঙাল, তা তো তোর কথার টানেই বুঝিতে পারিয়াছি। এখানকার ছাত্র তোর টিপ্রা জেলার ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্র নয় যে তুই অনার্স্ পাশ শুনিয়া চমকিয়া উঠিবে। এখানে বড় বড় ওস্তাদ শিক্ষকেরা ঘায়েল হইয়া যায়, তাহারা ক্লাস সামলাইয়া উঠিতে পারে না; তুই বাঙাল, তোকে তো একদিনে পাগল করিয়া ছাড়িবে।'

আমি বলিলাম, 'ক্লাস পড়াতে দিয়ে দেখুন না, বেশ তো, দেখি আপনার ছেলেরা বাঙালকে কি করে ঘায়েল করতে পারে?'

বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'তোর তো বেশ সাহস আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, তুই পারবি। বাঙালের কর্ম নয়; যাহোক তুই যখন চাচ্ছিস্, আজ শনিবার। তুই সোমবার দিন ১১টার সময় মেট্রোপলিটান স্কুলে যাস। আমি সেই সময় যাব। তোকে ক্লাস পড়াতে দেব।'

পার্টিশনের পর হইতে বাঙালের উপর এদিককার লোকদের উপদ্রব কতকটা কমিয়া গিয়াছে, নতুবা ময়নামতীর গানের কবি হইতে চৈতন্যদেব, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি সকলেই তো বাঙাল লইয়া খুব মজা করিয়া আসিয়াছেন, রঙ্গমঞ্চেও বাঙাল না হইলে তো অর্ধেক আমোদই মাটি।

যদিও শুনিলাম বাঙাল মাস্টার মেট্রোপলিটানে বড় আমল পায় নাই, তথাপি আমার একটু ভয় হইল না। সোমবার দিন যথাসময়ে স্কুলে গেলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পরে উড়িয়াবাহকের স্কন্ধারূঢ় একখানি পালকি স্কুলের গেটে আসিয়া হাজির। তাহার মধ্য হইতে টাক-বিরলকেশ, চটি পায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাহির হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'চল, তোকে হেডমাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দি।' হেডমাস্টার মহাশয়কে ডাকাইয়া তিনি লাইব্রেরীরুমে আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, 'তুমি একে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে

পড়াইতে দাও।' হেডমাস্টার বাবু বলিলেন, 'আপনি দেখছি ছেলেমানুষ, কি পড়াবেন?' আমি বলিলাম, 'ইংরাজি ও ইতিহাস'। প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজী পড়াইলাম,—আমার ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল—ছেলেরা আমার কথাগুলি স্তব্ধ হইয়া শুনিল—বোধ হইল যেন তাহাদের খুব ভাল লাগিল। কিন্তু শেষ কালে আমি বলিলাম, 'তোমাদের পড়া দেখিতেছি খুবই কম হইয়াছে, পরীক্ষা নিকটবর্তী—কি করিয়া সবটা শেষ করিবে? যিনি ইংরাজী পড়ান, তিনি বেশ হিসাব ঠিক করিয়া পড়ান নাই।' এই বলিয়া যেই বাহির হইব, দেখিলাম দরজার পাশে হেড-মাষ্টার চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আমার পড়ানো শুনিতেছিলেন। তিনিই প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজী পড়াইতেন। সুতরাং আমি আমার শেষ মন্তব্যটিতে তাঁহাকে যে একটু ঘা দিয়াছি, তাহা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে ভাবিয়া একটু শঙ্কিত হইলাম। তাহার পরের ঘণ্টায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস পড়াইলাম। উভয় শ্রেণীর ছাত্রেরাই যে আমার পড়ানোতে বিশেষ প্রীত হইয়াছিল, তাহা আমি সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম। সুতরাং পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার খুব গর্বভরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুবিখ্যাত চটিলগ্ন পাদযুগ্ম বন্দনা করিয়া স্মিতমুখে তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন—তাহাতে হেড-মাষ্টার লিখিয়াছেন—"প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রেরা খুশি হয় নাই, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ ভালই বলিয়াছে।"

আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, 'এ সকল আপনার হেড-মাষ্টারের চালাকি, চলুন আপনি নিজে ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারা যদি না বলে যে আমি আপনার হেড-মাষ্টার অপেক্ষা ইংরাজী ভাল পড়াইয়াছি তবে আমি কোন কাজ চাই না। হেড-মাষ্টার নিজে ছেলেদের পড়া সম্বন্ধে কতকটা শিথিল, তাহাই বলিয়াছিলাম। ইহা যে তিনি দূতীর মত কপাটের আড়াল হইতে শুনিবেন, ইহা আমি জানিতাম না—এই জন্য রাগ করিয়া ঐ রিপোর্ট দিয়াছেন।' বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'তোর ভিতর তেজ আছে, তুই পারবি। অন্ততঃ একটা ক্লাসে তো খুসি করেছিস। হেড-মাষ্টার নিজে লিখেছে—আমি তা প্রত্যাশা করি নাই। বাঙাল মাষ্টার পেলে তো ছেলেরা তাকে লাঙ্গুর মতো ব্যবহার করে। যা হোক, আমি আর কোন খোঁজ নেব না, তোকে যোগ্য মনে করলাম। কিন্তু তোর পূর্বে পাঁচ ছয় জন যোগ্যতা দেখিয়েছেন—এই দেখ্ তাদের নাম। এরা কাজ পেলে তুই পাবি। আর দেড় মাস দু মাস পরে আমি তোকে নিতে পারব। তুই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করিস্।'

আমি বলিলাম, 'আমার যে কুমিল্লার স্কুল খুলেছে। আমায় ২।১ দিনের মধ্যে যেতে হবে। আপনি আমায় কাজ খালি হলে চিঠি লিখবেন।' তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'সে হবে না, তোর এখানে থাকতে হবে। এখানে চাকরি প্রার্থী এত লোক আছে যে কাজ খালি পড়লে তোকে কুমিল্লা থেকে চিঠি লিখে আনবার সবুর সইবে না। বিশেষ দশ পনের দিন ক্লাসে পড়া বন্ধ রাখতে পারব না। তুই সেই চাকুরি ইস্তফা দিয়ে যদি এখানে থাকতে পারিস, তবে দুই মাসের মধ্যে কাজ পাবি, এটি আমি বলতে পারি।'

আমি বলিলাম, 'আগেই সেখানকার কাজ আমি ছেড়ে দিতে পারব না। বিশেষ

আমার সেখানে একটা দায়িত্ব আছে। সেখানকার একটা ব্যবস্থা ক'রে তো ছেড়ে দিতে হবে।'

তিনি বলিলেন, 'তবে আমি আর কি করব?' আমি পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ইহার পর কলিকাতায় দুই তিন দিন ছিলাম। আমার মাসীমা তখন কলিকাতায় ছিলেন। আমার মাসতুত ভাই জগদীশ বাবু প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রফেসরী করিতেন ও ছোট ভাই গিরীশ ও হেম এখানে বি. এ. পড়িত। সেই বাড়ীতে তখন ষোল সতের বৎসরের আর একটি যুবক থাকিতেন। ইনি আমার স্ত্রীর আপন মামাতো ভাই, এখন ইনি মিস্টার জে. এন. রায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি তখন বিলাত যাওয়ার জন্য সবে পাখা ঝাপটাইতেছিলেন, এবং অনর্গল ইংরাজী কহিয়া ও বাংলা কবিতা লিখিয়া, কখনও বা এক পায়ে জুতার এক পাটি, আর এক পায়ে অন্য জুতার আর এক পাটি পরিয়া শহর ভ্রমণপূর্বক নানা বিচিত্র ভাবে সেই বয়সেই উদীয়মান প্রতিভার প্রমাণ দিতেছিলেন। তিনি যে এ জগতে একটা কান্ড না করিয়া ছাড়িবেন না, তাহা আমরা তখনই জানিতাম। তাঁহার প্রতিভা কর্ম-ক্ষেত্রে আজ শত নক্ষত্রের আলোকে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই বাড়ীতে একদিন আমি খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় আমার মাসীমা বলিলেন, 'তুই হাঁ কর দেখি, তোর গলার মধ্যে কি একটা দেখা যাচ্ছে—খুব বড় হাঁ কর'। যাঁহাতক আমি সেইরূপ হাঁ করিয়াছি, অমনই আমার গলার ভিতর তিনি আধ-কোয়া কমলা লেবু ও এক ফালি আম প্রবেশ করাইয়া দিলেন, এবং আমি ভাল করিয়া অবস্থাটি বুঝিবার পূর্বেই তাহা গিলিয়া ফেলিলাম। তাহার পর আমার দুই চোখ হইতে অজস্র অশ্রু পড়িতে লাগিল, আমি বলিলাম, 'ছোট মাসী, তুমি কি করিলে, মা মরিয়াছেন আজ এই চার বছর, এই কয়েক বছর কমলালেবুর জায়গা শ্রীহট্টে থাকিয়াও আমি লেবু খাই নাই। এই চার বছর আমি আম খাই নাই, আর জীবনে খাইব না, এই সংকল্প করিয়াছিলাম। তুমি আমার সংকল্প ভাঙিলে।' মাসীমা বলিলেন, 'আমি তোর মায়ের চাইতে কম কিরে? আমার বাড়ীতে এত আম আসে—আর তুই শোকের জন্য আম না খেয়ে থাক্‌বি, এ কি আমার সহ্য হয়?' কলিকাতায় অসময়েও লেবু পাওয়া যায়—এই জন্য দুই ফল সম্বন্ধেই তিনি আমার সংকল্প ভাঙিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে কুমিল্লায় ফিরিবার পূর্বে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিব, পূর্বেই তাহা স্থির করিয়াছিলাম। এই জন্য বঙ্কিম বাবুর বন্ধু কালীপ্রসন্ন সরকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলাম। কালীপ্রসন্ন বাবু গীতার ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিলেন, আমি এ বিষয়ে তাঁহাকে কতকটা সাহায্য করিয়াছিলাম। কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার চিঠিতে সে কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমার মামাতো ভাই মতিলাল ও আমি একদিন বেলা দুইটার সময় প্রতাপ চাটুয্যের গলিতে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। যে বাড়ীটা বঙ্কিমবাবুর বাড়ী বলিয়া জানিতে পারিলাম, তাহার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া খুব চিৎকার শুনিতে পাইলাম। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, এক নগ্ন দেহ গৌরবর্ণ বৃদ্ধ তৎসকাশে দণ্ডায়মান একটি নীরব নত-মস্তক ভৃত্যকে অনর্গল বকুনি দিয়া

যাইতেছেন। আমরা দুরজায় উঁকি মারিয়া দাঁড়াইয়াছি দেখিয়া তিনি খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কাকে চান?' আমি বলিলাম, 'বঙ্কিমবাবুকে'। তিনি বলিলেন, 'কোত্থেকে এসেছেন, কি দরকার?' আমরা উত্তরে বলিলাম, 'কুমিল্লা থেকে এসেছি, শুধু তাঁকে দেখব বলে।' বৃদ্ধটি দক্ষিণ দিকের সিঁড়িটা দেখাইয়া বলিলেন, 'ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে যাইয়া অপেক্ষা করুন।'

আমরা উপরে যাইয়া দেখিলাম, একখানি নাতিবৃহৎ ঘর, তাহার একদিকে একখানি টেবিল ও তাহার চার দিকে খান কতক চেয়ার! ঘরে আসবাবের বাহুল্য নাই—যদিও ইহা বৈঠকখানা বলিয়াই বোধ হইল। আমরা বসিবার ২।৩ মিনিট পরেই দেখিলাম, সেই বৃদ্ধ একটা জামা গায়ে চড়াইয়া সভ্যভব্য হইয়া আসিলেন, তিনিই যে বঙ্কিম বাবু তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার গোঁফ দাড়ি কামানো রংটি বেশ ফরসা, মুখের হাঁ একটু বড়, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল কিন্তু বড় নহে; দীর্ঘাকৃতি, তিনি আসিয়া এক খানি চেয়ারে বসিয়া হাত বাড়াইয়া কালী বাবুর পত্রখানি লইয়া পড়িলেন, এবং তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুমিল্লার জলবায়ু, ধান চালের অবস্থা, লোকসংখ্যা, স্কুল কলেজের কথা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই আলাপ চলিল। যতবার আমি সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম, ততবার তিনি সে কথা এড়াইয়া ধান্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্নের অবতারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার তাঁহার লেখনী-নিঃসৃত কত প্রতিভা-দীপ্ত রচনার কথাই মনে পড়িতে লাগিল—একবার মনে হইল—"ধীরে রজনী ধীরে, অন্ধ অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ, বিকলা অথচ শীর্ণা, দূরাগত রাগিণীর ন্যায়, অর্ধবিকশিত কুসুম সুরভির ন্যায় রজনী ধীরে ধীরে জলে নামিতেছে।" আর একবার মনে পড়িল, "কোকিল তুই একবার ডাক দেখিরে, কণ্ঠ নাই বলিয়া আমি আমার মনের কথা বলিতে পারিলাম না"—এবং পুনরায় "শোন ওসমান, আবার বলি, এ বন্দী আমার প্রাণেশ্বর" প্রভৃতি কত ছত্র মনে পড়িল। শার্দুল চর্ম পরিহিত জীবন্ত শার্দুলের ন্যায় কাপালিককে মনে পড়িল। অগ্নিদেব যাহার "পা দুখানিকে কাষ্ঠ ভ্রমে চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিছু মাত্র রস না পাইয়া অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছেন" সেই "সহর্ণেঘঃ" পাঠনিরত দিগ্‌গজকে মনে পড়িল; এলায়িত-কেশা, বনলক্ষ্মীর ন্যায় নির্জন সমুদ্র তীরে কপালকুণ্ডলার বীণাকণ্ঠ "পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ" প্রভৃতি মনে পড়িল,—আমার, বড় ইচ্ছা সাহিত্য প্রসঙ্গে ইঁহার সঙ্গে কিছুকাল আলাপ করি। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর শৈল-কঠিন গাম্ভীর্য বোধ হয় আমার পদ্মাপারী কথার টানে আরও জমাট হইয়া উঠিতেছিল; তিনি যেন মনে করিলেন, আমি একটি কৃষক যুবক, সুতরাং লাঙল, ফাল ও চাষাবাদের কথা ছাড়া আর কিছু বলিবার উপযুক্ত নহি। বিষবৃক্ষ ও কপাল-কুণ্ডলার লেখক আমার নিকট এইরূপে দেখা দিলেন; আমি ভাবিয়াছিলাম যদি একবার সাহিত্যের কথা আমার সঙ্গে পাড়িতেন, তাহা হইলে মারলোর ফস্টাস ও শিলারের এপিসিকাইডন হইতে কবিতা আওড়াইয়া তাঁহাকে আমি আমার বিক্রম দেখাইয়া দিতাম,—চণ্ডীদাস—বিদ্যাপতি—গোবিন্দদাস যে গীতি-কবিতার রাজা তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে বিস্ময় ও প্রীতির স্তোক-বাক্য

আদায় করিয়া লইতাম। কিন্তু তিনি আমাকে সে সুযোগ দিলেন না। তিনি শুধু বই লিখিয়াই সাহিত্য-সম্রাট, না কথাবার্তায়ও সাহিত্যরস প্রচুর দিতে পারেন তাহা বুঝিবার সুবিধা পাইলাম না। বঙ্কিমবাবুকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম কিন্তু তাঁহার বই পড়িয়া তাঁহাকে যেরূপ মনে মনে আঁকিয়াছিলাম, সে আমার ধ্যান-লোকের বঙ্কিমবাবুর কোনই আভাস সাক্ষাৎকারে পাইলাম না, সুতরাং সাক্ষাৎ বিফল হইল।

আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম, রামদয়াল আর ঠিক তেমন নাই; সাহিত্যিক কথা লইয়া যে দিনরাত থাকিত, সে শুধু ধর্মকর্ম করিয়া বেড়াইতেছে। আর্যমিশন ইনস্টিটিউশনের সে হেডমাষ্টার হইয়াছে, তাহার স্বত্বাধিকারী পঞ্চানন বাবুর নিকট সে দীক্ষা লইয়াছে। এদিকে মহাকালী পাঠশালার মাতাজী এবং আর একটি নবীনা বাঙালী মাতাজী, এই দুই জনে তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। সে এমন সকল কথা বলিতে লাগিল, যাহা আমাদের মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায়। বাঙালী মাতাজীর সঙ্গে সে আমার পরিচয় করাইয়া দিল; আমার ইতিপূর্বে বিশ্বাস ছিল—স্ত্রীলোক ভালবাসার জিনিস, পূজার জিনিস। তিনি সুখদুঃখের সঙ্গিনী হইতে পারেন, পালন করিতে পারেন, নিতান্ত ধীর-বুদ্ধি ব্যক্তিকেও কবিত্ব-কল্পনা দিয়া স্বপ্নাবিষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা ও গুরুতর চিন্তাশীলতায় তিনি কখনই পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন না। মাতাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া আমার সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। এক একদিন সন্ধ্যা হইতে শুরু করিয়া রাত্রি একটা পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছি; তাঁহার কল্পনাশক্তি অদ্ভুত ছিল, বুদ্ধি ক্ষুরধার ছিল। ভাব-রাজ্যের তিনি রানী ছিলেন। তিনি আমার সামান্য গুণের পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে সাংসারিক এই ধূলিকণাময়, বৈষয়িক বিষয়ে লিপ্ত, হিসাব নিকাশ সমাবৃত ভবের বাজারের কেউ বলিয়া মনে করিতাম না; যেমন সপ্ততন্ত্রীর অতি উচ্চ সুর, তাহা কোকিলের পঞ্চম স্বরের উপরে ওঠে, যেমন পদ্মের সুরভি, মালতী, বেলা প্রভৃতির সুগন্ধকে অতিক্রম করিয়া তাহা ঊর্ধ্বলোকে চলিয়া যায়, তেমনই ছিল তাঁর জীবন; তাহা সংসার ছাপাইয়া কেবলই স্বর্গরাজ্যের কথা লইয়া থাকিত। জীবনে আরও দুই জন স্ত্রীলোককে আমি মানসপটে খুব বড় রেখায় আঁকিয়াছি, কিন্তু ভাব-জগতের এই সম্রাজ্ঞী—তাঁহার স্বস্থানে অদ্বিতীয়। ভক্তির কথা বলিতে যাইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে দিন অতিবাহিত হইয়া যাইত, রাত অতিবাহিত হইয়া যাইত; মনোহরসাই কীর্তনের মত তাহা আমায় আকর্ষণ করিত—তাঁহার যোগশাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞান ছিল—আমার মাতুলালয়ের সকলেই তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিল, শুনিয়াছি তাঁহার কতকগুলি অসামান্য শক্তি হইয়াছিল, সে সকল বিভূতি আমি দেখিতে চাহিতাম না। আমি তাঁহার নিকট দীক্ষা লই নাই, আমি যোগতত্ত্ব শুনিতে চাহিতাম না, তাঁহার ভাব ও ভক্তির কথার আবেগে ঝঞ্ঝাতাড়িত ফুলটির মত আমার মন কোথায় উড়িয়া যাইত; তিনি বলিতেন, 'দীনেশ, তুই আমার নিকট দীক্ষা নিলি না, তবু তোকে আমার যত ভাল লাগে—শিষ্যদের কারুকে তেমন লাগে না'। এই কথায় আমি ধন্য হইয়া যাইতাম। সংস্কৃত গীতাটি সমস্ত এবং উপনিষদ্‌গুলির বহু অংশ তাঁহার মুখস্থ

ছিল। শিউলি ফুল যেরূপ প্রভাতবায়ুতে টপ টপ করিয়া মাটিতে পড়ে, তাঁহার কথার মধ্যে সেইরূপ ব্যাখ্যার সঙ্গে সেই শ্লোকগুলি অজস্র ঝরিয়া পড়িত।

রামদয়ালকে একদিন আমি বলিলাম, 'দেখ দায়ু, আমি কুমিল্লায় বড় কষ্টে দিন কাটাইয়া থাকি, কতকগুলি জীর্ণ পুঁথি আমার সম্বল, আমি ইংরাজী পড়া ছাড়িয়া দিয়াছি। পৃথিবীতে আসার পর মা আমায় যে ভাষা শিখাইয়াছিলেন, আমি তাহারই অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছি; সেই ভাষার কবিরা আমাকে আনন্দ ও ভাব দিয়া থাকেন, নতুবা নানা কষ্টে আমি মরিয়া যাইতাম। আর এক আমার আশ্রয় আছে তোমার পত্র। তুমি পত্র লিখিলে আমার আবার শৈশবের সুখ-স্বপ্নগুলি ফিরিয়া পাই, জীবনের পবিত্র ব্রতগুলি, উচ্চ আদর্শসকল মনে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। মনে আছে গেটে প্রতিবৎসরের প্রথম দিন সিলারকে পত্র লিখিতেন, সিলার প্রতি বৎসর গেটেকে পত্র লিখিতেন। পরস্পরের পরিচয় হওয়ার পর হইতে আমরণ এই পত্রব্যবহার চালাইয়াছিলেন। তুমি প্রতিশ্রুত ছিলে যে আমরাও এইরূপ করিব। আজ আমি বড় কষ্টে পড়িয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। সংসার তো কেবলই পুরাতন কথা ভুলাইয়া দেয়। এই যখন আমরা দুজনে কথা বলিতেছি, ইহার মধ্যেই তো সময় একটা ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দিতেছে; তুমি আমি দূরে থাকিলে সপ্তাহে অন্তত তিনখানি চিঠি পরস্পরকে লিখিয়াছি, কিন্তু এখন তোমার চিঠি মাসে একখানির বেশী পাই না। হয়ত কালে পত্র লেখা লেখি একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। তোমার সেটা ক্ষতির কারণ না হইতে পারে, কারণ এখন তুমি ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছ; কিন্তু তোমার চিঠি না পাইলে আমি কোন্ অধঃপাতে যাইব তাহার ঠিক নাই, হয়ত আত্মহত্যাও করিতে পারি। তোমার চিঠিতে অতীতের আদর্শের সঙ্গে আমার বর্তমান জীবনের যোগ রাখিয়াছে। যাহা হউক এস, আমরা আজ সেই পুরাতন প্রতিশ্রুতি পুনরায় দৃঢ় করি। অন্তত বৎসরের প্রথম দিন আমরা আমরণ পরস্পরকে চিঠি লিখিব।'

রামদয়াল বলিল, 'আমি সেরূপ প্রতিশ্রুতি আর দিতে পারিব না। আমি সাংসারিক কোন বিষয়েই আর পূর্বের মতন নাই, আমি একটা প্রতিশ্রুতির বোঝা মাথায় চাপাইয়া জীবনকে সাংসারিকতায় আবন্ধ করিতে পারিব না।'

আমি অনেক সাধিলাম, এমন কি চোখের জল ফেলিলাম, আবেদননিবেদনে কথাবার্তা করুণ করিয়া তুলিলাম; ভিক্ষা চাহিলাম কিন্তু নির্লিপ্ত যোগীর মন টলাইতে পারিলাম না। তখন রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম। তখন মনে হইল আমি সম্পূর্ণ একা, এ জগতে আমার কেহ নাই, যাহাকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিয়াছি, সে বৎসরে একখানা চিঠি লিখিবার ভার লইল না ; আমাকে ছাড়িয়া দিল। মাতাজীর নিকটে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম, তিনি বলিলেন, 'ও ঐ রকম কাঠখোট্টা, ওর মধ্যে এতটুকু রস নাই।' আমি কুমিল্লা আসিয়া দেখি রামদয়াল আমাকে চিঠি লিখিয়াছে, আর্যমিশন ইনস্টিটিউশনে আমাকে একটা কাজ দিয়াছে. বেতন কুমিল্লায় যাহা পাইতাম, তাহা অপেক্ষা ১০ টাকা বেশী। আমি লিখিলাম. 'আমি তোমার সঙ্গে একস্থানে কাজ করিতে পারিব না'—রামদয়ালের শত শত চিঠি পোড়াইয়া ফেলিলাম। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ভগবানের নিকট বলিলাম, 'আমাকে দুর্দিনে কে রক্ষা করিবে! পৃথিবীর সকলেই তো আমাকে একে একে ছাড়িয়া দিয়াছে—আমার মরিবার পথ

বলিয়া দাও, আমি কাহার মুখ চাহিয়া ভাল থাকিব? আমি ভাল হই, মন্দ হই, তাহাতে তো কাহারও আসে যায় না। কাহারও চক্ষু তো—আমি কাঁটাবনে চলিলাম কি ফুলবনে আসিলাম—তাহা দেখিবার নয়, আমি এখন কি করিব?' তখন চতুর্গুণ পরিশ্রম করিয়া বঙ্গভাষায় ইতিহাস লিখিতে লাগিলাম, চতুর্গুণ পরিশ্রম করিয়া পুথি খুঁজিতে লাগিলাম, প্রাণপাত করিব, এই হইল সংকল্প। এক হয় সাপের মুখে প্রাণ দিব, না হয় খাটিতে খাটিতে প্রাণ দিব। কেহই যখন চাহিল না, বৎসরে একখানি চিঠি লিখিবার ভার কেহই লইল না,—আমার জন্য যখন এতটুকু মমতা পৃথিবীর কাহারও নাই, তখন মরিয়াই শান্তিলাভ করিব। হে ভগবান, খাটিয়া খাটিয়া প্রাণ দিব। তুমি জগৎ হইতে আমার স্নেহ-মমতার পাট উঠাইয়া লইলে, কিন্তু তোমার পাদপদ্মে এই তুচ্ছ অকেজো জীবনটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিব। এই প্রার্থনা করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

১৭

কুমিল্লা-জীবনের শেষাঙ্ক

এই সময় চন্দ্রকান্ত শর্মা নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্টোরিয়া স্কুলে হেডপণ্ডিত হইয়া আসিলেন। রানীর দীঘির পাড়ে আমার বাসার নিকট তাঁহার বাসা। মনের যখন আমার এই অবস্থা, তখন একদিন শুনিলাম চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছেন—"শ্যাম-প্রেম সুখ-সাগরে আমি মীনের মতন ডুবে রইতাম সই।" গান আমার তখনকার ভাব-প্রবণ চিত্তে শেলের মত বিঁধিল, কণ্ঠস্বরটি কি সুন্দর! এমন সুন্দর স্বর আমি শুনি নাই, বৃদ্ধের কণ্ঠ ঠিক কিশোরীর কণ্ঠের ন্যায়। পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিয়া সেই গান আবার গাহিতে বলিলাম, তিনি কৃষ্ণকমলের সেই গানটি সমগ্র গাহিলেন। শ্যামপ্রেমের বড়াই করিয়া জীবন কাটাইয়াছি, শারদ-রৌদ্রের ন্যায় প্রতিকূল ব্যক্তিরা আমাকে দগ্ধ করিয়াছেন—কিন্তু "তখন শ্যাম নবজলধরে থাকত শীতল ছায়া করে,—আমার লাগত না সে তাপ গায়।" তারপর অক্রূর অগস্ত্য মুনির মত আসিয়া আমার সুখসাগর গণ্ডূষ করিয়া গ্রাস করিলেন, 'আমার হরে নিল ইন্দু, শুকাইল সিন্ধু—একবিন্দু না রাখিল।' তখন পণ্ডিতকে বিদায় করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলাম। আমাকেও তো ভগবান এত স্নেহ এত প্রেম দেখাইয়া সব হরণ করিয়া লইয়াছেন—একবিন্দুও রাখেন নাই।

সন্ধ্যাবেলা সপ্ত-রত্ন দেখিতে যাইতাম, কুমিল্লার পূর্বদিকে প্রায় এক মাইল হাঁটিয়া গেলে এই প্রাচীন মন্দির। তাহাতে যে কেহ উঠিতে পারেন, কিন্তু নামিবার পথ পাইবেন না। সিঁড়িগুলি এমনই আড়ালে আছে, যে, তাহা নিতান্ত পরিচিত না হইলে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবার নহে। আমি চোখ বুজিয়া ওঠানামা করিতে পারিতাম, যেহেতু রোজই আমি সেই মন্দিরের ঊর্ধ্বতলায় উঠিয়া চতুর্দিকের সেই মেঘের কোলে পাহাড়ের দৃশ্য দেখিতাম,— কোন হতভাগ্য ঊর্ধ্ব চূড়ার স্বর্ণ কলস চুরি করিবার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, সে খুব বড় বড় পেরেক পুঁতিয়া সেই মন্দির-গাত্র বাহিয়া উঠিয়াছিল। পেরেকগুলি এখনও পোঁতা আছে, কিন্তু লোক-লোচনের বিষয়ীভূত হইয়া তাহার পদস্খলন হইয়াছিল—তদবধি বিগ্রহকে সেখানে না রাখিয়া নিকটবর্তী মন্দিরে নেওয়া হইয়াছে। সম্মুখে দীঘি, তাহা এক-হাজার-এক কলসী গঙ্গা জলে পবিত্র করা হইয়াছিল। সেই দীঘির পার্শ্বে কয়েকখানি কুটির, তাহাতে একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাস করিত। আমি সেই সপ্তরত্নের উপরের তলায় উঠিয়া তাহার কুটিরের দিকে তাকাইতাম, সে একটি সারঙ্গ, কখনও বা একতারা লইয়া আমার কাছে আসিত; সে চণ্ডীদাসের পদ গান করিয়া আমার হৃদয় জুড়াইয়া দিত। "এ ঘোর যামিনী, মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে, আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে, দেখে যে পরাণ ফাটে,"—এই গানটি সে গাহিত, আর কাঁদিত। সে আমাকে ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিত। 'আমার মনে পাপের অন্ধকার, বাহিরে ভীষণ দুর্যোগ, পাপীর কাছে ভগবান নিত্য আসেন, কিন্তু তাঁহার পায়ে কাঁকর বিঁধে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া যায়—তথাপি তিনি আমার মন পাইবার জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করেন।' বৃদ্ধের সুর খুব মিষ্ট ছিল না,

কিন্তু তাহার ভক্তি এত বেশী ছিল যে, সে যখন গাহিত, "বঁধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া, মোর মন হেন করে, কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া অনল ভেজাই ঘরে" তখন যেন প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত, মনে হইত কেন গৃহের প্রাচীরের ভিতর চিরকাল মাথা খুঁড়িয়া মরিব—তার নাম গান করিতে মুক্ত বায়ুতে বাহির হইয়া পড়া যাক—লোকে যাহা বলিবার বলুক।

রোজই বৃদ্ধের গান শুনিতাম, রোজই তাহার ভক্তি দেখিয়া ধন্য হইতাম। সে ভক্তি-ধর্মের এরূপ বড় কথা আমাকে বলিত যে আমি অবাক হইয়া যাইতাম, অশিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহার অপেক্ষা বিস্ময়কর কিছু কল্পনা করিতে পারি নাই। একদিন এই ভক্তিমান বৈষ্ণবের কথা বলিয়া চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে সপ্তরত্নে লইয়া গেলাম। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে প্রথম গান গাহিতে বলা হইল, তাঁহার সুকণ্ঠ বীণাধ্বনির ন্যায় সেই নির্জন প্রদেশকে যেন ঝংকৃত করিয়া তুলিল। তাঁহার সুর মিষ্টত্বের খনি, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত ভক্তি তাহাতে বেশী ছিল না। তাঁহার সুর শুনিয়া বুড় বৈষ্ণব একেবারে ভীত আড়ষ্ট হইয়া গেল। সে কিছুতেই আর গাহিতে পারিল না। "দিবা প্রদীপবৎ" তাহার প্রতিভার লোপ পাইল। কিন্তু আমি বুঝিলাম, যে মহাদান সে আমাকে রোজ রোজ দিত,—তাহার কাছে সুরের ঝংকারের মূল্য অল্প।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের খুব ভাল অবস্থা হইল, আমরা কলেজ স্থাপন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম।

কলেজ করা ঠিক হইল। আনন্দবাবু আমাকেই প্রিন্সিপাল করিবেন স্থির করিলেন, এবং অপরাপর প্রফেসার নিয়োগ এবং এ্যাফিলিয়েশনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

স্বর্গীয় দীননাথ সেন ইনস্পেক্টার তখন ছিলেন পূর্ববঙ্গের শিক্ষা বিভাগের একচ্ছত্র সম্রাট, তাঁহার মাথাটা ছিল বড় একটা গোয়ালন্দের তরমুজের মত। এত বড় মাথা খুব কমই দেখা যাইত, এত বড় বুদ্ধিমান লোকও তখন পূর্ববঙ্গে খুব কম ছিল। তিনি যখন কুমিল্লা, নোয়াখালী, প্রভৃতি অঞ্চলে আসিতেন, তখন আমার বাসায়ই উঠিতেন। একবার জেলা স্কুলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের তদন্ত করিতে আসিয়া আমাদের বাড়ীতে প্রায় পনের দিন ছিলেন, তাঁহাকে লোকে বাঘের ন্যায় ভয় করিত, কিন্তু আমি শুনিতাম রোজ সন্ধ্যাকালে পূর্বদিকের জানালাটা খুলিয়া তিনি রানীর দীঘির নীল জল দেখিতেছেন ও গাহিতেছেন, "হায়রে দশা কি, তামাসা বাসার জন্য ভাবছ কেনে। হৃদয়কমলে দিতে বাসা আশা করে কতই জনে।" সুতরাং বুঝিতাম, ভিতরে ভিতরে রসের ফল্গুধারা এহেন আটুট গাম্ভীর্যের শৈল-কঠিন হৃদয় দিয়াও বহিয়া যাইতেছে, গোপাল উড়ের চটুল ভাষায় হীরামালিনীর উক্তি পর্যন্ত হৃদয়ে হিল্লোল জাগাইতেছে। তিনি আমায় বলিলেন, 'দীনেশ, তুমি কি কাণ্ডটা করিতেছ, বল দেখি! শুনিয়াছি রাত নাই, দিন নাই, তুমি এই সকল পাহাড়ে দেশের জঙ্গলে জঙ্গলে পুঁথি খুঁজিয়া বেড়াও, রাত্রি তিনটা পর্যন্ত পুঁথি পড়। চক্ষু দুটি যাইবে—নতুবা সাপের মুখে—বাঘের মুখে প্রাণ দিবে! বাংলা ভাষা কি সত্যই এত বড় একটা জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ইহার একটা ইতিহাস লেখা চলে, আর কে সে বই পড়িবে বল দেখি! আমি বাঁচিয়া থাকিতে একখানি পাঠ্য বই লিখিয়া ফেল, তাহাতে বেশ দু' পয়সা হইবে—আর হাড়ভাঙা খাটুনিও

খাটিতে হইবে না।' আমি সে কথায় কর্ণপাত করি নাই। পৃথিবীটার সবটা টাকা পয়সায় বশীভূত নহে, অন্তত আমার মনটা তখন এমন ছিল যে দুইটি মিষ্ট কথায় তাহাকে ভুলাইতে পারা যাইত, টাকা এমন কি মোহরটাও আমার কাছে কানা-কড়ির মত মনে হইত। টাকাতে জীবনের কতকটা সুবিধা হইতে পারে—এখন বুঝিয়াছি, কিন্তু তখন তাহাও বিশ্বাস করিতাম না।

শুধু দীননাথ সেন মহাশয় নহে, বঙ্গ ভাষাটা যে একটা ভাষাই নয়, ইহাই ছিল তখনকার ধারণা। ইহার আবার একটা ইতিহাসের কোন মূল্য আছে,—ইহা বন্ধু ও সুহৃদ্বর্গের মধ্যে কেহই বিশ্বাস করিতেন না। সকলেই আমাকে দু' হাতে এই কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শুধু কলিকাতা হইতে মাঝে মাঝে কেহ কেহ উৎসাহ দিয়া চিঠি লিখিতেন এবং দুই একখানা সংবাদপত্র আমার উদ্যমের সুখ্যাতি করিয়া মাঝে মাঝে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশিত করিত। কিন্তু বাহিরের উৎসাহে আমি উৎসাহিত হই নাই, এবং বাহিরের বিরাগ ও প্রতিকূলতায় আমি নিরুৎসাহ হই নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম, এই বাংলাভাষার চর্চাই আমাকে জীবিত রাখিয়াছে, এই কাজ ছাড়িয়া দিলে আমার হাত রিক্ত হইবে, প্রাণ অবলম্বন-শূন্য হইবে এবং যাহা একটু অবশিষ্ট আনন্দ আছে তাহা হারাইয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিবে। সুতরাং নিন্দা-স্তুতি আমার কাছে তুল্য ছিল। কেহ যদি মাতাকে ছেলেটিকে ভালবাসিতে বলে এবং কেহ যদি নিষেধ করে—তাঁহার কাছে সে সকল উপদেশের কোন মূল্য থাকে কি? আমি দিনরাত্রি যে জিনিসগুলি জপতপ করিতে-ছিলাম, কাহারও উপদেশে তাহা বেশী ভালবাসিতে কিংবা ছাড়িয়া দিতে আমার শক্তি ছিল না।

টাকার অবশ্যই দরকার হইয়াছিল, পুস্তক ছাপিতে। গ্রীয়ার সাহেব তখন ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার নিকট হইতে সুপারিশ চিঠি লইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আগরতলা গেলাম। তখন রাধারমণ ঘোষ মহাশয় ত্রিপুরার ষ্টেটে সর্বেসর্বা। আমি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সাক্ষাৎকারের প্রার্থী হইয়া এত্তেলা দিলাম। মহারাজা আমার খাওয়াদাওয়ার খুব রাজোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আজকাল করিয়া দেখা করিতে দেরী করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে পূর্ববঙ্গের সুবিখ্যাত মল্লবীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি শেষে "সোঽহং স্বামী" নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন) একটা বন্য ব্যাঘ্র লইয়া আগরতলায় আসিয়া উপস্থিত। শ্যামাকান্ত অতি সুপুরুষ ছিলেন। যদিও তাঁহার বক্ষে অত্যন্ত গুরুভার পাথর পিটাইয়া ভাঙা হইত, এবং কুস্তি, ঘুষি, হাতাহাতি-যুদ্ধ এবং দৌড়ধাপে সাহেবদের মধ্যেও কেহ তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, তথাপি তাঁহার চেহারা দেখিলে ভয় হইত না, বরং ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। বিশাল দুই চক্ষু, মুখখানি প্রতিভাপূর্ণ, কথাগুলি তেজঃপুঞ্জ। দেখিলেই মনে হইত প্রতিভাশালী পুরুষ। শ্যামাকান্ত আমা অপেক্ষা বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা শশীবাবু আমার অপেক্ষা আড়াই গুণ বেশী বয়সের হইলেও, আমি তাঁহারই বন্ধুত্বাভিমানী ছিলাম। শশীবাবুর চেহারাটি ছিল অনেকটা বঙ্কিমবাবুর মত। বহু লোকে তাঁহাকে বঙ্কিমবাবু বলিয়া ভুল করিত। তিনি বঙ্কিমবাবু হইতে একটু খর্বকায় ছিলেন।

শ্যামাকান্ত ত্রিপুরা-সরকারে আগে কাজ করিতেন, তাহার পর বাঘ ভালুক

পোষ মানাইয়া সার্কাস করিয়া বেড়াইতেন। উইলসন সার্কাসে তিনি দুই এক বছর ১৮০০ টাকা মাসিক বেতনে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এবার আগরতলায় আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি এখানে কত দিন?' আমি বলিলাম, 'এই পনর দিন, রাজার সাক্ষাৎ পাইতেছি না, অতিশয় ভদ্রতা সহ তিনি দিন ক্রমাগত পিছাইয়া দিতেছেন! তোমাকেও ভাই কিছুকাল থাকিতে হইবে! আজ আসিয়াই কি দেখা পাইবে?'

শ্যামাকান্ত হাসিয়া বলিলেন, 'আমি! তুমি পাগল—আমি তোমার মত বসে থাকব নাকি?'

আমি বলিলাম, 'সাহেবরা এসেও যে সহজে দেখা পান না!' শ্যামাকান্ত হাসিয়া বলিলেন, 'সে দেখা যাবে।' তার পর তিনি কোথায় বাসা করিয়া আছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তাঁহার অভ্যস্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, 'ভাই, আমি পরের বাসায় উঠে কতগুলি ডাল ভাত, আর মিষ্টি খেয়ে লম্বোদর হয়ে বসে থাকবার ছেলে নই, বিশেষ, সঙ্গে একটা বাঘ আছে—আমার কাছে আসার পূর্বে সে নর-মাংস খেয়ে জীবনযাত্রা চালাত—তার আতিথ্য করবে কে? আমি তাঁবু খাটিয়ে আছি, রোজ বড় দেখে একটা ছাগল কিনে আনি, তার অর্ধেকটা বাঘকে খাওয়াই আর অর্ধেকটা উনুনে আধাসিদ্ধ করে নিজে খাই—শাক সবজির মত দুটো ভাত —খেলেও চলে, না খেলেও চলে।'

তাহার পরদিন শুনিলাম, মহারাজার নিকট হইতে ২০০০৲ টাকা আদায় করিয়া শ্যামাকান্ত চলিয়া গিয়াছেন। ঘটনাটা হইল এইরূপ—মহারাজার প্রাসাদে সিঁড়ির কাছে মণিপুরী সৈন্য সঙ্গীন লইয়া পাহারা দেয়, শ্যামাকান্ত তাঁহার ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর লইয়া সেই সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হয়। রাধারমণবাবু বলিলেন, 'মহারাজার সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হবে না।' সেকথায় কর্ণপাত না করিয়া সে কুকুর সহ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে থাকে, মণিপুরী সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাকে বাধা দেয়। তখন তাহাদের দুই তিন জনের সঙ্গীন কাড়িয়া লইয়া সে সেখানে একটা বিষম হল্লা বাধাইয়া দেয়! কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিয়া তারস্বরে চিৎকার করিতে থাকে। এই অশ্রুতপূর্ব কলরবে প্রাসাদের সকলে শঙ্কিত হইয়া ওঠে। মহারাজ "কি হইয়াছে" জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, এবং যখন ঘটনাটি শুনিলেন, তখন রাধারমণবাবুকে বলিলেন, 'ওর ভয়ে আমি সর্বদা অস্থির থাকি, ওকে কেন ঠেকিয়ে রাখলে—আসতে দাও।' শ্যামাকান্ত যাইয়া মহারাজকে বলিল, 'মহারাজ, আমি বাঘের মুখে হাত ঢুকাইয়া তাহা ফিরাইয়া আনিতে শিখিয়াছি, নরখাদক ভীষণ বাঘকে পোষ মানাইয়াছি। মহারাজকে খেলা দেখাইব—আদেশ করুন।' মহারাজ বলিলেন, 'তুমি কি চাও বল, আমি বাঘের মুখে ব্রহ্ম-হত্যা দেখতে মোটেই রাজী নই। তুমি কি হ'লে আমায় ছাড়বে তাই বল।' শ্যামাকান্ত বলিল, 'মহারাজ, আমি আপনাকে খেলা দেখাইব বলিয়া এতদূর আসিয়াছি, সে আশা যদি পূর্ণ না করেন, তবে আমার এই থলিয়াটি পূর্ণ করিয়া দিন, ইহাতে হাজার দুই টাকা ধরিতে পারে।' মহারাজা তখন দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া দিলেন। শ্যামাকান্ত মিলিটারী কায়দায় মহারাজকে সেলাম করিয়া এবং ডান হাত উঠাইয়া ব্রাহ্মণের মত আশীর্বাদ-সূচক বৃদ্ধাঙ্গুলি করতলে ঠেকাইয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

আর দুই দিন পরে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য আমাকে দেখা করিতে অনুমতি দিলেন—সাক্ষাৎকারে যে বিলম্ব, কিন্তু দেখা দিলে দয়ার অবধি নাই। দ্বারদেশে ভিড়, গোলমাল ও নিষেধবিধি—ইত্যাদি, কিন্তু ভিতরে আনন্দ-লোক। মহারাজ আমার সমস্ত খরচ দিবেন, আদেশ দিলেন, বই তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিতে অনুমতি চাহিয়া লইলাম। আগরতলায় অবস্থানকালে আমার কলেজসুহৃদ্ অশ্বিনীকুমার বসু এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিভূষণ বসু আমাকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা ও সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন মহারাজার ত্রিপুরার দেওয়ান ছিলেন রাজমোহন মিত্র, ইনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ব্যক্তি ও সজ্জন ছিলেন। তখন শিশিরবাবুর 'অমিয়-নিমাই চরিত' সবেমাত্র বাহির হইয়াছে। আমি এক এক দিন সন্ধ্যাকালে দেওয়ানজীর বাড়ীতে গেলে তিনি আমাকে ঐ বই পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। আমি পড়িতাম ও অনেক ভদ্রলোক সেইখানে বসিয়া পাঠ শুনিতেন। অবশ্য তাঁহারা সকলে একটু গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন, 'অমিয়-নিমাই চরিত'-এর ভক্তির দিকটারই উপরে সকলে জোর দিতেন, উহার ঐতিহাসিক দিকটার প্রতি কেহই লক্ষ্য করিতেন না।

আমাদের দেশের সাধারণ লোক কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে যে গল্পই হউক না কেন, তাহা নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সত্য এবং অসত্যের মধ্যে তাঁহারা অনেক সময় কোন প্রভেদ দেখেন না। পৌরাণিক যুগের ভক্তির মানদণ্ডই ছিল তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। কত লোক তো চারিদিকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, ইঁহাদের কে হাঁচিল, কে কাশিল, তাহা খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য হইলেও ভক্তের নিকট তাহার জানার কি দরকার? কে খাঁড়া ধরিয়া তাহার সহোদরের শিরশ্ছেদ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিল, কিংবা জিজিয়া টেক্স বসাইল—তাহার আলোচনা ভক্তের নিকট একান্ত নিষ্ফল। কিন্তু মহাদেব যখন সমস্ত জগৎ রক্ষার জন্য গণ্ডুষ করিয়া সিন্ধুময় গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন, কিংবা একটা বৃহৎ নগরীকে ক্রুদ্ধ দেবরাজপ্রেরিত বন্যার মুখ হইতে বাঁচাইতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপর গোবর্ধন গিরিটাকে ধরিয়া সেই ক্রোধের গগনভেদী বর্ষণ ও স্ফুরণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন—তখন দেবগণের দয়ার কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ ভক্তি-বিমূঢ় ও অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। এই কাহিনী বিশ্বাস করিয়া তাহার হৃদয় ভক্তি-গঙ্গায় বিধৌত হইয়া গেল অথচ এসকল কথা সত্যের ত্রিসীমায় আসিয়া পৌঁছে না, পৌরাণিক গল্পগুলি একান্তরূপে ইতিহাস বিরোধী। পৌরাণিক যুগে আমাদের ঐতিহাসিক বিবরণের প্রতি একান্ত তাচ্ছিল্য এবং দেবলীলার প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগ এই কারণে ঘটিয়াছিল। যে কাহিনী চোখের জল আনিতে পারে, নিত্য-ধামের আনন্দ-লোকের আভাস দেয়, মানুষকে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলাইয়া পর-কুৎসা ও আত্মগৌরব, অনেক সময় যাহা ইতিহাসের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়, তাহার প্রতি হৃদয়কে একেবারে বিমুখ করে—তাহাই ছিল সে কালের লক্ষ্য। মানুষ তখন নরলীলা শুনিতে চাহে নাই, দেবলীলা শুনিতে চাহিয়াছে। সুতরাং সম্ভব ও অসম্ভব এই দুইটা জিনিস তখন নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে একান্তভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই। ভক্তিই ছিল তখনকার একমাত্র মাপকাঠি। এখনও বঙ্গীয় পল্লীগুলিতে সেই পৌরাণিক যুগেরই জের চলিতেছে এবং মহাপুরুষদের সম্বন্ধে নানারূপ আজগবী গল্পের সৃষ্টি হইতেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ চিরন্তন

সংস্কারের হাত এড়াইতে না পারিয়া এখনও কলেজের কোন কোন পড়ুয়া 'There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy' সেক্স্‌পীয়ারের এই গৎ আওড়াইয়া সেই সকল গল্প-গুজব সমর্থন করিতেছেন।

রাজমোহন মিত্র মহাশয়ের দুই পুত্র যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্রের সঙ্গে আমার সেই সময় যে সৌহার্দ জন্মিয়াছিল তাহা এতকাল পরে স্নেহ-রস-সিক্ত হইয়া এখনও আমার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। উপেন্দ্র এখন কুমিল্লার উকিল-সরকার।

মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি রাধারমণ ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতা প্রাণচৈতন্য ঘোষ বি. এল. কুমিল্লায় একটি প্রেস খুলিয়াছিলেন। তাঁহারই চৈতন্য প্রেসে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কিন্তু পুস্তক প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ ১৮৯৬ সনের ৬ই নভেম্বর তারিখে, আমি কুমিল্লা পাবলিক লাইব্রেরীতে বসিয়া ছিলাম, এমন সময়ে মনে হইল আমার মাথা ও শরীরে কিরূপ একটা অসহ্য উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। উহা কোনো অঙ্গের বেদনা বা জ্বালাপোড়া নহে, অথচ সমস্ত শরীর ও মন যেন আমার হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে, মনের ভাবগুলি যেন আর আয়ত্তে নাই এরূপ বোধ করিলাম। আকাশে সাইক্লোন হইবার পূর্বে যেরূপ দুর্যোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় আমার মস্তিষ্ক ও সমস্ত শরীরে সেইরূপ একটা বিপদ-সূচনা অনুভব করিলাম। বাসায় ফিরিয়া আসিলাম—তখন দেশে কোঠা বাড়ী তৈয়ারী করিব, তাহার নকশা তৈয়ারী হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া স্কুলের স্বত্বাধিকারী আনন্দবাবু সাহায্য করিবেন স্থির হইয়াছিল। আমার পিতা বিম-বরগা ও ইষ্টক কিনিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন—সুতরাং ব্যয়বাহুল্য কিছুই হইবার কথা ছিল না। কেরানী লোকনাথবাবুকে তিন চার মাসের ছুটি দিয়া দেশে পাঠাইব, আনন্দবাবু স্বয়ং এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নকশা হাতে বসিয়া আছেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'বাড়ী আর হইল না, আপনি আনন্দ-বাবুকে বলুন, আমি পীড়িত, তিনি একবার আমাকে আসিয়া দেখিয়া যাউন।' আনন্দবাবু আসিলে বলিলাম, 'আপনি আর একজন হেডমাষ্টার খুজুন, আপনার ভাবী কলেজের প্রিন্সিপাল আমি হইতে পারিব না', এই বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিছু না বলিতে পারিয়া বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। এতদিনের প্রাণান্ত পরিশ্রম, কলহ, অশান্তি, শোক ও মর্মবেদনার ফল আজ ফলিল। এত দীর্ঘকালের রাত্রিজাগরণ, সময় সময় পাহাড়পর্বতে অনাহারে ১৪।১৫ মাইল পর্যটন, এবং শরীরের প্রতি একান্ত নিগ্রহ ও অত্যাচারের ফল আজ ফলিল। আমার চক্ষু হইতে নিদ্রা চলিয়া গেল, আহারের রুচি চলিয়া গেল, লিখিবার পড়িবার ক্ষমতা গেল, স্মৃতিভ্রংশ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও মনের সমস্ত বল হারাইয়া নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডবৎ বিছানায় পড়িলাম। আনন্দবাবুর সাহায্যে কুমিল্লায় যতটা চিকিৎসা চলিতে পারে তাহা হইতে লাগিল। তখন কুমিল্লার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন প্রকাশচন্দ্র সেন, তাহা ছাড়া ফ্রান্সিস্‌ সাহেব—এ. বি. রেলওয়ের বড় ডাক্তারও আমার বন্ধু ছিলেন। মহিমচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন বড়

কবিরাজ, তাঁহার পুত্র উপেন্দ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র তারক ছিল আমার ছাত্র। এখন উপেন্দ্র আলীপুর কোর্টের একজন সর্বপ্রধান উকিল। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, শশীবাবু, ইঁহারা পর্যায়ক্রমে আমাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার পাইলাম না। আমায় তুলিয়া ধরিয়া বসাইতে হইত। আমার আত্মীয় হরিকুমার দত্ত জজের নাজির মহাশয় কয়েকজন আদালতের পিয়ন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দিনরাত্রি তাহারা আমার পরিচর্যা করিত। আমার স্ত্রী অসমর্থ অবস্থা সত্বেও সারারাত্রি আমায় বাতাস দিতেন, আমার তো এক-মুহূর্তের জন্যেও সারারাত্রি ঘুম হইত না। আমার পরিচর্যায় নিরত থাকিয়া তিনিও রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না। কোন শিশুর চিৎকার, পাখীর ডাক শুনিলে আমি অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিতাম, কবিরাজ মহাশয়েরা দিনরাত্রি বরফের অভাবে আমার মাথায় ঘৃতকমল বাঁধিয়া রাখিতেন। তখন কিরণের বয়স ৪ বৎসর হইবে, একদিন একটা বড় বেলের কাঁটা তাহার পায়ের গোড়ালিতে এতটা ফুটিয়া গিয়াছিল যে তাহা টানিয়া বাহির করাতে এক গামলা জল রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাছে তাহার চিৎকার শুনিয়া আমার ব্যারাম বাড়িয়া যায়, এই ভয়ে সেই চার বৎসরের শিশু এত যন্ত্রণা সহিয়াও টুঁ শব্দটি করে নাই। ক্রমাগত পাঁচ সাত দিন ও রাত্রি একেবারে অনিদ্রা অবস্থায় কাটাইয়া আমি এরূপ উৎকট বোধ করিয়াছি যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি 'আধ ঘণ্টা ঘুমাইতে দিয়া আমায় মারিয়া ফেল'। মাথার অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে একদিন কাগজি লেবুর নাম স্মরণ করিতে যাইয়া কপাল হইতে ক্রমাগত স্বেদবিন্দু পড়ায় আমি অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর একদিন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শশীবাবু নাড়ী ধরিয়া আমার কাছে বসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার দাড়ি ধরিয়া গালে চড় মারিবার জন্য একটা দুর্দমনীয় লোভ অনুভব করিতেছিলাম। সত্যই আমার সমস্ত চেষ্টা অতিক্রম করিয়া ডান হাতখানি তাঁহাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন উৎকট মানসিক চেষ্টা দ্বারা সেই ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইয়াছিলাম।

ইহার পরে আনন্দবাবু আমার স্ত্রী পুত্র-কন্যাদিগকে আমার শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া আমাকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন, এবং আমার আরোগ্যের জন্য নানারূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। একদিন প্রকাশ ডাক্তার মহাশয় আমার অনিদ্রা রোগের জন্য মরফিয়া ব্যবস্থা করিলেন— ইহার পূর্বে ব্রোমাইড ও সালফোনাল দিতেন। মরফিয়া খাওয়ার পর আমি সারারাত্রি যে ভাবে কাটাইয়াছিলাম—সেরূপ দুঃসহ কষ্ট বোধ হয় জীবনে অতি অল্পই ভোগ করিয়াছি। পরদিন শুইয়া আছি, আমার মনে হইল কেহ যেন রাস্তায় দৌড়াইয়া যাইতে আমাকে বাধ্য করিতেছে, আমি উঠিয়া বসিলাম—ভগবানকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলাম এবং বলিলাম, 'হে ঈশ্বর আমাকে পাগল করিও না, আমাকে অন্ধ কর, কুষ্ঠ রোগ দাও, কিন্তু মানুষ হইয়া যেন পশু হইয়া না থাকি।' আনন্দবাবুর কাছে কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, 'আপনি কি করিয়া পাগল হইবেন? কাহাকেও এমন দেখিয়াছেন কি যে বিছানায় পড়িয়া পাগল হয়? আপনার উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই, এমন অবস্থায় কেহ কি কখনও পাগল হইয়াছে, শুনিয়াছেন?' এই কথা শুনিতে শুনিতে আমি উৎকট যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলাম—হাত মুষ্টি-বন্ধ হইল, দাঁতি লাগিল এবং

অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম মনে নাই, জাগিয়া দেখি, ডাক্তার কবিরাজে ঘর ভর্তি। তাহার পর হইতে শরীর ও মস্তিষ্ক খুব খারাপ হইলে. ঐরূপ ফিট হইতে লাগিল, দিনে ৩।৪ বার করিয়া ফিট হইত। ফিটের পরে একটু উপশম বোধ করিতাম।

তাহার পর আমার স্ত্রী অত্যন্ত উতলা হওয়াতে আমাকে আনন্দবাবু আমার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন এবং আবার স্ত্রীপুত্রকন্যার সংগে মিলিত হইলাম। আমার পীড়ার খবর পাইয়া আমার মাসতুত ভাই গিরীশচন্দ্র সেন কুমিল্লায় আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল, মনে হইল যেন অর্ধেক ব্যারাম কমিয়া গিয়াছে।

এই সময় হইতে আমি জপ আরম্ভ করি। এমন নিশ্চেষ্ট, এমন অকর্মণ্য আমার মত আর কে আছে? এমন উত্থানশক্তি রহিত, এমন একান্তরূপে স্বশক্তির উপর নির্ভরের অযোগ্য আর কে? সুতরাং তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে লাগিলাম। রাত্রে ঘুম হইত না, না হইল—অমৃতের খনির সন্ধানে রাত্রি জাগিয়া কাটাইতাম, কাশীদাসের মহাভারতের সূচনায় আছে "সর্বশক্তি বীজ হরি নাম দ্বি অক্ষর", "হরের্নামৈব কেবলম্" শাস্ত্রের উক্তি। এই নামের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমার আর কি শক্তি ছিল? যখন দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্যে হাঁপাইয়া উঠিতাম—দুর্ভাবনার ব্যূহ ভেদ করিয়া মন বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইত না, তখন করজোড় করিয়া নাম জপ করিতাম; আমার মনের সমস্ত দুর্যোগ আস্তে আস্তে কাটিয়া যাইত। চণ্ডীদাসের "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" ছত্র মনে পড়িলে চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকিত। তখন মনে হইল, সংসারে হীরা পাইয়াছিলাম তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কেন কাচ লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম, 'হরি' 'হরি', বলিতে প্রকৃতই অপূর্ব শান্তি পাইতাম। মনে স্থির করিলাম এবার ভাল হইলে তাঁহারই পাদপদ্ম আশ্রয় করিব—এই সংসার আর আমাকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না, যাহাদের সংগে ঝগড়া করিয়াছি পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাহাদের সংগে বিবাদ মিটাইয়া যাইব। শান্তি দ্বারা অশান্তিকে ধ্বংস করিব, প্রেম দ্বারা ইন্দ্রিয় বিজয় করিব, পর্বত ও সমুদ্র, মরুভূমি ও উপত্যকা, নগর ও গ্রাম এ সমস্ত জুড়িয়া ভগবানের পাদপদ্ম পড়িয়া আছে, আমার চক্ষে সমস্তই তীর্থ,—এই তীর্থে মহানকে দেখিব, সুন্দরকে দেখিব, তাঁহার ভৈরব শঙ্খ-নিনাদ শুনিব, তাঁহার সুমিষ্ট বাঁশী শুনিব, তাঁহার করপদ্মলগ্ন পঙ্কজের সুবাসে প্রাণ জুড়াইব।

আমার মন এক ধাপ উঁচুতে উঠিল, বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম আমার রোগ এইবার সারিয়া যাইবে।

এই উৎকট পীড়ার সময় 'বংগভাষা ও সাহিত্য' যে ভাবে শিক্ষিত বঙ্গসমাজে গৃহীত হইল তাহা আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। অযাচিত ভাবে কলিকাতা হইতে রাশি রাশি প্রশংসার অতিশয়োক্তি আসিতে লাগিল। রবীন্দ্রবাবু, রামেন্দ্রবাবু, হীরেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু পুস্তকখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। রামেন্দ্রবাবু অতি অল্পভাষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখনী ছিল ঘোর মুখরা—তিনি আট পৃষ্ঠা ভরিয়া এত প্রশংসার কথা লিখিলেন যে আমি কতকটা লজ্জিত হইলাম। সাহিত্য পত্রিকায় হীরেন্দ্রবাবু সুদীর্ঘ সমালোচনা করিলেন, নব্য ভারতে

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের অভিনন্দনটি খুব হৃদয়গ্রাহী হইল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দীর্ঘ সমালোচনা প্রদীপ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ক্যালকাটা রিভিউ এবং আর একখানি পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে ইংরাজীতে সমালোচনা করিলেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইলে রবীন্দ্রবাবু বঙ্গদর্শনে অতি বিস্তৃত গবেষণামূলক সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের কমিশনার এফ. এইচ. স্ক্রাইন অতি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমার অসুস্থতার জন্য সমবেদনা জানাইলেন এবং ডিরেক্টার মার্টিন সাহেবকে আমার সম্বন্ধে নানারূপ অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল এবং মাসিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলিতে আমার পীড়ার কথা লইয়া অনেক সহানুভূতির কথা প্রকাশিত হইল।

আমি পাড়াগাঁয়ের লোক—কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবি, সমালোচক ও সম্পাদকের নামের মোহ আমার কাছে কম ছিল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি সর্বত্র পরিচিত হইয়া কতকটা গৌরব অবশ্যই বোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আমি একেবারে উত্থানশক্তিরহিত, অপোগণ্ড শিশুর ন্যায় পরের উপর নির্ভরশীল। ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া মানুষের গৌরব করিবার কি আছে? এক সময় মনে হইত, এই লোক-প্রশংসা ও যশের মূল্য কি? এই সাংসারিক প্রতিষ্ঠার সোনালী রঙের পরদাটা সরাইয়া দেখিতাম—উহাও ছেলে ভুলাইবার, খেলা দেওয়ার একটা চাতুরী মাত্র। কখন কখনও সারারাত্রি জপ করিতাম—তখন আঁধার কাটিয়া যেন ঊষার সোনার আঁচল চোখে ঠেকিত;—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম, আমার খেলনাগুলি সোনারূপার মোড়ক দিয়া আর লোভনীয় করিয়া আমায় প্রলুব্ধ করিও না, আমাকে তোমার পায়ের কাছে একটুকু জায়গা দাও। মনে স্থির করিয়াছিলাম ভাল হইলে সন্ন্যাসী হইব। ইহার একটি বর্ণও মিথ্যা নহে, ভগবানের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, মনুষ্য, সমাজ ও জীব-জগতের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, আমার প্রকৃত পথ কি, ইহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া নদীর রূপ মানুষ বুঝিতে পারে না ডাঙায় উঠিয়া নদীর মূর্তি ধরা পড়ে, আমি সংসারের বাহিরে যাইয়া সংসারকে চিনিব, দরকার হয় পুনরায় সংসারে ফিরিব, কিন্তু নিজের গন্তব্য পথ আবিষ্কার করিবার পূর্বে নহে।

পীড়া যখন ছয় মাসেও সারিল না, অর্ধ বেতনে আনন্দবাবু আমাকে দেড় বৎসরের ছুটি মঞ্জুর করিয়া দিলেন। ছয় মাসের ছুটি পূর্ণ বেতনেই পাইয়াছিলাম।

চাঁদপুর আসিয়া ডেপুটি প্রকাশচন্দ্র সিংহ সুহৃদ্বরের আনুকূল্যে একখানা বজরা পাইলাম। তাহাতে রাত কাটাইয়া দিলাম। পদ্মার[১] অবাধ-গতি ঊর্মিকল্লোলে—শন্ শন্ বায়ুর শব্দে আমার বহুদিনের বিনিদ্র অক্ষিপুট বুজিয়া আসিল। ছয় মাস পরে মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় পদ্মাগর্ভে বজরায় আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। যদিও ফ্রান্সিস্ সাহেব আমায় বলিয়াছিলেন, 'তোমার মস্তিষ্ক আর ভাল হইবে না', তথাপি সেদিন মনে হইল ভাল হইলেও হইতে পারি।

পরদিন অশ্রুপূর্ণ চক্ষে স্ত্রীপুত্রদিগের নিকট বিদায় লইলাম। আমার মাসতুত

[১] সম্ভবত লেখক এখানে নদীর নাম ভুল করেছেন। কারণ, চাঁদপুর মেঘনার তীরে অবস্থিত।

ভাই গিরীশচন্দ্র আমার স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া বরিশাল চলিয়া গেলেন। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠ (মাসতুত) ভ্রাতা জগদীশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহারই কাছে পরিবার থাকিবে, আমি কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা চালাইব। কিন্তু পদ্মার পাড়ে বিদায়ের সময় মনে হইল, হয়ত এই শেষ দেখা, হয়ত আর সারিব না। আমি একান্ত নিঃস্ব, আনন্দবাবু মাসিক ৪০ টাকা দিবেন, তাহাতে কি করিয়া চিকিৎসা চলিবে? এ পীড়া হয়ত আর ভাল হইবে না, কতকটা ভাল হইলেও যে আর কাজকর্মের যোগ্য কখনও হইব না। পীড়া হইবার ছয় মাস পূর্বে আমি স্ত্রীকে বলিয়াছিলাম, 'দেখ, বেতন, প্রাইভেট টিউশন, পরীক্ষকের ফি প্রভৃতি লইয়া আমার মাসিক আয় দেড় শত টাকার বেশী নহে, একটি কপর্দকও বাঁচাইতে পারি না, যদি দু মাস পড়িয়া থাকি তবে সংসার চলিবে কিসে?' এ কিন্তু শুধু দু মাসের সমস্যা নহে। ক্ষুদ্র খাল কল্পনা করিয়া ভয় পাইয়াছিলাম, এ যে সত্যই সমুদ্রে আসিয়া ডুবিলাম। স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে হয়ত আর দেখা হইবে না। হয়ত একাকী কোথায় প্রাণ যাইবে। আমার বিচ্ছেদ-বিধুর প্রাণের স্পন্দন কি করিয়া বুঝাইব? সম্মুখে বিস্তৃত পদ্মা, আমি তাহার বক্ষে একা। পদ্মা আমার নৈরাশ্যের গভীর অনন্ত আলেখ্যের ন্যায়, ঘোর তিমিরাবৃত দুঃখ-তরঙ্গশালী অদৃষ্টের ন্যায়, আমি যেন একা তাহার মধ্যে ভাসিতাম।

তখন প্রাণপণে হরিনাম আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; কখনও দুশ্চিন্তায় দুঃখে মন উতলা হইত; মাখন, কিরণ ও অরুণের মুখ মনে পড়িয়া চক্ষে জল আসিত, তখনই ফিট হইত। কিন্তু সেই বিপদে আমি ভগবানের নাম আশ্রয় করিয়া রহিলাম। আমার স্ত্রীপুত্র নাই, আমার পিতামাতা নাই। বিশাল আলেখ্য হইতে বহুদিনের আঁকা স্নেহমমতার নানা রঙে ফলানো সমস্ত ছবি যেন মুছিয়া গিয়া বিশাল শূন্য পটে শুধু এক হরি নাম আঁকা রহিল, অন্য সমস্ত দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া সেই দিকে বদ্ধ-লক্ষ্য হইয়া রহিলাম। অসহ্য সাংসারিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে আমি কোন চিন্তা করিতাম না। চিন্তা ছাড়া চিন্তা দূর করিতে পারিতাম না, চিন্তাজালে আরও জড়াইয়া পড়িতাম, পীড়া বাড়িত, ফিট হইত। নিজের শক্তি দ্বারা মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার শক্তি হারাইয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতাম। শিশু যেমন ভয় পাইলে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরে, আমি সেইরূপ উপায়হীন হইয়া নামকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। সে নাম কাহার, তিনি কি করিতে পারেন, তাঁহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, এ সকল ভাবিতাম না। কিন্তু নামই সর্বস্ব, একমাত্র সম্বল এই ভাবিয়া জপ করিতাম, রাতদিন জপ করিতাম, চোখের প্রান্তে অশ্রু গড়াইয়া পড়িত।

এইভাবে কলিকাতায় ৮৫।২ মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটে মাতুলালয়ে আসিয়া পড়িলাম। বাড়ীখানি বেশ বড় এবং এত সুন্দর যেন একখানি ছবির ন্যায়। উপরকার হলটি মারবেল দেওয়া, নানারূপ আসবাবপূর্ণ, সেই ঘরে স্থান পাইলাম। মাতুল চন্দ্রমোহন ও শ্রীমোহন তখন উভয়েই কলিকাতায়, তখন তাঁহাদের ঋণ দশ লক্ষ টাকার উপরে উঠিয়া সর্বস্ব যায় যায়। যেন ভরা গাঙে ঝড় উঠিয়াছে, নৌকাখানি ডুবু ডুবু।

কলিকাতায় আসিয়া ৭।৮ দিন বেশ ছিলাম। আমি আসিয়াছি, সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার অনেক লেখক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। রামেন্দ্রবাবু ও

হীরেন্দ্রবাবুকে এই ভাবে প্রথম দেখিলাম। সুরেশ সমাজপতির সাহিত্যে অনেক লিখিয়াছি, তিনি আসিয়া বন্ধুত্বের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আসিলেন। নগেন্দ্রবাবুকে আমার বড় ভাল লাগিল, অনাড়ম্বর, মিষ্টভাষী ও সচ্চরিত্র। সেইদিন হইতে তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িলাম—সে ১৮৯৭ সনের মার্চ মাসে, তদবধি আজ পর্যন্ত সেই ভ্রাতৃভাব চলিয়া আসিতেছে। তখন তিনি তেলীপাড়ার একটা ভাঙা বাড়ীতে থাকিতেন, বিশ্বকোষ তখন বোধহয় 'ট' বর্গে পৌঁছিয়াছে। তখন তাঁহার প্রেস ছিল না। আর্য প্রেসে 'বিশ্বকোষ' ছাপা হইত এবং তখনও কায়স্থ-আন্দোলন জাগিয়া ওঠে নাই। শ্যামপুকুর লেনে ঢুকিতে ডান দিকে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর যে একতল বাড়ীখানি তাহাতেই পরিষৎ বসিত। তখনও হীরেনবাবু তাঁহার 'সুয়োরানী' থিওসফির উপর পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই। 'দুয়োরানী' অর্থাৎ পরিষৎ তখন তাঁহাকে সমগ্র ভাবে পাইত। তিনি পরিষদের তখন প্রধান বীর ছিলেন।

প্রতিভা ও অনুরাগের গান্ডীব লইয়া তিনি রাজা বিনয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া পরিষদ্‌কে শোভাবাজারের রাজবাটীর আওতা হইতে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের একতল গৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় রাজা বাহাদুর 'সাহিত্যসভার' সৃষ্টি করিয়া মনকে যথাসাধ্য প্রফুল্ল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসার ১০।১২ দিন পর আমার রোগ খুব বাড়িয়া চলিল ; এমন কি বসিতেও কষ্ট বোধ হইত, এই সময় সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক হাইকোর্টের উকিল যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন। বাংলা প্রাচীন সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তিনি বলেন, 'ঐ বটতলার ছাপা চাষাদের নাকী সুরে পড়া নাচাড়ী ছন্দের ভিতর কি ছাইভস্ম আছে, যে আপনি তাহার জন্য জীবনপাত করিয়া খাটিয়াছেন—আপনি আমাকে এ কথাটা বুঝাইয়া দিন।' আমি কবিকঙ্কণকে লইয়া বুঝাইতে শুরু করিয়া বলিলাম, ধরুন কালকেতুর চরিত্র। যখন কবিকঙ্কণ তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন কবিরা 'তিল ফুল জিনি নাসা' 'আজানুলম্বিত বাহু'— 'গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ' 'রাম রম্ভা উরু' এইরূপ বহু সংখ্যাক উপমা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে ধার করিয়া রূপবান ও রূপবতী নায়ক ও নায়িকাদিগকে সাজাইতেন। সেই যুগে সংস্কৃতের অলঙ্কারগুলি ডাকের সাজের ন্যায় অতি সস্তা দরে পাওয়া যাইত। যে কোন পল্লী-কবি সেই বাঁধাগৎগুলি লইয়া পয়ার রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। ইহার মধ্যে শক্তিশালী কবিকঙ্কণ হঠাৎ আসিয়া কালকেতু ব্যাধকে দাঁড় করাইয়া তাহাকে বর্ণনা করিতে বসিলেন—তাহার মাথায় 'জালের দড়ি' বুকের উপর 'বাঘের নখ', আর তাহার 'দুই বাহু লোহার শাবল'। পাঁচ বৎসর বয়সে সে 'শিশু মাঝে যেমন মন্ডল', ঐ বয়সে সে তাড়িয়া সজারু ধরে ও আকাশে যে পাখী উড়িয়া যায়, বাঁটুল দিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করে। আরও একটু বড় হইলে বেশী বয়স্ক ব্যাধ বালকেরাও কেহ মল্ল-যুদ্ধে তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। যাহাকে সে আঁকড়াইয়া ধরে 'তার হয় জীবন সংশয়'। সে কাব্যের নায়ক হইলেও যে তাহার বর্ণ অনিন্দ্য চম্পক পুষ্পের ন্যায় কিংবা অগ্নি-অংশুর ন্যায় হইবে, কবিকঙ্কণ তাহা হলফ করিয়া স্বীকার করেন নাই। বরং তাহার বয়সের সঙ্গে সে বাড়িয়া চলিল এই কথা বলিতে যাইয়া তিনি নির্দয়

ভাবে 'বাড়ে যেন হাতি করা' কহিয়া একটা কালো অদ্ভুত জানোয়ার শাবকের সঙ্গে তাহার উপমা দিয়াছেন। কখনও পরিষ্কার করিয়া তাহার বর্ণের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন যেন 'শ্যাম চামর কুন্তল'।

তাহার ছবিটি কবি একটুও সাজাইতে যান নাই, তাহাকে আঁকিতে যাইয়া অলংকারশাস্ত্র একটিবারও তাঁহার মনে পড়ে নাই। যদিও তিনি রাজকুমারের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন, এবং সংস্কৃতে যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল তাঁহার কাব্যেই তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ব্যাধ-জগতটাই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই জগতের কদর্যতা, কুশিক্ষা, ইহার কিছুই তিনি বাদ দেন নাই। কালকেতুর ভোজন বর্ণনা করিতে যাইয়া 'গ্রাসগুলি তোলে যেন তে-আঁটিয়া তাল' বলিয়া কাব্যনায়কের 'ভোজন কুৎসিত' বলিয়া ধিক্কার দিতেও ছাড়েন নাই ; কিন্তু ব্যাধ-গৃহের পশুর হাড়পূর্ণ, অস্পৃশ্য, দারিদ্র্য-পীড়িত, হীন আঙ্গিনায় এই যে কালকেতুকে তিনি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সমস্ত কদর্যতা সত্ত্বেও ভীষ্ম কি রামের মত একটা মহৎ চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার বাহাদুরী। যখন ফুল্লরা তাহাকে হীন সন্দেহ করিয়া বলিল, 'তুমি কোন্ রূপসী কন্যাকে লইয়া আসিয়াছ? দুষ্ট কলিঙ্গরাজ তোমায় বধ করিয়া আমার জাতি মারিবে।' এই হীন সন্দেহে কালকেতু ক্রুদ্ধ হইল, প্রত্যেক নিরপরাধ ব্যক্তিই তখন সেই সন্দেহে বিরক্ত হইতেন। কালকেতু ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'মিথ্যা হলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা', অবশ্য ভদ্র ভাবে সে তাহার প্রেয়সীর মর্যাদা রক্ষা করিয়া সৌজন্যপূর্ণ কথা বলিতে শেখে নাই। কিন্তু সে যে নিরপরাধ, তাহা এই কথায় চাষার ভাষায় খুব স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়াছে। মোট কথা, কবিকঙ্কণ এক মুহূর্তও ভুলিয়া যান না যে, তিনি ব্যাধের চিত্র আঁকিতেছেন। তাহাকে শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া নায়ক করিতে যান নাই, যাঁহারা সেরূপ নায়ক চাহিবেন, তাঁহারা রূপগোস্বামী কৃত "উজ্জ্বল নীলমণি' পড়ুন। সেই সকল নায়কের লক্ষণের একটুও কালকেতুতে নাই, অথচ কালকেতু মস্ত বড় কাব্য-নায়ক হইয়া আছে। কালকেতু ভগবতীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার কুটির ত্যাগ করিতে বলিল। এমন কি তাহার যে সামান্য শাস্ত্র-জ্ঞান ছিল তাহা দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে স্ত্রীলোকের স্বামীর ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র রাত্রি যাপন উচিত নহে—এইরূপ অপরাধে সীতারও বিপদ ঘটিয়াছিল। ভগবতীকে সে স্বামীর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে কিন্তু একা নহে, 'ফুল্লরা চলুক সাথে—চল বন্ধু জন পথে' একাকী নির্জন পথে নহে—স্বজনগণ যে পথে থাকেন—ফুল্লরাকে সঙ্গিনী করিয়া সে সেই পথে তাঁহাকে লইয়া যাইবে। ব্যাধ-নায়কের নৈতিক দৃষ্টির যে তীক্ষ্ণতা দেখিতে পাই, তাহা গ্রাম্য ভাষায় ব্যক্ত হইলেও খুব বড় জিনিস। ব্যাধের কথায় ভগবতী কোনরূপ কর্ণপাত করিলেন না, তখন গণিকা ভ্রমপূর্বক সূর্যকে সাক্ষী করিয়া সে তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল—'ভানু সাক্ষী করি বীর ছুড়িলেক শর।' কিন্তু ধনুতে শর আটকাইয়া গেল। তখন রূপসী বলিলেন, 'আমি ভগবতী'—কালকেতু বিশ্বাস করিল না, 'আমার মতো পাপী, হীন জাতীয় হিংস্রপ্রকৃতি ব্যক্তি কি দেবদয়ার কখনও প্রত্যাশা করিতে পারে, সে যে একেবারে অসম্ভব। তুমি হয়ত যাদুমন্ত্র জান, এইজন্য আমার শর ছুড়িবার শক্তি লোপ করিয়াছ।' যাঁহারা জপতপ করিয়া মনে করেন তাঁহারা কত ধার্মিক, তাঁহাদের সঙ্গে কালকেতুর তুলনা করুন। ইহার

চরিত্র প্রকৃতই সাধু, কিন্তু সে হীনজাতীয় এবং তাহার ব্যবসায়টা হেয়, এজন্য সে বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার এমন কোন্ গুণ আছে যাহাতে দেবী আসিয়া স্বয়ং তাহাকে কৃপা করিতে পারেন। এই একান্ত নিরভিমান স্বীয় হীনত্ববোধে চূড়ান্ত বিনয়ী ব্যক্তিই যে প্রকৃতপক্ষে দেবীর কৃপার যোগ্য, তাহা কবি বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তাহার পর দেবী নিজে কাঁখে করিয়া মোহরের কলসী লইয়া যাইতেছেন, তখন 'মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লইয়া পাছে পালায় পার্বতী।' সুতরাং সে যে অশিক্ষিত কুসংস্কারাবদ্ধ একটা জানোয়ার বিশেষ, এক মুহূর্ত কবি তাহা আমাদিগকে ভুলিতে দেন নাই। মুরারি শীল তাহাকে কিছু পয়সা ধারিত, অঙ্গুরীয় ভাঙাইতে যখন সে তাহার নিকট গেল, তখন সে অন্দরে ঢুকিয়া লুকাইয়া রহিল এবং বেনেনী আসিয়া বলিল, 'আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার'। কিন্তু অঙ্গুরীয়ের কথা জানিতে পারিয়া মুরারি খিড়কির পথে হাজির হইয়া কালকেতুকে উল্টা দোষ দিয়া বলিল, 'শুন শুন ভাইপো—এবে নাহি দেখি তো—এ তোর কেমন ব্যবহার'। কিন্তু কালকেতু উদার ও সরল প্রকৃতি। সে মুরারির কপটতা বুঝিতে চেষ্টা করিল না, বরং সে কাজের ভিড়ে আসিতে পারে নাই, তাই বলিয়া ক্ষমা চাহিল। সর্বত্র গ্রাম্য ভাষার অমার্জিত বর্ণে, মোটা বাঁশের তুলি দিয়া কবি-চিত্রকর যে ছবিগুলি আঁকিয়াছেন তাহা বড় বড়। অভদ্র জীবনের চালচিত্র, কিন্তু ভিতরকার ভদ্রতা সেই বাহিরের নেংটির ভদ্রতাকে আশ্চর্য ভাবে পাছে ফেলিয়া দিয়াছে। ফুল্লরা এই কালকেতুর যোগ্য স্ত্রী তাহার পদ্ম-পলাশ চক্ষু অথবা তিলফুল-বিনিন্দিত নাসিকা এবং কাদম্বিনী কেশের কোন উল্লেখ নাই, কবি লিখিয়াছেন—'এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা, কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পশরা। রন্ধন করিতে এই কন্যা ভাল জানে। বন্ধুগণ মিলিয়া ইহার গুণ গানে।' ফুল্লরা তালপাতের ছাউনি, ভাঙা ঘরে থাকিত, তাহার মধ্যস্থলে ভেরাণ্ডার থাম ছিল, তাহা বৈশাখী ঝড়ে রোজ ভাঙিয়া পড়িত এবং 'বৃষ্টি হলে কুড়্যায় ভাসিয়া যায় বান', জ্যৈষ্ঠ মাসে সে বঁইচির ফল খাইয়া একরূপ উপবাস করিয়া কাটাইত, এবং যখন মাংসের পশরা মাথায় করিয়া বাজারে যাইত, তখন 'দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধসারি'। শীতকালে সকলেই গরম বস্ত্রাদি পরিত, কিন্তু 'অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়'। আশ্বিন মাসে পূজায় বলিদানের মাংস গৃহে গৃহে, ফুল্লরার মাংস বিকাইত না, তাহার কুঁড়ে ঘরে একটা গর্ত ছিল, তাহাতে আমানি রাখিত ও তাহাই খাইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত, একখানা মাটির থালা কিনিবারও কড়ি কুলাইত না। বসন্তকালে মন্দ মন্দ সমীরণে মালতী কুসুম পরাগে ভ্রমর শ্লথ ভাবে লগ্ন হইত, যুবক যুবতীরা মদনোৎসবে মাতিয়া যাইত, কিন্তু 'অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।' এই নিদারুণ দুঃখচিত্রের বিভীষিকার মধ্য দিয়া কবি প্রেমের জয় দেখাইয়াছেন। যখন ভগবতী বলিলেন, 'দেখ আমার অঙ্গের বহুমূল্য অলংকার, আমি তোমার সমস্ত দুঃখ দূর করিব।' এত কষ্ট সহিয়া যে ফুল্লরার ধৈর্য অটুট ছিল, সে ফুল্লরা ভগবতীর এই কথায় কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার দারিদ্র্য থাকুক, তাহার উপবাস শত গুণে ভাল, সে চায় না স্বামীর অধিকার অপরকে ছাড়িয়া দিতে—সে তাহা পারিবে না। সমস্ত দুঃখের মধ্যে তাহার প্রাণ-জুড়ানো সামগ্রী, সমস্ত ব্যথার মধ্যে শান্তি,—তাহার ঐ স্বামীর প্রেম ; সে জলঝড় সহিবে, নিজে না খাইয়া স্বামীকে খাওয়াইবে—সে হরিণের ছড় পরিবে, বঁইচির ফল খাইয়া উপবাস

করিবে—কিন্তু স্বামীর প্রেমের ভাগ বসাইতে সে দিবে না, সে নির্লজ্জার মত এ সকল কথা বলে নাই—কিন্তু ভগবতী যখন কিছুতেই ছাড়িবেন না, তখন সে চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল—

এবং—

"কাঁদিতে কাঁদিতে রামা করিল গমন।
শীঘ্র গতি গেলা হাটে দিল দরশন॥
গদ গদ বচন চক্ষেতে বহে নীর।
ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন মহাবীর॥
শাশুড়ী ননদ নাই, নাই তোর সতা।
কার সঙ্গে ঝগড়া করি চক্ষু কৈল রাতা॥

কোন্ নায়িকা এই ব্যাধ-মেয়ের মত প্রেম ও সাধুতা দেখাইতে পারিয়াছে?

সেদিন আমার মাথার উৎকট ব্যাধি সত্ত্বেও মুখ খুলিয়া গিয়াছিল; তাহার পর সেক্সপীয়ার হইতে শুরু করিয়া আমি টেনিসন পর্যন্ত অনেক কবির কবিত্বের বিশ্লেষণ করিলাম। আমার উপর যোগেন্দ্রবাবুর একটা শ্রদ্ধার ভাব হইল বুঝিতে পারিলাম।

মস্তবড় বক্তৃতা করার দরুণ পীড়া বাড়িয়া মড়ার মত বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। দিনরাত্রি একটুও ঘুম হইল না। পরদিন দেখি, যোগেনবাবু আবার আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন, 'ক্ষুদিরামবাবু আপনাকে সেণ্ট্রাল কলেজের উপরের শ্রেণীগুলিতে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতে নিযুক্ত করিতে চান, আপনি প্রস্তুত থাকিলে শীঘ্রই নিয়োগপত্র পাঠাইবেন।'

আমি কাতর স্বরে বলিলাম, 'আমি উঠিতে বসিতে পারি না, আমি জীবনে যে কখনও কাজ করিবার যোগ্য হইব, তাহার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদিরামবাবুকে আমার নমস্কার ও ধন্যবাদ দিবেন।' যোগেন্দ্রবাবু সহানুভূতি দেখাইয়া দুঃখের সহিত বিদায় লইলেন।

এর পর আমার পীড়া এতই বৃদ্ধি পাইল যে মনে হইল, শীঘ্রই জীবন শেষ হইতে পারে, তখন আমার মাতুল চন্দ্রমোহন সেন আমার স্ত্রীপুত্রদিগকে পাঠাইয়া দিবার জন্য জগদীশদাদার নিকট তার করিয়া দিলেন।

তাঁহারা সকলে আসিলে মাতুলালয়ে স্থানাভাবজনিত অসুবিধা হইতে লাগিল, আমি আমার মামাতো ভাই হেমকে বলিলাম, 'তুই আমার জন্য বাড়ী খুঁজিয়া ঠিক কর। প্রায় দেড়মাস এখানে রহিলাম, এখন আর মামার বাড়ীর সেরূপ শ্রী নাই, মামাতো ভাইয়েরা কর্তা হইয়াছে। এখানে আর থাকিব না।' হেম বলিল, 'তোমার হাতে কিছু নাই; সপরিবারে নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়ী করিয়া কি ভাবে চলিবে?' আনন্দবাবু তিন মাসের অর্ধেক বেতন ১২০ টাকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে খরচ হওয়ার পর ৭৬ টাকা কয়েক আনা বাকি ছিল, আমি হেমের হাতে দিলাম। হেম বলিল, 'ইহাতে কি হইবে? যাহা হউক যখন জেদ করিতেছ, তখন বাসা করিয়া দিই। তাহার পরে যাহা হইবার হইবে।' হেম তখন বি. এ. পাশ করিয়া 'ল' পড়িতেছে, সে সন্ধ্যাকালে বাড়ী ঠিক করিয়া আসিল, রাজাবাগান জংশন রোড ১৪ নম্বরের বাড়ী, ভাড়া মাসিক ২২ টাকা।

পরদিন সেই বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। হেম বাজারের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনিয়া আনিয়া ৪৩ টাকা আমার হাতে দিল, কারণ আমার ঘটি, বাটি, বিছানাপত্র ও অপরাপর সমস্ত জিনিসই চন্দ্রমোহন দাস দাদামহাশয়ের বাটীতে কুমিল্লায় ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। ইহা হইতে বাড়ী ভাড়া ২২ টাকা দিয়া মোট ২১ টাকা হাতে রহিল।

আমি আমার এক বিশেষ বাল্যবন্ধু প্রকাশককে আমার সঙ্গে দেখা করিতে চিঠি লিখিলাম। ইনি প্রকাশকের কাজ করিয়া বিস্তর টাকা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, '"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রথম সংস্করণে ছয় শত ছাপা হইয়াছিল, তাহার রাজ সংস্করণের ১০০ শত বন্ধুবান্ধব ও সাহিত্যিকগণকে উপহার দিয়াছি। তাহার পর ত্রিপুরা রাজার ব্যয়ে বই ছাপা হইয়াছে, রাজ সরকারেরও অনেককে দিতে হইয়াছে। এখন বিক্রয় করিবার মতন ৪০০ বই আমার কাছে আছে। বই-র প্রশংসা চারিদিকেই হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের ইন্সপেক্টর দীননাথ সেন সারকুলার দিয়াছেন যে প্রত্যেক স্কুলের একখানি কিনিতে হইবে। এই পুস্তকের প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩ টাকা। স্কুলগুলি এখন বন্ধ, জ্যৈষ্ঠ মাস—স্কুল খুলিলেই বই বিক্রয় হইয়া যাইবে।' তাঁহাকে দীননাথবাবুর সারকুলার ও নানা পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনাগুলি দেখাইলাম এবং আরও বলিলাম, 'আমার অবস্থা অতি শোচনীয়, ১৫।২০ টাকা হাতে আছে, তাহা ছাড়া কুমিল্লার অর্ধেক বেতন, তিন মাসের টাকা অগ্রিম লইয়া আসিয়াছি, এ কয়েকটা টাকা ফুরাইলে আমরা না খাইয়া মরিব, তুমি আমার বাল্যসুহৃদ, বই-গুলি কিনিয়া লও। এগুলি স্কুলে স্কুলেই কাটিয়া যাইবে, বাহিরে বিক্রয়ের দরকার হইবে না।'

প্রকাশক মহাশয় বলিলেন, 'তুমি কি চাও'? আমি বলিলাম, 'চারিশত খণ্ড পুস্তকের মূল্য হয় ১২০০ শত টাকা, আমি ছয়শত টাকা অগ্রিম পাইলে ছাড়িয়া দিতে পারি।' তিনি বলিলেন, 'এ বেশ ভাল প্রস্তাব, আমি এই দরেই কিনিয়া লইব।' আমি খুব উৎসাহিত হইলাম। ছয়শত টাকা পাইলে, তাহার পর আর দুই মাস পর হইতে মাসিক ৪০ টাকা করিয়া অর্ধ বেতন পাইব, তাহা হইলে ইহাতেই আমার বৎসর চলিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকাশক মহাশয় বাড়ী গিয়া এক চিঠি লিখিলেন, 'এখন আমার একটু টানাটানির সময়, তোমাকে নগদ দুইশত টাকা দিব এবং তাহার পর ছয় মাসের মধ্যে বাকি চারিশত টাকা শোধ করিব।' আমি ভাবিলাম, ২০০ টাকাও তো কিছু কম নহে। তখন আমার হাতের টাকা তো আরও ঢের কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি তাহাতেই 'কবুল আছি', বলিয়া চিঠি লিখিলাম। আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সম্ভবত প্রকাশকের ভয় হইল। তিনি ভাবিলেন, 'যাহা বলি, তাহাতেই যখন রাজী হয়, তখন বোধ হয় কোন ফাঁকি আছে, বই বিক্রয় হইবে না।' নিশ্চয়ই এইরূপ আশঙ্কায় তিনি শেষে আমাকে বজ্রপাতের ন্যায় এই সংবাদ অতি সংক্ষেপে জানাইয়া লিখিলেন, 'বই এখন নেওয়ার আমার সুবিধা হইবে না।' মনে আছে, সেদিন শনিবার, আমার সম্বল আর তিনটি রৌপ্যচক্রে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। কাল চলিয়া যাইবে, কিন্তু পরশ্ব কি গতি হইবে! এই ভাবিতে লাগিলাম। স্ত্রীকে এ সকল কথার কিছুই বলি নাই। টাকার ভাবনা কোন কালেই আমার মনের উপর বড় বেশী অত্যাচার করে নাই। সেদিনও বেশীক্ষণ ভাবিলাম না। কিন্তু

খাওয়াদাওয়ার প্রবৃত্তি চলিয়া গেল। আহার প্রস্তুত হইয়াছিল, পেটের অসুখের ভাণ করিয়া খাইলাম না, স্ত্রীকে খাইতে বলিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। ভাবিলাম সংসারের কোন কাজে আমাকে ভগবান লাগাইবেন না—যখন পশুর মতই জীবন রক্ষা করিতে হয়, তখন দূর্বাঘাসের চিন্তা করিলে কি হইবে? আমার নিজ পরিবারবর্গের অন্নসংস্থান করিবার সামর্থ্য নাই—তিনটি শরণাগতকে আশ্রয় দিয়াছি, তাহাদিগকে ক্ষুধার সময় বলিতে হইবে, অন্যত্র যাইয়া খাও, আজ কাল গেলে পরশ্বই আমারই এই অবস্থায় পড়িতে হইবে, তখন এ জীবনের জন্য আমার দুশ্চিন্তা কেন? আমি উপলক্ষ হইয়া থাকিতে চাহি না, তোমার ভার তুমি লও। এই ভাবিয়া চক্ষু বুজিলাম, বুঝিলাম, দুই গণ্ড অশ্রুতে ভাসিয়া গেল। মা বাবাকে মনে পড়িল; মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, 'যে যেখানে দেবতা আছ, আমাকে লজ্জা হইতে রক্ষা কর—আমি সারা জীবন কুলির মত খাটিয়াছি, প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়া অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি, এখন ছেলেকে স্ত্রীকে বলিব, আজকার চাউল হইবে না, এই নিদারুণ লজ্জা পাইবার পূর্বে আমার প্রাণ লও, এই অশান্তি হইতে আমাকে শান্তিধামে লইয়া যাও।' আমার সমস্ত প্রাণ আবার ব্যাকুল হইয়া হরিনামের আশ্রয় লইল। আমি প্রত্যেক বার আমার নাম-দেবতাকে অশ্রু অভিষিক্ত করিতে লাগিলাম। মনে শান্তি আসিল, এমন একটা ভাব উপস্থিত হইল, যাহাতে সুখ-দুঃখ কিছু নাই, জীবন-মরণের চিন্তা নাই—কেবলই মধুর। 'মধুরং মধুরং' তাঁহার নাম আমার নিকট অমৃতের অমৃত বলিয়া মনে হইল। ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া গেলাম। আমার স্ত্রী ভাত খাইয়া দুঃখার্ত ভাবে আসিয়া বলিলেন, 'পেটের অসুখ কি কমিয়াছে? চারটি ভাত খুব নরম করিয়া রাঁধিয়া দিব কি?' আমি স্ত্রীর মুখ দেখিয়া কি এক আনন্দ পাইলাম! ছেলেদের দেখিয়া কি এক আনন্দ পাইলাম! বড় দুঃখের পঙ্কে এই আনন্দ-পঙ্কজ জন্মিয়াছিল—ইহা জীবন-সমস্যার এক অপূর্ব অনাস্বাদিত সুখের সমাধান।

এই সময় ছয় বৎসরের শিশু কিরণ একখানি চিঠি লইয়া ছুটিয়া আসিল। আমাকে বলিল, 'রেজিস্ট্রী চিঠি, সই দাও।' চিঠি খুলিয়া দেখিলাম, সোদরতুল্য সুহৃদ্ কুমুদবন্ধু বসু আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি চাটগাঁ ডিভিসনের স্কুলের এ্যাসিস্‌টেণ্ট ইন্সপেক্টার। 'দীনেশ, দীনুবাবুর সারকুলার দেখাইয়া আমি তোমার পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছি, এ সঙ্গে দেড়শত টাকার নোট পাঠাইলাম। তুমি তিনশত বই পার্সেলে পাঠাইয়া দিবে, বই পাইলে বাকী দাম পাঠাইব। একজন ভদ্রলোক এই জন্য খাটিতেছেন, তাঁহাকে ৫০ টাকা কমিশন দিতে হইবে। আমার ডিভিসনেই এই ৪০০ বই কাটিয়া যাইবে। সুতরাং তুমি আমার নিকট ১০০০ টাকা পাইবে।' দেড় শত টাকার নোট গুণিবার সময় চক্ষু হইতে অশ্রুর বেগ কিছুতেই থামাইতে পারিলাম না, স্ত্রীর দিক হইতে মুখ সরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিলাম। কুমুদবাবুকে হরকরা বলিয়া মনে হইল। আমার মনের দুঃখ কে যেন কি ভাবে জানিতে পারিয়া তাঁহার দয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। কে যেন কানের কাছে চুপে চুপে বলিলেন, 'আমি আছি'।

কুমুদবাবুর স্নেহের কথা কি বলিব? কুমিল্লায় যখন নিতান্ত পীড়িত হইয়াছিলাম, তখন তিনি ছুটি লইয়া দুইবার আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দুই-

বারে তাঁহার নিজের পকেট হইতে পাথেয় প্রায় ১০০ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। তিনি আমার আনন্দের সঙ্গী ছিলেন, দুঃখের দুঃখী ছিলেন, এখনও তিনি তাহাই আছেন। যখন ইংরাজীতে History of Bengali Language and Literature লিখি, তখন তিনি দেড়মাস বাড়ীঘর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া আমার কাছে ছিলেন, তিনি ইংরাজীতে বিশেষ প্রাজ্ঞ, পুস্তকখানির আদ্যন্ত ভাল করিয়া পড়িয়া দিয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থানে ইংরাজী শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিনজন শরণাগতের কথা লিখিয়াছি। যখন আমি নিতান্ত অভাবে ছিলাম—তখন একদিন বাঁকুড়া জেলা পাত্রসায়ের গ্রামবাসী রামকুমার দত্ত (তন্তুবায়) আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, 'বাবু আমি আমার স্ত্রী ও একটি সাত বছরের ছেলে আজ দুই দিন কিছু খাই না, আমাদের একটু আশ্রয় দিবেন কি? যদি চাকর করিয়া রাখেন তবে আমাকে তিনটি টাকা মাহিনা দিবেন, আর দুজনকে কিছু দিতে হইবে না, তাহারা শুধু খাইয়া পরিয়া থাকিবে, এবং কাজ করিবে।' হেম বলিল, 'না, বাপু, এখানে হবে না; বাবু নিজেই পরিবার পালতে পারেন না, শয্যাগত কাতর, আবার তোমাদের তিনজনকে চালাবেন কি ক'রে?' আমি বলিলাম, 'না হেম, থাকতে দে; আমাকে যিনি পালন করছেন ওদেরও তিনি করবেন। আমি তো আর নিজে রোজগার করছি না যে নিজের ইচ্ছানুসারে কাউকে তাড়িয়ে কাউকে রাখব। তিনি যখন এদের পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমাকে দীনহীন জেনেও এই পাড়ার এত লোক থাকতেও আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন আমি এদের কিছুতেই তাড়িয়ে দেব না, এরা তাঁর অসময়ের দান।'

রামকুমারকে আমি পুঁথি সংগ্রহ কার্য শিখাইয়াছিলাম। হরপ্রসাদবাবু, চিত্তরঞ্জন দাশ, নগেন্দ্রনাথ বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভৃতি মহাশয়দের নিকট আমি চিঠি লিখিয়া ইহাকে পুস্তক ও প্রাচীন চিত্র সংগ্রহে নিযুক্ত করিয়া দেই। সি. আর. দাশের বাড়ীর সমস্ত বাংলা প্রাচীন পুঁথি, নগেন্দ্রবাবুর ও সাহিত্য পরিষদের প্রায় সমস্ত পুঁথি ইহার সংগৃহীত। বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত ছবিসুদ্ধ প্রাচীন পুঁথির পাটা ও হাতীর দাঁতের প্রাচীন মূর্তি অবনীন্দ্রবাবু ইহাকে দিয়া সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর পুঁথিগুলি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্রয় করিয়াছেন। রামকুমার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বিস্তর পুস্তক বিক্রয় করে, গত বৎসরে সে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। তাহার ছেলে অবিনাশচন্দ্র দত্ত এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুঁথি সংগ্রহ হ, এবং আজকালকার বাজারে তাঁত চালাইয়াও রোজগার করিতেছে, তাঁতীর আমি নিজের ব্যবসায় ভুলিতে দেই নাই। রামকুমারকে আমি এমনই তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলাম যে সে মাসে ১৫০।২০০ টাকাও রোজগার করিয়াছে।

আরও পাঁচ ছয় মাস পরে অর্থাৎ পীড়া শুরু হইবার প্রায় একবৎসর পরে আমি একটু একটু হাঁটিতে পারিতাম, হয়ত ২।৩ মিনিট, তাহাও আবার যখন শরীর খুব ভাল থাকিত তখন,—অধিকাংশ সময়ই আমি বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম। একদিন আমি রাজাবাগান জংসন রোড দিয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পর্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়াছিলাম; আমার বাসাবাড়ী হইতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ২।৩ মিনিটের পথ। যেখানে আসিয়া আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার সম্মুখেই শ্রীযুক্ত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীর ডিস্‌পেন্সরী; তিনি আমাকে দেখিয়া আহবান করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা

করিলেন, 'আপনার বাড়ী কোথায়?' আমি বলিলাম, 'সুয়াপুর, ঢাকা'। তিনি বলিলেন, 'আপনার পিতার নাম কি ঈশ্বরচন্দ্র সেন?' আমি অনুকূল উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি করিয়া জানিতে পারিলেন?' তিনি বলিলেন, 'আমি তাঁহার নিকট পড়িয়াছি, যখন ছাত্র ছিলাম, তখন তাঁহার বয়স আপনার মতই ছিল, আমার আপনাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, ঠিক মাষ্টার মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন।' ইহাতে আশ্চর্য হইবার কথা কিছু ছিল না। শৈশব হইতে আমি অনেকবার ঐরূপ কথা শুনিয়া আসিয়াছি; একবার মাণিকগঞ্জে রাস্তায় বেড়াইতেছিলাম, তখন আমার বয়স আট নয়, সেই সময় দুইজন মুন্সেফ ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কথা বলিয়া যাইতেছিলেন। একজন আমাকে দেখিয়া অপরকে বলিলেন, 'এ ছেলেটি ঈশ্বরবাবুর ছেলে না হইয়া যায় না, কি আশ্চর্য সাদৃশ্য!' তারপর তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া অনেক মুন্সেফী জেরা করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে অরুণের জ্বর হইল। চন্দ্রশেখরবাবুকে ডাকাইলাম। তাঁহাকে ফি দিতে গেলে তিনি বলিলেন, 'ভাই, তুমি যে সপরিবারে আমার বাড়ীতে উঠ নাই, ইহাতেই আমাকে অনেক খরচ হইতে মুক্তি দিয়াছ। কারণ তুমি সবশুদ্ধ আমার বাসায় গেলে আমার সাধ্য থাকিত না তোমাকে নিষেধ করি; তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তাহা তুমি জান না।' চিরদিনই তিনি আমার উপকার করিয়া আসিয়াছেন। কতবার অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। গত বৎসর আমার স্ত্রীর ভয়ানক অসুখ হইয়াছিল। তিনি অসমর্থ শরীরে বেহালা যাইয়া আমার রথাকৃতি ত্রিতল বাড়ীর ছোট সিঁড়ি ভাঙিয়া ঊর্ধ্বতলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়াছেন, একবার নহে, বহুবার। শৈশবের স্মৃতি মধুর ভাবে তাঁহার হৃদয়ে আঁকা আছে, তাঁহার বাড়ী ধামরাই-গ্রামের কথা বলিতে গেলে আর কথা ফুরাইতে চায় না। এখন তাঁহার চেহারাটি ঠিক শিব ঠাকুরের মত হইয়া গিয়াছে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; আবক্ষ-লম্বিত দাড়ি, সবগুলি পাকিয়া গিয়াছে, মুখের কৌমার্য এ বয়সেও কমে নাই, চোখ-নাকের গড়ন প্রতিভাসূচক, এত বড় একটা লাঠি লইয়া যাতায়াত করেন যে, সেটি চাঁদ সদাগরের হিন্তালের প্রসিদ্ধ লাঠির সঙ্গেই তুলনা হইতে পারে। বাঙালী সৈনিকের ইতিহাস-বিশ্রুত রায়বাঁশের পরে সেরূপ লাঠি আর কেহ ব্যবহার করেন নাই। পুলিশের রেগুলেসনলাঠির মাথা ফাটাইয়া দিতে পারে চন্দ্রশেখরবাবুর লাঠি। রুদ্রাক্ষমালা গলায় পরেন, কপালে সময়ে সময়ে রুলি থাকে; দাড়ি গোঁফ, রুলি, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি আসবাবের সহযোগে লম্বোদর গজাননের মত মূর্তিখানি দেখিলে মনে হয়, এখন মন্দির তৈয়ারী করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেই হয়। বৎসর ৫।৭ হইল আমি উঁহার বাড়ীতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যে বাংলায় প্রথম হইবে, তাহার জন্য বৎসর বৎসর একটি স্বর্ণ-পদকের মূল্য ২০০০ টাকার চেক লইয়া আসিয়াছিলাম। উহা তাঁহার পিতা ও মাতার নামাঙ্কিত।

অরুণ জ্বরে ৩৫ দিন ভুগিয়া পথ্য পাইল। চন্দ্রশেখররাবু রোজই আসিতেন। আমি নিদারুণ রোগে কাতর, তারপর সারারাত্রি অরুণের শয্যাপার্শ্বে জাগিয়া বসিয়া থাকিতাম। কি কষ্ট যে গিয়াছে তাহা আর কি বলিব! ইহার মধ্যে একদিন চন্দ্রশেখর-বাবুর বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে গিয়াছিলাম, আমি শুধু গায়ে, চটি

পায়ে গিয়া তাঁহার বাহির বাড়ীতে বসিয়াছিলাম, দেখিলাম কয়েকজন যুবক কথোপকথন করিতেছেন। তাহার মধ্যে একটি বি. এ. উপাধিধারী তরুণ যুবক খুব আসর জমকাইয়া বঙ্গভাষার সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। তিনি বঙ্গভাষা সম্বন্ধে এরূপ অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যাইতেছেন যে অপর যুবকেরা হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের কথা যেন গিলিয়া খাইতেছেন। বিষয়টিতে আমি একটু আকৃষ্ট না হইয়া পারিলাম না। হঠাৎ একটা কথার মুখে আমি বলিলাম, 'মহাশয়! আপনি যে সকল কথা বলিতেছেন—তাহা ভুল!' তিনি ক্ষেপিয়া গিয়া ভুল দেখাইতে বলিলেন, আমি দুই চারিটি কথায় তাঁহার ভুল দেখাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, 'এ কথাই নয়, দীনেশবাবুর বঙ্গভাষায় যাহা লেখা আছে, আমি তাহাই বলিয়াছি, ঐ বই এখন অথরিটি, আপনি নিশ্চয়ই উহা পড়েন নাই।' আমি বলিলাম, 'ঐ পুস্তক প্রকাশ হওয়ার পর নূতন কতকগুলি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—সেই তত্ত্বগুলির আলোকে বইখানির সংশোধন আবশ্যক।' এই কথায় বক্তা খুব চটিয়া গেলেন, 'দীনেশবাবুর উপরে সংশোধন?' অপরাপর যুবকেরা বলিলেন, 'ও কথা বলিবেন না মহাশয়, দীনেশবাবুর পুস্তকে প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইয়াছে।' যখন তাঁহারা এইভাবে কলরব করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে নিরস্ত করিয়া দিতেছিলেন, এমন সময় চন্দ্রশেখরবাবু তাঁহার ভুঁড়ি পুরোভাগে করিয়া স্মিতমুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'এই যে দীনেশ! কতক্ষণ হল এসেছ?' এবং যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা বুঝি এঁকে চেন না। ইনি হচ্ছেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" দীনেশচন্দ্র।' তখন যুবকদিগের অনেক সৌজন্য ও ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা আমি অভিনন্দিত হইলাম।

এই সময় ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় আমার বাড়ীতে আসিয়া অনাহূতভাবে আমার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি আমার বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে পরিশ্রমের কথা অনেক প্রশংসোক্তি দ্বারা বাড়াইয়া বলিলেন, 'আমাদের যথাসাধ্য সহায়তা করা উচিত। আপনি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে চান, তাহার সম্পূর্ণ ভার আমি লইব। আর যদি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মত হয়, তবে বলুন, আমি বিজয়রত্ন সেন মহাশয়কে আনিয়া আপনার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়া দেই, আপনার কোন খরচ লাগিবে না ; তিনি আমার বিশেষ বন্ধু।' ভগবান যে কতদিকে কতজনের দ্বারা আমার খোঁজ লইতেছিলেন! মারিয়া ধরিয়া মাতা যেরূপ শিশুকে স্তন্য দান করেন, আমাকে যে সেইরূপ রোগযন্ত্রণা দিয়া, যেন আবার স্নেহার্দ্র হইয়া চুম্বন পূর্বক নিজের অসীম দয়া বুঝাইয়া যাইতেছেন, তাঁহার সেই দয়া যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম।

কবিরাজী চিকিৎসায়ই মত হইল, নীলরতনবাবু বিজয়বাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। বিজয়বাবুর পুত্র হেমচন্দ্র বিদ্যমান, হেমচন্দ্র যদি আর একটু দীর্ঘ হইতেন, ও তাঁহার মুখ চোখের যদি আর একটু দীপ্তি বেশী থাকিত, তবে তাঁহাকে ঠিক পিতার প্রতিচিত্র বলিয়া মনে হইত, এখনও খুব আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে, সন্দেহ নাই।

বিজয় কবিরাজ মহাশয়ের উদারতার ঋণ কি করিয়া ভুলিব? যাঁহারা আমার বিপদের সময় অযাচিত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ কি করিয়া শোধ

করিব? অনেকে তো আমাকে ঋণপাশে বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যিনি ইঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমার ভার দিয়াছিলেন, তাঁহার চরণপদ্মে কোটি নমস্কার পূর্বক তাঁহাদের মঙ্গল কামনা ভিন্ন আমি আর কি করিতে পারিয়াছি।

এই সময় বনোওয়ারীলাল গোস্বামী (শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামীর পুত্র) 'খিচুরী' নামক এক ব্যাঙ্গ-কাব্য প্রচার করেন, তিনি এই পুস্তকে বঙ্গের তৎকালীন লেখকদের লইয়া আচ্ছা মজা করিয়াছিলেন, সে সময় বইখানির বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এই পুস্তকে তাঁহার ব্যঙ্গের তালিকায় আমিও পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমার চোখ দুটি কি জানি কেন তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু আমার দাশরথি রায়ের সমালোচনা বোধহয় তাঁহার মোটেই ভাল লাগে নাই। তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছিলেন, তাহার দুটি ছত্র মনে আছে:

'চক্ষু দুটি পটল চেরা প্রতিভাতে আঁকা।
বল্লে পরে রাগ করিবেন, পথ ধরেছেন বাঁকা॥'

অরুণের জ্বর লইয়া রাত্রি জাগরণ ও সেবা-শুশ্রূষা এবং আরও কয়েকটি কারণে আমি আবার শয্যাশায়ী হইলাম; একটি কারণ, আমি গাড়ী করিয়া একজনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম; ফলে গাড়ীর ঝাঁকুনিতে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইল। দিনরাত্রি মাথায় বরফ দিয়া রাখিতাম। তারপর তিনমাস এমন ছিলাম যে এ ঘর হইতে ও ঘরে যাইবার আমার সাধ্য ছিল না। এই সময় ভ্রাতা হেমচন্দ্র ছায়ার ন্যায় আমার কাছে ছিল, ও পাড়ার মাতঙ্গিনী পালিত নামক এক যুবতী দয়া করিয়া আমার চিঠিপত্রগুলি লিখিয়া দিতেন।

১৮৯৮ সনে কলিকাতায় ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। বোধ হয় আষাঢ় মাস, আমার সেই পরমা সুন্দরী মামাত ভগিনী সরোজিনী আমার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমায় দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারও মাঝে মাঝে ফিট হইত; ইহার মধ্যে আমার মামাত ভাই দৈবকীলালের (এখন নারায়ণগঞ্জের মুন্সেফ) স্ত্রীর হিষ্টিরিয়ার ব্যারাম হয়।

এই সময় দৈবাৎ এক ওঝা জুটিয়া গেল। ওঝার প্রতিপত্তি আমাদের বাড়ীতে খুব বাড়িয়া গেল, সে গোপনে আমার ছোট মাতুলকে বলিল, 'আপনাদের বাড়ীতে দুই জনের উপর ভূতের দৃষ্টি আছে', একজন সরোজিনী ও আর একজন আমি—এই দুইজনকেই সে ভূতাশ্রিত বলিয়া নির্দিষ্ট করিল, সে মন্ত্রতন্ত্র ও বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা আমাদের ভূত তাড়াইয়া দিতে পারে এবং স্নায়বিক দুর্বলতা-জনিত ফিট বলিয়া যাহা ডাক্তাররা বলিয়াছেন সে তাহা অনায়াসে ভাল করিয়া দিবে বলিয়া দম্ভ করিতে লাগিল। সরোজিনী ও আমি পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, যে অবধি সেই ওঝা থাকিবে সেই অবধি সে বাড়ীতে আমরা কিছুতেই যাইব না।

সেই ভূমিকম্পের দিন আমি সরোজিনী ও হেম রাজাবাগানের বাসায় একত্র হইয়া এই সকল কথা লইয়া কৌতুক করিতেছিলাম। সরোজিনী আমার জন্য ভালো লেংড়া আম লইয়া আসিয়াছিল, সে আমাকে কাটিয়া দিতেছিল, আমি খাইতেছিলাম, এমন সময় সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। ঝড়ের সময় কলার পাতা যেরূপ থরথর করিয়া কাঁপে, সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল; মনে হইল যেন দ্বিতল বাড়ীর মাথাটা

ধরিয়া কেহ ঝাঁকুনি দিতে লাগিল, মুহূর্তের মধ্যে শত শত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল এবং কোন কোন বাড়ী পড়িয়া যাইবার ভীষণ শব্দে কানে তালা লাগিল।

সরোজিনীর ফিট হওয়ার উপক্রম হইল, আমি হাঁটিতে পারি না, আমাদিগের দুইজনকে দুই হাতে ধরিয়া এবং ছেলেদিগকে আগে আগে তাড়াইয়া লইয়া হেম বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাড়ীর সম্মুখে একটা ছোট খোলা মাঠ ছিল (যাহার উপর ডিরেক্টারের পার্শনাল এ্যাসিসট্যাণ্ট অম্বিকা বসু মহাশয় পরে বাড়ী করিয়াছিলেন) সেইখানে যাইয়া দাঁড়াইলাম। আমি ও সরোজিনী উভয়েই বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলাম না, আমি বসিয়া পড়িলাম, সরোজিনী শুইয়া পড়িল। তখনও বাড়ীখানি তাসের ঘরের মত দুলিতেছিল, আশেপাশের মেয়েরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমি দেখিলাম আমার স্ত্রী নাই, তখন হেমকে বলিলাম, 'তিনি লজ্জাশীলা হইয়া হয়ত কোন ঘরে বসিয়া আছেন।' তখন সেই পতনোন্মুখ গৃহের মধ্যে প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হেম ঢুকিয়া পড়িল এবং দ্বিতলের একটি ঘর হইতে হিড়হিড় করিয়া আমার স্ত্রীকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। বাড়ীখানি পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল, মনে হইল কেউ যেন 'তিষ্ঠ' বলিয়া কম্পিতা ধরিত্রীকে স্থির করিয়া ফেলিলেন।

পাড়ায় আমাকে সেদিন অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ঐ ঘাসের উপর যে রমণী পড়িয়াছিলেন, উনি আপনার কে? আমাদের মনে হইল যেন একটা বিদ্যুৎ মাটিতে পড়িয়া আছে, এমন সুন্দরী বাঙালীর ঘরে দেখা যায় না।' তাঁহারা সরোজিনীকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এ কিছু নূতন নহে, তাহাকে দেখিয়া অনেকেই ইহার পূর্বে চমৎকৃত হইয়াছেন।

ইহার কিছু পরে কলিকাতায় প্লেগ রোগের শুভাগমনের আশঙ্কায় শহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শীঘ্রই 'কোয়ারেণ্টাইন' বসিবে, এই জনরবে কলিকাতা হইতে লোক পলাইতে শুরু করিল। তেমন ভয় কলিকাতায় কেহ আর দেখিয়াছেন কিনা, জানিনা। ছেলে, বুড়ো, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে ভয়ে আড়ষ্ট, এরূপ সর্বজনীন ভীতি কলিকাতার ন্যায় শহরে যে কি আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা লিখিয়া বুঝানো শক্ত। কলিকাতা হইতে শত শত সহস্র সহস্র লোক ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। কুম্ভমেলা বিশৃঙ্খল হইলে, সমুদ্র তীর অতিক্রম করিয়া ছুটিলে বোধ হয় সেই দৃশ্যের কতকটা কল্পনা করা যায়। রেলগাড়ীতে স্থানাভাব, পথের ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া অসম্ভব; এক মহা-জনতা যেন পথ না পাইয়া দুর্দমনীয় বেগে ছুটিতেছে, যেন কোন রাজরাজেশ্বরের অক্ষৌহিণী সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছে।

১৮

ফরিদপুরে

আমি অশক্ত, আমি কোথায় যাইব? কে লইয়া যাইবে? মাতুলেরা চলিলেন, তাঁহারা বলিলেন, 'তুমি হেমকে নিয়ে স্টেশনে যেয়ো।' ইহার মধ্যে অরুণের ঊরুদেশের ঊর্ধ্বমূলের সন্ধি একটু ফুলিয়া বেদনা হইল, তাহার বয়স তখন ছয়। আমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাই নাই, অবশেষে দেখিলাম, সে একটা তক্তপোষের নীচে পলাইয়া আছে। প্লেগ মনে করিয়া পাছে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, ছয় বৎসরের ছেলের প্রাণে সেই আতঙ্ক হইয়াছে।

এই অবস্থায় হেম আমাদিগকে লইয়া স্টেশনে উপস্থিত হইল। ভয়ঙ্কর ভিড়ে মাতুলেরা কোনরকমে জিনিসপত্র তোলাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন, কিন্তু আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল, তখন তাঁহারা একজন বাজার-সরকারকে রাখিয়া গেলেন, আমাকে পরের ট্রেনে লইয়া আসিতে। আমি বিপদসমুদ্রে পড়িলাম। কোথায় যাইব? কে লইয়া যাইবে? সেই সরকারের আমার পরিবারসহ আমাকে লইয়া যাইবার মত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রকারিতা ও শক্তি কিছুই ছিল না, সে একটা মুটের মত ছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে পড়িয়া মনে হইল আমি বৈতরণীর পাড়ে আসিয়াছি, সম্মুখে যমরাজের বাড়ী।

সুয়াপুরের ঘরগুলি সমস্তই পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে পাকা ঘর তুলিবার সংকল্পে খড়ো ঘরগুলি মেরামত না করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলাম। মামারা হয়ত আমার পীড়া অসাধ্য জানিয়া আমাকে ভয়ে ত্যাগ করিয়া গেলেন। দেখিলাম মাথার উপর নীলবর্ণ ছাদ—তাহা আকাশ, সেখানে শত শত নক্ষত্র, সেইগুলিই আমার আলো। আমার মুক্তাকাশনিম্নে স্থান—আর কোথায়ও কোন সম্বন্ধ নাই। হেম এমন সময় বিদায় লইতে আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। আমি কোন কথা বলিলাম না, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সে বলিল, 'তুমি কেঁদ না, আমি তোমাকে ফেলিয়া কোথাও যাইব না। আমার পরিবারের লোকরা কলিকাতায় আছেন, আমার এখনই যাওয়ার কথা—এই ঘোর আশঙ্কার সময় আমি ফিরিয়া না গেলে তাঁহারা যে অবস্থায় রাত কাটাইবেন, তাহা বুঝিতে পার। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে এখানে পৌঁছাইয়া দিয়া রাত বারোটার গাড়ীতে তাহাদের লইয়া যাইব। কিন্তু তোমাকে মামারা যে এরূপ নির্দয়ভাবে ফেলিয়া যাইবেন, তাহা তো জানা ছিল না। তোমাকে আমি গোয়ালন্দ পৌঁছাইয়া দিয়া ফরিদপুরের স্টীমারে রওয়ানা করিয়া দিয়া ফিরিব—সেইখান হইতে সরকার মহাশয় তোমাকে লইয়া যাইবেন, আমি ফরিদপুরে তারাকুমারবাবুকে আজ রাত্রেই তার করিয়া দিব, স্টীমারঘাটে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতে।' আমি বলিলাম, 'দাদার পরিবার, তোর পরিবার—এই দুইদিনে যে কলিকাতায় ভয়ে মরিয়া যাইবে।' সে বলিল, 'তাহারা ঠিক তোমার মত নিরুপায় নয়—লোকজন বাড়ীতে আছে, কিন্তু না হইলেই বা কি? আমি কোন্

প্রাণে তোমাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইব? যখন সম্মুখে কর্তব্য এরূপ ভাবে উপস্থিত হয়, তখন সেটিকে দুর্ভাবনা ভাবিয়া কখনই অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে।'

হেম অতিশয় নম্র প্রকৃতির লোক, এমন মিষ্টস্বভাবের লোক বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার মত সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও বীরোচিত কার্যকলাপও আমি খুব কম দেখিয়াছি। অপোগণ্ড শিশু যেরূপ মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লয়, আমি সেইভাবে তাহার পরিচালনার উপর নিঃসহায় ভাবে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া নাম জপ করিতে লাগিয়া গেলাম।

গোয়ালন্দে যাইয়া প্রাতে হেম আমাকে স্টীমারে উঠাইয়া দিল, সঙ্গে স্ত্রীপুত্রাদি ও সরকার মহাশয়। হেম বিদায়কালে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আমাকে সাহস দিয়া গেল। আমার সহোদর ভাই নাই, কিন্তু হেমের অপেক্ষা কোন্ সহোদর বেশী স্নেহশীল হইতে পারিত?

পদ্মায় দেড় বৎসর পূর্বে একবার ভাসিয়াছিলাম, আবার সেই পদ্মায়। রোগ সারিবার যে কোন উপক্রম হইয়াছে, তাহা তো বোধ হইল না। ফরিদপুরে আমার ভগিনীপতি তারাকুমার রায়, সবজজের সেরেস্তাদার, ৫৮ টাকা বেতন পান। তাঁহার পুত্র, কন্যা ও জামাতা প্রভৃতিতে সংসারটি নিতান্ত ছোট নহে। ঐ অল্প বেতনে অনেক কায়ক্লেশে চলে, এই ভগিনী আর আমি যমজ। আমাকে দেখিয়া তাঁহাদের একটু ভয় হওয়া খুব স্বাভাবিক, যেহেতু তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, আমি বহুদিন রোগে ভুগিতেছি। ডাক্তাররা বলিয়াছেন রোগ সারিবে না, অথচ পুত্রকন্যায় আমার সংসারটিও নিতান্ত ছোট নহে, আমি একেবারে নিঃস্ব। তাঁহাদের ভয়ের আভাস বুঝিয়া আমি তারাকুমার-বাবুকে পাঁচশত কয়েক টাকা দিলাম, পুস্তক বিক্রয়লব্ধ টাকার সেই অংশ অবশিষ্ট ছিল। টাকা পাইয়া তারাকুমারবাবুর ভয় দূর হইল। তিনি খুব আদর দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই টাকা দেওয়ার পূর্বে, তাঁহাদের ছোট বাড়ীতে আমাদের সংকুলান হইবে না, এবং তিনি আমাদিগকে একটা ভার বোধ করিতে পারেন, এই আশংকায় স্থানান্তরে যাইবার কল্পনা করিয়াছিলাম। মাতুলদিগকে চিঠি লিখিয়া এই দুঃসময়ে জবাব পাইলাম না। আর একজন আত্মীয়কে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তিনি নানা অজুহাতে আমাকে এড়াইলেন। কিন্তু কবি দীনেশচরণ বসু মহাশয়কে, তিনি কায়স্থ হইলেও, বিপদে পড়িয়া আশ্রয় প্রার্থনাপূর্বক চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তরটি আমি এখন পর্যন্ত রাখিয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

'বহুদিনের পর তোমার পত্র পাইয়া সুখী হওয়া দূরে থাক, তোমার পীড়ার এখনও আরোগ্য হয় নাই জানিতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া যে এই পত্রখানি লিখিয়াছ, তজ্জন্য যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার এখানে তুমি সপরিবারে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পার, তাহাতে আমার অপার আনন্দ ভিন্ন কোন প্রকারের অসুবিধা হইবে না। ভূমিকম্পের পূর্বে হইলে তোমাকে অধিকতর সুবিধা দিতে পারিতাম। তথাচ এই ক্ষুদ্র গৃহের বর্তমান অবস্থায় আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে, তাহার ত্রুটি হইবে না। তুমি যত শীঘ্র পার সপরিবারে রওনা হইয়া আসিবে। স্টীমারে আসিলে এলাচিপুরের টিকিট কাটিবে। পূর্বে জানিতে পারিলে (আরচা) স্টেশনে পালকি ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাখা যাইতে পারে। চাকরানী পাওয়া কঠিন।

শূদ্র চাকর একজন একরূপ সুস্থির করিয়া রাখিলাম। মনে কোনরূপ ভিন্ন ভাব না ভাবিয়া অন্য কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া সরল স্নেহের আবেগে যেরূপ পত্র লিখিয়াছ, তাহার বশবর্তী হইয়া এখানে আসিবে, এবং আমাদিগকে সুখী করিবে।'

যাহা হউক, তারাকুমার বাবু যখন তথায়ই থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন দীনেশ বসু মহাশয়ের সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু চিঠির উত্তর দিতে ইতস্তত করিতে লাগিলাম ; তিনি তাগিদ দিয়া আর একখানি স্নিগ্ধ পত্র লিখিলেন, সেই পত্রের উত্তর দিতে যাইব, এমন সময় তাঁহার স্ত্রীর পত্র পাইলাম, তিনি তাঁহার মৃত্যুসংবাদ দিয়াছেন। দীনেশবাবুর বয়স ৪০-এর কিছু উপরে হইয়াছিল, শরীর খুব ভাল ছিল। তিনি 'জুরি' হইয়া ঢাকায় চলিয়াছিলেন, পথে রাত্রে নৌকায় কলেরা হয়। যেদিন প্রাতে সুস্থদেহে প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছিলেন তাহার পরদিন বেলা তিনটার সময় মাঝি তাঁহার মৃতদেহ লইয়া বাড়ীতে আসিল, সে বোধহয় ১৮৯৮ সনের আষাঢ় মাসে।

এই অভাবনীয় সংবাদে যে আমি কিরূপ মর্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা লিখিতে পারি না। আমার তিন চার রাত্রি ঘুম হয় নাই, এবং তাঁহার মুখ মনে পড়িলেই ফিট হইত। স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য অল্পতেই আমি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িতাম।

ফরিদপুর আসিয়া দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আদরস্নেহ লাভ করিলাম। তখন শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া নানা স্থানে চিঠি লিখিয়া আমার সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আর একজন আমার পূর্বসুহৃদ বরদাচরণ মিত্র মহাশয়। আমি বিছানায় পড়িয়াছিলাম, অতি কষ্টে কখনও কখনও একটু হাঁটিয়া প্রতিবাসী অনাথবন্ধু কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া বসিয়া সেতার বাজাইতাম, কখনও বা দিগম্বর সান্যাল মহাশয়ের এবং অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া গল্প করিতাম। ইঁহাদের বাড়ী আমাদের বাসা হইতে ২।১ মিনিটের পথ দূরে ছিল। বরদাচরণ মিত্র ছিলেন তখন ফরিদপুরের বাঘা জজ, তিনি প্রায়ই সেই পর্ণ কুটিরে আমাকে দেখিতে আসিয়া প্রায় ২।৩ ঘণ্টা কাটাইয়া যাইতেন। এতাদৃশ ব্যক্তি আমাকে দেখিতে আসাতে শহরে আমার নাম এরূপ প্রচার হইয়া গেল যে, বহু সম্ভ্রান্ত উকিল, ডেপুটি, জমিদার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বরদা মিত্র মহাশয় দে সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সাহিত্যিক পেনশনের জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আর্জি করিবার জন্য আমাকে উপদেশ দিলেন। তখন গ্রিয়ারসন সাহেব ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি সিমলায় থাকিতেন। তিনি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পড়িয়া আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। তিনি লিখিলেন, 'আপনি যদি বৃত্তির জন্য আবেদন করেন, তবে আমি সমর্থন করিব।' এই চিঠি দেখিয়া শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে এবং মিত্র মহোদয় খুব জোর পাইলেন, এবং আমার আবেদনপত্রের উপর অনুকূল মন্তব্য লিখিয়া উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর কমিশনার স্যাভেজ সাহেব ফরিদপুর পরিদর্শন করিতে আসিলে আমি উঁহাদের উপদেশমত পালকিতে চড়িয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি নাম (Savage) দিয়া ভীতি উৎপাদন করিলেও অতি মৃদু ও দয়ালু স্বভাব।

আমার অবস্থা জানিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আবেদনপত্র সমর্থন করিতে সম্মত হইলেন। এইভাবে সরকার হইতে আমার ২৫ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর হইয়া আসিল ১৮৯৯ সনে। মঞ্জুরী হইবার সংবাদটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাকে জানাইয়াছিলেন। সাহিত্যিক বৃত্তি বঙ্গদেশে এই প্রথম। তাহার পর কবিবর হেমচন্দ্র পাইয়াছিলেন, তাহাও সেই ২৫ টাকা।

মিত্র মহাশয়কে আমি বলিলাম, 'আমার কন্যা মাখন ১২।১৩ বৎসর বয়স্কা হইল, ইহার বিবাহের উপায় কি?' তখনও বিবাহের বাজারে বরের দর এতটা চড়িয়া উঠে নাই। আমরা কুলীন, অকুলীনদের আমাদের উপর তখনও একটা নেশা ছিল, সুতরাং পৈতৃক রক্তের গুণে তখনও একটু নীচে নামিলে বিশেষ অর্থের প্রয়োজন হইত না। যাহা হউক কন্যা-বিবাহ তখনও একটা ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল। মিত্র মহাশয় তাঁহার কোর্টের উকিলদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দীনেশবাবু City of Glasgow Life Assurance Company-র এজেণ্ট, আপনারা প্রত্যেকে একটা বীমা করুন।' তিনি নিজে বারো হাজার টাকার বীমা করিলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে অনেক উকিল, ডেপুটি ও মুন্সেফ বীমা করিলেন। আমার ইঁহাদিগকে লইয়া ডাক্তার সাহেবের ওখানে অনেক সময় যাইতে হয় নাই, মিত্র মহাশয় ডাক্তার সাহেবকে দিয়া আমার কাজ যতটা লঘু হওয়া সম্ভব তাহা করাইয়া দিয়াছিলেন। আমি দুই মাসের মধ্যে এই বীমার কাজে এগার শত টাকা পাইয়াছিলাম। কন্যা-বিবাহ ফরিদপুর বল্লভদি গ্রামে ঠিক হইয়া গেল। বর কুলদাকুমার সেন রায়, মাইনর পরীক্ষায় ঢাকা ডিভিসনে প্রথম হইয়া পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মাদারীপুর স্কুল হইতে দশটাকা বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতায় এল. এ. পড়িতেছিলেন। ইঁহাদের বাড়ীর অবস্থাও মোটামুটি মন্দ ছিল না। আমাকে অনেকটা নীচে নামিয়া এই সম্বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বিবাহের ঘটক ছিলেন বল্লভদি গ্রামের রাজেন্দ্র গুপ্ত। ইনি এখন মুন্সেফী করিতেছেন। বিবাহে ঠিক এগারশত টাকাই ব্যয় হইল।

এই সময় রমণীমোহন ঘোষ নামক এক তরুণ বয়স্ক উকিল আমার নিকটে সর্বদা আসিতেন। তিনি খুব ভাল কবিতা লিখিতে পারিতেন, রবিবাবুর প্রায় সমস্ত কবিতা তাঁহার মুখস্থ ছিল। তাঁহার নিজের ভাষায়ও রবি-বীণার একটা ঝঙ্কার মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিত, কিন্তু নিভৃত পল্লীর শিউলি ফুলের গন্ধ, কেয়ার সুবাস, ও পল্লী-বালিকাদের স্নেহার্দ্র হৃদয়ের পবিত্রতা লইয়া যখন রমণী কবিতা লিখিতেন, তখন তাঁহার নিজস্ব একটা রাগিণী ফুটিয়া উঠিত—সেটা আমার কাছে এত মনোহর লাগিত যে মনে হইত যেন সমস্ত পল্লী-প্রাণের রস দিয়া তাহা কোমল-স্নিগ্ধ করা হইয়াছে। রমণীর চেহারাটা কতকটা নামের উপযোগী, গোঁফ না থাকিলে তাঁহাকে মেয়েলোক বলিয়া ভুল হইতে পারিত এবং স্বরটিও ছিল মেয়েলী ধরনের। ঈদৃশ ব্যক্তি যে ওকালতিতে পশার জমাইতে পারিবেন না, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়ার কথা নহে। অথচ রমণী এরূপ দ্রুত ইংরেজী ও বাংলা লিখিতে পারিতেন, যে তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা কাহারও অগোচর ছিল না। আমি নিজ হাতে লিখিতে পারিতাম না, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রবন্ধ আকারে বাহির করিব, এই ছিল আমার লক্ষ্য। উপেন্দ্র নামক এক যুবক এবং রমণীকে দিয়া আমি

যে কত লেখা লিখাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ একরূপ অপরিশোধনীয়। আমি প্রায়ই মিত্রমহাশয়কে রমণীর কথা বলিতাম, তিনি রমণীর কবিতা পড়িয়া যেরূপ সুখী হইতেন, তাঁহার ওকালতির বিড়ম্বনা শুনিয়া তেমনই দুঃখিত হইতেন। তিনি রমণীকে একটা কমিশন দেন, তাহাতে সে ৬০০ টাকা উপার্জন করে। রমণী-মোহন ঘোষ এখন সাহিত্যিক জগতে সুপরিচিত কবি এবং বোম্বাই-এর পোস্টমাস্টার জেনারেল। এত বড় পদ পাইয়াও রমণী যেমন ছিলেন তেমনই আছেন, সেই মেয়েলী ঢঙের মধুর কল-হাসি, মৃদু-কথা, বন্ধুবর্গের সহিত প্রাণ-জুড়ানো ভাবে মেলামেশা।

কুমিল্লার প্রসিদ্ধ উকিল দিগম্বর সান্যাল সম্বন্ধে আমি 'প্রদীপে' দীর্ঘ জীবনী লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার 'সুকথা' নামক পুস্তকে পুনরায় মুদ্রিত হইয়াছে। কোন জেলা কোর্টের উকিল তাঁহার মত ৩।৪ হাজার টাকা মাসিক উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। তিনি ছিলেন উকিল-শিরোমণি, সাধু-শিরোমণি, বিনয়ের খনি, শুচিতার আদর্শ। জঙ্গল ও কাঁটাবনে তো পৃথিবী আচ্ছন্ন, ইহার মধ্যে যেমন একটা বনমল্লিকা বা যূথিকা ফুটিয়া প্রমাণ করে পৃথিবীর সবই কাঁটা নহে, এখানেও শোভা সুগন্ধ আছে, আদালতের নানা ছল, অভিসন্ধি ও কুটিলতার ভিতর তেমনই কেমন করিয়া দিগম্বরবাবু উদিত হইয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন এখানে সকলই ছলচাতুরী নহে, এ জায়গাটাও ভগবান একেবারে ভুলিয়া যান নাই। দিগম্বর বাবুর চেহারা অনেকটা স্যার গুরুদাসের মত ছিল, তিনি নিজেও একথা বলিয়াছেন, যে বহুলোকে তাঁহাদের এই সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিতেন। দিগম্বরবাবু আমাকে ছেলের মত ভালবাসিতেন, নিজে কাছে বসিয়া আমাকে খাওয়াইতেন, তাঁহারও হঠাৎ-মৃত্যু আমাকে অভিভূত করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্রাকৃতি, অতি নম্রপ্রকৃতি, বিনয়ী অথচ তেজস্বী উকিল যখন কুমিল্লা আদালতের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, তখন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন কংগ্রেসবিশ্রুত দেশমান্য অম্বিকা মজুমদার—শালপ্রাংশু মহাভুজ দীর্ঘাকৃতি—এই মহাশয়ের অদ্বৈতাচার্যের মতই 'পক্ক কেশ পক্ক দাড়ি বড় মোহনিয়া। দাড়ি পড়িয়াছে, তাঁহার হৃদয় ছাড়িয়া।'

অম্বিকাবাবুর ধর্মমত প্রায় নাস্তিকবাদের কাছাকাছি, মিলের মতন তিনি নীতি শাস্ত্রটাকেই চরম মনে করিতেন, আমার সঙ্গে তাঁহার ইহা লইয়া তর্ক-যুদ্ধ চলিত। তিনি বক্তৃতার রাজা, রাজনৈতিক আন্দোলনের পাণ্ডা, দেশউদ্বোধনমন্দিরের অন্যতম প্রবীণ পুরোহিত। কিন্তু রাজনীতি আমাকে কখনও আকর্ষণ করে নাই, বিশেষ আমি একরূপ শয্যাশায়ী হইয়া দিন কাটাইতাম, সুতরাং তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা শোনা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু মিত্র মহাশয় কিংবা দে সাহেব (ঠিক মনে পড়িল না) যখন ফরিদপুর ছাড়িয়া যান, তখন সেই বিদায়সভায় আমি বহু কষ্টে উপস্থিত হইয়াছিলাম, অম্বিকাবাবু সেদিন মাত্র দু-এক মিনিট বাংলাভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই দুই এক মিনিটেই তিনি শ্রোতৃবর্গের মন হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, অন্তত আমার। তিনি একটি ফুলের মালা লইয়া বিদায়োন্মুখ মহোদয়কে পরাইয়া দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, 'আমরা আপনাকে আর কি দিব? কিন্তু এই যাহা দিতেছি, ইহার মত উৎকৃষ্ট পৃথিবীতে কিছু নাই, এই ফুলের মালাই সর্বতোভাবে আপনার যোগ্য।'

ফরিদপুরের আইনআকাশের অপরাপর জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমার তাৎকালিক

বন্ধু পূর্ণ মৈত্রেয় ও মথুর মৈত্রেয় উল্লেখযোগ্য, ইঁহারা এখন সেখানকার বড় উকিল। ঢাকায় নব রায়ের বাড়ীতে থাকিয়া বহুদিন যাঁহার সঙ্গে কাটাইয়াছিলাম, সেই কৈলাসচন্দ্র দাশ তখন কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন, এখন তাঁহার প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি উকিল-সরকার। সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ফরিদপুর বার ছাড়িয়া দিয়া হাইকোর্টে আসিয়াছেন, তিনি তখন বাংলায় অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন, সুতরাং ওকালতি জমাইতে পারেন নাই। এখানে তিনি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর শ্যামবাজার ট্রামের আড্ডার নিকট বাড়ী করিয়াছেন। একদিন দেখিলাম, তিনি একটি ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে লইয়া ট্রামে যাইতেছেন, আমি সেই ট্রামের আরোহী ছিলাম। মেয়েটির মুখে চোখে লাবণ্য ঢল ঢল, তাহার বয়স ৭।৮, আমি বলিলাম, 'এটি বুঝি মেয়ে?' সতীশবাবু হাসিয়া গোপনে বলিলেন, 'এ মেয়েটির বাপ মা কেউ নেই, আমার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই, তবে ইহার বাপ-মা মরিবার সময় ইহাকে লালনপালনের ভার আমাকে দিয়া গিয়াছেন। মেয়েটি জানে আমি ইহার পিতা, আগাছাটি এরূপ ভাবে জড়িয়া গেছে, যে আমাদের সংসারের পক্ষে একে এড়ানো আর সম্ভবপর হইবে না।' দেখিলাম মেয়েটি সহসা সতীশবাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া হীরেন্দ্রবাবুদের বাড়ীর পুতুল-গুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা এটা কাদের বাড়ী,' আমি দেখিলাম মেয়েই হইয়া গিয়াছে বটে। ইহার পাঁচ সাত বৎসরের পর দেখিলাম, সতীশবাবুর বাড়ীতেই মেয়েটি অন্দরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাথায় ঘোমটা নাই, কপালে সিন্দুর-বিন্দু স্পর্শ করিয়া শাড়ীর একটা পাড় রহিয়াছে। সতীশবাবুকে বলিলাম, 'ইহার বিবাহ কোথায় দিয়াছেন?' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে।'

ভাদ্রমাসে আমার পীড়া বড়ই বাড়িয়া গেল। আবার বিছানায় পড়িয়া রহিলাম, এই সময়ে একটা সাপ আমার শয়নঘরের দাওয়ার কাছে কিলবিল করিয়া বৃষ্টিতে চলিয়া গেল, কেন জানি না। আমার মন সাপের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। তাহার পরদিন খড়ো ঘরের চালে আর একটা সাপ দেখিলাম, সেটি আমার বিছানার দিকে চাহিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। এই ভয় আমাকে এতদূর পাইয়া বসিল যে আমি সর্বত্র সাপ দেখিতে লাগিলাম, বাহিরে তো এই দু'টি মাত্র সাপ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু মনের ভিতরে অসংখ্য সাপ আনাগোনা করিতে লাগিল। মশারীর দড়িটা সাপ হইয়া দুলিতে লাগিল, চটি পায়ে দিতে মনে হইল উহার মধ্যে পা ঢুকাইলেই পা যাইয়া সাপে ঠেকিবে, পায়ে ঠাণ্ডা জল লাগিলে মনে হইতে লাগিল, সাপে পাখানি জড়াইয়া ধরিয়াছে। সেই দিন দৈবক্রমে আর দুইটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার সর্প-ভীতি দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। দুপ্রহরে একটি ভদ্রলোক আসিয়া আমার কাছে অনেক সাপের কেচ্ছা বর্ণনা করিয়া গেলেন, আমি যে সাপের ভয়ে ভীত তাহা কাহাকেও বলি নাই। তাঁহার প্রত্যেক কথায় আমার যে ভয় হইতেছিল, তাহা আমার বুঝাইবার শক্তি নাই। মনে হইল যেন তাঁহার বর্ণিত প্রত্যেকটি সাপ ফণা দোলাইয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া আছে এবং আমার আত্মাপুরুষ তাহাদের ভয়ে কম্পিত হইতেছে। তিনি চলিয়া গেলে বেদেরা "সাপের খেলা দেখবে গো" চিৎকার করিয়া ঝাঁপি মাথায় আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়া চলিয়া গেল। কিরণ আসিয়া আমাকে ধরিল, 'বাবা সাপের খেলা দেখব।' আমি তাহাকে এমন ধমক দিয়াছিলাম যে

সে ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল। আমার স্ত্রী বলিলেন, 'ওরা শিশু, সাপের খেলা দেখতে চেয়েছে, কি অন্যায়টা করেছে? তাতে তুমি এমন চিৎকার করছ, যেন কি একটা ভয়ানক কান্ড করেছে!' আমি লজ্জিত হইলাম, কিন্তু আমার অন্তর্যামী জানেন, চিৎকার আমি করি নাই, আমাকে ভয়ের যে দেবতা পাইয়া বসিয়াছিল, ইহা তাহারই চিৎকার।

কয়েক রাত্রি চোখ বুজিতে পারি নাই, যতবার চোখ বুজিতে চেষ্টা করিয়াছি, মনে হইয়াছে পায়ের কাছে সাপ কুন্ডলী পাকাইয়া আছে, চোখ বুজিলেই কামড়াইবে। উপেন্দ্রবাবু আসিয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য কপি লিখিতে লাগিলেন, একটা লাল কালির দোয়াত হইতে কালি তুলিতেছিলেন, আমার মনে হইল সেগুলি সাপের রক্ত। শুধু মনে হওয়া নয়, এক একটি অক্ষর লাল কালিতে লিখিতেছিলেন আর আমার পঞ্চপ্রাণ ভয়ে কাঁপিতেছিল। ইহার পর লোকের চোখের কোণে একটু রক্তিমা থাকিলে ভয় হইত, মনে হইত যেন উহা সর্পচক্ষু।

আমি যে কি উৎকট যন্ত্রণায় ছিলাম তাহা বলিতে পারি না, এদিকে হাঁটিবার শক্তি একেবারে লোপ পাইল। এই সাপের ভয়ের কথা কাহাকেও বলিলাম না। তাহা হইলে তো সকলে হাতে তালি দিয়া বলিবে, "ক্ষেপিয়া গিয়াছে"। জপ করিতে চেষ্টা পাইতাম, কিন্তু হরিনাম ছাপাইয়া গোখুরার চোখ দুটি আমার মন অধিকার করিয়া বসিত। মুখে হরিনাম আসিত না।

এই উৎকট যন্ত্রণা প্রায় ১৫ দিন ছিল, শেষে তাহা এরূপ অসহ্য হইয়াছিল যে আমি প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিয়া বলিতাম, 'আমি চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিতেছি না, তুমি আমাকে মারিয়া ফেল—এরূপ মৃত্যুযন্ত্রণা দিও না।' একদিন সন্ধ্যার পর ভাত খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। পা ধুইয়াছিলাম, মনে হইল যেন একটা বরফের মত ঠান্ডা, কালির মত কালো সাপ আমার পাদুটি জড়াইয়া আছে, বুকের ভিতর অসহ্য কষ্ট হইতেছে। 'আমার কে কোথায় আছ—আমাকে রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলম। ধীরে ধীরে চোখদুটি বুজিয়া আসিল। নিঃসহায়ের, নিরালম্বের, একান্ত বিপন্নের নির্ভরের অশ্রু চোখের কোলে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আমার একটু তন্দ্রা আসিল, তখন কে যেন আমাকে ডাকিল, সে স্বর আমার এখনও মনে আছে। তাহা কঠোর হইয়াও কোমল, ক্রুদ্ধ হইয়াও স্নেহার্দ্র, বাহিরের হইয়াও একান্ত আপনার জনের মত। স্পষ্ট শুনিলাম, 'তুই মনসাদেবীকে গালাগালি করেছিস্; জানিস্ না যারা কুঁড়ে ঘরে থেকে সাপের ভয়ে অস্থির হয়, তারা ভয়ে 'মা' 'মা' বলে আর্তস্বরে ডেকে মনসা দেবীর স্মরণ নেয়। যে পাদ-পীঠ শত শত ভক্তের অশ্রুতে সিক্ত, শত শত লোক যে মঙ্গল-ঘটে অর্ঘ্য দিয়ে শান্তি পায়, তুই স্পর্ধা ও হঠকারিতার সহিত তাকে ব্যঙ্গ করেছিস্, লোকের প্রাণ যেখানে আর্ত হয়ে, অসহ্য কষ্ট পেয়ে, ফুল বিল্বদল নিয়ে একান্ত নির্ভরশীল হয়ে তীর্থযাত্রী হয়, তখনকার তাদের শুচিতা, ভক্তি ও বিশ্বাস তুই দেখলি না,—সেইখানে বুট জুতা পায়ে হঠকারিতার সঙ্গে পূজার ফুল মাড়িয়ে এলি।' ঠিক এই কথাগুলি না হইতে পারে, কিন্তু এই ভাবের কথা। সেই তীব্র ভর্ৎসনার সুরেও মনে ভক্তি হইল। জাগিয়া দেখিলাম কেহ নাই, কেবল আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে

ও মুখে অলক্ষিত ভাবে 'মা' 'মা' ডাক উচ্চারিত হইতেছে, এবং আমার মুক্ত জানালার পথে সদ্যপ্রস্ফুট শিউলি ফুলের ঘ্রাণে দিক আমোদিত করিতেছে। মনে হইল, যিনি আসিয়াছিলেন, উহা তাঁহারই অঙ্গগন্ধ।

জাগিয়া অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে আমার মেয়ে মাখনকে বলিলাম, একটা মোমবাতি জ্বালিতে ও আমার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বইখানি দিতে। তখন, যেখানে যেখানে মনসাদেবীর নিন্দা করিয়াছিলাম, অপরাপর ঠাকুর দেবতার নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহা সমস্ত কাটিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, মনসাদেবীকে লইয়া আমি কত বিদ্রূপই না করিয়াছিলাম! 'তাঁহার মত দুষ্ট মেয়ে দেবলোকে নাই' 'কানীর গীত এক কানা প্রথম রচনা করেন' ইত্যাদি প্রকারের ব্যঙ্গোক্তিই করিয়াছিলাম। চোখের জল মুছিতে মুছিতে সেগুলি কাটিয়া ফেলিলাম। আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি-জাত সেই সর্পজগৎ হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেল, তাহার পরদিনও একটু ভয় ছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনে আমি সম্পূর্ণ নির্ভয় হইলাম। সেই দিন একটি টাকা মনসা-দেবীর মানত করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। এই ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ আমি 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সংখ্যা 'উপাসনা' কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। যদি পাইতাম, তবে এইখানে সেটি উদ্ধৃত করিয়া দিতাম, নূতন করিয়া লিখিতাম না। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি কলিকাতায় এক ছোট বাসায় ছাদের উপর শুইয়াছিলাম, আমার স্ত্রী আমার পাশেই শুইয়া-ছিলেন। রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় একটা ভয়ানক শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম, তখন জ্যোৎস্না ছাদের উপর আলো ছড়াইয়া দিয়াছে—দেখিলাম, একটি কৃষ্ণ সর্প আমার গা ঘেঁষিয়া ঘনিষ্ঠতা করিতে চেষ্টা পাইতেছে, আমার স্ত্রীকে জাগাইলাম। তিনি চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন বুঝি সাপে আমাকে কামড়াইয়াছে, কিন্তু সাপ আমাকে কামড়ায় নাই। অথচ এ সময়ও আমার কোন ভয়ই হইল না, হাতে তালি দিয়া সাপ তাড়াইয়া দিলাম। যদি ঐ ঘটনাটি আমার সেই সময় হইত, তাহা হইলে বোধহয় ভয়েই মরিয়া যাইতাম। ইহার দেড় বৎসর পরে আমি 'বেহুলা' বই লিখিয়াছিলাম, ৩।৪ বৎসরের মধ্যে তাহার ২০।২২ হাজার খণ্ড কাটিয়া গিয়াছিল। আমার মন এই পুস্তকলব্ধ অর্থ মনসাদেবীর দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, একথা বলিলে যাহারা আমাকে উপহাস করিবেন—তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া নাই। আমার বন্ধু বৃদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারেজ সাহেব লিখিয়াছিলেন, মনসাদেবীর পূজা মানসিক দুর্বলতা, হয়ত তাহাই। কিন্তু যাহা আমাকে বল দিয়াছিল, রোগের সময় উৎকট অমৃততুল্য ভেষজের কার্য করিয়াছিল, আমি কখনই তৎসম্বন্ধে অন্যের উপদেশ গ্রহণ করিব না। যিনি যে ভাবেই আসুন না কেন, তিনি পরম অনুকম্পা করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি ভগবানের প্রকাশ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

এই ভাদ্র মাসেই আমি ভগবানের দত্ত আর একটি মহাপ্রসাদ পাইয়াছিলাম, তাহা বিনয়ের ন্যায় পুত্র লাভ। জীবনের সমস্ত সৌভাগ্যের মধ্যে যে সৌভাগ্য পূর্ণশ্রীভূষিত হইয়া আমার জীবন অমৃতময় করিয়াছে তাহা বিনয়রূপে প্রকাশ ভগবৎদয়া।

এ পর্যন্ত কবিরাজ বিজয়বাবু সপ্তাহে সপ্তাহে আমাকে তৈল ঔষধ পাঠাইয়া

দিতেছিলেন। পীড়ার উপশম হউক আর না হউক, আমি তাহা ব্যবহার করিতে-ছিলাম। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে যোগীন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে অমার আলাপ হয়। তিনি ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর এবং সেই সূত্রে ফরিদপুর যাতায়াত করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, ইনি বিদ্যা বুদ্ধি, খ্যাতি প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের যোগ্য পুত্র। আমাদের অল্প সময়ের সাক্ষাৎকারেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হইল, সে অনুরাগের ফল জীবনব্যাপী বান্ধবতা ও ভ্রাতৃভাব। ইহা কথার কথা নহে। বোধহয় খুব কম ভ্রাতাই ভ্রাতার জন্য এত করে, যোগীন্দ্র কবিরাজ আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, খুব কম বন্ধুই এরূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে বন্ধুর হিতে রত থাকেন। ফরিদপুর থাকার সময় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি 'উড়িষ্যার চিত্র' লিখিতেছিলেন। ডেপুটি শ্রেণীতে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ, এই দুই জন তাঁহাদের ডেপুটি পদোচিত চির-বিশ্রুত শার্দুলবিক্রমের নাম হাসাইয়াছেন। ইঁহারা নিতান্তই ভাল মানুষ। যতীন্দ্রবাবু অতি সাদাসিধে লোক, কিন্তু 'উড়িষ্যার চিত্র' পড়িয়া বোঝা যায় ইনি বিলক্ষণরূপে পরের টিকি নাড়া দিতে জানেন। ইনি গোঁড়া হিন্দু, অথচ ইঁহার 'ধ্রুবতারা' পড়িয়া দেখা যায়, ইংরাজী উপন্যাসের নকলে ইনি বেশ বিলাতী প্রেমসমুদ্রে ঢেউ তুলিতে জানেন। ইনি পূজা আহ্নিক লইয়া ব্যস্ত এবং হাঁচি ও টিকটিকির শব্দ ঋষিবাক্যের ন্যায় অমোঘ মনে করেন, অথচ একখানি উপন্যাসে তিনি একটি চরিত্রকে পঞ্জিকার নিষিদ্ধ দিনে খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিয়া চলার দরুন পরিহাস করিতে কসুর করেন নাই। যতীন্দ্রবাবুর পরিহাসরসিকতার শক্তি বেশ তীব্র, তাঁহার লেখার ভঙ্গীটি চমৎকার, কিন্তু সর্বাপেক্ষা মনোরম তাঁহার নির্মল প্রীতিপূর্ণ সঙ্গ। বিশ্বেশ্বরবাবু ও যতীন্দ্রবাবু সাহিত্যিক গুণে আমাদিগকে যতটা মুগ্ধ করেন, তদপেক্ষা চরিত্রগুণে বেশী প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া বিশু-বাবুর মৌলিক গবেষণা-শক্তিটি কম নহে। তিনি ময়নামতীর গান লইয়া দস্তুরমত মল্লযুদ্ধ করিতেছেন। এ বিষয়ে যে তিনি জয়ী হইবেন, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

কলিকাতায়

১৯

১৯০০ সনের কার্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে আমি সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্যামপুকুর স্ট্রীটে ১১ টাকা মাসিক ভাড়ায় আমার জন্য একখানি বাড়ী ঠিক করেন, উহার উপরে ৮×১০ ফুট এই মাপের দুইখানি ঘর ছিল, তৎসংলগ্ন একটি ছাদ ছিল এবং নীচে একখানি রান্নাঘর ও একখানি বাহিরের ঘর ছিল, তাহা পূর্বোক্ত মাপের, নীচে বাড়ী-সংলগ্ন একটি সন্দেশের দোকান।

প্রথমবার কলিকাতায় যখন ছিলাম, তখন রোজ সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্রবাবু আমাকে দেখিতে আসিতেন, রোগের শয্যায় সান্ত্বনা দিতেন, অভাবে পড়িলে ভৃত্যাদি পাঠাইয়া সহায়তা করিতেন, এবারও তাই।

শ্যামপুকুরের ঐ বাড়ীটায় আসা অবধি ছেলেরা সর্বদা ব্যারামে ভুগিত। রোজ যোগীন্দ্র কবিরাজ মহাশয় দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল, ততই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। এদিকে এম. এ. পাশ, মেডিকেল কলেজে চার বছর পড়িয়াছেন,—কবিরাজী শাস্ত্রে তাঁহার এতটা অধিকার, যে কোন রোগের লক্ষণ বলিলে তিনি চরক, সুশ্রুত কি বাগ্‌ভট হইতে সেই লক্ষণ অনুযায়ী শ্লোক বলিতে থাকেন। সমস্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রটি যেন নখাগ্রে, কিন্তু ইহাতে আমি তাঁহার প্রতিভার প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়াছি বটে, আকৃষ্ট হই নাই; কিন্তু যখন তিনি সমস্ত শকুন্তলা, সমস্ত উত্তররামচরিত মুখস্থ বলিতেন, প্রাকৃত ভাষার কথোপকথন পর্যন্ত বাদ পড়িত না, স্বয়ং দেবী ভারতীর ন্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুকণ্ঠের ঝংকারের সহিত শ্লোক বলিয়া যাইতেন, তখন বিস্ময় জন্মিত, বুঝিতাম বেদ কি করিয়া শুধু স্মৃতিশক্তির বলে বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, ইনি প্রাচীন স্মার্তশিরোমণিদেরই বংশধর। কোন দিন 'ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদন। চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটিকুটিলাননৌ॥' হইতে সমস্ত চণ্ডী আওড়াইয়া যাইতেন, কখনও 'অবিদিত গত যামা' প্রভৃতি উত্তরচরিতের শ্লোক পড়িয়া অশ্রুকণ্ঠ হইতেন, কারণ ইহার কিছু পূর্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। তিনি অনর্গল হিন্দী ও সংস্কৃতে বক্তৃতা করিতে পারেন, ইংরাজীতেও তাঁহার বাগ্মিতা প্রশংসনীয়। আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ হইলাম। যে কোন কঠিন রোগ হইত, তিনি আমার ভয় দেখিলে হাসিয়া বলিতেন, 'কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতিঃ'। আমার বড় মেয়ে একবার মরিবার মুখে পড়িয়া তাঁহার চিকিৎসায় বাঁচিয়া গেল। সেই বাড়ীতে আমার প্রত্যেক ছেলেই কোন না কোন উৎকট রোগে পড়িয়াছে, তিনি চিকিৎসা করিয়া সারাইয়াছেন এবং মাঝে মাঝে যেরূপ মেঘের পশ্চাতে এভারেস্টের শৃঙ্গ দেখা যায়, তেমনি তাঁহাকে আগে পাঠাইয়া শৈলবিশালদেহ গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ উদিত হইতেন। ইঁহাদের দুইজনকে দেখিলেই আমাদের বাড়ীর রোগগুলি যেন আপনাআপনি পলাইয়া যাইত।

যোগীন্দ্রবাবুর ঔষধে, বিশেষ তাঁহার প্রদত্ত ষটোৎপল ঘৃতে আমি অনেকটা উপশম বোধ করিলাম।

কিন্তু প্রায় ছয় সাত মাস পূর্ব হইতে আমি নিজের চিকিৎসা নিজে করিতেছিলাম। আমি সংযমে দীক্ষিত হইতেছিলাম, শুধু ইন্দ্রিয়-সংযম নহে, বাক্যে, ব্যবহারে ও চিন্তায়। আমি বুঝিলাম, যদি কুচিন্তা মুহূর্তেও স্থান দেই, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে আমার স্বাস্থ্য ও শান্তি নষ্ট হয়। সেই চিন্তা প্রবল হইয়া কার্যে পরিণত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমার অনিষ্ট না করিয়া ছাড়ে না; সুতরাং কুচিন্তার পথে মনকে পাহারা দিতে শিখাইলাম। আরও দেখিলাম, বন্ধুগণের সঙ্গে কথায় বার্তায় অনেক সময় গল্পের স্রোতে পড়িয়া কত কথা বলিয়া ফেলি, যাহাতে সৎ অসৎ দুই রকমের জিনিসই থাকে, অনেক কথা বলি, যাহা না বলিলে ভাল ছিল, পর-কুৎসায় অলক্ষিত ভাবে যোগ দেই, তখন বাক্যে সাবধান হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ব্যবহারিক জীবনের প্রতিও লক্ষ্য পড়িল। এক কথায় পরের দোষ, পরের কথা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, শিশু যেরূপ প্রজাপতির ডানা ছিঁড়িয়া আমোদ বোধ করে, সেইরূপ পরের চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া ক্রূরভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আনন্দ পাইতাম, এখন নিজের দিকে চোখ পড়িল।

এই চেষ্টা শুধু নৈতিক সূত্র অবলম্বন করিয়া পুষ্ট হইতে পারে না। আমি নাম জপ করিতে লাগিলাম। প্রতি রাত্রে শুইবার সময় চিন্তা করিতাম কি কথা দিন ভরিয়া বলিয়াছি, তাহার কোন্‌টি না বলিলে চলিত, কি কাজ করিয়াছি যাহা যোগ্য হয় নাই, কাহার মনে ব্যথা দিয়াছি, কাহার অপকার করিয়াছি, পরের উপকার করিবার কোন্ সুযোগ হারাইয়াছি। যেখানে ত্রুটি হইয়াছে, সেইখানে জোড় হাত করিয়া নামের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছি এবং বলিয়াছি, 'আমায় রক্ষা কর, কাল যেন এমনটি না হয়।'

সর্বদা চণ্ডীদাস ও সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতাম। ঋষ্যমূক পর্বতের উপর বর্ষা ও শরতের খেলা, পম্পা তড়াগের অপূর্ব দৃশ্যাবলী, রামের বীরমূর্তি, লঙ্কা-কাণ্ডে নহে, কিন্তু যেখানে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিতেছেন, 'বিদ্ধি মাং ঋষিভিস্তুল্যং বিমলম্ ধর্ম্মমাশ্রিতম্,' এবং শোকক্ষিপ্ত দশরথের পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বারংবার সান্ত্বনা দিতেছেন, 'ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্' এই পড়িয়া মনে হইত, আমি তো সেই দেশের মানুষ, যে দেশের লোক প্রাকৃতিক দুরন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে এইরূপ বিশাল মানবআদর্শ আঁকিয়া গিয়াছেন।

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন 'আমি ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যামবঁধু বিনে গতি আর কেহ নয়।' আমার প্রাণ এই ছত্রে সাড়া দিয়া বলিত "শ্যামবঁধু বিনে গতি আর কেহ নয়।" কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠিন ছিল, এই শিক্ষা, "আমি শ্যাম অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিলতুলসী দিয়া"। তিলতুলসী দিয়া যে দান করা যায় তাহা আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। আমি কি তাঁহাকে এ দেহ তাঁহার প্রীতির জন্য দিতে পারিব না? সে যে বড় শক্ত দান! আমি এমন কথা বলিব না যাহা তাঁহার অপ্রীতিকর হইবে, এমন কাজ করিব না যাহা তাঁহার প্রিয় নহে, নিজের সুখের জন্য কিছু করিব না, তাঁহার প্রীতির জন্য কাজ করিব। ইহা না হইলে নির্ব্যূঢ়

স্বত্বে তাঁহাকে আর দেহ কি করিয়া দিতে পারিলাম? সুতরাং তিনি যদি এ দেহের প্রভু হন, স্বামী হইয়া যদি এই দেহ গ্রহণ করেন, তবে ইহার সুখ-দুঃখ ধ্বংস কিছুতেই আমাকে পাইবে না। এ শিক্ষা কি সম্পূর্ণ করিতে পারিব? শুধু সোপানে পা দিয়াছি মাত্র; ইহা কি কখনও বলিতে পারিব—"আমি নিজ সুখদুঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি।" নিজ সুখদুঃখ তাঁহার প্রীতিতে ডুবাইয়া কবে এত বড় কথা বলিবার অধিকার হইবে?

সংযম ও জপদ্বারা প্রায় আড়াই বৎসর পরে আমি আবার কিছু কিছু করিয়া নিজ হাতে লিখিতে শক্তিলাভ করিলাম, পাঁচ সাত মিনিট হাঁটিতে পারিলাম। যদিও ট্রামে উঠিলে যানের ক্ষিপ্রগতিতে আমার পীড়া বৃদ্ধি পাইত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় কিছু না খাইলে ফিট হইবার উপক্রম হইত, তথাপি ধীরে ধীরে যে একটু আরোগ্যের পথে আসিলাম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার পূর্বেই সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় 'পদ্মা' নামক কাব্য লিখিয়া—তরুণ বয়সে সরস্বতীর কুঞ্জে একটা জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। আমি মুখে বলিয়া পরের হাতে লিখাইয়া এই কাব্যের সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে প্রবন্ধ যত দূর মনে হয় 'প্রদীপে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে বহুদিন আমার কোন প্রবন্ধ আর কোন কাগজে বাহির হয় নাই। 'বামা বোধিনী' পত্রিকায় প্রমথবাবুর সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

এবার কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম সমস্ত সাহিত্যিকগণ আমার ব্যথার ব্যথী। হীরেন্দ্রবাবু আমাকে প্রায়ই দেখিতে আসিতেন, তাঁহার সহিত যখনই দেখা হইয়াছে, তখনই কোন না কোন লাভ হইয়াছে, সে লাভ চূড়ান্ত লাভ, তাহা আধ্যাত্মিক জগতের। নাটোরের কোন সাহিত্যিক সম্মেলনে তিনি গিয়াছিলেন, সেই ভূমিকম্পের সময়। পাকা বাড়ী কাঁপিতেছিল—সকলে সে বাড়ী ত্যাগ করিল, কিন্তু হীরেনবাবু 'যৎবিধের্মনসিস্থিতম্' বলিয়া নির্ভীকভাবে বসিয়া রহিলেন,—এই এক চিত্র। সেই ভূমিকম্পের সময় আমার মাতামহ গোকুল মুনশী মহাশয় তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ীতে ছিলেন, দিনের মধ্যে রোজ ৪।৫ বার ভূমিকম্প হইত, তাঁহার নাটমন্দির ও নহবৎখানা ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহার ঘরের জানালা দরজা ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিত, বাড়ীর চাকর, দারোয়ান, পাহারা, বরকন্দাজ, নায়েব এবং সন্ততিবর্গ সকলে পলাইয়া গেল। কিন্তু তিনি তাঁহার দ্বিতল গৃহের বিশাল হল-ঘরে একা নির্ভীকচিত্তে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার রামকৃষ্ণ মুনশীর বাড়ী যে অঞ্চলে সেখানে ভূমিকম্প হয় নাই, সুতরাং তিনি গৃহ ছাড়েন নাই। 'রামকৃষ্ণ বলিবে গোকুল ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া গেল, এই অপমানের অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।' নবতিবৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের এই বীরত্ব রাজসিক বীরত্ব, কিন্তু হীরেনবাবুর এই সাত্ত্বিক বীরত্বের তুলনা কোথায়? একটি চিত্র স্বপ্রতিষ্ঠার আর একটিতে ভগবানের প্রতি পূর্ণ নির্ভর। কলিকাতায় যখন প্লেগ লাগিল, তাঁহার বাড়ীর চাকরবাকরদের মধ্যে সেই রোগ দেখা দিল, তখনও হীরেনবাবুর সেই একই প্রশান্ত ভাব, সেই 'যৎবিধের্মনসিস্থিতম্', আমি যতবার ভয় পাইয়া বিচলিত হইয়া তাঁহার নিকট যাইতাম, ততবার দেখিতাম, নির্লিপ্ত পুরুষের ন্যায় তিনি বসিয়া আছেন, তাঁহার শৈল-মহান্ গাম্ভীর্য ও অবিঘ্নিত শান্তির ছবি দেখিলে,

আমার ভিতরকার ঝড় থামিয়া যাইত। রুদ্রবেশে প্রভঞ্জন হিমালয়ের গায়ে ঠেকিয়া যেরূপ ব্যর্থ হইয়া যায় সেইরূপ তাঁহার বাড়ীর বিপদ আপদ সমস্ত তাঁহাকে একটুও বিচলিত করিতে পারিত না। এই বিকম্পবিহীনতা তাঁহার মহাদান। যখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, এই মহাদানের কণিকা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছি। যখনই ভয়ের কথা বলিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিব, মনে ভাবিয়া গিয়াছি, তখনই তাঁহাকে ধীর, স্থির, শান্ত, সমাহিত ও আত্মস্থ দেখিয়াছি, উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি, মিষ্টত্বে ভরপুর পাইয়াছি—অপর রাজ্যের আলোকমণ্ডিত দেখিয়াছি। সভা-সমিতিতে তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সে পক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী। প্রতিপক্ষের মস্তক তাঁহার নিকট নত হইয়াছে, তাঁহার বিজয়শ্রী-যুক্ত উপসংহারের পর আর কেহ উঠিতে সাহস করে নাই, অথচ তিনি যাঁহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন; তাঁহার ভাষায় গ্রাম্যতা, অন্যায় আক্রমণ ও শ্লেষ কিছুই থাকিত না। শরৎ শাস্ত্রীর সঙ্গে বাংলা-ভাষা লইয়া সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার অনেক বিতর্ক হইয়াছে। তাঁহাকে তিনি প্রকারান্তরে মূর্খ, অজ্ঞ সকলই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষার বাহাদুরী এই যে তিনি তীক্ষ্ম বাণগুলি যেন সর-ভাজার মোড়কে আবৃত করিয়া ব্যবহার করেন—কাহারও তাহাতে মনে কষ্ট হয় না, অভিমান আহত হয় না। শরৎ শাস্ত্রীর সংস্কৃতের জ্ঞানের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া একদা তিনি বলিলেন, 'কিন্তু শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতমহাশয় য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ব পড়েন নাই, এখনকার পণ্ডিতেরা যে সকল সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, বহু ভাষার যে তুলনামূলক মানদণ্ড স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্রীমহাশয়ের তাহা জানা নাই, এইখানে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের বিরোধ মিটিবার নহে।' এইভাবের কথাগুলি প্রীতির রসান দিয়া এমনই মিষ্টভাবে তিনি বলিয়া গেলেন যে, শরৎ শাস্ত্রী নিজেও প্রীত হইলেন। মনু যে বলিয়াছেন সত্য বলিতে হইবে ও প্রিয় কথাও বলিতে হইবে, তাহা হীরেন্দ্রবাবু যে ভাবে পারিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। ইহার একমাত্র গোপনীয় সূত্র এই যে হীরেনবাবুর চিত্ত ভগবানে স্থিত, তাঁহার কোন স্থানে বিদ্বেষ নাই।

এই সময় নগাধিরাজের ডিক্স অভিধানের মত সুরেশ সমাজপতি মহাশয় আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন, এবং আমার পীড়ার অবস্থা ও আর্থিক অভাব দেখিয়া চিরবন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়া আপ্যায়িত করিয়া যাইতেন। কিন্তু যখন আমি একটু একটু করিয়া ভাল হইতে লাগিলাম ও মূল্য লইয়া বিবিধ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলাম, তখন তিনি ততটা সহৃদয়তা রক্ষা করিতে পারিলেন না। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য রামেন্দ্রবাবু ও সুরেশ সমাজপতি ভারতমিহির মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারী কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয়কে ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, এই ঋণ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু যতই সাংসারিক ব্যয় নির্বাহকল্পে আমি প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া অপরাপর পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলাম, ততই 'সাহিত্য' পত্রিকায় শবের ন্যায় আমার প্রবন্ধাদির ব্যবচ্ছেদ চলিতে লাগিল। আমি অসমর্থ, ব্যাধিপীড়িত, নাতিক্ষুদ্র একটি পরিবারের ভারে ব্যতিব্যস্ত, আমি কেমন করিয়া বিনামূল্যে 'সাহিত্যে' প্রবন্ধ লিখিব? কুমিল্লা থাকিতে আমি 'সাহিত্যে' লিখিতাম, তাহার অর্থ এইরূপ শুনিয়াছিলাম, যে, 'সাহিত্য'পত্রে

আমার প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত করিয়া সম্পাদক আমার মত অকৃতীকে সাহিত্যজগতে প্রচারিত করিয়া দিয়াছেন এবং সেই কৃতজ্ঞতায় উক্ত পত্রিকায় চিরকাল আমি বিনা পারিশ্রমিকে লিখিতে বাধ্য। আমি উক্ত পত্রিকায় প্রায় প্রতি মাসে প্রকাশিত দারুণ শ্লেষ সহ্য করিয়াও তাহাতে দুই একটি প্রবন্ধ না লিখিয়াছি এমন নহে। কিন্তু বেশী লিখিতে পারি নাই। যাহা হউক আমি যত কষ্ট পাইয়াছি, তাহা আমি আর মনে স্থান দিব না, এখন সুরেশবাবু স্বর্গগত। তিনি স্বর্গ হইতে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি রবিবাবুর কথায় ভগবানকে প্রার্থনা করিয়া জানাইতেছি 'যে কেহ মোরে দিয়াছ দুঃখ, চিনায়েছ পথ তাঁর, তাঁহারে নমি আমি'।

শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় 'মানসী ও মর্মবাণী'তে সুরেশবাবুর কথা উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ভুল ছিল। সুরেশবাবুর জীবিতকালেই আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় 'মানসী ও মর্মবাণী'র অফিস হইতে কোন সুরেশ-ভক্ত লোক আমার প্রতিবাদ-টির উপর যথেচ্ছরূপ কলম চালাইয়া উহাকে বিকৃত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এইরূপ অপ্রীতিকর বিষয় লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমি নীরব ছিলাম। সুরেশবাবু আমার প্রতি অনুকূল-প্রতিকূল যাহাই থাকুন না কেন, আমি তাঁহার পদধূলি আমার বাড়ীতে সর্বদাই পাইতাম, এবং সাহিত্যের জন্য প্রবন্ধের দাবী তিনি কখনই ছাড়িতেন না। মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্বেও তিনি বেহালা যাইয়া আমাকে প্রবন্ধের জন্য তাগিদ দিয়াছিলেন।

আমার কাছে এই সময় সর্বদা আসিতেন ব্যোমকেশ মুস্তফি। তাঁহার মত সুদর্শন, প্রিয়ভাষী, অনুরক্ত বন্ধু কোথায় পাইব? আমরা পরস্পরকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতাম। পৃথিবীর যে বন্ধু যাহা করিবেন, ব্যোমকেশ অযাচিত ভাবে যাইয়া তাহার সাহায্য করিতে দাঁড়াইতেন। এত কর্তব্যের ভার কেহই একাকী সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। তাঁহার শরীর ভাল ছিল না। সুতরাং প্রায়ই তিনি প্রতিশ্রুত কার্যের সবটা করিতে না পারিয়া সলজ্জ ও অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা চাহিতেন। সাহিত্য পরিষদের জন্য তাঁহার খাটুনির অবধি ছিল না এবং পরিষদের ইষ্টের জন্য তিনি ডাকাতি করিতেও বোধ হয় পশ্চাৎপদ হইতেন না। একবার তিনি আমার বাড়ীতে ডাকাতের মত পড়িয়া আমার ৭০।৭৫ খানি 'ভারতী' দস্তুরমত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। ইহার পরে তিনি আসিলে আমি পুস্তকের ঘরের চাবি বন্ধ করিয়া ফেলিতাম। তাঁহার মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে তিনি আমাকে নিজ হাতে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা আমার কাছে আছে। মৃত্যুর আয়ত্ত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে লেখনী চালাইয়াছিলেন, চিঠিখানির আঁকা-বাঁকা অক্ষর সেই করুণ ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলার প্রধান পরীক্ষক ছিলাম। তিনিও সেইবার পরীক্ষক ছিলেন, সে কাজ সারিতে না পারিয়া ত্রুটি স্বীকার করিতে করিতে এই কর্ম-ক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেলেন। শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসুর পুত্র হরনাথ ও আমি তাঁহার সেই অবশিষ্ট কাজ সারিয়া লইয়াছিলাম। প্রফুল্ল কুসুমটি যেরূপ হাসিতে হাসিতে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে, সেইরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-অধিষ্ঠিত ভারতীর সেবায় তিনি হাসিতে হাসিতে প্রাণপাত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাবুদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় লাভ করি। পালকি করিয়া গগনবাবুদের বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম, তিনটি ধ্যানী বুদ্ধের মত, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সমরেন্দ্র তিন ভাই আলখাল্লা পরিয়া বসিয়া আছেন। গগনবাবু জ্যেষ্ঠ হইলেও দেখিতে সর্বকনিষ্ঠের মত, খর্বাকৃতি, গৌরবর্ণ। অবনীন্দ্রবাবু সর্বকনিষ্ঠ হইলেও সর্বজ্যেষ্ঠের মত দেখিতে, দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যাম-রূপ। তিন ভাইয়েরই হাসি মুখ। অবনীন্দ্রবাবুর হাস্যে মাঝে মাঝে একটু সরল ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়া উঠে। ইঁহারা আমাকে নানারূপ সাহায্য করিয়া মাসিক একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ইঁহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিয়াছে ; আমার আপদে বিপদে সর্বদা ইঁহাদিগকে পাইয়াছি। অবনীন্দ্রবাবু তখন হ্যাভেল সাহেবকে লইয়া দেশীয় চিত্রশালার পত্তন দিতেছিলেন, তখনই তাঁহার সুবিখ্যাত 'বিরহী যক্ষ', 'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'ইংরেজের হাতে শাহ আলম' প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। একটা রূপা-বাঁধা হুকা হাতে, ইঁহাদের আশ্রিত মতিবাবু নামক একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সর্বদা কাছে বসিয়া থাকিতেন। মতিবাবু গভর্নমেণ্ট হইতে কিছু পেনসন পাইতেন, এবং গগনবাবুদের নানা কাজের ভার লইয়া সম্পাদন করিতেন। ধরুন, যেমন ইঁহারা অভিনয় করিবেন, তাহার মঞ্চ তৈয়ারী করিতে হইবে ; স্টার, মিনার্ভা কিংবা অপর কোনো নাট্য-সম্প্রদায় যদি ইঁহাদের বাড়ীতে অভিনয় দেখাইতে আহূত হইতেন, তবে চালাঘর ও রঙ্গমঞ্চ বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে মতিবাবুই ছিলেন কর্মকর্তা। ইহা ছাড়া বাবুরা সর্বদা বাংলা বই কিনিতেন, মতিবাবু গুরুদাসবাবুর দোকান হইতে তাহা আনিয়া দিতেন। এই সকল ব্যাপার লইয়া গগনবাবুরা ইঁহাকে প্রায়ই খেপাইয়া পাগল করিয়া তুলিতেন। 'আজ কত লাভ হইল?' প্রশ্ন হইলেই মতিবাবু চটিয়া লাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বকিতে থাকিতেন। গগনবাবুরা তাঁহার গালাগালিটা বেশ হাসিতে হাসিতে সহিয়া লইতেন, যেহেতু মতিবাবু ছিলেন তাঁহাদের পিতৃসহচর। উত্তরকালে গগনেন্দ্রবাবু বিদ্রূপ চিত্র আঁকিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার হাত পাকাইয়া লইয়াছেন মতিবাবুকে দিয়া। মতিবাবু যখন যেভাবে বসিতেন, যে ভঙ্গী করিয়া কথা কহিতেন, হুঁকাটি নামাইতেন, কিংবা হুঁকা ধরিয়া যে ভাবে নিবিষ্ট হইয়া তন্দ্রা উপভোগ করিতেন, তাঁহার সেই ভাবের শত শত ছবি গগনবাবু আঁকিয়াছেন। 'রাইফেল রেঞ্জে' যেরূপ গোরা সৈনিকেরা লক্ষ্য স্থির করিয়া হাত ঠিক করিয়া লয়, মতিবাবু ছিলেন গগনবাবুর সেইরূপ চিত্র-লক্ষ্য। তাঁহার হাতে মতিবাবুর যে সকল ছবি আঁকা হইয়াছে, বোধ হয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন ; তাঁহার সৃষ্টির এরূপ হুবহু নকল হইতে পারে, ইহা এই সকল ছবি না দেখিলে তিনিও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। অবনীন্দ্রবাবু সর্বদা তাঁহার লেখা ও ছবি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার চিত্রে রঙের কোমল খেলা ও মৃদু মাধুরী দেখিয়া সমস্ত য়ুরোপ মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার বাংলা রচনায় পল্লী-সৌন্দর্যের যে মোহিনী আছে, সে যাদুকরী বিদ্যা তাঁহার নিজস্ব, অপর কোন লেখক এ পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি কলম ও তুলি দিয়া কেবলই ছবি আঁকিয়া যান। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণন করিতে গেলে নিত্য-প্রত্যক্ষ অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র বিষয়গুলি তাঁহার হাতে আশ্চর্য সুন্দর কোন স্বপ্নের ন্যায় হইয়া উপস্থিত হয়,

তাহা সাহিত্যে শিল্পের কি উচ্চ স্থান তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করে। তাঁহার রাজস্থানের কাহিনীগুলিতে ভাটিয়াল সুরের মত একটা করুণ সুর আছে, তাহা তাঁহার সুকোমল হৃদয়ের ব্যঞ্জনা করিতেছে। বিরহী যক্ষের চিত্রটিতে যে লাল রঙের আভা যক্ষের কপালের চন্দন-ফোঁটায় ও স্নিগ্ধ সূর্যাস্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কালিদাসের স্পষ্টতম ব্যাখ্যা। বোধ হয় মল্লিনাথ যাহা বুঝাইতে পারিতেন না, চিত্রকর তাহা বুঝাইয়াছেন। 'বুদ্ধ ও সুজাতা' চিত্রে ভক্তিবিনম্রা ললনার প্রণতি ও সাদর নিমন্ত্রণ নারীহৃদয়কে যেন একটা পুষ্পিত লতার ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া দেখাইতেছে, ভক্তি যেন রূপ ধারণ করিয়া সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে।

অবনীন্দ্রবাবু সেই এককভাবেই আছেন, সেই এক-লক্ষ্যে। চেহারাও যে ২০ বৎসরে বেশী পরিবর্তন হইয়াছে তাহা নহে। মাঝে সি. আই. ই. উপাধি পাওয়ার পরে একটু বাঁকিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বঙ্কিমত্ব বাতরোগে কিংবা বাঁকা শ্যামের শ্রী দেহে ফলাইবার জন্য, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমার বিশ্বাস সরকারী উপাধির গুরুভার সহ্য করিতে না পারিয়া এরূপ হইয়াছিলেন। ব্যঙ্গ ছাড়িয়া দিলে, বাত-রোগ তাঁহার দেহটি কিছুকালের জন্য টানিয়া ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন আবার সেই হাসি-প্রফুল্ল মুখে স্নিগ্ধ মধুর চাহনি লইয়া সম্পূর্ণ ঋজু দেহে তিনি বিদ্যমান আছেন।

কিন্তু গগনবাবুর খেয়ালের অন্ত নাই। সহসা স্বদেশী চিত্রের প্রতি অনুরাগের মাত্রা চড়িয়া গেল, অমনই প্রাচীন বড় বড় বহুমূল্য বিলাতী ছবি তিনি নামাইয়া ফেলিয়া তাহার জায়গায় অজন্তা গুহার চিত্র, ক্যাটসুটা নামক জাপানী চিত্রকরের অঙ্কিত রামায়ণের চিত্র, কৃষ্ণের রাসলীলার চিত্র দিয়া দেওয়াল ছাইয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ-পাথর ও অষ্টধাতুর প্রাচীন মূর্তি, এবং মোগলাই চিত্রের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যখন যে খেয়াল গগনবাবুর মাথায় আসে তাহা যেন তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসে। এই খেয়ালে একটু 'মন্দা' না পড়িতে পড়িতেই, তিনি তাঁহার হলঘরটির পরিবর্তন করিতে লাগিয়া গেলেন ; নীচেকার ঘরটা ছাড়িয়া দিয়া উপরের ঘরটায় আসিলেন, এবং বৎসরে দুইবার করিয়া দেয়ালের চিত্রিত লতা-ফুলগুলি নূতন করিয়া আঁকাইতে লাগিলেন। ঠিক কোন উৎসবের সময় যেরূপ লোকজন ব্যস্ত হইয়া কাজ করে, চিরকালটা ইনি সেই ভাবে কাটাইয়া আসিতেছেন। ঠাকুর-বংশের পুরাতত্ত্ব-সম্বলিত চিঠিপত্র লইয়া সেগুলি টাইপ করিতে এক সময় লাগিয়া গিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার অন্য কোন দিকে দৃষ্টিই ছিল না, তাহার পর বিনা তারে টেলিগ্রাফির ব্যবস্থা করিয়া এ ঘর হইতে ও ঘরে কথাবার্তা চালাইয়া কতকদিনের জন্য তাহাই একটা উৎসবে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় নন্দলাল বসু চিত্রশিক্ষার জন্য আসিলেন। তুলির বড় বড় টানে তিনি এমনই ছবি আঁকিতে লাগিলেন যে তাহা আমাদের বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার সকল ছবিতেই মৌলিকত্ব থাকিত। অভিমানিনী কৈকেয়ীর ছবিতে তাঁহার লাল রঙের শাড়ীর লহরে লহরে যেন রাগের রঙ্গিমা ফুটিয়া উঠিয়া জ্বলন্ত অভিমানকে আঁকিয়া ফেলিল, এবং মৃত সতীর একখানি হস্ত রজতগিরিনিভ স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া দেখাইল যে মৃত্যুর পরও অনুরাগ চলিয়া যায় নাই। গগনবাবু ও অবনীবাবু

নন্দলালকে দিয়া অজন্তার ছবির প্রতিলিপি আঁকাইতে লাগিলেন—এইভাবে স্বদেশী চিত্রশালার পরম সম্পদ রচিত হইতে লাগিল।

গগনবাবুর শেষ প্রিয়তমা হইয়া চুম্বন গ্রহণ করিলেন চিত্রকলা, তাহা বিদ্রূপে যেমনই কৌতুক ও হাস্যের উৎস, আবার ভক্তিসাধনা ও কবিত্বে তেমনই চিত্তাকর্ষক। সমাজের সমস্ত ছলনা, কপটতা ও ভান, তাঁহার চোখে যেমন স্পষ্ট করিয়া ধরা পড়িয়াছে, বাঙালী আর কোন চিত্রকরের বোধ হয় সেরূপ পড়ে নাই। হাস্যরস ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ব্যঙ্গরসের ছবি আঁকিয়া গগনবাবু নীতিজ্ঞের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, এ চাণক্যের শ্লোক নহে, চিত্রকরের চাবুক—ইহা কম তীব্র নহে। গগনবাবু চৈতন্যের ছবি আঁকিয়া মন্দিরযাত্রীর ভিড় দেখাইয়া প্রেম ও ভক্তির পথে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ভাবুককে বিস্মিত এবং কবিকে উদ্বোধিত করিবার শক্তি রাখে।

গগনবাবুর নানা খেয়ালের মধ্যে যে কর্মঠতা ও উদ্যম দৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহার ক্ষিপ্র, অসহিষ্ণু প্রতিভাকে বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইতেছে। ঠাকুরবংশে ইঁহার মত বিচিত্র মনস্বিতা আমি খুব অল্পই দেখিয়াছি। বাহিরে এ কথা কেহ হয়ত স্বীকার করিবেন কিনা জানি না, কিন্তু দৈনন্দিন প্রত্যেক ঘটনায় যে ইনি কত বিচিত্র ভাবে এই প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা আমার কাছে চির বিস্ময়কর। তিনি যেন নিত্যই নূতন যুগের লোক, সভ্যতার আতুরঘরে নিত্য জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার গত জীবনের পত্রগুলি দিবাশেষে রোজই শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে এবং প্রতিদিন প্রত্যুষে নূতন জীবন সদ্যস্ফুট কুসুমের ন্যায় নূতন সৌন্দর্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে। তিনি তাঁহার মন্দিরে বাসি ফুল রাখিয়া আবর্জনার সৃষ্টি করেন না, নূতনের জন্য তাঁহার গৃহে সর্বদা অভ্যর্থনার জায়গা হইতেছে। তাঁহার মনস্বিতার বহু লক্ষণের মধ্যে, তাঁহার জীবন-ইতিহাসের পত্রগুলির নিত্য ওলটপালটের মধ্যে একটা জিনিস স্থায়ী দেখিয়াছি—তাহা তাঁহার সহৃদয়তা। সম্পূর্ণরূপে প্রতিদান, প্রতিষ্ঠা ও সাংসারিক চিন্তার উর্ধ্বলোকে থাকিয়া এই সহৃদয়তা দুঃখীর ব্যথায় অতি গোপনে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

ইঁহাদের তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্পভাষী সমরেন্দ্র। ইনি একান্ত ভাবে অনাড়ম্বর, অনেক সময় ইঁহার মুখে কথাটি নাই। কিন্তু হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত কথা একটা সরল হাসিতে বোধ হয় বাক্যাবলী হইতেও বেশী ব্যক্ত করে। সেই হাসিতে শুধু তাঁহার ঠোঁট দুটি উজ্জ্বল হয় না, গোঁফজোড়া পর্যন্ত হাসিয়া ওঠে। অনেক সময় মনে হইবে যে ইনি কিছুই জানেন না, একান্ত নিরীহ ভাল মানুষ' কিন্তু ভাব-রাজ্যের ডুবুরী হইয়া কেহ এই প্রশান্ত জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করিলে অনেক রত্ন পাইবেন। ইনি দিনরাত্রি পুস্তক পড়েন, ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে ইঁহার জ্ঞান অসাধারণ। সাধারণত ইনি জমিদারির কাজকর্ম দেখেন বলিয়া ইঁহার শিক্ষা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

আমি এই তিন ভ্রাতার সৌহার্দ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র, গগনবাবু, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রাজা মন্মথ রায়চৌধুরী, ত্রিপুরেশ্বর এবং শরৎকুমার রায় এক সময়ে আমাকে মাসিক বৃত্তি দিয়াছিলেন। আমি দুরবস্থার সময় ইঁহাদের সাহায্য লাভ করিয়াছি। এখনও ত্রিপুরেশ্বর এবং কাশিমবাজারের মহারাজা সেই বৃত্তি চালাইতেছেন।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইবার পর আমার প্রতি বঙ্গীয় সমাজ সহৃদয়তার পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কত লোকের নিকট যে অযাচিত ভাবে সাহায্য পাইয়াছি, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। ছোট লাট উড্‌বার্‌ন সাহেব স্বয়ং আমার জন্য মহারাজ মনীন্দ্র নন্দী এবং অপর দুই এক জন মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। চিফ্‌ সেক্রেটারি ম্যাক্‌ফার্সন সাহেব অনেক স্থান হইতে আমার জন্য সাহায্য আদায় করিয়া পাঠাইয়াছেন। বরদাচরণ মিত্র মহোদয় ময়ূরভঞ্জাধিপতির নিকট হইতে ১০০০ টাকা আদায় করিয়া আমাকে প্রদান করেন। এমনও হইয়াছে যে অযাচিত ভাবে কোন কোন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিয়া ১০০।২০০ টাকা অতি বিনয়ের সঙ্গে দিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু গগনবাবুকে একবার মাত্র আমার কথা বলিয়াছেন, গগনবাবুর সহৃদয়তার তুলনা নাই, আমি না চাহিতেই তিনি আমার বাড়ী নির্মাণের জন্য ১৮০০ শত টাকা দিয়াছিলেন। প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া রাত্রি দিন খাটিয়া আমি বঙ্গ-ভারতীর এক কালে সেবা করিয়াছিলাম, দেবী আমাকে লুকাইয়া অজস্র দান করিতেছিলেন। ১৯০৫।০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি একরূপ শয্যাগত পীড়িত অবস্থায়ই ছিলাম, কারণ তখন দুই চারিদিন বাহিরে একটু ভ্রমণাদি করিতে পারিলেও মোটামুটি অনেক সময়ই বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম, কিন্তু তখন লিখিবার শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। প্রবন্ধাদি লিখিয়া মাসিক ১৫০।২০০ টাকা উপার্জন করিতে লাগিলাম। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের উৎসাহ বর্ধনের জন্য ও আমার রোগক্লেশে সহানুভূতি দেখাইয়া আমাকে যাঁহারা সাহায্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে অর্থের পরিমাণ ১০,০০০ টাকার কম হয় নাই, সুতরাং এই সময়ে আমার আর্থিক অভাব দূর হইয়া হাতে কয়েক হাজার টাকা জমিয়াছিল।

যখন একান্ত বিপন্ন হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি, তখন নগেন্দ্রবাবুর (প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব) ন্যায় রামেন্দ্রবাবুও আমাকে সর্বদা দেখিতে আসিতেন। কি করিয়া তিনি আমার সাহায্য করিবেন, সাহিত্যিক গৌরব দিবেন, তাহাই ছিল তাঁহার সর্বদা চেষ্টার বিষয়। তিনি আমাকে সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য করিবেন, সেই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যে সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন, সেই সভায় সুরেশ সমাজপতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রস্তাবে বাধা দিবেন বলিয়া রামেন্দ্রবাবুকে ভয় দেখাইলেন। যদিও বিশিষ্ট সভ্য সম্বন্ধে তখনও খুব কড়াকড়ি নিয়ম হয় নাই, তথাপি এইরূপ প্রস্তাব সর্বজনসম্মত হইলেই শোভন হয়। তিনি আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলিলেন, 'এই বাধা দেওয়ার যুগে প্রস্তাবটি এখন আর করিতে চাহি না।' আমি বলিলাম, 'বিশিষ্ট সভ্য না হইলে আমি মরিয়া যাইব না, আপনি কেন এজন্য দুঃখিত হইতেছেন?' কিন্তু তিনি অতিশয় লজ্জিত হইয়া তাহার পরের সভায় "বিশেষ সভ্য" নামক এক শ্রেণীর সভ্য সৃষ্টি করিয়া সর্বাগ্রে আমার নাম করিবেন, স্থির করিলেন। সুরেশবাবু আমাকে বলিলেন, 'কানা ফকির ভিক মাঙ্গে—এখন যান বিশেষ সভ্য তালিকাভুক্ত হউন গিয়া, আমি এবার বাধা দিব না।' আমি রামেন্দ্রবাবুকে বলিলাম, 'যদি আপনি আমার নাম বিশেষ সভ্য রূপে প্রস্তাব করেন, তবে আমি দাঁড়াইয়া অস্বীকার করিব।' সুতরাং আমি বিশেষ সভ্যভুক্ত হইলাম না। আবদুল করিম, অতুল গোস্বামী প্রভৃতি কয়েক জনের নাম

বোধহয় সেইবার প্রস্তাবিত হইয়াছিল। রামেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে একদিন আমি প্রাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি কষ্টেসৃষ্টে ভুঁড়িটা সরাইয়া তাঁহার নিকট আমার একটা জায়গা করিয়া দিয়া একটা উপাধান অবলম্বন করত জলমগ্ন ব্যক্তি যেরূপ কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া থাকে সেইভাবে রহিলেন। আমি বলিলাম, 'কি জন্য আমার তলব হইয়াছে?' তিনি বলিলেন, 'আমি একটি লোকের প্রতীক্ষা করিতেছি, তিনি আসুন, তারপর বলিব।' কথাবার্তা তিনি খুব কমই বলিতেন, যেখানে কথার দরকার, সেখানে শুধু মৃদু-হাসি এবং ভাবের আধিক্য হইলে উচ্চ-হাস্য। এই হাসি দ্বারা তিনি আদর-আপ্যায়ন বুঝাইতেন, বিদায় গ্রহণের ভদ্রতা জানাইতেন, প্রাণের সহৃদয়তা বুঝাইতেন,—হাসিই ছিল তাঁর সম্বল। তাঁহার প্রাণের কথা ঐ হাসিতে যত বোঝা যাইত, কথায় বোধহয় ততটা বুঝাইতে পারিতেন না।

এমন সময় একটি ধীরস্থির যুবক তথায় আসিলেন, অতি সাধারণ বেশভূষা, গৌরবর্ণ, মুখে চোখে অধ্যবসায় ও তেজ এবং সকলের অপেক্ষা একটা স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সহৃদয় চরিত্র দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট। রামেন্দ্রবাবু ইঁহাকে আদর করিয়া কাছে বসাইলেন এবং আমাকে পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'ইনি দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎচন্দ্র রায়। ইনি আপনার সঙ্গে গোপনে কি কথা বলিবেন।' আমি কুমার বাহাদুরের সঙ্গে সেই ঘরের একটা নিভৃত স্থানে দাঁড়াইলাম। কুমার বাহাদুর বলিলেন, 'আমি আপনার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পড়িয়াছি, রামেন্দ্রবাবু আমাকে আপনার অবস্থা বলিয়াছেন। যদি অনুমতি দেন, তবে আমি আপনাকে সামান্য কিছু সাহায্য করিতে চাই।' এই বলিয়া ৫০০ টাকার নোট আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'আর মাসিক ২০ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে চাই, গ্রহণ করিবেন কি?' আমি নির্বাক হইয়া কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজিতেছিলাম। এমন সময় রামেন্দ্রবাবুর আহ্বান হইল; দেখিলাম এই সাহায্য দিতে দেখিয়া তাঁহার মুখে আনন্দ ও স্ফূর্তি খেলিতেছে।

কুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুরের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি বঙ্গের ইতিহাস-সেবায় জীবন সমর্পণ করিয়াছেন; এরূপ জ্বলন্ত অনুরাগ খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার মুক্তহস্ত দানে এক সময় সাহিত্য পরিষৎ যথেষ্ট পুষ্টি লাভ করিয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার দান আছে,—ঘোষণা নাই, তাঁহার কথা অতি স্পষ্ট,—মিথ্যা ভদ্রতা এবং মিষ্টভাষা দ্বারা তিনি কাহাকেও কখনও প্রলুব্ধ করেন না ; যাহা করিবেন তাহা প্রাণপণে গোপনে নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখিয়া করিয়া থাকেন। তিনি বাংলা অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন, দুই একখানি ছাপা হইয়াছিল। এই লেখাগুলি আমি পড়িয়া দেখিয়াছি, সাধারণ উপন্যাসগুলি হইতে এইগুলিতে অনেক বেশী কৃতিত্ব আছে। কিন্তু বিদ্যাচর্চার জন্য অসংখ্য টাকা দান করিয়াও ইনি নিজের লেখা ছাপাইবার জন্য ব্যয় করিতে বিশেষ সম্মত নহেন। তাঁহার বিনম্র প্রতিভার লাজুকতা যেমনই মধুর, বঙ্গীয় ঐতিহাসিক চর্চার প্রাণস্বরূপ হইয়াও নিজের যশের ডঙ্কানিনাদ শুনিতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতাও তেমনই মধুর। তিনি প্রেরণা দিয়া যাহাদিগের দ্বারা কার্য করান, স্বীয় প্রাপ্য যশের মুকুট তাহাদিগের মস্তকে পরাইয়া সুখী হইয়া থাকেন। আমাকে তিনি ৪।৫ বৎসর মাসিক ২০ টাকা

বৃত্তি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার হেমেন্দ্রকুমার জ্যোতিষ ও চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত—কুমার শরৎকুমারের ন্যায় তিনি হয়ত দৃঢ়চরিত্র নহেন, কিন্তু এমন মধুর বিনয় ও অমায়িকতা এমন শেফালি-শুভ্র নির্মলতা খুব অল্পই পাওয়া যায়।

কুমার শরৎকুমার কবিকঙ্কণের হস্তলিখিত পুঁথিখানি সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। তিনি এবং রামেন্দ্রবাবু বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে ধরিয়া বহু চেষ্টার ফলে পুঁথিখানি সংগ্রহ করিলেন। পুঁথিখানি নকল করাইয়া সম্পাদন করিবার ভার হইল আমার উপর। আমি প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যকে দিয়া তাহাকে নকল করাইতে লাগিলাম। এই পুঁথি কবিকঙ্কণের হাতের লেখা বলিয়া আমার বোধ হয় নাই। পূর্ব ও পশ্চাৎ ভাগের কয়েকটি পাতা নাই, সুতরাং; সনতারিখের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই পুস্তকের মধ্যে যে মুকুন্দরামের হাতের লেখা আছে, তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। পুঁথিখানি তালপাতায় লেখা। অক্ষরগুলি সুন্দর, ভাল লেখক দিয়াই কবিকঙ্কণ নকল করাইয়াছিলেন, পরন্তু লেখাগুলির মাঝে মাঝে, আমার যতদূর মনে পড়ে, লাল কালিতে সংশোধন আছে, কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ ছত্র পরিবর্তন করিয়া নূতন ছত্র লিখিত হইয়াছে। স্বয়ং কবি ছাড়া অন্য কেহ এরূপভাবে তাঁহার লেখায় কলম চালাইয়াছেন ইহা সম্ভব নহে। সংশোধিত ছত্র কবির নিজের হাতের লেখা বলিয়াই বোধ হয়, সে লেখাগুলি তত সুন্দর নয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লেখার মত কতকটা জড়ানো লেখা। এই পুঁথির মধ্যে একখানি দলিল ছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি। সেই দলিলে দেখা যায়, বারা খাঁ নামক কোন শাসনভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামকে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন, দলিলের তারিখ ১৬৪০ খৃীঃ। আমরা কেতকী দাস ক্ষেমানন্দের 'মনসা দেবীর ভাসানে' এই 'বারা খাঁর' নাম পাইয়াছি। শেষোক্ত কবি লিখিয়াছেন, বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হইলে পর তিনি মনসা মঙ্গল রচনা শুরু করেন। মুকুন্দরামস্থাপিত সিংহবাহিনীর মন্দিরেই এই পুস্তক পূজিত হইতেছিল এবং মুকুন্দরামের বংশীয়দের এবং দামুন্যাগ্রামের অপরাপর লোকের বিশ্বাস যে পুঁথিখানি মুকুন্দরামের নিজের। সুতরাং যখন শিবরামের দলিল ঐ পুঁথির মধ্যে ছিল, তখন বাড়ীর প্রবাদ যে পুঁথিখানি স্বয়ং কবির এবং যখন পূর্বোক্তভাবের সংশোধন কাব্যের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, তখন পুস্তকখানি অবশ্য মুকুন্দরামের বলিয়া আমরা মানিয়া লইলাম। কিন্তু সংশোধনের অংশ ছাড়া অন্য কোন অংশ কবির স্বহস্তলিখিত বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

এই পুঁথিখানি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাঁচ শত টাকা এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তিন শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিবার অভিপ্রায় আমার নিকট ব্যক্ত করেন। আমি রামেন্দ্রবাবুকে তাহা বলিয়াছিলাম। কবিকঙ্কণের বংশধর যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ঐ পুঁথি ফিরাইয়া লইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া আমার বাড়ীতেই ছিলেন। কবিকঙ্কণের বংশধর বলিয়া আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, যদিও পূর্বপুরুষ-প্রাপ্ত এই বংশগৌরব ছাড়া তাঁহার মধ্যে কোনই প্রশংসনীয় গুণ দেখি নাই। বয়স প্রায় ৭০, আমার ছেলেদের দিয়া দিনরাত্রি তামাক সাজাইতেন ও কাশিয়া কাশিয়া ধূমোদ্গীরণ করিতেন,—পানরসসিক্ত নিষ্ঠীবন দ্বারা আমার নূতন

বাড়ীখানির দেওয়াল রঞ্জিত করিতেন এবং কোন স্থানে বাহির হইয়া গেলে যত রাজ্যের ধূলি ও কাদায় ছিন্ন-চটির অভ্যন্তরস্থ শ্রীপাদপদ্ম লাঞ্ছিত করিয়া সেই লাঞ্ছনার পর্যাপ্ত ভাগ আমার শয্যায় প্রদানপূর্বক অকুণ্ঠিত চিত্তে বিরাজ করিতেন।

পুঁথি নকল হইয়া গেল, কিন্তু তখনও মিলাইতে পারি নাই। ইতিমধ্যেই রামেন্দ্রবাবু আমাকে তাড়া দিয়া বলিলেন, 'কই, শীঘ্র শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেলুন, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য পুঁথির জন্য তাড়া দিতেছেন, বই শীঘ্র ফেরৎ দিতে হইবে।' ইহার মধ্যে উক্ত ভট্টাচার্য একদিন আমায় বলিলেন, 'দীনেশবাবু, আমার বড়বাজারের এক শিষ্য বইখানি দেখিতে চাহিতেছে—মহাপুরুষের হস্তাক্ষর, সে দেখিয়া পুণ্য অর্জন করিতে চায়—দুই এক দিনের জন্য দিন্, আমি তাঁহাকে দেখাইয়া আনি।' তাঁহার বই তাঁহাকে দিব, ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু আমি সাহিত্য পরিষৎ হইতে রসিদ দিয়া বই আনিয়াছিলাম—তাঁহাকে একখানি রসিদ দিয়া বই নিতে বলিলাম। কি ভাগ্য এই রসিদ আমি লইয়াছিলাম! যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য খানিকটা ইতস্তত করিয়া রসিদ লিখিয়া দিলেন, কিন্তু নামের একটা অংশ রূপান্তর করিলেন, তাহা আমি তখন ধরিতে পারি নাই—"নাথের" জায়গায় বোধহয় "চন্দ্র" করিয়াছিলেন। বই পরদিন ফিরাইয়া দেওয়ার কথা, কিন্তু যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য যে সেই দিন অন্তর্হিত হইলেন তার পর আর আমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন নাই। দুই তিন দিন পরে নগেন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন, 'শুনিলাম, রামেন্দ্রবাবু দুই শত টাকা মূল্যে যোগেন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট হইতে সাহিত্য পরিষদের জন্য পুঁথিখানি কিনিয়াছেন।' আমি ভাবিলাম, ভট্টাচার্য বোধহয় তাঁহাকে পুঁথি দিয়া মূল্য লইয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তথাপি রামেন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখিলাম 'বই যদি আপনাকে দিয়া গিয়া থাকে তবে আমাকে ফেরৎ দিবেন, কারণ এখনও আসল দেখিয়া নকল মিলানো হয় নাই।' এই পত্র পাওয়ামাত্র রামেন্দ্রবাবু জ্বর গায়ে গাড়ী করিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আপনি কেন বই দিলেন? সে আমার নিকট হইতে দুই শত টাকা লইয়া গিয়াছে, আপনার কাছে বই আছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা দিয়াছি।' আমি তাঁহাকে রসিদখানি দিলাম, তাঁহাকেও ভট্টাচার্য আর একখানি দুই শত টাকা প্রাপ্তির রসিদ দিয়াছেন, সে রসিদ তিনি আমাকে দেখাইলেন। আমি বলিলাম, 'আপনি এই যে কারবারটা করিলেন, ঘুণাক্ষরে তাহা আমাকে জানিতে দিলেন না, অথচ যোগেন্দ্র ভট্টাচার্যকে শীঘ্র বই ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া আপনি আমাকে তাগিদ দিতেছিলেন। বইখানি সত্যই ফিরাইয়া দিয়াছি কিনা, তাহা না জানিয়া আপনি আগেই টাকা দিয়া সাফ হইলেন।'

তিনি বলিলেন, 'সাহিত্য পরিষৎ হইতে আপনি পুঁথি পাইয়াছেন—সাহিত্য পরিষদে পুঁথি দিবেন, তাহাকে দেওয়ার অধিকার আপনার কিরূপে হইল?' আমি বলিলাম, 'পুঁথি তো আর সাহিত্য পরিষদের নহে, তাঁহারই পুঁথি, তিনি যদি দুই এক দিনের জন্য কার্যবশত চাহেন তবে রসিদ লইয়া দিয়া যে আমি কি অন্যায় করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারি না। এই বইখানির দাম পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল, তাহা আপনি জানিতেন, অথচ গরীব ব্রাহ্মণকে, কবিকঙ্কণের বংশধরকে —জানিয়া শুনিয়া তিন শত টাকা কমে আপনি একটা রফা করিয়াছেন, ব্যবসায়ীর পক্ষে একথা কিছু দোষের নহে, কিন্তু আপনার মত লোকের পক্ষে এটা শোভন

নহে। সাহিত্য পরিষদের দু পয়সা লাভ দেখাইতে যাইয়া গরীব ব্রাহ্মণের ক্ষতি করিতে গিয়াছেন, সে আপনার উপর এক কাঠি; ফাঁকে পাইয়া জব্দ করিয়াছে।' রামেন্দ্রবাবুর মুখে সেদিন আর হাসি দেখিলাম না; তিনি মাঝে মাঝে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া চক্ষুর তারা ঊর্ধ্বে উঠাইতেন,—তাহাতে ছদ্মবেশী ক্রোধের অভিনয়টা বেশ কৌতুকাবহ হইত,—এই ভাবে চোখের তারা ঊর্ধ্বে উঠাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরে সাক্ষীর সমন পাইয়া লালবাজার পুলিশ কোর্টে যাইয়া দেখি, ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য, তাহার ৯২ বৎসরের মাতাকে সঙ্গে করিয়া উভয়ে মড়ার মতন কোর্টের বারান্দার উপর চোখ উলটাইয়া পড়িয়াছে, বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের অনুরক্ত, তাঁহাদের কীর্তিরক্ষণশীল ও পৃষ্ঠপোষক সাহিত্য পরিষদের হস্তে কবিকঙ্কণের বংশধরের এই লাঞ্ছনা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। আমি ভট্টাচার্যকে মিষ্ট কথায় বলিতে গেলাম ; সে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির ন্যায় অস্ফুট স্বরে বলিল, 'আপনি সরিয়া যান্—সাহিত্য পরিষদের লোকগুলি রাক্ষস, আপনারা কি মনস্থ করিয়াছেন, গরীব ব্রাহ্মণ কয়েকটা টাকা লইয়াছিল, ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিলেই তো পারিতেন, কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া একটা কাজ করিয়াছি, তাহার ফলে আজ ফৌজদারীতে টানিয়া আনিয়া আমাকে আমার মাতার সহিত বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।' এই বলিয়া সে চোখ বুজিল ও ঘৃণায় আর আমার সঙ্গে কথা বলিল না। আমরা সাক্ষ্য দিলাম, কিন্তু সে যে প্রতারণা করিয়াছে ইহা সাব্যস্ত হইল না। জ্ঞাতিরা তাহার হাত হইতে পুঁথি ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল, কারণ একা তাহার বই বিক্রয় করিবার কোন অধিকার ছিল না। এইরূপ কোন একটা আকার ধারণ করিয়া মোকদ্দমাটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল ও ভট্টাচার্য বেকসুর খালাস পাইল। তাহার বিরুদ্ধে পরিষৎ আর দেওয়ানী করিতে পারেন নাই, কারণ ইহার অল্প পরেই সংবাদ আসিল ভট্টাচার্য শুধু রামেন্দ্রবাবুকে নয়, তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলকে ফাঁকি দিয়া সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছে।

রামেন্দ্রবাবুর হাতের লেখা পড়া যাইত না; এই জন্য আমি এক পোষ্ট-কার্ডের মধ্যে হিজিবিজি লিখিয়া—মাঝে মাঝে তাহার দুই একটা বঙ্গাক্ষর ছিল—চিঠিখানির উপরে urgent লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি গাড়ী করিয়া ঐ পত্র আমাকে দিয়া পড়াইয়া লইতে আসিয়াছিলেন, আমি হাসিতে হাসিতে সব কথা বলিয়া ফেলিলে তিনি 'নির্দহন্নিব চক্ষুষা' অভিনয় করিয়া আমার ভয় অপেক্ষা কৌতুকেরই বেশী উদ্রেক করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার 'ত্রিপুরং জঘ্নুষং পুর্বং রুদ্রস্যেব বভৌ তনুঃ' এই ভাব দর্শনে আমার ছোট ছোট ছেলেরা ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল।

এই সকল কৌতুক ও আমোদপ্রমোদ যাহা লইয়া শৈশবে মাতুলালয়ে নিত্য ব্যস্ত থাকিতাম তাহা রোগ, অভাব ও নানা ক্লেশের মধ্যেও আমায় সময় সময় পাইয়া বসিত। একদিন ১লা এপ্রিল উপলক্ষে আমার ভায়রাভাই রণদাপ্রসাদ গুপ্তকে (জুবিলি আর্ট একাডেমির প্রিন্সিপ্যাল) এক আত্মীয়াকে দিয়া আমার বড় মেয়ের নামে এই চিঠি দিলাম, 'মেসো মহাশয়, বাবা হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মারা পড়িয়াছেন।'

১লা এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা রণদা ও তাহার স্ত্রী হেমনলিনী দেবী, চোখের জল মুছিতে মুছিতে দীর্ঘনিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা শোক সূচনা করিয়া আসামাত্র আমাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আমি মনে করিয়াছিলাম বাঁচিয়া থাকাটা আমার পক্ষে ভারী অন্যায় হইয়াছে।

এই সময় কলিকাতায় প্লেগের উৎপাত হওয়াতে আমি শ্যামপুকুর লেনের বাড়ী ছাড়িয়া লাউডন্ স্ট্রীটে ত্রিপুরার মহারাজার ভাড়াটে বাড়ীতে গেলাম। সেই বাড়ীর ভাড়া মাসিক বারো শত টাকা। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য আমাকে সেই বাড়ী দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মহারাজার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তখন আমার বাল্য সুহৃদ্ কর্ণেল মহিমচন্দ্র। অতি উদার চরিত্রের লোক, বাংলা লিখিতে সুনিপুণ, বেশ কথাগুলি জোটে, রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্যস্ত না থাকিলে মহিম ভাল লেখক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। রাজবাড়ীর লোকদিগের মধ্যে মহারাজকুমার নবদ্বীপ-চন্দ্র ছাড়া আমি এরূপ শিক্ষিত কায়দাদুরস্ত, মনস্বী ব্যক্তি আর দেখি নাই। মহিম আমার চির-উপকারী বন্ধু, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য আমাকে অনেক আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন, ত্রিপুরার রাজবাড়ীর সঙ্গে আমার চিরকালের একটা কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ-মূলক সম্বন্ধ আছে। অন্যত্র আমার অভিমান আছে, প্রতিষ্ঠা ও নিজ-পদমর্যাদার জ্ঞান আছে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজপ্রাসাদে আমার প্রাণ বিকাইয়া গিয়াছে—সেখানে বিপদে পড়িয়া সাহায্য চাহিতে ও চাহিয়া সহায়তা না পাইলেও আমি কখনই লজ্জা বোধ করিব না; দুঃখে পড়িলে মহিমের কাঁধে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াও সান্ত্বনা পাইয়া থাকি।

লাউডন্ স্ট্রীটের বাড়ীতে আসার দুই দিন পরে দেখিলাম, একজন ফিরিঙ্গী খিড়কির দরজা দিয়া ঢুকিয়া বাড়ীর বৈদ্যুতিক আলোর তার কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুরীটা আঁধার করিয়া ছেলেপুলে সুদ্ধ আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছ নাকি'? সে বলিল ত্রিপুর-রাজ তাহাদের প্রায় এক বছরের বিল দেন নাই। আমি বলিলাম, 'তোমরা যাহা করিলে, তাহাতে যে আর কোন কালে বিলের টাকা পাইবে তাহা মনে হয় না। কারণ রাজা আর ২।৩ বছরের মধ্যে এ বাড়ীতে আসিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।' আমি শেষে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, 'তুমি তারটা জুড়িয়া দিয়া যাও, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি, টাকা আদায় করিয়া দিতে পারি কিনা।' সে খানিকটা নীরব থাকিয়া শেষে তারটা আবার জুড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি মহিমকে লেখামাত্র বিলের টাকা চলিয়া আসিল। লাউডন্ স্ট্রীটের আর এক বিপদ ছিল। চারিদিকে বড় বড় সাহেবের বাড়ী, আমাদের ছেলেদের কেহ কাঁদিয়া উঠিলে প্রতিবাসী সাহেবদের ছেলেরা বন্দুক দেখাইয়া গুলি করিবার ভয় দেখাইত। গুলি করাটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে—কারণ তাহাদের হাত হইতে ফসকাইয়া গুলিটা চলিয়া আসিলে অনবধানতার অজুহাতে আইন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে, শুধু ক্ষুদ্রজীবী বাঙালী শিশুর প্রাণটা পিতামাতাকে শোকে ভাসাইয়া যে চলিয়া যাইবে তাহা আর ফিরিবে না। ছেলেরা ভয়ে অস্থির হইয়া থাকিত, তাহাদের পিতামাতার ভয়ও কম ছিল না। ব্যথা, কষ্ট ও শত রকমের যন্ত্রণায় শিশুরা মুখভঙ্গী করিয়া কান্নার অভিনয় করিত, ভয়ে কণ্ঠ হইতে স্বর উত্থিত হইত না। লাউডন্ স্ট্রীটের তৃতীয় বিপদ, নাপিতেরা গোঁফ

কামাইয়া আট আনা চাহিত, বড় বড় সাহেবেরা তাহাদের হাতে টাকাটা পকেট হইতে ফেলিয়া দিতেন; আমি এত দর কি করিয়া দিব? সুতরাং মনে করিলাম মুনি-গোঁসাইদের কিংবা ব্রাহ্মদের নকল করিয়া শ্মশ্রু-গুম্ফরাজিত মুখশ্রী লইয়া নরসুন্দর-নন্দনদের ফাঁকি দিব।

কিন্তু চতুর্থ বিপদ সত্য সত্যই একটা বিপ্লব উপস্থিত করিল। প্লেগের ভয়ে গগনবাবুরা জোড়াসাঁকোর বাড়ী ছাড়িয়া লাউডন্ স্ট্রীটের নিকট একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় আসিলেন। গগনবাবুর বড় ছেলে গুপুর সেইবারে বিবাহ হইয়াছিল। তাহার বয়স ছিল ১৬।১৭, ঠাকুরবংশ সৌন্দর্যের খ্যাতিতে সর্বত্র পরিচিত, এই বংশেও গুপুর মত ছেলে খুব কম জন্মিয়াছে। গুপুর বিবাহে গগনবাবু বোধহয় ৫০,০০০ টাকার বেশী খরচ করিয়াছিলেন। পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের সকলকে নানা কারুকার্যে পূর্ণ থালা ও অপরাপর তৈজসপত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। সাহেব-পাড়ায় আসিয়া গুপুর টাইফয়েড্ জ্বর হয় এবং ৮।১০ দিন পরে তাহার মৃত্যু হয়।

এই অতীব শোকাবহ ঘটনায় গগনবাবুরা জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদিগকে সর্বদাই বিষণ্ণ দেখিতাম। আমি একদিন বলিলাম, 'আপনারা যদি সান্ত্বনা চান, তবে আমি একজন ভাল কথককে নিযুক্ত করিতে পারি, তাঁহার কথায় আপনারা শান্তি পাইবেন।' সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি যেরূপ তৃণটিকেও আশ্রয় করিতে হাত বাড়ায়, গগনবাবু এই প্রস্তাবটির সফলতা সম্বন্ধে আস্থাহীন হইয়াও ইহাতে রাজী হইলেন। বাড়ীর মেয়েরা সাগ্রহে এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। আমি ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণিকে এই ভাবে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। মাথায় মস্ত-বড় টাক—বিশাল হাঁ, যেন জহ্নু মুনি সমুদ্র গ্রাস করিবেন, বর্ণটি জলো কালির মত, বিশাল ভুঁড়ি লইয়া চটি পায়ে কথকপ্রবর গামছাখানি দিয়া বারংবার মুখ মুছিতে মুছিতে ব্যাসাসনে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু কথা বলিবার ইঁহার আশ্চর্য শক্তি ছিল, প্রথম দিনই আসর জমিয়া গেল। গগনবাবুদের বাড়ীতে ছেলেবুড়া সকলে মৌতাত ধরিলেন, সন্ধ্যায় বড় হলঘরটায় ক্ষেত্রচূড়ামণির কালো কণ্ঠে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিয়া ফুলের মালা দুলিতে থাকিত, এবং তিনি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জড়ভরত, দক্ষযজ্ঞ, রুক্মিণীহরণ, বকাসুর বধ প্রভৃতি কত পালা যে বলিয়া যাইতেন, তাহার অবধি ছিল না। তিনি কথায় কথায় ছবি আঁকিয়া যাইতেন; বর্ণনার ছটায় মেঘ, বৃষ্টি, বসন্ত-সমীরণ এবং পদ্মবন যেন চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন, কখনও শ্রোতৃ-বর্গ অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, কখনও হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এরূপ অপরূপ বক্তাকে পাইয়া ধর্মের কথায় পৌরাণিক প্রসঙ্গে মন হইতে শোক ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার বাক্‌ছটায় অঙ্কিত চিত্র হইতে আমি 'ধরাদ্রোণ', 'জড়ভরত' ও 'সতী'র মালমসলা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। প্রায় এক মাসের মধ্যে গগনবাবুর মন এরূপ লঘু হইয়া গেল যে, যখন ক্ষেত্র-কথক কথা বলিতেন, তখন গগনবাবু লুকাইয়া তাঁহার চেহারা ও ভঙ্গীগুলি আঁকিতেন। এ পর্যন্ত মতিবাবু ছিলেন তাঁহার অঙ্কনের প্রধান লক্ষ্য, এখন হইতে ক্ষেত্রচূড়ামণি এই ক্ষেত্রে মতি-বাবুর ভাগী হইলেন। ক্ষেত্র-কথকের উপার্জনও কম হইত না। বামনভিক্ষা প্রভৃতি পালায় বাড়ীর মেয়েরা তাঁহাকে গহনা, মোহর ও টাকা দিতেন, দুই মাসে তাঁহার ভুঁড়ি বাড়িয়া গেল, চেহারার চিকনাই হইল, কালো রংটা শ্যামাভ হইল। তাঁহার

উপার্জন দেখিয়া মতিবাবুর ঈর্ষা হইত। তিনি বলিতেন, 'আপনারা শোনেন নাই, তাই! পাণিহাটীতে এক কথক আছেন, তিনি যখন কথা বলেন, তখন শ্রোতারা কখনও হাসিতে হাসিতে গড়াগড়ি যান, করুণ-রস বর্ণনাকালে স্ত্রীলোকেরা মূর্ছা যায়, পুরুষেরা মাটিতে মাথা খুঁড়িতে থাকে, আপনারা এক ক্ষেত্রকেই চিনিয়াছেন, ভারি তো চূড়ামণি!' তখনই সেই পাণিহাটীর কথককে আনা হইল, তিনি কিছুমাত্র জমাইতে পারিলেন না। কিন্তু মতিবাবু দমিবার ছেলে নন, বলিলেন, 'বামুন বুড়ো হয়ে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে, সেরূপ আর শক্তি নাই। কিন্তু বেনেটোলায় এক কথক এসেছেন, তিনি নাকি পুত্রশোকীকেও হাসাতে পারেন।' আসিলেন সেই বেনেটোলার কথক, কিন্তু ক্ষেত্র-কথকের পায়ের নখের কাছে তিনি দাঁড়াইতে পারিলেন না। এই ভাবে আর দুই মাসের মধ্যে ২৫।২৬ জন কথক মতিবাবু আস্ফালন করিতে করিতে লইয়া আসিলেন, কিন্তু ক্ষেত্র-কথক কলিকাতার কথকমণ্ডলীর চূড়ার কৌস্তুভমণি হইয়া রহিলেন, তাঁহার আসন কেহই টলাইতে পারিলেন না। একমাত্র শ্যামবাজারের কৃষ্ণ কথক ক্ষেত্র চূড়ামণির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি নানা কারণে আমাদের আহ্বানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে কথকতার পরীক্ষা দিতে রাজী হইলেন না।

ইহার মধ্যে রবীন্দ্রবাবু গগনবাবুকে কুষ্ঠিয়ানিবাসী শিবুকীর্তনিয়ার কথা বলিলেন। শিবু আসিল। ভিনি, ভিডি, ভিসি, আমি আসিলাম, আমি দেখিলাম, আমি জয় করিলাম। প্রথম দিন গোষ্ঠ গাহিয়াই সে সভা মাৎ করিয়া দিল, আর কি কথকতা দাঁড়াইতে পারে? তাবৎ একতারা যে পর্যন্ত বীণা না আসিয়াছে, তাবৎ মল্লিকার বাস যে পর্যন্ত গোলাপ তাহার মাদকতা লইয়া না ছুটিয়াছে। মনোহরসাহী একটানে কথকতা উড়াইয়া লইয়া গেল। শিবু বৃন্দাদূতীর মত হাত নাড়িয়া ব্যঙ্গোক্তি করিতে পারিত, গুন্ গুন্ করিয়া ভ্রমরের মত বিলাপের সুরে গুঞ্জন করিতে পারিত, প্রেমের উচ্ছ্বাসে পাগলের মত প্রলাপ বকিয়া শ্রোতাকে পাগল করিতে পারিত। সে হঠাৎ গাহিতে গাহিতে গান অসমাপ্ত রাখিয়া শুধু হাতের ভঙ্গী দিয়া বাকীটুকু বুঝাইয়া দিত, তাহার চেহারাটা ছিল ক্ষুদ্র একটা হাতীর মত, হাতী যেমন শুঁড় দোলাইয়া বাঁশীর সুরে নাচিতে থাকে, শিবু সেইরূপ ভুঁড়ি দোলাইয়া হাত প্রসারণ করিয়া যে কত ভঙ্গীতে মন ভুলাইত তাহা আর কি বলিব! শিশুর দল হইতে শুরু করিয়া বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাহার গান শুনিয়া কাঁদিতেন।

একদিন রবীন্দ্রবাবু বলিলেন, 'শিবু তুমি তো খুব ওস্তাদ, তোমার 'পূর্বরাগ', 'মাথুর' এগুলি না হয় বুঝিলাম, কিন্তু ব্রাহ্ম-মেয়েরা থাকবেন—তুমি 'খণ্ডিতার' পদ গাইবে কিরূপে? দেখ, যেন হাটে হাঁড়ি না ভাঙে।' শিবু জোড়হাত করিয়া বলিল, 'হুজুর শুনবেন, এ সকল আমাদের ভক্তির কথা, এতে কি কোন দোষের কারণ থাকতে পারে?'

সেইদিন শিবু খণ্ডিতার পালা গাহিল। প্রথমেই আসরে আসিয়া শিবু চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইল, গানে গানে বুঝাইল, যাহারা আত্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত তাহারা প্রেম, নির্মল ভগবৎপ্রেম বোঝে না। কিন্তু ভগবান কি তাই বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন? কামুক ভগবানের বুকে নখাঘাত করে, তাঁহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দেয়, তবু দয়ার আধার ভগবান তাঁহার কাছে যান। প্রেমিক দুঃখ করিয়া বলেন, 'তোমার জীব তোমাকে কত কষ্ট দিতেছে।' এই কথাগুলি শিবু

এমন চমৎকার করিয়া বুঝাইল যে ভগবানের অসীম দয়ার রাজ্য, এবং তাহাতে পাপী-কৃত অপরাধের চিত্র যেন স্পষ্ট হইয়া শ্রোতৃবর্গকে এক ঊর্ধ্বতন রাজ্যে লইয়া গেল, তাহার পর যখন সেই ব্যাখ্যার আলোকে সে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নখাহত, দংশিত কৃষ্ণের শ্যামলরূপ আঁকিয়া দেখাইল, তখন কোন অপবিত্রতার লেশ সেই সকল পদে স্পর্শিল না, সমস্তই যেন মনকে এক ঊর্ধ্ব-রাজ্যের স্বর্গীয় সংগীতের ঝংকারে মাতাইয়া তুলিল।

ক্ষেত্র-চূড়ামণির পশার শিবু আসিয়া এই ভাবে মাটি করিয়া দিয়া গেল। ক্ষেত্র-কথক আমার নিকট প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, 'তাই তো দীনেশবাবু, শিবু এসে আমার বাঁধা আসরটা নষ্ট করে দিয়ে গেল।'

আজ শিবুও নাই, ক্ষেত্র-কথকও নাই, কিন্তু গগনবাবুর পুরাতন চিত্র-খাতায় ইহাদের ছবি নানা ভঙ্গীতে আঁকা আছে, তাহা একটা দেখিবার জিনিস বটে।

একদিন চন্দ্রশেখর কালী ডাক্তার মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীতে আমি দুটি জিনিস ভালবাসি, হোমিওপ্যাথী ও মনোহরসাই গান।'

শিবুর পরে আমি গণেশের কীর্তন শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ গণেশের কীর্তনে মাতিয়া গিয়াছেন। গণেশ বেশ গায়, বিশিষ্ট লোকের আসরে গণেশ গাহিবার যোগ্য। সুরটি মেয়েদের মত মিষ্ট, ভাবও বেশ লাগাইতে পারে। কিন্তু শিবুর ভাব, ভঙ্গী ও উন্মাদনা গণেশের নাই, গণেশ অনেকটা সভ্যরকমের গায়ক। কিন্তু কীর্তন-গায়কের রাজা গৌর দাস। গৌর দাস রাত্রি ৯টায় জপ করিতে বসে, রাত্রি তিনটায় জপ শেষ হয়, সমস্ত সময়ই প্রায় কাঁদিতে থাকে, পার্শ্বে তাহার যুবতী স্ত্রী ঘুমাইয়া থাকে। শুনিয়াছি গৌর দাস তাহার দিকে দৃকপাতও করে না। তাহার জপমালা একটা গোখুরাসাপের মত, এত বড় তুলসীর মালা আমি দেখি নাই ; সে থলি হইতে সেটি বাহির করিলে ছেলেরা ভয় পায়, ঐ জপমালাটি গৌর দাসের প্রাণ, সে নিঃসন্তান। আমি আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে কি করিয়া বুঝাইব যে ঐ জপমালা গৌর দাসের সন্তান ও স্ত্রী প্রভৃতি সকলের স্থান পূরণ করিয়াছে। তাহার চেহারাটা দাঁড়কাকের মত, কথাবার্তায় কতকটা পাগলের মত—সে আসিয়া হয়ত আমার সোনার চশমাটি ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, না হয় আমার আলোয়ানখানা লইয়া নিজে গায়ে দিয়া হাসিতে লাগিয়া গেল। এদিকে সে এত বড় হিসাবী, আসরে যদিও একচ্ছত্র সম্রাট, তথাপি গান গাহিয়া যাহা পায় দলের লোকেরা হয়ত সবটাই ফাঁকি দিয়া লইয়া যায়, গৌর দাসের হয়ত অন্ন জোটে না।

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও এই গৌর দাসের মত লোককে যে দিন শিক্ষিত সমাজ চিনিবে, সেইদিন তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। বড় বড় ইংরাজী পুস্তকের গৎ আওড়াইয়া চমকাইয়া দেওয়ার যুগ চলিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের সভ্যতার সার, যাহা ৭।৮ হাজার বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, তাহার কতক কতক বৈষ্ণবদিগের সহজসম্প্রদায়ের পুস্তকে আছে। বটতলা কিছু কিছু ছাপাইয়া রাখিয়াছে। যাহাকে আমরা নিম্নশ্রেণী বলি, তাহারাই এই পুস্তকগুলির পাঠক। মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি তন্ত্রের ভিতর দিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া কিরূপ অপূর্ব প্রেমধর্মে পরিণত হইয়াছে, যাহা শুনিলে য়ুরোপীয় দার্শনিকের বিস্ময় জন্মিবে, তাহার বোদ্ধা আমাদের জনসাধারণ। শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও তাহার খবর পান না, অনেক সময়

সেগুলি সম্প্রদায়বিশেষের পারিভাষিক শব্দপূর্ণ, সে ভাষার নাম 'সন্ধ্যাভাষা', তাহা অপরের দুর্বোধ্য। গৌর দাস যখন গান গায় তখন চৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়। বহু কথা যাহা আজীবন বৈষ্ণবপদ ঘাঁটিয়া আমি বুঝিতে পারি নাই—গৌর দাস গান গাহিয়া তাহা আমাকে বুঝাইয়াছে। পদাবলীর টীকা হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসাদির যে টীকা রাধামোহন ঠাকুর সংস্কৃত পদামৃতসমুদ্রে করিয়াছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্ট টীকা গায়কেরা করিয়াছেন, তাহা গানে গানে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে—সেই টীকার নাম আখর। গৌর দাস এই আখরের রাজা, সে যখন গোষ্ঠ গান করে, তখন যেন কোন যাদুকাঠির স্পর্শে চণ্ডীদাসবিদ্যাপতি সজীব হইয়া আসরে উপস্থিত হন। এরূপ অপূর্ব হইতে অপূর্ব কিছু আমি শুনি নাই। কালিদাস, বাল্মীকিকে হার মানাইয়া দেয় এই কীর্তন। সেই কালো, সেই কঙ্কাল-সার, রেখাগ্রস্ত কপাল, একান্ত নিরীহ ব্যক্তি যখন আসরে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন যেন দেবী ভারতী স্বয়ং বীণা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ান। কীর্তন শুধু গান নহে, ইহা উপনিষদের সময় হইতে বৌদ্ধ জগতের মধ্য দিয়া ভারতীয় যত ধর্মমত হইয়াছে, তাহার হৃদয়গ্রাহী সরল ব্যাখ্যা, তাহা সমস্ত ধর্মের প্রাণ, হিন্দুসভ্যতার রাগ-রাগিণীতে মূর্তিমান প্রকাশ। গৌর দাস পাগল, হাতে তালি ও বাহবার চোটে সে হয়ত বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিল, তখন গান মাটি হইয়া গেল। তেজস্বী ঘোড়ার যেরূপ রাশ ধরিয়া রাখা চাই, গৌর দাসকে সেইরূপে গানের মধ্যেই রাখিয়া দেওয়ার চেষ্টা দরকার। ইতর শ্রেণীর শ্রোতারা ব্যাখ্যা শুনিয়া হাতে তালি দিয়া গৌর দাসকে বিপথে লইয়া গিয়া তাহার গান মাটি করিয়া ফেলে। এই একরূপ নিরক্ষর বৈষ্ণব ভিখারী কেমন করিয়া হিন্দুর দার্শনিক তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলি এরূপ মন-ভুলানো গানে পরিণত করিয়া ফেলিল তাহা আশ্চর্যের বিষয় বটে। আখরগুলির কতক সে পূর্ব-পুরুষদের নিকট হইতে পাইয়াছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ আখর সে জপের নিকট পাইয়াছে—কৃষ্ণভক্তিতে ভরপুর তাহার স্বীয় নয়নাশ্রুর নিকট পাইয়াছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদ পাইলে তাহার মনের বীণা ঝংকার দিয়া বাজিয়া ওঠে, তাহার আখরগুলি সেই ঝংকার হইতে উৎপন্ন। সে আসরে একাই এক শ'। শিবু, গণেশ তাহার ছাত্র হইবার যোগ্য। তাহার খোলের হাত এত দুরন্ত, যে সে যখন খোলওয়ালার ব্যর্থতায় চটিয়া গিয়া শিখাটা দোলাইতে দোলাইতে খোলে চাটি দেয়, তখন খোল যেন মানুষের ভাষা শিখিয়া কথা বলিতে থাকে।

আমাদের নকলবাজী-প্রিয় দেশ গৌর দাসের মত ব্যক্তিকে চিনিল না। আমাদের ঘরের কাছে নিরন্ন গায়ক খোল-করতাল-মন্দিরার সঙ্গে হিন্দুর সুপ্রসিদ্ধ অথচ চির জীবন্ত, অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সরস, অতি দার্শনিক হইয়া অতি মধুর, সারগর্ভ অথচ সকরুণ—যে শিক্ষা বেদ-বেদান্তের সার, যাহা চৈতন্যজীবনের সাক্ষাৎ প্রকাশ, চরিতামৃতের মর্ম তাহা বুঝাইতে চাহিয়া দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ চাহিতেছে, আমরা বিদেশী শিক্ষার মোহে নেংটীপরা ভিখারী মনে করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছি। এইরূপে আমরা আমাদের দেশলক্ষ্মীকে পদে পদে অপমান করিতেছি। আমাদের আঙিনা হইতে সেই লক্ষ্মীর অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত পায়ের ছাপ মুছিয়া ফেলিয়া কতকগুলি বিলাতী কচু টবে সাজাইয়া রাখিয়া "আমার দেশ" গান ধরিয়া বিলাতী সুরে বিষম চিৎকার করিতেছি—এই আমাদের দেশহিতৈষিতা ও স্বদেশভক্তি।

আমাদের সঙ্গে অপরাপর দেশের তফাৎ এইখানে—আমাদের কুশিক্ষার দৃষ্ট-চক্ষে—দেশের যাহা বড় তাহা ছোট হইয়া গিয়াছে, ঠাকুর কুকুর হইয়াছে, যাহা কিছু নগণ্য, ক্ষুদ্র তাহাই দীর্ঘ তালতরুবৎ আকাশ স্পর্শ করিয়া উঠিয়াছে। আমরা রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া ডুবালকে লইয়া বড়াই করিতে শিখিয়াছি।

আমি আর একটি কীর্তনগায়কের নাম করিব, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র, জ্যোতিষচন্দ্র। জ্যোতিষের ভক্তি এত বড় যে কীর্তন গাহিতে যাইয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হন, তাঁহার ভক্তিপূর্ণ আবেশ ও মনভুলানো কীর্তনগানে শ্রোতৃবর্গ মাতিয়া উঠে। তিনি পুলিশের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। বীরভূমিতে থাকাকালে তিনি ময়নাডাল প্রভৃতি স্থান হইতে কীর্তন শিখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব-পদে মশগুল হইয়া আছেন, কাহারও কীর্তন শুনিতে যান না, কেবল গৌর দাসের নাম শুনিলে উন্মত্ত হইয়া রাতদিন গ্রাহ্য না করিয়া ছুটিয়া যান। গৌর দাসের বাড়ী নবদ্বীপ বঙ্গপাড়ায়। কিন্তু সে কলিকাতায় শ্যামবাজারে কানারাজার বাগানে সস্ত্রীক বাস করিতেছে।

এ দেশের এই রীতি যে, মহা-কবি যে কাব্য রচনা করিয়া গেলেন, তাঁহার ভাব সাধারণ্যে বুঝাইতে গায়কেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়, এইভাবে চণ্ডীমঙ্গল, রামমঙ্গলের উৎপত্তি। দেশটা এইভাবে একটা কাব্যের জগৎ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বাল্মীকি ধূর্জটির জটাবন্ধ হইয়া থাকেন নাই, সেক্সপীয়ারদিগকে ইংরাজ জাতি একরূপ শেল্‌ফে তুলিয়া রাখিয়াছেন, ক্বচিৎ কোন পরিশ্রমী পাঠক তাহার পাতা উলটাইয়া গবেষণা করিয়া থাকেন, কিন্তু গায়কেরা আমাদের দেশে ভগীরথের মত পল্লীর দুয়ারে দুয়ারে কাব্যগঙ্গাকে বহাইয়া দেন। সর্বাপেক্ষা হিন্দুর প্রাণ-ভাণ্ডারের অমূল্য হীরামাণিক লইয়া গৃহে গৃহে হরিলুট দিতেছেন কীর্তন-গায়কেরা। এই সকল চিরন্তনী মহাশক্তি, যাহা আমাদের সামাজিক জীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, যাহার অপর্যাপ্ত মহাদানে এই সমাজ সরস হইয়াছিল, যাহা হইতে কাব্য-ভাবের পুষ্পবৃষ্টি নিরন্তর হইয়াছে, শিক্ষাভিমানীর অবহেলা ও তাচ্ছিল্যে তাহার মূল পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে, এইরূপ গায়কসৃষ্ট সর্বজনীন শিক্ষা—সভ্যতার বিস্তার—প্রায় আর পৃথিবীর কোন স্থানে নাই। জাতীয় শিক্ষার এই মুকুটমণি কি খসিয়া পড়িবে? ইঁহারা কাব্যগুলিকে জীবিত রাখিয়াছেন, তাহাদের সর্বকালের করিয়া রাখিয়াছেন—চৈতন্যপ্রভুর শ্রীমুখ আরতির পঞ্চ-প্রদীপে আলোকিত করিয়া দেখাইয়াছেন, আজ জাতীয় শিক্ষা কি ইহাদিগকে বাদ দিয়া সফলতার চেষ্টা করিবে?

বাড়ীতে এই সময় সকলেরই অসুখ চলিতেছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দেও যে আমি খুব ভাল শোধরাইতে পারিয়াছিলাম, তাহা নহে। যদিও চলিতে ফিরিতে শক্তি হইয়াছিল, সে শক্তি হঠাৎ পাইতাম, আবার হঠাৎ খোয়াইয়া বসিতাম। এমন মাস যায় নাই, যাহাতে অন্তত সাত আট দিন একেবারে সামর্থ্যশূন্য হইয়া বিছানায় পড়িয়া না রহিয়াছি—কোন কোন মাসের প্রায় সব কটা দিনই রোগশয্যায় শুইয়া, জানালাপথে রাস্তা দিয়া লোকের আনাগোনা, গো-শকট-অশ্বশকটচালকের বিচিত্র মুখভঙ্গী ও মূক পশুর উপর কশাঘাত প্রত্যক্ষ করিয়াছি, পালকিবাহকের দুর্বোধ্য সমস্বরে উচ্চারিত উড়িয়া বুলি ও তালে তালে পা ফেলা নিতান্ত কৌতুকাবহ ব্যাপারের ন্যায় লক্ষ্য করিয়াছি। যখন খুব ভাল থাকিতাম, তখনও এক মাইলের

বেশী হাঁটিতে পারিতাম না। এই সময় আমার কন্যা ব্রজবালা দেবীর মৃত্যু হইল, সে দশ বৎসরে পা দিয়াছিল। আমি আমার ছেলেমেয়েদের একটা কন্ডাক্ট-রেজিস্টার করিয়াছিলাম, তাহাতে সে প্রায়ই প্রথম থাকিত। সে ছিল শ্যামাঙ্গী, কিন্তু এরূপ মৃদু-স্বভাবের মেয়ে, এরূপ ভীরু প্রায় দেখা যায় না ; সে একা ঘরে থাকিলে নিজের একটা ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিত; তাই ভাবি, যে আঁধার রাজ্যের নামে বড় বড় বীর আতঙ্কিত হয়, সেই রাজ্যে এই ভীরু শিশু একা কেমন করিয়া থাকিবে? সে ছায়ার ন্যায় আমার পাছে পাছে থাকিত, নিজের স্নেহশীল কচি হাত দুখানি দিয়া আমার শয্যা প্রস্তুত করিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে আমাকে হাওয়া করিত, আমার বস্ত্রাদি সাজাইয়া রাখিত। তাহার জন্য কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁহার পিতৃদেব নিঃস্বার্থভাবে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই দুই মহারথী প্রাণপণে যমরাজের সঙ্গে যুঝিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। ৪৯ দিন জ্বরে ভুগিয়া এক মঙ্গলবার অপরাহ্ণে সে চলিয়া গেল, প্রাণ-ত্যাগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে তাহার মায়ের দিকে স্নেহনির্ভরশীল পরম করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, সেই দৃষ্টি এখন পর্যন্ত আমাদের বুকে শেলের মত বিঁধিয়া আছে। সে নিবেদিতার স্কুলে পড়িত, তাহার আঁকা ছবি এবং লেখার খাতা নিবেদিতা একখানি সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি লিখিয়া আমায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সে টাইফয়েড জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক ঘরে যখন সে নিদারুণ জ্বরে ইহসংসারের দ্বার ডিঙাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল তখন অন্য ঘরে পাঁচ বৎসরের ছেলে বিনয় সেই ক্রূর টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পিতামাতার বিরল-সঙ্গের জন্য হাঁপাইতেছিল, উৎকট অবস্থায় ব্রজবালাকে ছাড়িয়া আমরা তাহার প্রতি মনোযোগী হইতে পারি নাই। তাহাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া বিনয়ের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলাম। কবিরাজ মহাশয় আর্তকণ্ঠে বিদায় গ্রহণ করিলেন, যাঁহাকে ধন্বন্তরী জ্ঞানে চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম তাঁহার উপর সেরূপ বিশ্বাস আর রাখিতে পারিলাম না। রাত্রে বিনয়ের অবস্থা এমন হইল যে সে রাত্রিতেই তাহাকে রাখা যায় কিনা সন্দেহের স্থল হইল। পাড়ার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কৃষ্ণবাবু দেখিতেছিলেন। রাত্রে তঁাহার নিকট হইতে বারংবার ঔষধ আনিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাত্রিকালে রোগী দেখেন না বলিয়া আসিতে রাজী হইলেন না। সে নিদারুণ রাত্রি কোনক্রমে কাটিয়া গেল ; পর দিন প্রত্যূষে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, বাড়ীর দ্বারদেশে একটি ক্ষুদ্র ঘট দেখিয়া অশ্রুতে মুখ ভাসিয়া গেল, সেই ঘটরূপে মৃত শিশু যেন আমার গৃহে তাহার শোকস্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে, পার্শ্বে একটা গলির মধ্যে দেখিলাম তাহার শয্যা, আমার পা যেন আর চলিতে চায় না। চোখের জল মুছিতে মুছিতে বড় রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, মিউনিসিপালিটি রাস্তার গাছগুলির বড় বড় ডাল কাটিয়া ছাঁটিয়া দিয়াছেন। নিতান্ত পরিচিত পথ অপরিচিতের মত বোধ হইল, জনপূর্ণ পথ শূন্য মনে হইল। চন্দ্রশেখরবাবুর বাড়ীতে যাইয়া শুনিলাম, তিনি রোগীর আহ্বানে মফঃস্বলে চলিয়া গিয়াছেন। আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল ; মনে হইল যেন ভগবান সব দিক হইতে আমায় ছাড়িয়া দিলেন, তখন চিরদিন যাহা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, তাহাই করিলাম, 'তুমি ছাড়িয়া দিতে পার, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলে কি লইয়া থাকিব?'

এই ভাবে নির্ভর করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম মনে মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম। বাড়ীতে আসিয়া দেখি, ভ্রাতা গিরীশচন্দ্র, সতীশ বরাট ডাক্তার মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। এখন সতীশবাবু কলিকাতার উত্তর ভাগের একজন নামজাদা ডাক্তার, কিন্তু তখনও তিনি ফুটিয়া উঠেন নাই। আমি গিরীশকে বলিলাম, 'ইঁহার উপর এই সঙ্গীন রোগীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি কি?' সতীশ বলিলেন, 'আমি এখন ঔষধ দিতেছি, ইহার পর ডি. এন. রায় কি প্রতাপ মজুমদারকে বৈকালে কি কাল আনা যাইবে।' আশ্চর্যের বিষয় ১৭ দিন যাবৎ যে জ্বর ১০৫°-এর নীচে নামে নাই, গত রাত্রে যে রোগীর ৫০।৬০ বার রক্ত দাস্ত হইয়াছে, এক মাত্রা ঔষধ সেবনে জ্বর ১০২ ডিগ্রীতে নামিয়া আসিল এবং পেটও অনেক ভাল হইল। তাহার পরদিন শ্যামপুকুরের বাড়ী ছাড়িয়া শিশু বিনয়কে অতি সাবধানে পালকিতে চড়াইয়া ফড়িয়াপুকুরের এক নূতন বড় রকমের ভাড়াটে বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। তখন ইহার ভাড়া ছিল ৩৫ টাকা, এখন বোধহয় ১২০ টাকা হইয়াছে।

সতীশের চিকিৎসায় বিশেষ উপকার পাওয়াতে তাঁহারই উপর চিকিৎসার ভার রহিল। কিন্তু ২।৪ দিন পরে ভয়ানক বিভীষিকা দেখিলাম। আমার স্ত্রীর কলেরা হইল, এবং আমার চতুর্থ পুত্র বিনোদ (তখন ২½ বৎসর বয়স্ক) হারাইয়া গেল। এদিকে নানা উদ্বেগে নিজ হাতে ষ্টোভে বার্লি জ্বাল দিতে গিয়া স্পিরিটের আগুনে রুগ্ন শিশু বিনয়ের মাথার চুল পোড়াইয়া ফেলিলাম ও আমার হাত পুড়িয়া গেল। বিনোদের জন্য হেম, গিরীশ প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ খুঁজিয়া হয়রান হইল। আমি শয্যাগত হইয়া পড়িলাম, কে দেয় পথ্য, কে দেয় ঔষধ? স্ত্রীর অবস্থা খারাপ হইতে চলিল, একমাত্র ভৃত্যটিকে গিরীশচন্দ্র প্রহার করাতে সে পলাইয়া গেল, এই একটা দিন চিরজীবনের স্মরণীয়। যখন বিপদ আসে তখন তাহা শিলাবৃষ্টি মত আসে। আমি নিরুপায় হইয়া কর্ণধারকে হাল ছাড়িয়া দিলাম,—"মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারি না"।

দুশ্চিন্তায় ও শোকে আমার স্ত্রী এতদূর অন্যমনস্কা হইলেন, যেন তাঁহার কলেরা সারিয়া যাইবার মত হইল। সতীশকে ছোট ভাইয়ের মত কাছে কাছে পাইয়াছিলাম, বিপদের দিন মনে হইতে যেমন কষ্ট হয় বিপদের সময়ের বান্ধবতার স্মৃতি আবার তেমনই মহার্ঘ। পুলিশে খবর গেল, নানরূপ সন্ধান হইতে লাগিল, ছয় সাত ঘণ্টার পর সন্ধ্যাকালে নিকারীপাড়ার ভোলা মিস্ত্রি বিনোদকে কোলে করিয়া উপস্থিত হইলে। আমি ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভোলাকে আলিঙ্গন দিলাম। আমার স্ত্রী আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। ভোলা মিস্ত্রি আমার বাড়ী তৈয়ারী করিতেছিল, সে বিনোদকে চিনিত। সে সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাইল, শিশু একটা ছড়ি হাতে নিকারীপাড়ার এক মুসলমানের বাড়ীর ঘরের দেয়ালে গা ঠেকাইয়া কাঁদিতেছে এবং অনেক লোক তাহাকে বেষ্টন করিয়া নানা প্রশ্ন করিতেছে, কিন্তু তাহার কান্না বোঝা যাইতেছে কথা বোঝা যাইতেছে না, আড়াই বৎসরের ছেলের ভাষার অর্থ কোন অভিধানে থাকার কথা নহে।

সতীশের চিকিৎসার ছয় মাস পরে বিনয় সারিয়া উঠিল। তাহার পর শ্রীচন্দ্রের ও সুধীরচন্দ্রের সেই পীড়া আক্রমণ করিল। অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে সতীশ তাহাদিগকে বাঁচাইয়া আমাকে ফেরৎ দিয়াছেন। টাইফয়েড রোগের চিকিৎসায়

তাঁহার মত কৃতী চিকিৎসক আমি দেখি নাই। আমার বাড়ী ছাড়াও তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বাড়ীতেও সতীশ সেইরূপ আশ্চর্যজনক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—শ্মশানযাত্রীকে মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিয়াছেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বিচারপতি মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে সামাজিক আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। নগেন্দ্রবাবু 'কায়স্থ কারিকা' লিখিলেন এবং তিনি এই আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ হইলেন। বিষয় সংক্রান্ত তাবৎ ব্যাপারে তাঁহার মত বোদ্ধা আমি খুব কম লোকই দেখিয়াছি, তথাপি আমার কথার উপর কেন জানি তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, তিনি সকল বিষয়েই আমার পরামর্শ লইয়া চলিতেন।

তিনি উপবীত গ্রহণ করিবেন কিনা এই লইয়া দোমনা ছিলেন। আমার পীড়াপীড়িতে শেষে পৈতা গ্রহণ করা ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ-সমাজে আমি এজন্য নিন্দিত হইব, আমি জানিতাম। কিন্তু যখন কেহ তাঁহার শুভ পথ কি, আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা নিজেকে অন্ধ করিয়া বন্ধুকে অশুভ পন্থা দেখাইতে প্রস্তুত হইতে পারি নাই। ব্রাহ্মণদের অনেকে যে এক সময় পৈতা সর্বদা গলায় পরিতেন না তাহার প্রমাণ আমি যথেষ্ট পাইয়াছি। এই নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই একজন নেপালবাসী করাতী একবার কাঠ চিরিতেছিল, সে খুব লোভনীয় বড় বড় রুটি তৈয়ারী করিত। আমি তাহাকে আমার জন্য সেইরূপ কয়েকখানি রুটি তৈয়ারী করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা কোন্ জাত?' সে বলিল, 'ব্রাহ্মণ', আমি তাহার পৈতা দেখিতে চাহিলে সে বলিল, 'আমার পৈতা নাই, আমি কাঠ চেরার কাজ করি, আমার পৈতায় কি দরকার? আমার কনিষ্ঠ সহোদর যজনযাজন করে, তাহার গলায় পৈতা আছে।' একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই কথায় আমার নিকট প্রকাশিত হইল। যদিও ক্ষুদ্র হউক এই পৈতাটার ভার দিনরাত্রি কাঁধে করিয়া রাখিবার দরকার কিছু ছিল না, দরকার না হইলে মানুষ একটা বাহুল্যের প্রশ্রয় দেয় না। পৈতার নাম যজ্ঞোপবীত। শ্রাদ্ধাদি কার্যের সময়, যজনযাজন উপলক্ষে ও যজ্ঞের জন্য এই ধর্মচিহ্নের ব্যবহার হইত। যাঁহারা পুরোহিত, তাঁহাদের পৈতা সর্বদা গলায় রাখার দরকার হইত, কিন্তু অপরাপর ব্রাহ্মণেরা সময়ে এই চিহ্ন ধারণ করিতেন, সময়ে ছাড়িয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ব্রাহ্মণ জাতিকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র-গৌরবে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা করিবার পর, ব্রাহ্মণমাত্রেরই উহা এদেশে অপরিহার্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পূর্বে পৈতা সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। এজন্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যে একসময় পৈতা ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা "পৈতা হাড়ি পৈতা লয়—বৈদিকে দেয় গাতি" এই পরিচিত প্রবাদবাক্যে পাওয়া যাইতেছে। বিজয় গুপ্তের মনসাদেবীর ভাসানে মুসলমানকৃত অত্যাচার বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—"বাছিয়া ব্রাহ্মণ লয় পৈতা যার কাঁধে। প্যায়াদাগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে।" ইহা দ্বারা দেখা যায় যে তাহারা শুধু সেই সকল ব্রাহ্মণকে ধরিয়াছিল, যাহাদের গলায় পৈতা ছিল। সুতরাং সকল ব্রাহ্মণের গলায় পৈতা ছিল না। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে দৃষ্ট হয় ব্রাহ্মণ রাজসভায় আহূত হইলে উত্তরীয়ের ন্যায় পৈতাগাছাও পরিতেন, তাহা তাঁহার গললগ্ন থাকিত না। লোচন-

দাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' দেখা যাইতেছে, চৈতন্যপ্রভু পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের প্রাক্কালে স্বীয় পৈতাগাছা কণ্ঠ হইতে তুলিয়া তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ উপহার দিয়া গেলেন। সুতার পৈতা ছাড়া আর ধরা—এটা শুধু সামাজিক ব্যাপার। আমি নগেন্দ্রবাবুকে বলিলাম, 'শুনিয়াছি, উত্তর-পশ্চিমের লালাকায়েতেরা আপনাদিগকে কায়েত বলিয়া স্বীকার করেন না। বাংলার ব্রাহ্মণাদি সমস্ত জাতিকে তাঁহারা ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড জাতিগুলি যদি এক হইতে পারে সেটাও যে জাতীয় ঐক্যের পক্ষে একটা মস্তবড় লাভ। যদি উপবীত গ্রহণ করিলে লালাকায়েতেরা আপনাদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করেন তবে সংখ্যাবলে আপনারা বলীয়ান হইয়া উঠিবেন। আমাদের এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সমাজের কোন এক শ্রেণী যদি এই ভাবে বড় হয় তাহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে। দ্বিতীয়ত কে কোন্ জাতি কে জানে? সমাজে বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য ব্রাহ্মণের শিরার রক্ত পরীক্ষা করিলে উহা অবিমিশ্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। যখন আদম হাল চষিতেন এবং হেবা তাঁত বুনিতেন, তখন কে ছিল ব্রাহ্মণ আর কে ছিল শূদ্র! কিন্তু এখন যদি আপনারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন তবে শুধু নামটির জোরে ক্ষাত্রতেজ আপনাদের সমাজ-দেহে কিছু না কিছু সঞ্চারিত হইবে, এবং আচার-শুদ্ধতার দিকেও একটা লক্ষ্য পড়িবে এদিক দিয়াও তো মস্তবড় লাভ।'

আমার উৎসাহে নগেন্দ্রবাবু উপবীত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ঠিক পৈতা দেওয়ার মুখে পুরোহিতেরা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পলাইয়া গেলেন। নগেন্দ্রবাবুর সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার মুখখানি ভয়ে ও লজ্জায় ছোট হইয়া গেল দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যথিত হইলাম। আমি রাস্তা হইতে কোটালিপাড়ার বিখ্যাত চৌধুরী বংশোদ্ভব রামকৃষ্ণ পণ্ডিতকে গামছা জড়াইয়া বলপূর্বক ধরিয়া আনিলাম এবং যে পর্যন্ত নগেন্দ্রবাবুর উপবীত কার্য শেষ না হইল, সে পর্যন্ত তাঁহাকে চোখের আড়াল হইতে দেই নাই। তিনি বারংবার পলাইবার জন্য এ দরজা সে দরজায় ঢু মারিতেছিলেন। এই পৌরোহিত্যের দরুণ বৈদ্যদের যাঁহারা যাঁহারা তাঁহাকে প্রণামী দিতেন, তাঁহারা তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ চৌধুরী এইজন্য বৎসর বৎসর আমার নিকট খেসারত আদায় না করিয়া ছাড়িতেন না।

ইহার পর অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্রের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবুর কন্যার বিবাহ আমিই স্থির করিয়া দেই। অক্ষয়বাবু ছিলেন পৈতাবিরোধী, আমি তাঁহাকে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া এই বিবাহে সম্মত করাইয়াছিলাম। কিন্তু বিবাহ-বাসরে শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয়ের আনীত ব্রাহ্মণেরা নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কিছুতেই খাইবেন না স্থির করিয়া আমার বাড়ীতে আসিয়া জলযোগ করিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইলাম এতকাল শূদ্রদিগের পৌরোহিত্য করিয়া তাঁহারা হীন কাজ করিয়াছেন, এখন কায়স্থেরা যখন ক্ষত্রিয় ও উপবীতধারী হইলেন, তখন তাঁহারা অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী হইয়া পবিত্র হইবেন। ইহাতে তাঁহারা কেন বিরক্ত হইতেছেন? এই সকল কথায় তাঁহারা প্রীত হইয়া নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাইয়া আহারাদি করিলেন।

বৈদ্য-সমাজ আমার উপর বিরক্ত হইলেন, আমি বৈদ্যসভার সম্পাদক ছিলাম। কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি বলিলাম, 'আমাদের এই সামাজিক পদমর্যাদার

উদ্ধারকল্পে যে জাতিই যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণকর, পরন্তু সমস্ত হিন্দু সমাজের পক্ষেও তাহা শুভ। আমরা ভাই ভাইয়ের মত পরস্পরকে ধরিয়া তুলিব, কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে আমাদের অনিষ্ট কি? ঈর্ষাদ্বেষে সমাজ নষ্ট হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই ক্ষেত্র হইতে যথাসাধ্য কাঁটা তুলিয়া ফেলিব, কাঁটাবনে জল সেচন করিয়া তাহা পোষণ করিব না। পরস্পরের কপালে পরস্পরে গৌরব-চন্দনের ফোঁটা আঁকিয়া প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইব। আমি এই বিষয়ে অনুকূলতা দেখাইয়া কি অন্যায় করিয়াছি, বুঝাইয়া দিন।'

কিন্তু ইহার পরে বিশ্বকোষে 'বৈদ্য' শব্দ লইয়া বিদ্বেষপূর্ণ একটা কুৎসাকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধপ্রকাশের প্রায় ছয় মাস পরে উহা আমি প্রথম দেখিলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত শুনিলাম, ঐ প্রবন্ধটি আমি লিখিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন। বৈদ্য সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আমাকে কায়স্থদের অনুকূল জানিয়া এমন একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অমূলক কথাও বিশ্বাস করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে ফুল ছড়াইলে প্রতিদানে ফুল পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে কপালে শূল ঘটে, এই পৃথিবী বড় বিষম স্থান।

অক্ষয় সরকার মহাশয়ের সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষার পরীক্ষকতার সাহচর্যে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলাম। বিরাট বপু, শ্বেত দাড়ি, যেন মনুষ্যজগতের পাহাড়-পর্বত, অল্পভাষী, কিন্তু যখন সাহিত্যিক প্রসঙ্গে কথা বলিতেন, তখন দুইটি চক্ষু যেন প্রতিভায় জ্বলিয়া উঠিত। বঙ্কিমবাবুর প্রিয় বন্ধু ইনি ও চন্দ্রনাথ বসু, উভয়ের রচনাই এক সময় বঙ্গদর্শন অলংকৃত করিয়াছে। যখন বাঙালী ইংরাজী সাহিত্যের অনুরাগে অন্ধ হইয়া দেশীয় পুথিগুলিকে তামাক-পাতার মত অশ্রদ্ধেয় মনে করিত, তখন ইনি ইংরাজী সাহিত্যানুরাগী হইয়াও তারতম্যে বাংলা গীতি-কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন. ইনি কবির গানের 'হাসি হাসি যখন সে আসি বলে। সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে' প্রভৃতি চিত্রের বঙ্গীয় কুল-বধূর সলজ্জ গন্ডের রক্তিমা আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন। ইংরাজী কবিদের কাছে যে বাংলার কবিওয়ালা শুধু দাঁড়াইতে পারে তাহা নহে, তাঁহাদিগকে এমন বীণার সুর শুনাইয়া দিতে পারে যাহা 'বে অব বিস্কে' কিংবা 'ইংলিশ চ্যানেলে'র পারে কখনও বাজে নাই, এই কথা অক্ষয়বাবু সর্বপ্রথম বুঝাইয়াছিলেন। চন্দ্রবাবু সংস্কৃত-সাহিত্যের দিক দিয়া হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবু সুকোমল চিত্তবৃত্তির খেলা খেলিয়া বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যটি নূতন করিয়া আধুনিক গদ্য-ছন্দে নির্মাণ করিয়াছিলেন। আর্য-দর্শনের যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী ক্ষাত্র তেজ, বাংলায় আমদানী করিয়া পাশুপত অস্ত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। আমি ইঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। গত যুগ ইঁহাদের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে—সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য এ যুগের লেখকগণের মধ্যে নাই। ইঁহাদের কাছে বসিলে, কথায় মুগ্ধ হইতে হইত। ইঁহারা বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন—ইঁহাদের তুলনায় এখনকার লেখকেরা হালকা. সে পাণ্ডিত্য, সে পুরুষোচিত তেজ, সে গাম্ভীর্য এখন সাহিত্যক্ষেত্রে পাওয়ার আশা বৃথা। তাঁহারা ছিলেন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা, পর্বত ভাঙিয়া ইঁহারা পথ

করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাই এখনকার নির্ঝর-নিনাদ ও মৃদু-তরঙ্গের গান আমরা শুনিতেছি। চন্দ্রশেখরবাবু এক দিন প্রায় তিন-ঘণ্টাকাল তাঁহার 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' লেখার ইতিহাস আমাকে বলিয়াছিলেন। সে যে কি উন্মাদনাময় ইতিহাস! মনে হইয়াছিল যেন বাল্মীকির কাব্য কিংবা নারদের বীণা-ধ্বনি শুনিতেছি। কি করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যের পথে আসিলেন, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে পরিচিত হইলেন, স্ত্রীহারা হইয়া আহারনিদ্রাশূন্য বিরহী যক্ষের মত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলেন—সমস্ত বলিয়াছিলেন, তেমন কথার মোহিনী অল্পই শুনিয়াছি। চন্দ্রশেখরবাবু শুধু নহেন, বঙ্কিমযুগের প্রায় সকলেই এইরূপ কথা ও পাণ্ডিত্য দ্বারা বিস্মিত, স্তব্ধ এবং মুগ্ধ করিতে পারিতেন। একালের লেখকেরা মেয়েলী ছন্দে কথা কহেন, মেয়েলী ঢঙ্গে কোঁকড়াইয়া চুল গ্রীবার উপর ফেলিয়া দেন, কথার চাতুরী ও বাক্‌ছল দ্বারা মনোরঞ্জন করেন, কিন্তু এই নারায়ণী সৈন্যের সুদর্শনচক্রের প্রভাব স্বীকার করিয়াও সেই গাণ্ডীবীদিগকে মনে পড়ে, যাঁহারা ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলে অর্ধ বিশ্ব চমৎকৃত হইত এবং অক্ষৌহিণী সৈন্য শুধু ধনুর টংকারের রব শুনিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাইত।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ফরিদপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া আমি কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে অন্ধ কবি হেমচন্দ্রকে দেখিতে গিয়াছিলাম। হেমচন্দ্রের কবিতার প্রতি বাল্যকালে আমাদের যে অনুরাগ ছিল—এখনকার ছেলেদের তাহার কিছুই নাই; শৈশবে মাণিকগঞ্জ স্কুলে আমরা তাঁহার "সুদূরে পশ্চিমে ছাড়িয়া গান্ধার, ছাড়িয়া পারস্য আরব কান্তার" প্রভৃতি কাব্য আবৃত্তি করিতাম। পূর্ণবাবু মাষ্টারমহাশয় সেগুলি আমাদের তরুণ কণ্ঠে গানের সুরে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। যৌবনে "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" প্রভৃতি পদ আওড়াইয়া আমরা নিরাশ প্রণয়ী সাজিয়াছি। কলেজে পড়ার সময় দশমহাবিদ্যার "রে সতী রে সতী, কাঁদিল পশুপতি—পাগল শিব প্রমথেশ" প্রভৃতি ছন্দাত্মক কবিতা লঘু-গুরু মাত্রা ঠিক করিয়া আবৃত্তিকৌশল দেখাইয়াছি। তাহার পর কুমিল্লায় থাকিতে বরদাচরণ মিত্র উত্তেজিত ও বিস্ময়াভিভূতভাবে হেমবাবুর 'বৃত্রাসুর বধ' কাব্যের কবিত্ব ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইতেন। তাঁহার মতে 'বৃত্রসংহার' কাব্যের মত কাব্য বাংলায় হয় নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের সঙ্গে তিনি তুলনামূলক সমালোচনা করিতেন, এবং পদে পদে হেমকবির মহাকাব্যের সৌন্দর্য আবিষ্কার করিতেন। বৃত্রাসুরের গৌরব লঙ্কেশ্বরের নাই এবং শচীর বিরাট-চিত্রের নিকট প্রমীলা সীতা ও মন্দোদরী হীনপ্রভ, হেমকবি অতি অল্প কথায় খুব বড় বড় চিত্র ফলাইতে পারেন, নাট্য-শিল্পের যে কৌশল তিনি দেখাইয়াছেন, তাহার নিকট মেঘনাদবধ দিবাপ্রদীপবৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে, এই ছিল তাঁহার মত। নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় আমাদের শিক্ষক ছিলেন, তিনি দশ-মহাবিদ্যাকে মানবসমাজের ক্রমোন্নতির আধ্যাত্মিক আলেখ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই বড় বড় সমালোচকগণের মতকে যাঁহার কাব্য অনুকূল ও বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল তাঁহার কবিপ্রতিভা অবশ্যই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার সামগ্রী।

তখনও সাহিত্যিক জগতের রবি মধ্যাহ্নগগনে উদিত হইয়া অপরাপর জ্যোতিষ্ক-

মণ্ডলীকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ করিয়া দেন নাই। তখনও হেমবাবুর যশ ডঙ্কানিনাদে বিঘোষিত হইত, "বিংশতি কোটি মানবের বাস" শুনিলে বঙ্গযুবকের শিরায় রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিত।

এই কবিবরকে দেখিতে উৎসুক হইয়া আমি অসুস্থ শরীরেও একখানি গাড়ী করিয়া সঙ্গিদ্বয়সহ খিদিরপুর রওনা হইলাম। তখন শীতকাল, বেলা দুইটা কি তিনটার সময় প্রকাণ্ড বাপীনীরবিধৌত, মধ্যাহ্নরৌদ্র-স্পৃষ্ট মধুর শীতোষ্ণ বায়ু-প্রবাহে সুখানুভব করিয়া একখানি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখীন হইলাম। পুকুরটির উত্তর পাড়ে বাড়ীটি চিত্রপটের ন্যায়, বড় হইলেও বাড়ীখানি যেন অনাদরে শ্রীহীন হইয়া আছে, গৃহস্বামীর দৃষ্টি নাই বলিয়াই এই দুর্গতি, বুঝিতে পারিলাম। বেশী লোকজন নাই, আমরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। সম্মুখের হল-ঘরটি হইতে পুকুরটি বড় সুন্দর দেখাইল, ঘরখানি যেন দক্ষিণানিল উপভোগ করিবার জন্য সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। একটা মলিন টেবিল ও দুই চারিখানি চেয়ার পূর্ব কোণে, এবং হলের অপর প্রান্তে একখানি সামান্য তক্তপোষ, তাহার উপরে তোষক ও চাদর অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা এত মলিন ও ছিন্ন যে কবি-রাজের চক্ষু থাকিলে তিনি তাহা কখনই ব্যবহার করিতেন না, মনে হইল তাঁহার তো চক্ষু নাই এবং তাঁহাকে দেখিবারও কোন চক্ষু নাই।

কবিবর সেই ম্লান শয্যার উপর খাটো একখানি মলিন কাপড় পরিয়া বসিয়া ছিলেন, শ্যামবর্ণ, ঈষৎ স্থূলাকৃতি। সুরেশবাবু মহিমঠাকুরের পরিচয় দিলেন। ত্রিপুর-রাজের ষ্টেট হইতে কবিবরের জন্য একটা বৃত্তি মঞ্জুর হইয়াছিল, এজন্য তিনি মহিমকে ধন্যবাদ দিলেন; আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'এর-ও তো আমার মত ২৫ টাকার একটা বৃত্তি গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন!' এই বলিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া শেষে বলিলেন, 'আপনারা কেন আসিয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।' এই কথা শুনিয়া তাঁহার ঠোঁট দুখানি কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হইয়া গেল, এবং অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, 'কি দেখ্‌তে এসেছেন?' এই বলিয়া আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিলেন না, প্রায় ৫ মিনিট কাল বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে আর আলাপ করিতে পারিলাম না। কিন্তু 'কি দেখ্‌তে এসেছেন' কম্পিত কণ্ঠের এই উক্তি ও অন্ধ চক্ষুর সেই অজস্র অশ্রু অনেক কথা অতি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিল, বুঝিলাম যে তাজমহল ভাঙিয়া গেলে তাহার চূর্ণ-বিচূর্ণ প্রস্তর দেখিতে আমরা আসিয়াছি রাজরাজেশ্বর পথের ভিখারীর মত রাস্তায় দাঁড়াইয়া হাত পাতিয়া মুষ্টি ভিক্ষা লইতেছেন, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি, শীতকালে পত্রসার শেফালিকাতরুকে দেখিতে আসিয়াছি। সে করুণ কাহিনী কথায় বুঝাইবার নহে, অশ্রুই তাহার একমাত্র ভাষা। এই অশ্রুতে আমরা সব কথা বুঝিলাম। কবিবরের হৃদয়ের অন্তস্তলের ব্যথা করুণভাবে, সম্পূর্ণভাবে আমাদের কাছে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। আমরাও সাশ্রু-নেত্রে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। সেই করুণ দৃশ্য এখনও ভুলিতে পারি নাই। হেম-কবির যত কাব্য পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে তাঁহার জীবনের এই শেষ পত্রের ন্যায় কোনটিই বোধ হয় এত মর্মস্পর্শী নহে।

১৯১০ সনে আমি আবার কর্মঠতা ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। কত যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহা মনে নাই। প্রবন্ধ লিখিয়া যাহা পাইতাম, প্রধানত তাহাতেই সমস্ত সাংসারিক খরচপত্র চলিয়া যাইত। প্রতি প্রবন্ধের জন্য ২০৲ হইতে ৫০৲ পর্যন্ত পাইয়াছি। নিতান্ত ছোট প্রবন্ধ ১০৲।১২৲ টাকায়ও লিখিয়াছি। 'দাসী', 'প্রদীপ' 'প্রবাসী', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য', 'বামাবোধিনী' প্রভৃতি কত পত্রিকায় যে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহা এখন স্মরণ নাই। ভগবান যখন আমাকে একটু স্বাস্থ্যের মুখ দেখাইয়াছেন তখন কখনও আমি বসিয়া থাকি নাই।

কুমিল্লায় ১৮৯৬ সনে যখন আমি উৎকট রোগ-শয্যায় পড়িয়াছিলাম, এবং যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন অর্থাৎ ২৫ বৎসর পূর্বে, আমি রবীন্দ্রবাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহা একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া আমি অনেক দিন রাখিয়া দিয়াছিলাম। ছোট একখানি কাগজ দোভাঁজ করিয়া মুক্তার মত হরফে কবিবর লিখিয়াছিলেন, সেই প্রত্যেকটি হরফ আমার নিকট মুক্তার মত মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর, সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমবার কলিকাতায় আসিয়া একটি বৎসর ছিলাম, তখন আমি শয্যাগত, রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। ফরিদপুর থাকাকালে তিনি তাঁহার 'ক্ষণিকা' আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, আমার মন্তব্য সম্বলিত চিঠির উত্তরে বাংলা ১৩০৭ সনের ৩০শে ভাদ্র তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরে যে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠইয়াছেন, সে জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন। কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম। যখন আপনার খবর পাইলাম, তখন আর সাক্ষাৎ করিবার সময় ছিল না।' তাহার পর তিনি আমাকে শিলাইদহ যাইতে আমন্ত্রণ করিয়া চিঠির উপসংহার করিলেন।

এই সময় হইতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে পত্রব্যবহার চলিয়াছিল। ১৯০১ সনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া আমি জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। রবিবাবু শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ লেখক; অপরাপর লেখকের কাব্য পড়িলেই তাঁহার মধ্যে যাহা ভাল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত লেখা পাঠ করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক জানিবার বাকী থাকে; তিনি রূপ দিয়া চক্ষু ভুলান, "গুণে আঁখি ঝরে।" কণ্ঠস্বরে মিষ্টত্ব; বন্ধুর সহৃদয়তা ও ঋষিতুল্য ধর্মভাব দিয়া মন হরণ করেন, তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার পর অন্য সমস্ত প্রসঙ্গ ছায়ার ন্যায় মন হইতে চলিয়া যায়, এবং ছবির মত তিনি সমগ্র মনটি দখল করিয়া বসেন। কত দিন আমার ন্যায় শ্রোতার সম্মুখে সারাটি দিন বীণানিন্দিত সুরে তিনি গান গাহিয়া কাটাইয়াছেন, কতদিন সাহিত্যধর্ম সমাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে; তিনি নিত্যই নূতন হইয়া দেখা দিয়াছেন। রূপ ছন্দ ও চিত্তহারী নানা গুণে তিনি আমার মত বহু লোককে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রবাবু ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে কখনই লোকমতকে গ্রাহ্য করিয়া লন না— ঠাকুরবাড়ীর সর্বত্র একটা মৃদু-মধুর সৌজন্য আছে, পাছে পরের মনে আঘাত লাগে,

এজন্য ঐ বাড়ীর কেহ কোন ভদ্র ব্যক্তির কথার প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু রবিবাবু অতি মিষ্টভাষী হইয়াও অন্যায় কথার প্রতিবাদী, যাহা তিনি ভাল বলিয়া মনে করেন না, তাহা তাঁহার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ জোরে প্রতিবাদ করেন। গল্পচ্ছলে নানা কথা কহিবার সময়ও তাঁহার সেই প্রখর স্বাতন্ত্র্য সর্বদা জাগরূক থাকে। তাঁহার স্নিগ্ধ শ্লেষ ও বাক্‌চাতুরী অনেকেই টের পাইবেন, যাহাকে ইংরাজীতে pun বলে, তিনি কথাবার্তায় অলংকারশাস্ত্রের সেই ধারাটি সর্বদা ব্যবহার করেন। তাঁহার সম্পাদকাতার সময় শৈলেশ তাঁহাকে না জানাইয়া নিজেকে সহসম্পাদক বলিয়া বঙ্গদর্শনের মুখপত্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, 'শৈলেশ তো আপনার সহ-সম্পাদক হইয়াছেন।' তিনি বলিলেন, 'সহ নহে দুঃসহ'। কোন এক লোকের নাম ছিল—কয়েকটি কড়ি. বোধহয় তিনকড়ি টিনকড়ি হইবে. সেই ব্যক্তির মতামত লইয়া কথা হইতেছিল, কেহ কেহ তাহার মতটির উপর বেশী মূল্য দিতেছিলেন। রবিবাবু বলিলেন, 'উ'হার বাপ মায়ের চাইতেও কি আপনারা উ'হাকে বেশী জানেন? তাঁহারা তো উহার প্রকৃত মূল্য ধার্য করিয়া রাখিয়াছেন।' বহুকাল হইতেই তাঁহার দর্শনকামী ব্যক্তিগণ বাড়ীতে ভিড় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিছুতেই উঠিতে চান না, স্নানের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তথাপি বসিয়াই থাকিবেন। একদিন ঐরূপ এক ব্যক্তি বসিয়া ছিলেন, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ই'হার নাম কি?' আমি বলিলাম "বসন্ত" তিনি বলিলেন—'হয়েছে! "বসন্তকে" উঠাবেন কি করে?' কথার এই চাতুরী তিনি মিষ্টভাবে, নিপুণভাবে এত বহুল পরিমাণে দেখাইয়া থাকেন, যে, তাহাতে বাংলা ভাষার প্রতি শব্দটির প্রতি যে তাঁহার সর্বদা লক্ষ্য তাহা টের পাওয়া যায়।

আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি 'চোখের বালি' লিখিতে শুরু করেন। একবার তিনি আমাকে বোলপুরে যাইতে সাদর আহ্বান পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন—(১২ই বৈশাখ, ১৩০৯), 'আপনি এবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কান্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই বলিয়া বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদকধর্মসংগত হইবে কি না. তাহা এখন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহা হউক আর বিলম্ব করিবেন না। পুঁথিপত্রসহ লুপমেলের গাড়ীতে চড়িয়া বসুন, তাহার পরে আর আপনাকে কে নিবারণ করিতে পারে?' কিন্তু 'চোখের বালি' তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আমাকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। 'গোরার'ও অনেকটা ছাপা হইবার পূর্বে আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। প্রেম খুব বড় বড় তুলিতে মোটা মোটা রেখায় আমাদের সাহিত্যে ইতিপূর্বে আঁকা হইয়াছে। খুব গভীর ভাবের সঙ্গে অসামান্য সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় বৈষ্ণব কবিরা দিয়াছেন, কিন্তু বিনোদিনী প্রভৃতি চিত্রের মধ্যে যে খোদকারি আছে, তাহা একান্ত অভিনব, এ যেন ঢাকই সেকরার তারের কাজ, প্রেম জিনিসটাকে কারুকার্যের এমন নিপুণ সৌন্দর্য দিয়া তিনি আঁকিয়াছেন, যে, তাহা চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। প্রেমিকার চুলের গন্ধ, পঠিত পুস্তকের উপর সুগন্ধ তেলের দাগ, এমন মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

কোমল রেখা—স্বপ্নের জিনিস, যেন অলক্তকের আল্‌পনার মত, তাহা বিধিসৃষ্ট নারীকে নূতন করিয়া দেখাইতেছে।

এই শিল্পকলা বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। আমি 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', ও 'গোরা' পড়ি নাই, রবিবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, তেমন আগ্রহে ইহার পূর্বে কোন বই শুনি নাই। কবির লেখা গীত হয় নাই, বাদিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি বীণাবেণুর কথাই সর্বদা মনে জাগাইয়া দিয়াছে—যেন বীণাপাণি নূপুর-শিঞ্জিত পদে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন, এই পুস্তকত্রয়ের নর্তনশীল গদ্যছন্দের গতি আমার নিকট তেমনই বোধ হইতেছিল। আমি নৈতিক আদর্শের কথা আনিব না, অপেক্ষাকৃত অল্পদরের লেখকরা যখন রসের নামে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয় তখন সে রসের নাম হয় বীভৎস। কিন্তু প্রকৃতই যদি কেহ সুরসিক হন, তবে তিনি মানুষের মনটা লইয়া পুতুল খেলা খেলিতে পারেন—তাহাও কি আবার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে?

রবিবাবু দয়া করিয়া অনেকবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, একবার আমার ৫ বৎসরের পুত্র বিনয় তাহার লম্বা চুলগুলি লইয়া মাথাটা রবিবাবুর পায়ের উপর রাখিয়া আব্দার ধরিয়া ছিল, 'আমায় বোলপুরে লইয়া যাও'। রবিবাবু তাহাকে বড় হইলে লইয়া যাইবেন, এই আশ্বাস দিয়াছিলেন। সে কথা এখনও তাঁহার মনে আছে, ঐ ছেলেটির কথা অনেকবার তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন।

রবীন্দ্রবাবুর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ তাঁহার ভগবৎপ্রীতি; ইহাই তাঁহার 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'খেয়া' প্রভৃতি কাব্যের ছত্রগুলিকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে। এই ভগবৎপ্রীতি তাঁহাকে মনুষ্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেয় নাই, বরং সমস্ত মনুষ্যসমাজ, এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য ঘনীভূত করিয়া আনন্দরস-সিক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহা শুধু তাঁহার কবিতার কথা নহে, ইহা শুধু প্রতিভায় স্ফুরিত আকস্মিক আলো নহে, ইহা তাঁহার জীবনের কথা, তাঁহার সাধনা। তাঁহার বহু চিঠিপত্র আমার নিকট আছে; এই পত্রগুলিতে অনেকের মধ্যেই সেই সাধকের তপস্যা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একবার কোন লোক বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ক্রমাগত বিদ্বেষের বিষ পত্রিকায় বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, (২০শে বৈশাখ ১৩০৯), 'পত্রে আপনি যে কথার আভাস মাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন, সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে। লেখাটা আমি পড়ি নাই—আমার দৃষ্টিপথে আনিতে নিষেধ করিয়াছি, কারণ লেখকজাতির অভিমান সহজেই আঘাত পায়, অথচ এরূপ আঘাতের মধ্যে লজ্জার কারণ আছে। নিজেকে সেই গ্লানিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি কথিত বা লিখিত গালিমন্দের কথা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বিদ্বেষে কোন সুখ নাই, কোন শ্লাঘা নাই, এই জন্য বিদ্বেষ্টার প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে, আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি। জীবনপ্রদীপের তেল তো খুব বেশী নয়, সবই যদি রোষে দ্বেষে হু হু শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি, তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব?'

এই ক্ষমা ও উচ্চ প্রীতির ভাবই, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কেও রবীন্দ্রবাবুর মনে জাগিয়াছিল। তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন (১৩ই কার্তিক ১৩১৩), 'আমার

কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া বাদপ্রতিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বৃথা সকল জিনিসকে বাড়াইয়া দেখিয়া নিজের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধের সৃষ্টি করি। জগতে আমার রচনা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নহে, তাহার সমালোচনাও তথৈবচ। তা ছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ মত থাকে থাক্ না; সেই তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে নাকি? আমার লেখা দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাল লাগে না, কিন্তু তাঁহার লেখা আমার ভাল লাগে, অতএব আমিই জিতিয়াছি—আমি তাঁহাকে আঘাত করিতে চাই না।'

আমার ছেলে অরুণকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলাম। তাহাকে লইয়া রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার একটা মনান্তর হইয়াছিল। দোষ হয়ত আমারই ছিল, কিন্তু কোন কোন চক্রীলোক নানা অমূলক কথা আমার সম্বন্ধে প্রচার করিয়া এই মনোমালিন্যটা বাড়াইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু চিরকালই বন্ধুবৎসল, উদারপ্রকৃতি, তাঁহার মনের দুর্যোগ শীঘ্রই কাটিয়া যায়। এতদুপলক্ষে তিনি আমাকে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। উত্তেজনার সময় কেহ নিজের দোষ স্বীকার করিতে চান না, কিন্তু রবিবাবুর দেব-প্রকৃতি সেই উত্তেজনার সময় কিরূপ বিনয় ও ক্ষমা-ভূষিত হইয়া আমার চক্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা সেই পত্রের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি. 'যদি অজ্ঞানে অথবা ভ্রমক্রমে আপনার মনোবেদনার কারণ হইয়া থাকি, তবে শত সহস্রবার আপনাকে প্রণিপাত করিয়া আপনার মার্জনা ভিক্ষা করি। আমার দোষ যথেষ্ট আছে, সেজন্য সংসারে আমি প্রশ্রয় পাই নাই। প্রত্যাশাও করি নাই। আপনাদের সকলের কাছে পরমেশ্বর আমার মাথা হেঁট করিয়া দিন, আমাকে এমন জায়গায় দাঁড় করান, যেখানে আপনাদের কৃপাপাত্র হইতে পারি, কিন্তু চিরদিন আপনাদের অসহ্য মনস্তাপের কারণ হইয়া আপনাদিগকে অন্যায়ে উত্তেজিত করিতে থাকিব, ইহাই না ঘটে, এই আমার অন্তরের প্রার্থনা। আমি রাগ করিয়া আপনার সঙ্গে বিবাদ করিব না—আমি নত হইয়া আপনার বিচার গ্রহণ করিব।'

ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট এই মহান নতি কত বড় মহত্ত্বের পরিচায়ক! তাঁহার সুদীর্ঘ অনেক পত্র আমার কাছে আছে—অনেকগুলি হারাইয়া গিয়াছে, সর্বত্রই তাঁহার উদারতা ও প্রীতি প্রতিবিম্বিত। যিনি খুব বড় রাজ্যের আবহাওয়া পাইয়া থাকেন, শুধু তিনিই এই ছোট রাজ্যে সেই উচ্চদরের বার্তা বহন করিয়া আনিতে পারেন।

ইহার পর বহুবৎসর চলিয়া গেল। ঘটনাচক্রে আমি তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার নিকট সর্বদাই উৎকৃষ্ট চিন্তার প্রেরণা—স্বর্গীয় শুভবার্তার ইঙ্গিত। আমি প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যসমূহ হইতে একটা বড় সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করিব, এইজন্য তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং আমাকে লিখিয়াছিলেন, (১৬ই কার্তিক, ১৩১৩), 'প্রাচীন কবিতাসংগ্রহের যে প্রস্তাব আপনার নিকট করিয়াছি, তাহা একান্তই প্রয়োজনীয় এবং আপনি ছাড়া আর কাহারো দ্বারা সাধ্য নহে। স্থির করিয়াছিলাম, কয়েক মাস আমিই আপনাকে সাহায্য করিব, কিন্তু এখানে (বোলপুরে) নূতন ছাত্র ও রোগীদের জন্য ইমারত ঘর তৈরি করিতে হইতেছে,

তাহাতে বিস্তর খরচ পড়িবে। অতএব এখন কিছুকাল আমার সম্বল কিছুই থাকিবে না। তাহার পর বহু ব্যয়ে বই ছাপাই এমন শক্তি আমার নাই। ত্রিপুরা হইতে অর্থসাহায্য সম্প্রতি কোন মতেই প্রত্যাশা করা যায় না। নাটোরকে টাকার কথা বলিতে আমি কুণ্ঠিত। যদি গগনেরা এই ভার লইতেন, তবে বড় সুখের হইত।'

তাঁহার এস্টিমেট ছিল লক্ষ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় খুব বৃহদাকারে পুস্তক না ছাপাইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রভাবে 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহারই পত্র-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯১৪। রবীন্দ্রবাবু আমাকে কত সম্মান দিতেন তাহা ব্যোমকেশের নিকট যে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যাইবে। উহা ১৯০৫ সনের ৭ই মার্চ তারিখের লেখা। তিনি 'সফলতার সদুপায়' নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে লিখিতেছেন, 'মিনার্ভার চেয়ে কার্জেনে বেশী জায়গা আছে। আমার প্রবন্ধটির নাম 'সফলতার সদুপায়'। সভাপতি মেজদাদা হইলে কোনমতেই চলিবে না। বরং নাটোরের মহারাজা হইলে ভাল। নতুবা হীরেন্দ্রবাবু, ত্রিবেদী মহাশয়, বা দীনেশবাবুকে ধরিবে।' ব্যোমকেশ আমাকে ধরিতে আসিয়া চিঠিখানি আমার নিকট ফেলিয়া গিয়াছিল, তদবধি উহা আমার নিকট আছে। আমি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম, সুতরাং রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার সভায় সভাপতিত্বের গৌরব পাইলাম না। তখনও আমি ইংরাজী কোন পুস্তকই রচনা করি নাই, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লিখিয়া সাহিত্যরাজ্যের প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম মাত্র, তথাপি রবীন্দ্রবাবু আমার সামান্য সাহিত্যিক গুণের এতটা পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে তিনি অতি দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন ও 'রামায়ণী কথা'র শুধু ভূমিকা নহে, তাহার প্রত্যেকটি চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ সকল মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থকার অত্যন্ত উপকৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

যখন আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি, তখন কি ভাবে লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশ রবীন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন। সাহিত্য একটা যুগের প্রতিবিম্বস্বরূপ, সেই যুগের আদর্শ, রুচি ও নীতিজ্ঞান সাময়িক সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়। প্রধান প্রধান লেখকেরা এক এক যুগের কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সেই যুগের জাতীয় চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং কোন প্রধান লেখককে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা বা নিন্দাবাদ না করিয়া তাঁহার মধ্যে যুগ-লক্ষণ কি পাওয়া যায়, তাহাই নির্দেশ করা বিধেয়। এক এক যুগের শিক্ষা-দীক্ষার ঐতিহাসিক কারণগুলি বিবৃত করিয়া কবিগণকে সেই শিক্ষা-দীক্ষার পাণ্ডা স্বরূপ দাঁড় করাইয়া তাঁহার প্রসঙ্গে সমস্ত জাতির চরিত্র নির্দেশ করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য—নতুবা কোন একটি লোককে তাঁহার যুগ হইতে পৃথক করিয়া আনিয়া বর্তমান কালের নৈতিক কি সামাজিক রুচির মাপকাঠি দিয়া বিচার করা সংগত নহে। আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে কবিগণের আলোচনা কতকটা ব্যক্তিগতভাবে হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজী ইতিহাসখানায় রবীন্দ্রবাবুর উপদেশ অনুসারে আমি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম। তিনি শেষোক্ত পুস্তকের অবলম্বিত প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। যে সকল কবি ঝড়ের মত তাঁহাদের ব্যক্তিগত ভাবের

আতিশয্যে পাঠকচিত্তকে উলট-পালট ও অভিভূত করিয়া ফেলেন, রবীন্দ্র তাহাদিগের অনুরক্ত নহেন।। তিনি সেই সকল কবির পক্ষপাতী যাঁহারা বর্ণিত বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়া নিজকে একেবারে আড়াল করিয়া রাখিতে পারেন, এই জন্য তিনি বাইরণ-জাতীয় কবির কবিত্ব স্বীকার করেন না, বাল্মীকির মত বিষয়গৌরবে সম্পূর্ণ আত্মহারা কবির অনুরাগী।

১৯০৯ সনের শীতকালে একবার বোলপুরে গিয়াছিলাম। অরুণকে সেইখানে পাঠাইবার পর মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আমি যাইতাম। অতবড় খোলা জায়গা কখনই আমাকে আকর্ষণ করে না, এসম্বন্ধে অনেকের সঙ্গে আমার মতভেদ। যাহার যেরূপ রুচি, কি করিতে পারা যায়, আমার কাছে পল্লী ভাল লাগে, আশ্রম ও শূন্য ময়দানে গেলে আমার প্রাণ হা হা করিয়া উঠে।

সেইবার নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রকে তথায় দেখিলাম। কেহ না বলিয়া দিলে তিনি রাজা কি প্রজা তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তিনি ছোটবড়র তারতম্য করেন না, সকলের সঙ্গেই গালায় গলায় ভাব। সাহিত্যিক শক্তি ভগবান তাঁহাকে এতটা দিয়াছেন যে, তাঁহার লেখা পড়িলেই তিনি যে একজন শক্তিশালী লেখক তাহা তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়। গদ্য লেখায় তিনি প্রচুর কবিত্বের আমদানী করেন, সেই কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণক্ষম কবিদৃষ্টি ও হৃদয়ের কৌমার্য ধরা পড়ে। তাঁহার রাজত্ব যতটা তদীয় বিশাল ভূখণ্ডের উপর, তাহা অপেক্ষা বহু সংখ্যক বন্ধু-হৃদয়ের উপর বেশী। বন্ধুবর্গ লইয়া কৌতুক ও আমোদ করিয়া তিনি নিত্য উৎসবের সৃষ্টি করেন, সেই উৎসব হরিলুটের মত, ছোটবড় কেহই প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হয় না। বোলপুর গিয়া আমার ফিটের পীড়া হইল, কতকটা সময় অজ্ঞান হইয়া রহিলাম। জ্ঞানলাভের পর দেখিলাম মহারাজ জগদিন্দ্র শিয়রে বসিয়া। তিনি রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে একটা নূতন মজার ফন্দী পাকাইতেছিলেন। কতগুলি নূতন কাপড় আনিয়া ছোপ দিয়া গেরুয়া রং ধরাইলেন, একতারা ও খঞ্জনীর ব্যবস্থা হইল। মতলবটা এই হইল, মহারাজা গেরুয়া পরিয়া গুরু সাজিয়া চোখ বুজিয়া থাকিবেন, রবিবাবু ও শিবধন বিদ্যার্ণব চেলা সাজিয়া একজন খঞ্জনী ও অপরে একতারা লইয়া পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিবেন। শিবধনের বয়স ছিল ত্রিশ এবং তিনিও সুকণ্ঠ ছিলেন। কোন একটা গাছতলায় মৌনী বাবা বসিয়া থাকিবেন, আর চেলারা পল্লীতে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া যাহা আনিবেন তাহাই শিবধন রাঁধিয়া সকলের আহারের ব্যবস্থা করিবেন। গুপ্তভাবে একখানা গোশকট অপেক্ষা করিতে থাকিবে। চার-পাঁচ পল্লী পর্যটন করিবার পর ঐ গোযানে আরোহণ করিয়া মহাপুরুষেরা আবার অন্য এক কেন্দ্রে গমন করিয়া ভিক্ষুধর্মের চর্চা করিবেন। এই অভিযানে মোট ১৫ দিন ব্যয় করিয়া তাঁহারা বোলপুরে ফিরিবেন। শিবধন আমার নিকট অনেক কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, 'রাজা মহারাজার খেয়াল, ইঁহারা এত কষ্ট সহিতে পারিবেন কেন? কোথায় কোন্ পল্লীতে যাইয়া হল্লাক হইয়া পড়িবেন, তখন আমার খিদ্‌মদ্‌গারী করিতে হইবে, এবং এরূপ ভারি ভারি লোকের বাহন হওয়ার বিপদে তাল রাখিতে হইবে। গণদেবতারা যে মূষিকটির কাঁধে কেন চাপিতেছেন, বুঝিতে পারি না।' কিন্তু প্রকাশ্যে মহারাজার প্রতিকূলতা করা তাঁহার সাহসে কুলায় নাই, যখনই মহারাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'কি হে

পণ্ডিত, এতবড় একটা আনন্দ পেঁচার মত মুখ করিয়া মাটি করিয়া ফেলিবে নাকি?' তখন শিবধন ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিয়াছেন, 'না মহারাজ, রাজেন্দ্র-সংগমে—দীন যথা ধায় দূরে তীর্থ দরশনে।' কিন্তু সে যাত্রা এই মতলব টিকিল না। রবীন্দ্রবাবুর অসুখ হইয়া পড়িল। যতই সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় নিকটবর্তী হইতে লাগিল ততই বোধহয় জঙ্গলে জঙ্গলে হিমের মধ্যে নগ্নপদে ঘুরিবার আশঙ্কায় তাঁহার শরীর খারাপ হইল—শেষে সর্দি ও পরে জ্বর হওয়ায় বোলপুরের মাঠে প্রস্তাবটি মাটি করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজা কলিকাতায় নিজ বাড়ীতে বৈষ্ণব সাজিয়া গিয়া নিজের ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া রানীমহাশয়াকে গান শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্য যতীন বসু প্রভৃতি দলের বন্ধুরাই পুরোভাগে ছিলেন— তাঁহারা ঘটা করিয়া তিলক কাটিয়া গুম্ফ কামাইয়া, তুলসীর মালা ধারণপূর্বক ছদ্মবেশটার ভূমিকা খুব উৎকৃষ্টভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণববেশী মহারাজাও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, বাড়ীর কেউ মহারাজাকে এ পর্যন্ত চিনিতে পারেন নাই।

শান্তিনিকেতন হইতে গোশকটে বোলপুর রওনা হইলাম. দুপ্রহরের সময় তখন চটি পায়ে মহারাজা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, আমি অতিশয় কুণ্ঠার সঙ্গে বলিলাম, 'মহারাজ. আমি গাড়ীতে. আর আপনি হাঁটিয়া যাইতেছেন ইহা বড়ই বিসদৃশ দেখাইতেছে।' তিনি বলিলেন, 'তুমি যে রাজ-তক্তায় যাচ্ছ. তার লোভ দেখিয়ে আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিও না।' দেড় মাইল পদব্রজে হাঁটিয়া তিনি দুইখানি সেকেণ্ডক্লাসের টিকিট কিনিয়া আমার সঙ্গে তাঁহার ছেলেদের মাষ্টার রজনীবাবুকে দিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। আমি পীড়িত. এজন্য একা আমাকে ছাড়িয়া দিলেন না। ইহার বহুদিন পরে বোধহয় ১৯১৫ সনে হইবে, কৃত্তিবাসের জন্মোৎসব সম্পাদনার্থে ফুলিয়া গ্রামে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন স্যার আশুতোষ। জলধর-দা ('হিমালয়' লেখক). খগেনবাবু (অধ্যাপক), আর কয়েকজন সাহিত্যিক ও আমি একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইতেছিলাম। হঠাৎ মহারাজ জগদিন্দ্র প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে অবতরণ করিয়া আমাদের কামরায় আসিলেন এবং বলিলেন. 'একা একা প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল, বাঁচলুম', এই বলিয়া আমার দিকে বিস্ময়সূচক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একটু বিস্ময়ের বিষয় যে না হইয়াছিল তাহা নহে, আমি তাঁহার দৃষ্টির বেগে সংকুচিত হইয়া পড়িতেছিলাম। আমার পরিধানে ছিল একখানি ভাল কোঁচান ঢাকাই ধুতি। গায়ে একটা নূতন সিল্কের পাঞ্জাবী ও ভাল ফুলদার সিল্কের চাদর. পায়ে এক জোড়া নূতন পাম্পসু ছিল এবং পথে এক বন্ধু আমার জামার একটা বোতামের কাছে সপত্র একটা মল্লিকা ফুলের গুচ্ছ আটকাইয়া দিয়াছিলেন. হাতে একখানি সরু রূপারমুখ ছড়ি ছিল। মহারাজ সব ভুলিয়া আমার রূপমাধুরী পান করিতে লাগিলেন, আমি প্রমাদ গণিলাম। তখন তিনি গোপনে যতীন বসুকে উসকাইয়া দিলেন, তাঁহার বামাকণ্ঠ অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনি ব্যাঘ্রবৎ লাফাইয়া উঠিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাহমঙ্গল গাহিতে লাগিলেন। আমি হইলাম বর, আর স্বয়ং মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলে মিলিয়া দোহারী করিতে লাগিলেন, কখনও আমার মুখের কাছে আঙুলগুলি নানারূপে মুদ্রার ছলে ঘুরাইতে লাগিলেন,

কখনও 'বাহবা'র সঙ্গে উচ্চহাস্যে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁহারা আমাকে লইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আমার একটি স্মরণীয় ঘটনা হইয়া আছে। জলধর-দা অতি নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু সেদিন মহারাজের উত্তেজনায় তিনিও ব্যাঘ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কানে একটু খাট, এইজন্য বোধহয় এইরূপ সচিৎকার উৎসব তাঁহার খুব পছন্দ হয়, কারণ শুধু কথাবার্তা বলিলে অনেক কথা তাঁহাকে এড়াইয়া যায়। তাহার পর যখন ফুলিয়ার নিকট যাইয়া গাড়ী থামিল তখন মহারাজার প্রবর্তনায় সকলে মিলিয়া আমার গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

২।৩ বৎসর হইল বেহালা মহাকালী পাঠশালায় পুরস্কার-বিতরণে সভাপতিত্বে আহ্বান করিয়া আমি চৌরঙ্গীতে মহারাজার সঙ্গে সন্ধ্যা ৮-৩০ টার সময় দেখা করিয়াছিলাম। তখন দরজায় খাড়া পাহারা রাখিয়া মহারাজ আমাকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত রাখিয়া দিয়াছিলেন, ফলে আমাকে ট্রাম না পাওয়াতে গাড়ী করিয়া বেহালা যাইতে হইয়াছিল।। কিন্তু এই সকল উৎপাত যে কত মধুর তাহা কথায় বুঝাইবার নহে। ভাগবতের ৯ম, ১০ম স্কন্ধ তো এই সকল উৎপাতের কথা লইয়াই। এমন শিশুসুলভ কমনীয়তা আমি আর কাহারও দেখি নাই— কি লেখায়, কি ব্যবহারে, কি সহৃদয়তায়। একদিনে তিনি যেন কতদিনের আপনার হইয়া পড়েন। রাজ-রাজেশ্বরের এই ধূলিখেলা দেখিয়া তাঁহারই কথা মনে পড়ে, যিনি মথুরার সিংহাসন তুচ্ছ করিয়া গো-বাঁধন-দড়িপরা সখাদের জন্য কাঁদিয়াছিলেন। এই একটি মানুষ দেখিয়াছি যিনি অবস্থার তুঙ্গশৃঙ্গে উঠিয়া কেবল মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। গত বৎসর রামমোহন রায় হলে খগেন্দ্রবাবু (অধ্যাপক) বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই সভায় মাননীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতি হইবার কথা ছিল, তিনি কার্যগতিকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব হইল, কিন্তু তিনি তাঁহার বন্ধুত্বাভিমানী এই দীন লেখককে সভাপতির আসনে একরূপ বলপূর্বক তাহার সমস্ত সংকোচ ও দ্বিধা ভাঙ্গাইয়া বসাইয়া দিলেন। এতাদৃশ ব্যক্তির সান্নিধ্যে আমি অবনতশিরে তাঁহার অনুরোধ পালন করিয়াছিলাম।

২০

ভারতী ও বঙ্গদর্শন

আজ ১২।১৪ বৎসরের কথা, 'ভারতী' তখন শ্রীমতী সরলা দেবীর হাতে ছিল। তখনকার নানাবিধ আন্দোলন ও সভাসমিতির সঙ্গে জড়িত থাকিয়া তিনি পত্রিকাখানির জন্য চিন্তা করিবার অবসর পাইতেন না, আমার উপর প্রায় সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমি যে সকল প্রবন্ধ নির্বাচন করিতাম ও নিজে লিখিতাম, তাহা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে 'মহতাশ্রমের' পার্শ্বে একখানি দোতলা বাড়ীর উপরে বসিয়া তিনি বেলা ৩টা হইতে ৫।।টা পর্যন্ত সপ্তাহে দুইদিন শুনিতেন; এই বাড়ী হইতে বাবু কেদারনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার 'ভাণ্ডার' নামক মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন। বাড়ীটাতে 'ভারতী'র কাজকর্মের জন্য একখানি ঘর ছিল, এই ঘরে কোন কোন সময় সাহিত্যিক সুহৃদ্‌বর্গের মিলন হইত। এইখানে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি 'ভারতী'সম্পাদিকার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এই ঘরে কেদারবাবু প্রায়ই আসিয়া রবিবাবুর কবিতা আবৃত্তি করিয়া আমার মন বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেন বলিয়া আমি সম্পাদিকাকে কহিয়া তাঁহার প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। নানারূপ ফল ও উপাদেয় সন্দেশাদির উপঢৌকন লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিতেন ও আমাদের আইন-কানুন রদ করিয়া দিতেন।

'ভারতী'র সম্পাদিকার বাড়ী বালীগঞ্জে, আমার বাড়ী শ্যামবাজার হইতে বহুদূর; প্রথম কয়েক মাস বালীগঞ্জে ঘন ঘন যাতায়াত করার পর সেখানে যাওয়ার পক্ষে অসুবিধা জানাইয়াছিলাম। এজন্যই তাঁহার এতদূরে আসার নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

'ভারতী' সম্পাদিকা কাজের ভার প্রায় সমস্তই আমার উপর ছাড়িয়া দিলেও পত্রিকাখানির উপরে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রবন্ধ লিখিবার বেশী অবসর পাইতেন না, কিন্তু আয়ব্যয়ের খবরটা তিনি রাখিতেন; এ সম্বন্ধে ভার ছিল কেদারবাবুর উপর। সম্পাদিকা নিজে যেটুকু লিখিতেন তাহা চমৎকার হইত। কোন কোন সময় পুস্তক-সমালোচনা করিতেন। তিনি অতি অল্প কথায় ভাবের সমাবেশ করিতে জানেন, তাঁহার লেখায় বাক্যপল্লব ও বৃথা কথার আড়ম্বর আদৌ নাই, হঠাৎ ছবির মত সুন্দর দৃশ্য তাঁহার রচনায় ভাসিয়া উঠে। যাহাতে তাঁহার এই লিপিকুশলতায় ভারতীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, এ জন্য আমি সর্বদা তাঁহাকে তাগাদা করিয়া বিরক্ত করিতাম, এই বিরক্তির ফলে তিনি ক্রমাগত প্রতিশ্রুতি দান করিয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতেন। কিছু লিখিতে বসিয়াছেন অমনই রানী মৃণালিনী আসিলেন, কিংবা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী আসিলেন, নিদেনপক্ষে জোড়াসাঁকোর ৫নং বা চৌধুরী-বাড়ীর নিমন্ত্রণ তো আসিবেই। এইভাবে অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত।

নূতন সাহিত্যিক দলের মধ্যে শ্রীমান মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বালীগঞ্জের বাড়ীতে সর্বদা যাইতেন। তখন মণি তরুণ বালক। মণিকে যেদিন আমি প্রথম দেখি, সেই

দিনই আমি তাহার প্রতিভাদীপ্ত মুখখানি ও সুন্দর মূর্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। মণিলাল সরলা দেবীকে ভয় করিতেন। তাঁহার কয়েকটি কবিতা তিনি গোপনে আনিয়া আমাকে দেখান, তাঁহার আশঙ্কা ছিল, সরলা দেবী কবিতা লেখার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন। সেই সন্তর্পিত, অতি-লজ্জিত লেখকের পাণ্ডু-লিপির মধ্যে কয়েকটি কবিতা আমার বেশ ভাল বলিয়া মনে হইল। একটি 'ভারতী'তে ছাপাইলাম। সরলা দেবী তাহার পর বলিলেন, 'আপনি করিয়াছেন কি? ছেলেটির আখের নষ্ট করিতে দাঁড়াইয়াছেন। ইহার পর ইহাকে কবিতার রোগে পাইয়া বসিবে।' কিন্তু মণির কতকগুলি কবিতা আমি সম্পাদিকাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তাঁহার মুখে প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল, এবং তিনি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, 'তা আমি আগেই জানিতাম, মণির রচনা-শক্তি আছে। কিন্তু সে এখনও বালক, ইহা স্মরণ রাখিবেন।' কিন্তু ইহার পর হইতে প্রায় প্রতি মাসেই মণির কবিতা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইতে লাগিল। আজ শ্রীমান মণিলাল 'ভারতী'র সম্পাদক, তাঁহার রচনার সরল মাধুর্য এখন অনেক লেখক অনুকরণ করিতে প্রয়াসী। আমি এই ঘটনায় বিশেষ প্রীত, তাহা বলা বাহুল্য। 'ভারতী'র অন্যতম সম্পাদক সৌরীন্দ্রবাবু কলেজে পড়ার সময় ভবানীপুরের সাহিত্যসমিতিতে বক্তৃতা করিবার জন্য আমাকে প্রায়ই লইয়া যাইতেন। তখন জানিতাম না, ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। সেই সময় প্রিয়দর্শন, সদাপ্রফুল্ল চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতী'র পতাকার নীচে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। এই তরুণের দল এখন লিপিচাতুর্যে প্রবীণের দলকে ছাপাইয়া উঠিতে প্রয়াসী। কিন্তু যেদিন ইঁহারা উদ্দাম উৎসাহ লইয়া সবিনয়ে সাহিত্যিক দলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সেদিনের কথা মনে পড়িলে আনন্দ হয়।

এই সময় নবপ্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শনে'র সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল। রবিবাবু অনেক সময় বোলপুরে থাকিতেন; শৈলেশবাবু মাঝে মাঝে কাগজের তাড়া লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইতেন। রবিবাবুর উদ্যোগে 'বঙ্গদর্শন' চালাইবার জন্য ও সাহিত্য চর্চার নিমিত্ত আমরা মজুমদার লাইব্রেরীর উপরে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। রবিবাবু যখন অনুপস্থিত থাকিতেন, তখন এই আড্ডায় যতীনবাবু অনেক সময় তাঁহার কীর্তন ও কথকতার নকল শুনাইয়া আমাদিগকে হাসাইতেন। শৈলেশবাবুর নধরকান্তি আজ আমার চক্ষের সামনে ভাসিতেছে। তাঁহার মুখ হইতে সোজা লাইন নীচের দিকে টানিলে ভুঁড়িটা অন্তত এক ফুট দূরে প্রমাণিত হইত। এই ভুঁড়ি দোলাইয়া হাসিমুখে যখন তিনি উপস্থিত হইতেন, তখন বন্ধুবর্গের আনন্দের সীমা থাকিত না। কি জানি কোন্ অজ্ঞাত কারণে সকলের বিদ্রূপের লক্ষ্য হইতেন শৈলেশবাবু, বোধহয় তাঁহার অমায়িক চরিত্র ও নিরীহতা এই বিদ্রূপ আমন্ত্রণ করিত; কেহ বা তাঁহার দেহের পরিসর লক্ষ্য করিতেন, কেহ বা তাঁহার বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, বিশেষ হিসাব-রক্ষার বন্দোবস্ত লইয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেন। শৈলেশবাবু উত্তর দিতে ছাড়িতেন না, তিনি সকল ঠাট্টাতেই আমোদ অনুভব করিতেন; যেগুলি নিতান্ত তীব্রভাবে তাঁহার গায়ের উপর পড়িত তাহাতেও তিনি হাসিতেন। এমন উদারচেতা ভোলামহেশ্বর সংসারে কমই আছে। 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকবর্গকে তিনি মুক্তহস্তে টাকা দিতেন,

অর্থাৎ যখন হাতে টাকা থাকিত। এই ব্যক্তি অদৃষ্টের কি রহস্যে পুস্তকের দোকান খুলিয়াছিলেন জানি না, হিসাব সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান একেবারে ছিল না। বন্ধুদের জন্য টাকা খরচ করিতে তাঁহার মত মুক্তহস্ত ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। ধার দিলে তাঁহার কাছে ফিরিয়া পাওয়া বড় শক্ত ছিল। নিজের হউক, পরের হউক, টাকা পাইলে তাহা খরচ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না, অথচ যাঁহাদের নিকট হইতে ধার করিতেন, তাঁহারা কিছুতেই নির্মম হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে চাহিতেন না। একজনকে আমি জানি, তিনি শৈলেশ-বাবুকে ৩০০০ টাকা ধার দিয়াছিলেন; শৈলেশবাবুর কাছ হইতে কোনক্রমেই তিনি তাহা আদায় করিতে পারিলেন না, অথচ মেয়াদ চলিয়া যায়। ঋণদাতার অবস্থাও খুব সম্পন্ন ছিল না, কিন্তু তথাপি তিনি নানা লোকের উত্তেজনা পাইয়াও টাকার জন্য নালিশ করেন নাই। তিনি যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, 'শৈলেশ কাহাকেও ঠকাইবার মতলব করে না, পরের উপকারের জন্য সে সর্বদা উদ্যত, তাহার দেবচরিত্রের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহার হাতে টাকা না থাকিলে কোথা হইতে দিবে? আমি এরূপ লোককে লাঞ্ছনা করিতে কখনই অগ্রসর হইব না।'

শৈলেশবাবুর 'দাদার কাণ্ড' যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার গল্প লিখিবার কেমন সুন্দর ক্ষমতা ছিল, তাঁহার 'চিত্র-বিচিত্র' অতি চমৎকার পুস্তক। আমার মনে হয়, তাঁহার দাদা শ্রীশ মজুমদার মহাশয় হইতে তাঁহার নিজের লিপি-শক্তি কম ছিল না। ভগবান তাঁহাকে বেশ উচ্চদরের প্রতিভা দিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক আসরে শৈলেশবাবু এমন নিরীহভাবে, এমন বিনীত হইয়া থাকিতেন, যেন তিনি সকলের চেয়ে কত নীচু! এই অনাড়ম্বর ভাবটা তাঁহার চরিত্রটিকে বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। একবার শৈলেশবাবু বড় সাহসিকতার কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রবিবাবু 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক; তাঁহার নামের নীচে শৈলেশ-ভায়া নিজের নামটি 'সহ-সম্পাদক' বলিয়া ছাপাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রবিবাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'সহ-সম্পাদক' নহে 'দুঃসহ-সম্পাদক'—একথা পূর্বে একবার লিখিয়াছি। আমি তাঁহার ঠাট্টাটি মনে গাঁথিয়া রাখিলাম এবং যখন তখন তাঁহাকে 'দুঃসহ-সম্পাদক' বলিয়া পরিহাস করিতাম. শৈলেশবাবু যথারীতি বাহিরে হাসিতেন বটে, কিন্তু ঠাট্টাটি তিনি বেশ আমোদকর বলিয়া বোধহয় মনে করিতেন না। কারণ এই উপাধি যিনি দিয়াছেন, তাঁহার কথা পাছে এই প্রসঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সভয়ে তিনি কথা অন্যদিকে পাড়িতে চেষ্টা করিতেন।

একবার শৈলেশবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমিও বড় জব্দ হইয়াছিলাম। যেদিন খাওয়াইবার কথা ছিল. তাহার ২।৩ দিন আগে আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলাম। নানা কার্যের বাহুল্যে আমি একেবারে সে কথা ভুলিয়া গিয়া-ছিলাম। সেদিন বেলা ১২টার সময় খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া আমি আমার গল্পের বই 'তিন বন্ধু'র প্রুফ্ দেখিতেছি. এমন সময় দেখিতে পাইলাম 'ধীরকুঞ্জর. গতিমন্থর' শৈলেশবাবু বাহু এবং দেহ দোলাইতে দোলাইতে আসিতেছেন। গৃহদ্বারে তাঁহাকে দেখিয়াই আমার নিমন্ত্রণের কথা মনে হইল এবং মুখ শুকাইয়া গেল। তখন বাড়ীর সকলেরই খাওয়াদাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। যে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর হাঁড়ির

একটি শাক-কণা লইয়া বিপদে তাঁহার মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আতঙ্কিত ভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে বলিলাম, 'এই যে শৈলেশবাবু, আসুন, এত দেরী হইল যে?' শৈলেশভায়া আমার মুখ দেখিয়াই মৌখিক ভদ্রতার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিলাম না। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া বাজারের লুচিসন্দেশ খাওয়াইয়া বিদায় করিলাম। শৈলেশবাবু ইহার একদিন প্রতিশোধ লইতে চাহিয়াছিলেন। তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।*

শৈলেশের সহস্র ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। 'বঙ্গদর্শন' লইয়া রবীন্দ্রবাবুর একটা ক্ষতির কারণ দাঁড়াইয়াছিল। ১৩১১ সনের ১৬ই বৈশাখে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'আপনি বোধহয় জানেন আমার গ্রন্থের স্বত্ব আমি বোলপুরকে দিয়াছি অথচ অর্থাভাবে আমি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া ফিরিতেছি। কাজের লোকের হাতে পড়িলে এ দুর্দশা হইত না; এইজন্য এবং দুর্ভাগা শৈলেশের আসন্ন দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

আমাদের আলোচনাসমিতি সম্বন্ধেও অনেক কাজের ভার শৈলেশের উপর থাকিত, একবার (২১শে বৈশাখ ১৩১১) রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন, 'শৈলেশ Renal Colic লইয়া ভুগিতেছে, বোধহয় সেইজন্য সমিতির কার্যবিবরণ পাঠাইতে পারে নাই, যদিও আমার বিশ্বাস এই Colic ধরিবার পূর্বেই সে পাঠাইতে পারিত। কিন্তু শৈলেশকে তো চেনেন। সে পিতৃদত্ত নাম সার্থক করিয়াছে। শৈলেশের মতই সে অচল।'

'প্রদীপে' কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পরিচালনার গুরুতর ভার আমার উপর ছিল—অনেক পত্রে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিলাতী ও দেশীয় অনেক কাগজ হইতে সন্দর্ভ সংকলন করিবার জন্য সেগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার পত্রগুলির পাতা উলটাইয়া সেই প্রীতিসম্বন্ধের পূর্বস্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে; সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল—দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে আমার পত্রব্যবহার ও দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। কিন্তু কখনও আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই—তাঁহার কৃত রাশি রাশি উপকারের কথা বিস্মৃত হই নাই, তাঁহার অপূর্ব সঙ্গসুখের লোভ মন হইতে দূর করিয়া ফেলিতে পারি নাই। কোটি কোটি লোকের মধ্য হইতে যাঁহাকে বাছিয়া লওয়া যায়, যিনি সমগ্র জাতির নিকট ভগবানের এক মহোপকার—তাঁহাকে লইয়া বন্ধুবর্গের শ্লাঘা হইবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। কেন যে এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল—এ ক্ষতি তাঁহার নহে, সম্পূর্ণ আমার। তথাপি কি কারণে এই ক্ষতি সহ্য করিয়াছিলাম—তাহা পরস্পরের কতকগুলি ভুলভ্রান্তির ইতিহাস, তাহা না বলাই ভাল। দুই বৎসর হইল, আমি তাঁহাকে মনের আবেগে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম—কথাগুলি হৃদয় ছুঁইলে, কবির হৃদয়ে সাড়া পড়িবেই পড়িবে। আমি

* এ আখ্যানের এ পর্যন্ত 'ভারতী'তে একটি সন্দর্ভাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার নিকট হইতে যে উত্তরখানি পাইয়াছিলাম, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শান্তিনিকেতন

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

আজ আপনার পত্রখানি পাইয়া আমার মনের একটি ভার নামিয়া গেল। আমার প্রতি আপনার চিত্ত প্রতিকূল, এতদিন এই কথাই মনে জানিতাম। এরূপ বিশ্বাস যে কেবল পীড়াজনক তাহা নহে, ইহা অনিষ্টজনক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ-বিকার হইতে আপনি মুক্তিলাভের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমাকেও মুক্তি দিয়াছেন, সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার সহিত পরিচয়ের আরম্ভ হইতেই আমি সর্বপ্রযত্নে আপনার সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কেমন করিয়া যে বিপরীত ফল ঘটিয়াছিল, তাহা আমার দুর্গ্রহই জানে। আমি এই জানি, আমি কখনই স্বেচ্ছাপূর্বক আপনার ক্ষতি বা বিরুদ্ধতা করি নাই। কিন্তু এ সকল কথা বিচার করিবার আর প্রয়োজন নাই, জীবনের অনেক গ্লানি একে একে মুছিবার আছে, অথচ সময় আছে অল্প—এই যে একটা দাগ মন হইতে মিটিল, সে বড় কম কথা নহে।...এবার কলিকাতায় গিয়া আপনার সঙ্গে এবং আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম. এ. পরীক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আপনি শরীরে মনে স্বাস্থ্য শান্তি লাভ করুন, অন্তরের সহিত এই কামনা করি। ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

ভগিনী নিবেদিতা

এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত উন্নতি হইয়াছিল। পুস্তকও অনেক লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের দ্বারা আর্থিক অনেক সুবিধা হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। তাহার পর 'রামায়ণী কথা', 'সতী', 'বেহুলা', 'ধরা-দ্রোণ ও কুশধ্বজ', 'জড়ভরত', 'ফুল্লরা', 'সুকথা' প্রভৃতি অনেক পুস্তকই লিখিয়াছিলাম। ইহার প্রত্যেকখানি পুস্তক পাঠ্য হইয়াছিল। অপরাপর পুস্তকেরও বেশ বিক্রয় হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রিডার নিযুক্ত হইয়া এবং 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়' সংকলন করিয়া আমি কয়েক হাজার টাকা পাইয়াছিলাম। পরে সাত বৎসর পূর্বে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চফেলো' নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তখন ঐ পদের বেতন ছিল মাসিক ২৫০ টাকা, এখন ৩৫০ টাকা হইয়াছে। আমার হাতে যা টাকা জমিয়াছিল, তদ্বারা কলিকাতার বাড়ী ত্রিতল করিয়াছিলাম, এবং বেহালায় জমি কিনিয়া ত্রিতল বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া পুত্রদিগের শিক্ষা ও আর দুটি মেয়ের বিবাহে সেই সঞ্চিত অর্থের প্রায় সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। প্রথম বৎসর (১৯০৭ সনে) রিডার হইয়া আমি ইংরাজীতে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ইতিহাস লিখিতে নিযুক্ত হই। এই পুস্তকখানি সমাধা করিয়া আমি দুইজনকে দেখাইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসুর নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মিস্ মার্গারেট নোব্‌লের নাম—ইনি 'নিবেদিতা' নামেই বঙ্গসমাজে পরিচিত। আমাদের কলিকাতার বাড়ীর পার্শ্বেই বোসপাড়া লেনে (এখন 'নিবেদিতা লেন') ইনি একটি ছোটখাট দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। একদিন সকালবেলা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া পুস্তকখানি তাঁহাকে দেখাইবার প্রস্তাব করি, তিনি তখনই স্বীকার করিলেন ; আমি বলিলাম, 'পুস্তকখানি খুব বড়।' 'তা হউক না, আমি যখন বলেছি, তখন দেখে দেব।' এই বলিয়া তিনি হাসিমুখে আমাকে বিদায় করিলেন।

নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন, আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম আলাপের পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আমার সঙ্গে একেবারেই করিতে চাহিতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক হইতেও হীনবল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিতেন—রাজনৈতিক কোন কথা বলিলে ক্রোধের সহিত বলিতেন, 'দীনেশবাবু, ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে, আমি আপনার সঙ্গে ওসম্বন্ধে কথা বলিব না।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পুস্তকখানি পড়িতে লাগিলেন। ইংরাজী 'ইডিয়ম' সংক্রান্ত ভুল যে মাঝে মাঝে না পাইতেন এমন নহে, কিন্তু তিনি মোটের উপর বলিতেন, 'আপনার ইংরাজী ভাল'। ভাবের দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার সর্বদা তর্কবিতর্ক ও বিরোধ চলিত ; সে সম্বন্ধে তাঁহার মতগুলি এত দৃঢ় ছিল যে, তিনি কোন মতেই প্রতিকূল হইলে আমার মত মানিয়া লইতেন না। হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কথা, তাঁহারই কথা আমাকে মানিয়া লইতে হইবে, এই দায়ে পড়িলাম। ধনপতি সদাগরের স্ত্রী খুল্লনা ছাগল রাখিতে বনে

প্রেরিত হইয়াছিল—এই অপরাধে জ্ঞাতিগণ তাঁহার হাতে খাইবেন না বলিয়া ঘোঁট করিয়া বসিলেন। এক, হয় অগ্নি কিংবা বিষপরীক্ষা গ্রহণ করিয়া চরিত্রের শুদ্ধতা সর্বসমক্ষে প্রমাণ কর, নতুবা এক লক্ষ টাকা খেসারৎ দিয়া তাহাকে ঘরে রাখ—অন্যথা আমরা তোমাকে সমাজচ্যুত করিব। আমি ধনপতির গল্প লিখিতেছিলাম, সুতরাং এ সকল কথা বাদ দেই কি করিয়া? কিন্তু নিবেদিতা জেদ করিয়া বসিলেন, 'বাদ দিতেই হইবে।' স্ত্রীলোকের জেদ—সে যে কি ভীষণ তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? তাঁহার যুক্তি এই, 'জোর করে তার সতিনী তাকে ছাগল রাখতে বনে পাঠিয়ে দিয়ে তার উপর জুলুম করলে, তাকে ঢেঁকিশালে শুতে দিলে, আধপেটা খাইয়ে চূড়ান্ত কষ্ট দিলে। সামাজিক বিচারপতিগণ এজন্য লহনার কোন শাস্তি না দিয়ে, নিপীড়িত নিরপরাধ খুল্লনার উপর উল্টো শাস্তির ব্যবস্থা করলেন, এ কেমন সমাজ? আপনার গল্পে যদি একথা থাকে, তবে পৃথিবীর লোক এটাকে 'কাজির বিচার' বলে আপনাদের ঠাট্টা করবে— নো, নো, নো—একথা আপনি রাখতে পারেন না, গল্প হতে এটি ছেঁটে ফেলুন।' আমি বলিলাম 'আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের চরিত্র-মর্যাদার আদর্শ অন্যরূপ—সে মাপকাঠি বাতাসে নড়ে, তা আপনাদের Common Sense (সহজবুদ্ধি) দিয়া বুঝিতে পারিবেন না। ধরুন যদি বীণাটির তারে সুর দিয়া বাদক রাখিয়া দেন, আর যদি একটা হাওয়ায় নড়িয়া গিয়া কোন তারটা একটু শিথিল হয় তাহাও সেই বাদক সহ্য করিতে পারেন না; যাবৎ তাঁহার কানে একটুকুও বাধিবে সে পর্যন্ত তিনি রাগরাগিণী বাজাইবেন না। আমাদের সামাজিক বিধানে স্ত্রীলোক দেবীর ন্যায় পূজা পাইয়া থাকেন, সেই দেবতা সর্বপ্রকারে কলঙ্ক ও গ্লানির উপরে থাকিবেন— কোন প্রতিকূল মন্তব্যের লেশমাত্র হইলে তাঁহার স্বামী, পুত্র ও আত্মীয়গণ লজ্জায় মরিয়া যাইতেন, এই জন্য রাম সীতাকে নিরপরাধ জানিয়াও বনবাস দিয়াছিলেন। এখানে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে না—কৌস্তুভমণিতে যদি একটা সুতার তুল্য দাগ লাগে তবে মণিরাজের মূল্য কমিয়া যায়। স্ত্রীলোককে এতটা সখের পোশাকী জিনিসের মত করিয়া রাখা ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে সুবিধাজনক, এমন কি ন্যায়সংগত কিনা—তাহা আমি জানি না। স্ত্রীলোক যে জহরব্রত করিয়া—সতী সাজিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিত, তাহাও এই আদর্শের পবিত্রতা রক্ষার জন্য—সিজারের স্ত্রী সম্বন্ধে কথাটি হইতে পারিবে না, এই প্রবাদের অনুকূলে আমাদের সামাজিক আদর্শের সৃষ্টি! ন্যায়-অন্যায়ের সীমা অনেকটা নীচেকার কথা। এক জাতি যদি কোন একটা জিনিসকে খুব বড় করিয়া দেখে, এত বড় করিয়া দেখে যে পার্থিব ব্যবহারিক নীতি ততদূর পোঁছে না, ঐন্দ্রজালিক রূপ দিয়া দেখে, যাহা ফুঁয়ের ভর সহ্য করে না—ভাবের রাজ্যে সে একটা মস্তবড় বাহাদুরী—আপনাদের সমাজে কাঠখোট্টা জীবনযাত্রা চালাইবার পক্ষে সুবিধাজনক ও মোটামুটি ন্যায়সংগত, কিন্তু এদেশের কাব্য, জীবন ও সমাজ সমস্তই একটা বিশেষ ভাবনামূলক, সেই ভাবের যাদুকাঠি হাতে না থাকিলে এই সমাজের মন্দিরে আরতি দেখিবার প্রবেশাধিকার হইবে না।'

এইভাবে কোন একটা কথা লইয়া তর্ক বাধিত, হয়ত পুস্তকের এক লাইনও পড়া হইল না, দুইদিন তর্কযুদ্ধে কাটিয়া যাইত। নিবেদিতা নিজের জেদ বজায় রাখিতে সময়ে সময়ে এতটা বদ্ধপরিকর হইতেন, যে বলিয়া বসিতেন, 'দীনেশবাবু

ঠিক বলছি, যদি এই অংশটা পরিবর্তন না করেন, তবে আমি এ পুস্তক আর পড়ব না।' আমি প্রমাদ গণিতাম ও তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য খানিকটা পরিবর্তন করিতাম, নিজের ভাবের সঙ্গে না মিলিলে তিনি থামিয়া যাইতেন, কিছুতেই আগাইতে চাহিতেন না, ঠিক হাতী পাঁকে পড়িলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কোন একটা অংশে আসিয়া থামিয়া পড়িতেন। এটা ভুলিয়া যাইতেন যে পুস্তকের মতামতের দায়িত্ব আমার, ইংরাজী সংশোধনের ভার তাঁহাকে দিয়াছিলাম। সেখানে তাঁহার স্ত্রীলোকাচিত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি।

কোন একটা বিষয়ের ভার লইলে তিনি এটা মনে করিতে পারিতেন না যে, উহা পরের। সেটি সম্পূর্ণ আপনার ভাবিয়া খাটিতেন,—এইভাবের পরিশ্রম কেহ মূল্যে দিয়া ক্রয় করিতে পারে না। কোনদিন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি খাটিয়াছেন, ইহার মধ্যে তিনি ও আমি ২।৫ মিনিটের জন্য খাইয়া লইয়াছি মাত্র। এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপরভাববিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম—তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম, আর একজনের মধ্যেও পাইয়াছিলাম, তিনিও পাশ্চাত্ত্য জগতের লোক, তাঁহার কথা পরে লিখিব।

ইংরাজীর সংশোধন পুস্তকে অল্পই হইয়াছে—বেশীর ভাগ ভাবসংশোধন। কবিতা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসামান্য ছিল। শূন্যপুরাণের শিব সম্বন্ধে একটা ছড়া আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিত আছে, 'শিব, তুমি কেন ভিক্ষা করিয়া খাও? ভিক্ষা বড় হীনবৃত্তি, কোন দিন কিছু জোটে, আর কোন দিন রিক্ত ভাণ্ডে ফিরিয়া আস; তুমি চাষ করিয়া ধান বোন, তাহা হইলেই তোমার এ কষ্ট দূর হইবে। হে প্রভু, তুমি কতদিন উলঙ্গ হইয়া অথবা 'কে'ওদা' বাঘের ছাল পরিয়া কাটাইবে? যদি কাপাস বুনিয়া তুলা তৈয়ারী কর তবে কাপড় পরিতে পাইয়া কত সুখী হইবে!' এই ভাবসম্বলিত পয়ারের মধ্যে যে ভারতীর কোন অপূর্ব প্রেরণা থাকিতে পারে তাহাতো আমার মনেই হয় নাই। তিনি ঐ স্থানটি পড়িয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, কেবল 'আশ্চর্য,' 'আশ্চর্য' এই কথাটি বারংবার বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'ভগিনী, এটাতে এমন কি জিনিস পেয়েছেন, দীনদরিদ্র হঠাৎ রাজ্য পেলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, আপনি সেইরূপ হয়ে পড়েছেন!' নিবেদিতা সেই কবিতাটি হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া, এক হাত দিয়া অপর হাত চাপিয়া ধরিয়া আনন্দগর্বফুল্ল চোখে কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'ও দীনেশবাবু, এটা একটা আশ্চর্য জিনিস'। আমি ভাবিলাম, ক্ষেপা মেয়ের মাথায় যেন কি হইয়াছে! সেই সময় সেখানে আর একজন মেমসাহেব ছিলেন, আমি তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। পরদিন তাঁহাকে নিরালা পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নিবেদিতা এই শিবের কবিতায় এমন আশ্চর্য কি পাইয়াছেন, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি শুনিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'শুনেছি, সাধারণ ভক্ত ও উপাসক তাঁহাদের দেবতার নিকট সাহায্য চাহিয়া প্রার্থনা করেন "ঠাকুর আমায় ধন দিন, যশ দিন, মান দিন, স্বাস্থ্য দিন,"—তাঁহারা কত কি বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঐ

কবিতায় ভক্ত তাঁহার উপাস্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন, নিজের দুঃখের কথা তাঁহার মনে নাই; ঠাকুরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট যাহাতে নিবারণ হয়, তাই তাঁহার ভাবনার লক্ষ্য হইয়াছে।'

আমি তখন নিবেদিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। গ্রাম্য ছড়াগুলি সম্বন্ধে যদি আমি হেলায় অশ্রদ্ধায় কথা বলিয়াছি, তবে নিবেদিতার নিকট গালমন্দ খাইয়াছি। তিনি বলিতেন, 'বড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাঁহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে। আপনি কৃষকগণের গান অবজ্ঞা করিবেন না, তাহাদের মেঠো সুরে রাগিনী না থাকিলেও কারুণ্য আছে—তাহাদের সরল কথায় আভিধানিক জ্ঞান না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাহাদের কুঁড়ে ঘরে সোনারূপার থাম না থাকিলেও আঙিনায় শিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে।'

বই পড়িবার সময় তিনি আমার প্রতি যে কত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যাইতেন তাহার অনেকগুলিতে আমি বিরক্ত হইতে পারিতাম কিন্তু বিরক্ত হই নাই; কেননা আমি তাঁহার রুষ্ট কথার মধ্য দিয়া তাঁহার অতি কোমল পুষ্পকোরকের মত সহৃদয়তায় ভরপুর প্রাণটি দেখিতাম। কখনও বলিতেন, 'দীনেশবাবু, আপনার মত বোকা আমি জগতে আর একটি দেখি নাই; আপনার নির্বুদ্ধিতা আমি স্ত্রীলোক হলেও আমাকে অবাক করে ফেলেছে।' আবার হয়ত পড়িতে পড়িতে আর এক জায়গায় পোঁছিয়া বলিতেন, 'দীনেশবাবু, আপনি সত্যিই একজন প্রধান কবি, আপনার লেখা গদ্য হইলে কি হইবে, আপনার ভাষা প্রকৃত কবির। আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব।' কখনও অতিরিক্ত গালাগালি, কখনও অতিরঞ্জিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হইয়া আমি উভয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতাম। কিন্তু বাহিরের কোন লোক আসিলে দু-চারিটি কথায় আমার যে পরিচয় দিতেন তাহাতে অবশ্য আমি শ্লাঘা বোধ করিতাম। একবার তাঁহার কোন এক ইংরেজ বন্ধু দেখা করিতে আসিলে তিনি আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'বঙ্গদেশের সামাজিক তত্ত্ব ইনি যেরূপ জানেন, এই দেশের কুঁড়ে ঘর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সকল জায়গার ইতিহাস যাহা উনি ছেঁড়া পুঁথিপত্রের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছেন, সে বিষয়ে ইঁহার সমকক্ষ কেহ নাই।' ইত্যাদি। আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকিতেন গণেন ব্রহ্মচারী, ইঁহার ভাঙা ইংরাজী লইয়া আমি প্রায়ই ঠাট্টা করিতাম। নিবেদিতা বলিতেন, 'গণেন ইংরাজীতে উহার মনের ভাব বুঝাইতে পারে, এটুকু আমায় স্বীকার করিতেই হইবে, যেটুকু না পারে, হাতমুখের ভঙ্গীতে সেটুকু আর বুঝিতে বাকি থাকে না।' কিন্তু নিবেদিতা বাংলা বেশ ভাল বুঝিতেন, গণেন তাঁহার ভাষাজ্ঞানের গভীরতা প্রতিপন্ন করার মানসেই মাঝে মাঝে ইংরাজী বলিতেন। নিবেদিতা আমার পুস্তকে বৈষ্ণব কবিতা ও আগমনী গানের প্রশংসা পড়িয়া প্রায়ই আমাকে তাগাদা করিতেন, একজন বৈষ্ণব কীর্তনিয়া আনিয়া তাঁহাকে গান শুনাইতে। আমি আগমনী-গায়ক একজন বৈষ্ণব ভিখারীকে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে গান শুনাইয়াছিলাম। "গিরি, গৌরী আমার এসেছিল" গান শুনিয়া তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গায়ককে একটি টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। কতক-

দিন তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন অ্যালেক্‌জেণ্ডার নামক এমেরিকাবাসী বিংশবর্ষ-বয়স্ক এক বালক। ইঁহার অতি অসামান্য প্রতিভা ছিল, এই অল্পবয়সে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ করিবার তাঁহার যে শক্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা বিদেশীয়ের পক্ষে বিস্ময়কর। নিবেদিতা বলিতেন, 'এই বালকের লিখিবার ক্ষিপ্রকারিতা লক্ষ্য করা চক্ষুর অপর্যাপ্ত আনন্দ। টাইপরাইটার যন্ত্রটা যেন ইহার দ্রুত রচনার তাল সামলাতেই পারে না।' অ্যালেক্‌জেণ্ডার বিবেকানন্দের জীবনচরিত লিখিয়া ভাবী কর্মঠ ও প্রতিভাশালী জীবনের বহু আশা দিয়া সংসার হইতে সহসা সেই তরুণ বয়সে বিদায় লইয়া গিয়াছেন। নিবেদিতার এক সঙ্গিনী ছিলেন ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা, স্বভাবটি মিস্‌রির মত মিষ্ট—তাঁহার বাড়ী এমেরিকায়। নিবেদিতা আমার পাণ্ডুলিপি পড়িতে পড়িতে যখন খুশি হইতেন তখন মাঝে মাঝে বলিতেন, 'দীনেশ বাবু, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সে দিক দিয়া আপনার কথা ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নহে, মর্মপীড়া দান করে; কিন্তু তবুও আমার আপনাকে ভাল লাগে কেন শুনিবেন? আপনি বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খাটিয়াছেন ও দেশের উপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়াছেন যে, আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি প্রকৃত দেশভক্তের স্থানের দাবী করিবার যোগ্যতা রাখেন, এজন্য আপনাকে আমার ভাল লাগে।' তিনি আমাকে কাপুরুষ বলিয়া প্রায়ই ঠাট্টা করিতেন। একদিন আমি সত্যই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া লজ্জিত হইয়াছিলাম। সেদিন সন্ধ্যাকাল; গণেন, নিবেদিতা ও আমি বাগবাজারের রাস্তা দিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমি ছিলাম আগে, তাহার পর নিবেদিতা এবং সর্বশেষে গণেন। এমন সময় একটা ষাঁড় ক্ষেপিয়া শিং নাড়িতে নাড়িতে আমার সামনে ছুটিয়া আসিল। আমি প্রাণভয়ে পাশ কাটাইয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলাম, কিন্তু আমি সরিয়া পড়াতে যে নিবেদিতাকে ষাঁড়ের শিঙের সম্মুখীন করিয়া গেলাম, তাহা ভাবিয়া দেখিবার আমার অবকাশ হয় নাই। গণেন তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া ষাঁড়টিকে তাড়াইয়া দিলেন;তাহার পর তিনজনে আবার একত্র হইলাম। তখন নিবেদিতা তীব্র ব্যঙ্গের সুরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনি পুরুষজাতির আজ মুখ উজ্জ্বল করেছেন। একটি নিঃসহায় রমণীকে ষাঁড়ের সামনে ফেলে দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করেছেন; অদ্যকার এই কাজটি আপনার একটা কীর্তিস্তম্ভের মত হয়ে রইল।' তারপর হাসির ছটা মুখ হইতে চলিয়া গেল, এবং একটু ঝাঁজালো সুরে বলিলেন, 'দীনেশ বাবু, আপনার একটু লজ্জা হল না?' আমি কাজটা ভাল করি নাই, সেই জন্য অন্য সময় যেরূপ কথা কাটাকাটি করি, তাহা না করিয়া চুপ হইয়া রহিলাম। তিনি রাস্তায় যাইতে সাহেবদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না, কিন্তু বাঙালীদিগকে খুব সম্মান দেখাইতেন। একদিন তিনি আর আমি ট্রামে যাইতেছিলাম, এমন সময় একজন ইংরাজ আসিয়া তাঁহার গা ঘেঁষিয়া বসিলেন, তিনি এমন তীব্রভাবে চোখ রাঙাইয়া অসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন যে, সাহেব অধোমুখে অন্য বেঞ্চিতে যাইয়া বসিলেন। নিবেদিতা আমার কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নিকট নিজেকে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবাসীদের সকলকে ভাই বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

এইজন্য 'ভগিনী নিবেদিতা' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ দেশের লোকদিগকে পাশ্চাত্ত্য জগতের লোকেরা ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এইটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

যেদিন আমার নিকট তিনি শুনিলেন, খড়দহে একদা ১২০০ নেড়া ও ১০০০ নেড়ী বীরভদ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, সেই দিন হইতে খড়দহে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে তাগাদা করিতে লাগিলেন। সেই নেড়া-নেড়ীরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী। বৌদ্ধ ধর্মের জয়পতাকা যখন বঙ্গদেশে হতশ্রী ও লাঞ্ছিত হয়, এবং উক্ত ধর্মের পাণ্ডাগণ যখন এতদ্দেশ হইতে পলায়নপর হন, তখন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দুর্দশা ও অধঃপাতের চূড়ান্ত সীমায় নীত হইয়াছিল। বিজয়দৃপ্ত হিন্দু সমাজ ইহাদের প্রতিকূলে একেবারে দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলেন। এই পতিতের দলটিকে বীরভদ্র-প্রভু বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া আশ্রয় দান করেন। যে স্থানটিতে তাহারা শরণপ্রার্থী হয় এবং যে স্থানে দয়াল বৈষ্ণব-প্রভু শরণাগতদিগকে আশ্রয় দান করেন। সেই স্থানটিতে নেড়া-নেড়ীদের কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি স্বরূপ প্রায় ৩৫০ বৎসর যাবৎ একটা বাৎসরিক মেলা বসিয়াছিল। অল্প কয়েক বৎসর যাবৎ এই মেলাটি উঠিয়া গিয়াছে।

একদিন ফাল্গুন মাসের মধ্যাহ্নে নিবেদিতাকে সঙ্গে করিয়া আমি ও গণেন একখানি নৌকায় খড়দহে রওনা হইলাম। আমরা এইরূপ নৌকায় গঙ্গায় আরও দুই-তিন বার পরিভ্রমণ করিয়াছি। খাওয়াদাওয়া ১০টার মধ্যে সমাধা করিয়া সন্ধ্যায় বাগবাজারে ফিরিয়াছি। খড়দহে যাওয়ার দিন তাঁহার কি আনন্দ! আমাকে বলিলেন, 'ও জায়গাটার নাম আমি কি দিয়াছি জানেন?—ওটা হইতেছে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের সমাধিক্ষেত্র। ওঁরা মেলাটা তুলিয়া দিলেন কেন? এরূপ একটা ইতিহাস-বিশ্রুত ঘটনার স্মারক উৎসবটিকেও এইভাবে মাটি করিয়া ফেলিতে হয়!' আমরা জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া সাথে লইয়া গিয়াছিলাম। সেগুলির সদ্ব্যবহার করিলাম। কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেই গঙ্গার হাওয়া জঠরানল উস্‌কাইয়া দেয়। আমরা জেলেদের ডাকিয়া ইলিশ মাছ কিনিলাম। বেলা ৩টার সময় খড়দহের ঘাটে পেঁছিলাম। একজন মেমসাহেব ও সঙ্গে দুই বাঙালী ভদ্রলোককে ঘাটে নৌকা লাগাইতে দেখিয়া কর্মহীন পল্লীর লোকেরা কৌতূহলে মরিয়া যাইতেছিলেন। স্ফীতোদর লম্বিতোপবীত গোঁসাইয়ের দল ঘাটে আসিয়া আমাদের দিকে সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। নিবেদিতা আমাদিগকে পরিচয় দিতে মানা করিয়া দিয়াছিলেন; দর্শকেরা ভাবিয়াছিলেন, আমরা নৌকা কয়েক মিনিট সেই ঘাটে রাখিয়া পুনরায় চলিয়া যাইব। কিন্তু সত্যসত্যই যখন নিবেদিতা তীরে পদার্পণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলিতে বলিতে আমরা গাঁয়ের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম, তখন পঙ্গপালের মত নিত্যানন্দ-বংশীয়গণ ও অপরাপর লোকে আমাদের পিছনে পিছনে চলিলেন। এই অপূর্ব শোভাযাত্রা দেখিয়া নিবেদিতা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনুসরণকারীদের মধ্যে কেহ কাশিয়া কাশিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কেহ লম্বোদরটি হেলাইয়া বক্র দৃষ্টি দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন, কেহ গামছাখানি দিয়া মুখ মুছিয়া যৎপরোনাস্তি সাহসের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয় ইনি কে?'

সেই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য, যেন তাঁহাদের জীবন-মরণের সমস্যার সমাধান আমি করিব, এইভাবে সেই বৃহৎ জনতা উদ্‌গ্রীব হইয়া আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'উনি কে—উঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, উনি নিজের পরিচয়টা অপর হইতে নিজেই ভাল দিতে পারিবেন।' নিবেদিতা আমার উত্তর শুনিয়া এমনই গম্ভীর হইয়া গেলেন, যে, কাহার সাধ্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে অগ্রসর হইবে? একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শ্যামসুন্দরের মন্দির কোথায়?' অমনই দশ-বারো জন লোক কৃতার্থ হইয়া একসঙ্গে উত্তর দিতে লাগিলেন। কেহ হস্ত-প্রসারণ-পূর্বক অঙ্গুলি দিয়া একেবারে উত্তরটি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন,—কেহ বা 'আসুন আমাদের সঙ্গে' বলিয়া আমাদের পরিচালকত্বের সমস্ত গৌরবটা আত্মসাৎ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই আতিথ্যের আতিশয্যে আমরা কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলাম। শ্যামসুন্দরের মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া যখন সোপানাবলীর উপর হ্যাটটি খুলিয়া রাখিয়া নিবেদিতা প্রণাম করিলেন, তখন সেই বৃহৎ জনতা মুগ্ধ ও বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কেহ হিন্দুধর্ম যে কত বড় তাহা বলিতে যাইয়া বাহুনাড়া দিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন, কাহারও বুক গর্বে আধ হাত উঁচু হইয়া যেন ফুলিয়া উঠিল, কেহ বা কোন ধর্মবিদ্বেষী যুবকের অনুপস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 'আজ যদি সে এখানে এই দৃশ্য দেখিত, তবে তাহার অসার যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইত' এবম্বিধ মন্তব্য প্রকাশপূর্বক আনন্দোৎফুল্ল চক্ষে শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া তাঁহাদের অনুকূল ঘাড়-নাড়ায় তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। আমি এবং গণেন আমাদের বক্ষে সূত্রাকারে লম্বিত হিন্দুধর্মের গৌরবের শুভ্রমহিমা প্রকট করিয়া একেবারে মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। পুরোহিতকে কিছু দক্ষিণা দেওয়াতে তিনি এত আপ্যায়িত হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ আমাদের অনুরোধে নিত্যানন্দ-প্রভুর হস্তলিখিত ভাগবত ও তাঁহার ভগ্ন যষ্টি আনিয়া দেখাইলেন, আমরা তাহা লইয়া আসিয়া নিবেদিতাকে সেই মন্দিরের বাহিরে দেখাইলাম। পুঁথি ও লাঠির উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তিনি পাঁচটি টাকা দক্ষিণা দিলেন। পুরোহিত আনন্দে গদগদ হইয়া একটি 'শিরোপা' আনিয়া নিবেদিতাকে মাথায় ধারণ করিতে বলিলেন। তখন হ্যাটটি হাতে লইয়া ভগিনী নিজের শিথিল কবরী ও সিঁথির মূল পর্যন্ত জড়াইয়া রক্তবস্ত্রটি ধারণ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা তখন আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'এই শিরোপা (রক্ত-বস্ত্রখণ্ড) অতি মূল্যবান পদার্থ। শ্যামসুন্দরের মন্দিরের এই শিরোপা মাথায় পরিতে পারিলে এককালে রাজারাও ধন্য হইতেন, আমরা আপনাকে কম গৌরব দিলাম, মনে করিবেন না, এটা একটা মস্তবড় গৌরব। তবে আপনি কে এইবার পরিচয় দিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন।' তাঁহার ইঙ্গিতে আমি ও গণেন বলিলাম, 'ইঁহার অপর পরিচয়ে আপনারা কি চিনিবেন? ইনি জনৈক ইংরেজ মহিলা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণের মঠে আশ্রয় লইয়াছেন।' একজন বলিলেন, 'তবে কি ইনি নিবেদিতা?' তখন আর গোপন করা চলে না। হিন্দুর দলের কাহারও কাহারও চোখে জল আসিল, কেহ বা ভক্তিতে গদগদকণ্ঠ হইলেন, কেহ বা দুই হাত জোড় করিয়া নিবেদিতাকে নমস্কার করিলেন। নিবেদিতা সবিনয়ে বিদায় চাহিলে পুরোহিত বলিলেন, 'সেও কি হয়? প্রসাদ পাইয়া যাইতে

হইবে।' খানিক পরে রসগোল্লার এক বিরাট ঠোঙা উপস্থিত হইল, তাহার নীচু হইতে অজস্র রস বাহকের গায়ে পড়িয়া তাহাকে রসিক করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা দুইজনে বেশ উদরপূর্তি করিয়া খাইলাম। ভগিনী একটি খাইয়া অব্যাহতি পাইলেন না, নানারূপ মিশ্রকণ্ঠের অনুরোধ-সমবায়ে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে আর একটি খাইতে হইল। বেলাশেষে আমরা নেড়া-নেড়ীর মেলার জায়গাটা দেখিলাম। নিবেদিতা সেইখানে বসিয়া অনেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সেই মেলা সম্বন্ধে কতকগুলি নোট লিখিয়া লইলেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ ছিল, এই বৌদ্ধধর্মের সমাধিক্ষেত্র দর্শন সম্বন্ধে আমি একটি সন্দর্ভ লিখিব; তখন তিনি সেই নোটগুলি আমায় ব্যবহার করিতে দিবেন। আজ বহু বৎসর পরে সেই সন্দর্ভ লিখিলাম, কিন্তু সেই নোটগুলি আর পাওয়ার কোন সুযোগ হইল না।

সন্ধ্যাকালে ইলিশ মাছগুলি নিবেদিতার ভৃত্য রামলালের হাতে দিয়া আমরা বাগবাজারের ঘাটে উঠিয়া সেই ভ্রমণবৃত্তান্তের আলোচনা করিতে করিতে যাইতেছি, এমন সময় একটা সাজিতে কতকগুলি মেটে পুতুল লইয়া একটা ফেরিওয়ালা বিক্রয় করিতে যাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন এবং পুতুলগুলি দেখিয়া আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইলেন। পুতুল তিনটি এক পয়সায় বিক্রয় হয়, হলদে আর কালো রঙে রঞ্জিত, স্ত্রীমূর্তির মাথায় একটা খোঁপা ও জগন্নাথের হাতের মত ছোট অর্ধসমাপ্ত দুইখানি হাত, সেই হস্তদ্বয় হইতে স্তনদ্বয় বড়, পায়ের জায়গাটা মৃত্তিকায় গড়া শিবলিঙ্গ অথবা বেতের মোড়ার মত। এরূপ পুতুল তো শত শত অলিতে গলিতে পাওয়া যায়, বঙ্গের এমন বালকবালিকা বোধহয় নাই, যাহারা এরূপ পুতুলের দশ বিশটা শৈশবে না ভাঙিয়াছে। এই পুতুল হাতে লইয়া 'Oh most wonderful' (অতীব আশ্চর্য) ক্রমাগত এইরূপ প্রশংসোক্তি করিতে লাগিলেন, আমি বলিলাম, 'একেবারে ক্ষেপে গেলেন নাকি? এগুলির ভিতরে কি পেয়েছেন যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন করছেন? এখুনি আবার খড়দহের মত এখানে ভিড় জমাবেন, দেখছি।' নিবেদিতা আমার কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল 'অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত, অতি সুন্দর' এইরূপ মন্তব্য উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিতে করিতে এক টাকায় সেই সমস্তগুলি পুতুল কিনিয়া রামলালের হাতে দিলেন। তারপর আমি বিদায় লইলাম।

পরদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুতুলগুলি লইয়া কাল ওরূপ করিয়াছিলেন কেন?' তিনি বলিলেন, 'আপনি ও বুঝবেন না, ওর মত সুন্দর ও আশ্চর্য জিনিস আমি ভারতবর্ষে দেখি নাই।' এই বলিয়া অতি লুব্ধ চক্ষে তাহার একটি হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহাকে বাড়াইবেন, তাহার মাথা আকাশে না ঠেকাইয়া ছাড়িবেন না। আমি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু তিন দিন পরে মেজাজটা একটু পড়িয়া আসিয়াছিল, সেদিন হাসিয়া বলিলেন, 'দীনেশবাবু, ওই পুতুল আমার এত ভাল লাগিয়াছে কেন, শুনিবেন? ৩০০০ খৃীঃ পূর্বের অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বের অনেকগুলি জিনিস সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে লইয়া আসিয়াছেন। আমি এইবার বিলাত যাইয়া সেগুলি দেখিয়া আসিয়াছি, সেই সংগ্রহের ভিতর অবিকল এই পুতুলের মত পুতুল দেখিয়া আসিয়াছি।'

নিবেদিতা কালীমন্দির দেখিলেই প্রণাম করিতেন; 'Mother Kali' নামক পুস্তকে রামপ্রসাদের গানের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা শাক্ত লেখকেরই ভক্তির অর্ঘ্য স্বরূপ। কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃপুরের একটা কথা একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আপনি কি সত্যই ভগবানকে "মা" বলিয়া ডাকিতে পারেন?' আমি বলিলাম, 'কেন পারব না? তিনি পিতা, তিনি মাতা, এ আমাদের মুখের কথা নহে। মাতৃ-স্তন্যপানের সঙ্গে আমরা ভগবানের মাতৃত্ব উপলব্ধি করিয়া বড় হইয়াছি, কালীমন্দিরে যাইয়া যখন "মা-মা" বলিয়া প্রণাম করি—তখন আমরা কপটতার অভিনয় করি না।' তিনি বলিলেন, 'দেখুন, এইখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনের তফাৎ, আমি কিছুতেই মনে মনে ভগবানের মাতৃভাব উপলব্ধি করিতে পারি না। তাঁহার পিতৃত্বই আমাদের চিরাগত সংস্কার।'

এই সময় অর্থাৎ যখন মৃত্যুর যাত্রী হইয়া তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দারজিলিং যাইবেন; তাহার দুই মাস পূর্বে, তিনি আমার নিকট হইতে একটি প্রস্তরময় 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র বিগ্রহ চাহিয়া লইয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, 'এ মূর্তি আপনাকে দিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছি, আপনি এটি না নেন—ইহাই আমার ইচ্ছা।' তিনি বলিলেন, 'আমি আপনার মত ঐতিহাসিকের মুখে দিদিমার গল্প প্রত্যাশা করি না।' একরূপ জোর করিয়া সেই মূর্তি লইয়া গিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগ একটা কুলঙ্গীর সঙ্গে তিনি গাঁথিয়া ফেলিয়া অতি যত্নে পুষ্প ও ধূপদীপ দিয়া প্রত্যহ তাহার সেবা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভীত কণ্ঠে ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন, 'এ মূর্তি আপনি এখনি লইয়া যাউন এবং আমাকে রক্ষা করুন, যেদিন হইতে এই মূর্তি এই গৃহে আসিয়াছে, সেইদিন হইতে নিবেদিতার যে কত অশান্তি ঘটিয়াছে তাহা আর কি বলিব? মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে শান্তি দিয়াছে মাত্র।' আমি বলিলাম, 'কেন? এ মূর্তি তো তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম—তাঁহাকে পাঠাইয়া দিন।' ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন, 'ব্রাহ্ম হইলে কি হইবে! তাঁহারা কিছুতেই এ মূর্তি লইতে সম্মত নহেন।' ক্রিশ্চিয়ানা এই মূর্তি সম্বন্ধে এরূপ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আমি বিগ্রহখানি অন্যত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

দারজিলিং যাওয়ার কয়েকদিন পূর্বে আমার ইংরাজীতে লিখিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' বৃহৎ ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া আসিল, আমি তাহার দুইখানি তাঁহাকে দিলাম। ভূমিকায় তাঁহার নাম না প্রকাশ করার জন্য তিনি আমাকে বাধ্য করিয়াছিলেন। পুস্তক পাইয়া যে তিনি কতরূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব!

তাঁহার শেষ কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে। একটু করুণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'এই বই উপলক্ষে বহুদিন আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি, দুইজনে একত্র হইয়া খাটিয়াছি। এখন কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, আর বোধহয় আপনাকে তেমন ঘন ঘন পাইব না। কিন্তু যে সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আপনি ভাঙ্গিবেন না, আপনি যদি পূর্ববৎ না আসেন, তবে আমি কষ্ট বোধ করিব।' বস্তুত তাঁহার ভগিনীজনোচিত আদর আমার নিকট কত মূল্যবান ও প্রীতিকর ছিল, তাহা আর কি লিখিব! যেদিন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম, সেদিন

সমস্ত বোসপাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া তিনি অনেক কবিকেই তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসা দিতেন কিন্তু তিনি নিধুবাবুর গানের যত প্রশংসা করিতেন, এত আর কাহারও নয়, রামপ্রসাদ কি চণ্ডীদাসেরও নয়।

২২

কলিন সি. গ্যালিল্যাণ্ড এবং জে. ডি. অ্যাণ্ডারসন

সৌভাগ্যবশত আমি আমার স্বদেশীয় বন্ধুদের মত অনেক পদস্থ ও মনস্বী য়ুরোপীয় বন্ধু পাইয়াছি, তাঁহাদের সৌহার্দ্য আমার গৌরবের বিষয় হইয়া আছে। আমার এক অতি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন কলিন. সি. গ্যালিল্যাণ্ড। তিনি 'সিটি অব গ্লাসগো' এবং 'লণ্ডন ল্যাঙ্কেসায়ার' বীমা কোম্পানির বড় সাহেব ছিলেন। মাসিক আয় ছয় সাত হাজার টাকা ছিল। কলিকাতার ইংরাজ ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা ছিল। ছোটলাট বাহাদুর যে সভার সভাপতি ছিলেন, স্কট বণিককুলের সেই সভার পরবর্তী সভাপতি হইয়াছিলেন গ্যালিল্যাণ্ড সাহেব। তিনি আমাকে সহোদরের মত ভালোবাসিতেন। একবার চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'না তাহা, কিছুতেই হইবে না, আমি তোমাকে "রায়সাহেব" লিখিতে পারিব না, তাহা হইলে তুমি পর হইয়া যাইবে।'[১]

তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত গিয়াছেন। গত ডাকে তাঁহার একখানি টাইপ করা চিঠি পাইয়াছি, তাহা এত বড় যে আমার তাহা পড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়াছে. পত্র একখানি পুস্তিকা-বিশেষ। এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'আমি ৩২ বৎসর ভারতবর্ষে ছিলাম, ইহার মধ্যে বহু ভারতীয় বন্ধু জুটিয়াছিল, কিন্তু গিরীশ ও তাহার মাসতুত ভাই দীনেশের মত এমন অন্তরঙ্গ কেহ হয় নাই।'[২] তাঁহাদের দেশের জড়বাদী সভ্যতার নিন্দা করিয়া এবং আমাদের সাত্ত্বিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে বহু বিতর্ক করিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'সে ছিল আমাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণত্ব দেখাইবার এক মহা-সমরক্ষেত্র, কিন্তু সেই যুদ্ধ কি তৃপ্তিদায়ক ছিল! তাহাতে আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিতাম। আমি তোমাকে সরলভাবে বলিতে পারি যে আমা অপেক্ষা তোমার গুণানুরক্ত বন্ধু নাই।[৩] সে সকল দিন তখন মহার্ঘ বলিয়া মনে করা হয় নাই. কিন্তু এখন মনে সাধ হয়. সেরূপ জীবন যদি আবার পাইতাম! তাহার মত সুখকর সময় আমাদের জীবনে বোধহয় নাই। তোমাকে এবং তোমার মত আর কয়েকজন বন্ধু না পাইলে হয়ত আমার জীবনের এরূপ সফলতা হইত না, অন্তর হইতে এই কথাগুলি বলিতেছি, ঠিক জানিও।'[৪] আমি রোগের শয্যায় কতদিন এই সহৃদয় বন্ধুকে আমার শয্যার পার্শ্বে

[১] "No, not "Rai Saheb" that would be foreign to me."

[২] "I counted, in my 32 years of Indian experience, many Indian friends, but there were none like Girish and his cousin Dinesh."

[৩] "It was a great battle of wits, at times, but it was all so refreshing, and we won each others' esteem and regards . . . . I can assure you, that you have no sincerer admirer than myself."

[৪] "Without you and men like you Dinesh, I would not be where I am to day *and that is sure*."

পাইয়াছি। এমন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অহংকার বা ইংরেজসুলভ গর্ব কিছুই ছিল না। ৩২ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াও বর্ণ-বৈষম্যের অহংকার তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা হইতে তাঁহার খাঁটি মনুষ্যত্ব প্রমাণ করিবার আর কি থাকিতে পারে! ই'হার সঙ্গে তো বহু বৎসরের আলাপ-পরিচয় ছিল। কিন্তু যাঁহাকে চোখে দেখি নাই, যাঁহার মুখের কথা কানে শুনি নাই, তিনি কি করিয়া সহোদরাধিক বন্ধু হইতে পারেন? অথচ অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান, চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কমিশনার, কেম্ব্রিজের বাংলার অধ্যাপক ডঃ জে. ডি. অ্যাণ্ডারসন আমাকে না দেখিয়াও আমার প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, যাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। আমার ইংরাজী, বাংলা বইগুলির সামান্য গুণ ইনি এত বাড়াইয়া দেখিতেন যে, তাঁহার প্রশংসোক্তিতে আমি অনেক সময় লজ্জিত হইয়া পড়িতাম। অ্যাণ্ডারসন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যখন শিশু তখন সিপাহী যুদ্ধের হাঙ্গামা হয়। তাঁহার মাতাও তাঁহার শৈশব অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করেন। পিতা একটি হিন্দু আয়া ও হ'রে নামক বাঙালী চাকরের উপর তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া বিদ্রোহ সংক্রান্ত কাজে চলিয়া যান। হ'রে তাঁহাকে ভূতের গল্প শুনাইত, তিনি ভয়ে চক্ষু বুজিয়া শুনিতেন কিন্তু নেটের মাশরীর ভিতরে গেলে মনে করিতেন, ব্যুহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে ভূত-প্রেত প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রায় ৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, ইংরাজী জানিতেন না। একখানি পত্রে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে এই কয়েক বৎসরের প্রভাব জীবনে এতটা বেশী হইয়াছিল যে ইংরাজীর উচ্চারণ বাঙালীরা যে ভাবে করিয়া থাকে, আমি এখন পর্যন্ত কোন কোন শব্দ সেই ভাবে উচ্চারণ করিয়া ধরা পড়িয়া যাই। সেই প্রভাব হইতে এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত ডোনাল্ড ফ্রেজার (এখন রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট) আমাকে লিখিয়াছেন, একবার শিশু এ্যাণ্ডারসনের জ্বর হইয়াছিল, তখন হিন্দু আয়া কালীঘাটে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বলি দেওয়া পাঁঠার রক্তে স্নান করাইয়া দিয়াছিল, তাহাতেই নাকি তাঁহার জ্বর সারিয়া যায়।[৩] অ্যাণ্ডারসনের মত বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি য়ুরোপেও খুব বিরল। তিনি ভারতবর্ষীয় বহু ভাষা জানিতেন; মেচ্, টিবেটান, অহম্দের ভাষা, আকা ভাষা, টিপ্রা ভাষা, প্রভৃতি বহু ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল; তাহা ছাড়া সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতিতেও তাঁহার আশ্চর্য দখল ছিল। বিলাতী বড় বড় সমস্ত পত্রিকার তিনি রীতিমত লেখক ছিলেন এবং মৃত্যুর কিছু পূর্বে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি আধুনিক ভাষা সংক্রান্ত একটা নূতন সিরিজ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। অ্যাণ্ডারসনের বাংলা ভাষার বইখানি দিয়া এই সিরিজের মুখপাত করা হইয়াছে। ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি 'ঘুমের ব্যারামে' আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

প্রথম পত্র ব্যবহারের পরই তিনি আমার ইংরাজীতে লিখিত 'বঙ্গভাষার

[৩] "He got ill. The Ayah took him to Kalighat, a goat was decapitated, he was smeared with blood and Mantras were recited. He recovered."

ইতিহাস'খানি সম্বন্ধে লিখিলেন, 'ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয়গুলি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে গভীর শ্রদ্ধার সহিত আপনার সমক্ষে তাঁহাদের টুপি নামাইতে বাধ্য হইবেন।'[৬]

ফ্রেজার সাহেব লিখিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের প্রতি তাঁহার এতই প্রাণের টান ছিল যে, বিশাল নদনদী-বেষ্টিত ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের কথা উঠিলে তিনি আর জীবনে তাহা দেখিতে পাইবেন না, এই আক্ষেপে তাঁহার চক্ষে জল আসিত। অ্যান্ডারসন 'ব্রহ্মপুত্রের স্নানের' সময় একবার তেজপুরে ছিলেন, তখন একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁহাকে অপরাপর যাত্রীর সঙ্গে স্নান করাইয়া দিয়াছিল। তিনি বহু কষ্টে একজন চাকরের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া 'আকা' ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সরকারের নিকট ঐ ভাষায় পরীক্ষা দিতে আবেদন করেন। সেই ভাষাবিৎ আর কেহ না থাকাতে তিনি নিজেই সরকার কর্তৃক পরীক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া নিজের পরীক্ষা গ্রহণ এবং তদনন্তর পারিতোষিক লাভ করেন।[৭] তিনি বাংলা ভাষায় এতটা ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে একবার নদীয়ার এক বুড় উকিলকে তিনি ভুল বাংলায় সওয়াল-জবাব করার অপরাধে জরিমানা করিয়াছিলেন।[৮] তিনি একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'আপনার বই পড়িলে আমার নিজেকে ক্ষুদ্র এবং অজ্ঞ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইঁদুরও সিংহকে সাহায্য করিয়াছিল—এটি জানিবেন, অন্তত আমি আপনার বইয়ের প্রচারের পক্ষে কিছু সাহায্য করিতে পারিব।'[৯]

আমার 'মধ্য-যুগের বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য' নামক ইংরাজী পুস্তকের পান্ডুলিপি তাঁহাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম। তখন ঘোর যুদ্ধানলের আহুতি-স্বরূপ ইংরেজ পরিবারের বহু পুষ্পতুল্য সুকুমার জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে উৎসর্গীকৃত হইতেছিল। অ্যান্ডারসনের এক পুত্র যুদ্ধে নিহত হন, এবং অপরাপরেরা রণক্ষেত্রে ছিলেন। আমার পান্ডুলিপি পাইয়া তিনি লিখিলেন, 'যদি অবস্থাচক্রে আমার সাহসে কুলায়, তবে এই বইখানির একটি ছোট ভূমিকা আমি লিখিব। সেই ভূমিকায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব কি জন্য আপনার সমস্ত পুস্তকের একজন রীতিমত পাঠক মনে করেন যে, এই বইখানি শুধু কলিকাতায় নহে, লন্ডনে এবং প্যারিসে, অক্সফোর্ড

৬ "All students of Indian Subjects must take off their hats to you with profound respect."

৭ "When he had learnt this language, he reported to Government his desire to take an examination in it. Government asked him to name an examiner. He replied, there was no one to examine. So he was told to set himself an examination paper. He submitted such a paper to Government. It was approved. He then answered it and corrected it and had a viva voce with an Aka and passed himself. Then he drew his reward. Such was his story. I do not vouch for its accuracy or my memory of exact details."

৮ "In Nadia he fined an old pleader for careless Bengali in pleading.

৯ "Your book makes me feel humble and ignorant. But the mouse helped the lion, you know, and I may at least be able to make your work known over here."

ও কেম্ব্রিজে সর্বত্র অধীত হওয়ার জিনিস হইয়াছে। আমি এই পুস্তক অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি ও করিতেছি, ইহা হইতে অনেক অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং আদ্যন্ত অনুরাগের সঙ্গে পড়িয়াছি। যে ভয়ানক সময়ে বহির্দ্বারে একটু কড়া নড়িলে, কোন চিঠি আসিলে আশংকায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, যখন ভয়ানক দুঃখ ও ভয়ে আমরা অভিভূত হইয়া আছি, এই সময়েও আপনার এই চমৎকার পাণ্ডুলিপি পড়িয়া সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিতেছি। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারেন, আপনার বইখানির বিষয় ও রচনাপদ্ধতি কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমি আপনার অতি চমৎকার বইখানি ফিরিয়া পড়িবার ব্যস্ততায় এই পত্রখানি অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে সারিলাম।'[১০]

আমার লেখার প্রতি তাঁহার এতই অনুরাগ ছিল যে ইংরাজী বাংলা যাহা কিছু লিখিতাম, তাহারই অশেষ সুখ্যাতি করিতেন। প্রীতির রঙ্গীন চশমা পরিয়া তিনি আমার লেখাগুলি পাঠ করিতেন, সেই প্রীতিই আমার সামান্য রচনায় সৌন্দর্য আবিষ্কারের যাদুকাঠি ছিল। শুধু আমার ইংরাজী বই নয়, বাংলা লেখাগুলিও আদ্যন্ত অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন : মদ্‌রচিত 'সতী' পড়িয়া লিখিয়াছিলেন, 'আমার সব চাইতে একটি বিষয় খুব ভাল লাগিয়াছে, ফরাসী লেখক জুলে লিমেটার যেরূপ প্রাচীনতম কথাগুলি ও সেমিটিক জাতীয় পৌরাণিক কাহিনী নূতন সাজে সাজাইয়া বাহির করিয়াছেন, আপনিও অবিকল সেইভাবে প্রাচীন উপকথাগুলির সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন। সেই প্রাচীন কথা-সাহিত্য যে সর্বসময়ে চিন্তাক্লিষ্ট মানবচিত্তকে সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তৎসম্বন্ধে উক্ত ফরাসী লেখকের মতই আপনার সরল বিশ্বাস। লিমেটারের ন্যায় রহস্য-প্রিয়তাও আপনার লেখার বিশেষ একটা গুণ; যে-স্থানে আপনি তরুণ-বয়স্কা দেবীদের আড়ম্বরপ্রিয়তা, ও সতীর রুদ্রাক্ষবলয় ও বল্কলবাসের প্রতি অবজ্ঞা বর্ণনা করিয়াছেন, সে জায়গাটি আমার চমৎকার লাগিয়াছে। আপনি কি জানেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের সুন্দরী মেয়েরা এখনও অতি মনোরম বল্কল-বাস পরিয়া থাকেন? সেগুলি তাহাদের চমৎকার মানায়।'[১১] আমার 'নীলমাণিক' নামক গল্পের

[১০]"I propose to send with it, if circumstances leave me the courage to write it, a short preface explaining why in the judgment of a very old student of all your works, your book should be read not only in Calcutta but in London and Paris and Oxford and Cambridge. I have read it and am reading it with great delight and profit and very real sympathy. Think how great must be the charm of your topic and treatment when in this fearful year of anxiety and sorrow, the reading of your delightful Ms. has given me rest and refreshment at a time when every post, every knock at the door may bring us sorrow. I write this in frantic hurry in order to go back to your most interesting and fascinating pages."

[১১]"But what interests me most is the fact that you retell the story in exactly the same fashion as Jules Lematre tells the ancient legends of classical antiquity and of the Semetic East, with a pious delight and belief in their charm and beauty, and power

বইখানি পড়িয়া তিনি ১৬ পৃষ্ঠার এক চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রশংসার অবধি ছিল না। তিনি মনে করিতেন, 'নীলমাণিক'কে আমি নিজের চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া দিয়াছি।[১২] ঐ পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছিলেন, 'সুন্দরী, জেদপরায়ণা দুর্ভাগা এবং বিপথগামিনী রাণী-চরিত্রের শেষ অংশের মত করুণ এবং মর্মস্পর্শী লেখা আমি বহুদিন পড়ি নাই।'[১৩]

একদা নিউনহাম কলেজের দুই শত মহিলার নিকট তিনি আমার 'সতী' গল্পটি পড়িয়া তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং 'এসিয়াটিক কোয়ারটারলি' পত্রিকায় ঐ পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া একটি জীবনী প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিলাতপ্রত্যাগত অনেক ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছি, তিনি আমার সম্বন্ধে সকলের নিকট এত উচ্চ প্রশংসা করিতেন, যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ আমার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের খুব বেশী একটা মূল্য দিতে চাহিতেন না, তাঁহাকে আমার পক্ষপাতী বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন।

আমাকে তিনি বহু পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অর্ধেকের বেশী হারাইয়া গিয়াছে। আর যাহা আছে, তাহা আমি বাঁধাই করিয়া রাখিয়া দিয়াছি, তাহা প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠা হইবে। এই সকল পত্রে রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মসম্বন্ধীয় নানারূপ আলোচনা আছে। একবার য়ুরোপীয় নীতিমূলক ধর্ম ও আমাদের ভক্তিবাদ লইয়া তাঁহার সঙ্গে আমার খুব বিতর্ক চলিয়াছিল। ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া তিনি ঐশ্বরিক বিধানের সততা নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু ন্যায়ান্যায় ও ধর্মাধর্মের ঊর্ধ্বে যে একটা ভগবৎ-লীলার জগৎ আছে, নীতিজ্ঞের সূক্ষ্ম বিচারে যাহা আয়ত্ত করা যায় না, যাহা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভক্তের একান্ত আশ্রয় ও সান্ত্বনার চরম স্থল—সেইটি তিনি স্বীকার করিতে চান নাই, অথচ প্রতিপক্ষের মতের উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্গভাষা তিনি প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত একথা স্বীকার করেন নাই, তাঁহার বিশ্বাস ছিল আর্য-উপনিবেশের পূর্বে এদেশে তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষামূলক এক প্রকার অনার্য ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই মূল ভাষার উপর প্রথম প্রাকৃত তৎপরে সংস্কৃত ভাষার অভিযান আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই বিষয়ে বাংলা ভাষা ও ফরাসী ভাষা তিনি একরূপ বলিয়া মনে করিতেন। ফরাসী ভাষা গ্যালিক ভাষার ভিত্তির উপর ল্যাটিন ভাষার অভিধানিক ঐশ্বর্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। তিনি মনে করিতেন, বদো মেচ্, কাছাড়ি ও মণিপুরী ভাষার চিহ্ন

to give solace to the poor puzzled mortals. Like M. Lematre your tale has the additional delight of humour. That is a very delightful passage in which your little goddesses show off their jewels and laugh at Sati's bark-dress and rudraksa-bracelet and do you know that in the Pacific Islands the pretty girls still wear the most lovely bark-dresses which are extremely becoming?"

১২ "There is an element of self-portraiture in your vivid picture of Nilmanik."

১৩ "As for poor little Rani, wilful, beautiful, erring, unhappy, that scene of the poor girl's death is one of the most touching and significant things I have read for many a long day."

যদিও বাংলা ভাষায় এখন ততটা দেখা যায় না—যেহেতু প্রাকৃত-অভিধান অগস্ত্যমুনির ন্যায় সেই পুরাতন অনার্য ভাষাটাকে একেবারে গণ্ডূষ করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—তথাপি খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বাংলা ভাষার সেই অনার্য ভাষার সুরটি পাওয়া যাইতে পারে। এই সংমিশ্রণে বাংলা ভাষা তাহার অসামান্য ক্ষিপ্রগতি, কোমলতা ও সর্বতোমুখী প্রকাশ-শক্তি অর্জন করিয়াছে। তিনি 'বদো' ভাষা হইতে অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত ভাষায় প্রচলিত বহুল অসমাপিকা ক্রিয়ার ভঙ্গীটি এখনও বঙ্গভাষার ভিত্তিমূলে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—উদাহরণ-স্থলে তিনি এই ছত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব।'—অসমাপিকা ক্রিয়াবহুল এই প্রকার কথার বিন্যাস সংস্কৃত বা প্রাকৃতে দৃষ্ট হয় না ; 'বদো' প্রভৃতি ভাষায় এই ভাবের রচনা পাওয়া যায়। তিনি হিন্দী ও ইংরাজীতে শব্দের উপর জোর দেওয়াটা ঐ ভাষাগুলির বিশেষ লক্ষণ মনে করিতেন এবং ফরাসী ও বাংলায় একটা পূর্ণ বাক্যাংশের উপর জোর দেওয়ার প্রণালীর প্রতি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ঐ word-stress এবং phrasal accents, এতদুভয়ের লক্ষণ লইয়া তিনি অনেক দীর্ঘ চিঠি আমায় লিখিয়াছিলেন।

বস্তুত তাঁহার চিঠিগুলি এত বিভিন্ন বিষয় লইয়া গবেষণার উপাদান প্রদান করিতেছে, যে সেগুলি প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হওয়ার যোগ্য, সেগুলি একজন আজন্ম সাহিত্যসেবীর সরল প্রাণের উপহার, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন, এবং তাঁহার সহৃদয়তা ও সৌহার্দ্যের খনিস্বরূপ—হাতের লেখাগুলি ঠিক মুক্তার ন্যায়। আমি ভুল করিলে তিনি সহৃদয়তার কৌশলে আমাকে কি ভাবে সংশোধন করিয়া দিতেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি কয়েকবার তাঁহার নিকট লাল কালিতে চিঠি লিখিয়াছিলাম, বোধহয় চিঠিপত্রে লাল কালি ব্যবহার ইংরাজী কায়দা-বিরুদ্ধ। আমাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে তিনি সংকোচ বোধ করিতেছিলেন, অথচ আমি যখন ক্রমাগতই লাল কালি চালাইতেছিলাম, তখন আমাকে উৎসাহ দেওয়া কিছুতেই তাঁহার পোষাইতেছিল না—এটা বুঝিতে পারিলাম। তিনি একখানি চিঠি এইভাবে শুরু করিলেন, 'লাল কালিতে লিখিলাম, ক্ষমা করিবেন, কি করিব? ছেলেদের খাতা সংশোধন করিতেছিলাম, একটি ছেলে আমার কালো কালির দোয়াতটা লইয়া পলাইয়াছে।'[১৪]

তাঁহার সঙ্গে পত্রব্যবহারের এক বৎসর পরে তিনি আমাকে একখানি চিঠিতে লিখিলেন, 'আমি আপনাকে আর 'মিস্টার সেন' বলিয়া সম্বোধন করিতে চাই না। 'মিস্টার' কথাটা ছাড়িয়া দিতে চাই, আপনি কি বলেন? আপনিও আমাকে আপনার প্রবৃত্তি হইলে শুধু 'অ্যান্ডারসন' বলিয়া সম্বোধন করিবেন।'[১৫] পরে তিনি চিঠিগুলিতে 'ভাই আমার' কথাটা বাংলায় লিখিয়া ইংরাজীতে আর সব কথা লিখিতেন। কখনও কখনও ইংরাজী পত্রের নিম্নে অ্যান্ডারসন না লিখিয়া 'ইন্দ্রসিংহ' লিখিতেন।

১৪ "Excuse red ink! I have been correcting excercises and one of the children has carried off the black inkpot."

১৫ "May I drop calling you "Mr. Sen" and will you, if you like, call me 'Anderson' without 'Mr'?"

আমি একবার লিখিয়াছিলাম, 'আপনি 'ইন্দ্র সিংহ' না লিখিয়া 'ইন্দ্র সেন' লিখুন না কেন? তাহা হইলে আপনি ঠিক আমাদের আত্মীয় হইয়া দাঁড়াইবেন; তাহা ছাড়া Anderson এর Son এর সঙ্গে 'সিংহ' অপেক্ষা 'সেনের' সাদৃশ্য বেশী।' ইহার পর হইতে তিনি পত্রে 'ইন্দ্র সেন' বলিয়া অনেকবার স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

আমি তাঁহাকে যে সকল চিঠি লিখিতাম, তাহার প্রশংসা তিনি অনেকের কাছে করিতেন। ডঃ তারাপুরওয়ালার কাছে একখানি চিঠিতে, আমার পত্রগুলি তাঁহার নিকট কিরূপ ভাল লাগে তাহা লিখিয়াছিলেন। আমাকে একবার লিখিয়াছিলেন, 'আপনাকে আমি কখনও চর্মচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু এইটি আমার সান্ত্বনা যে অনেক সময় মুখের কথায় লোককে যাহা বুঝা যায়, চিঠিপত্রে তাহার চাইতে ঢের বেশী বুঝা যায়। আমি নিশ্চয়ই একটা বড় ভুল করিয়াছি, যদি আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা ঠিক না হইয়া থাকে; আমি আপনার চিঠিপত্র পড়িয়া সর্বদা মনে করিয়া থাকি যে, আপনি একজন অতি উৎকৃষ্ট সহৃদয় ব্যক্তি।'[১৬] তাঁহার প্রীতি আমার সমস্ত ক্ষুদ্রতার উপর খুব বড় রংয়ে ফলাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র যুদ্ধে মৃত হন, আমি সান্ত্বনা দিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম, উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'পত্রের গোড়াতেই আমি বলিতে চাই—এটি অত্যন্ত আন্তরিক এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন যে, পৃথিবীর সমস্ত স্থান হইতে আমাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের নিকট হইতে সান্ত্বনা-সূচক চিঠি পাইয়াছি, কিন্তু কাহারও চিঠিতে আপনার কথাগুলির অপেক্ষা আমরা বেশী সান্ত্বনা ও আন্তরিকতা পাই নাই।'[১৭]

আমি সমস্ত শোকদুঃখ বাসি ফুলের মত সরাইয়া ভগবানের শ্রীচরণপদ্মে ভক্তি ও নির্ভরের নূতন ডালি উপহার দিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম।

তাঁহার শত শত পত্র হইতে আর বেশী কিছু উদ্ধৃত করিব না। তিনি সিলেট-হবিগঞ্জে প্রথম দাম্পত্যজীবন কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, খোয়াই (ক্ষেমংকরী) নদীর সংস্রবে কতরূপ কবিত্বময় ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার মন ভরপুর হইত, তাহা একখানি চিঠিতে অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রমাগত দুই ডাকে আমার চিঠি না পাইলে তিনি সহোদরের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইতেন। আমার চিঠি জার্মান ক্রুজারে নষ্ট করিয়া ফেলিল কিংবা আমি হঠাৎ অসুখ করিয়া বসিলাম, এইরূপ নানারূপ দুশ্চিন্তাতুর হইয়া তিনি কত কি লিখিতেন! আমার স্নায়বিক দুর্বলতা কিসে ভাল হইবে, সাত সমুদ্র তের নদী দূরে বসিয়া ব্যস্ত হইয়া তিনি সেই চিন্তা করিতেন। শারীরিক ব্যায়াম কি ভাবে করা দরকার, কত বৈজ্ঞানিক মত খুঁজিয়া

১৬ "It has always been something of a consolation to me for not having met you in the flesh that often a man's written style in his letters tells his temperament and character even better than his spoken words, and I am very much mistaken if my unseen friend Dinesh is not one of the kindest and best of men."

১৭ "In the first place let me tell you, with the greatest earnestness and truly that of all the kind messages of sympathy and regret which has reached us from friends and relatives in all parts of the world, none has moved and comforted us more than your affectionate words."

খুঁজিয়া সেই উপদেশ বাহির করিতেন এবং শরীর ও বয়সের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইতেন। গত ১৯২০ সালের ২৪শে নভেম্বর সাড়ে ছয়টার সময় তিনি স্বর্গীয় হইয়াছেন। পুত্রশোক ও অতিরিক্ত খাটুনিতে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধের উপলক্ষে, বহু ভাষার অধিকার থাকার দরুণ, গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে অনুবাদকার্যে বেগার খাটাইয়া ভগ্ন স্বাস্থ্যের যেটুকু ভাঙিতে বাকি ছিল, তাহার উপর শেষ আঘাত দিয়াছিলেন। অবশ্য স্বদেশ-প্রেম তাঁহাকে এই কার্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। অনেক ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছেন, তিনিও সেই যুদ্ধের জন্য খাটিয়াই প্রাণ দিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার য়ুরোপীয় বন্ধুবান্ধব ও সাহিত্যিক সুহৃদ্-বর্গ এক বাক্যে বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের বঙ্গসাহিত্যের এরূপ প্রীতিমূলক, এরূপ গৌরবাত্মক এবং এরূপ বিজ্ঞজনোচিত সমালোচনা করিবার লোক বিলাতে আর কেহ নাই। যেদিন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছিলাম, সেদিন আমি নিদারুণ পীড়ায় শয্যাগত, সেইদিন মনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছিল তাহার বেগ এখনও থামে নাই। এখনও বিলাতী ডাক আসিলে অ্যাণ্ডারসনের পত্র না দেখিয়া হঠাৎ মনের প্রফুল্লতা সমস্ত চলিয়া যায়, নূতন বই প্রকাশিত হইলে তাঁহার কথা মনে পড়িয়া কান্না পায়।

তিনি আমাকে অনেকগুলি চিঠি বাংলায় লিখিয়াছিলেন, তাহার বেশীর ভাগ বন্ধুবান্ধবেরা লইয়া গিয়াছেন, একখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

২৯শে জুলাই, ১৯১৫
মণ্টিন হাউস, ব্রুকল্যাণ্ড অ্যাভিনিউ,
কেম্ব্রিজ

প্রিয় ভাই,

অবশেষে আমি যথাসাধ্য ক'এক কথা আপনার জন্য উপক্রমণিকা স্বরূপ লিখিয়া উঠিয়াছি। ভরসা করি ইহা আপনার প্রয়োজনের মত হইবে। ইহাতে যদি কোন 'ভুল চুক' থাকে, আপনার বুড়ো ভাইকে ক্ষমা করিবেন। কাল রাত্রি ১২টা পর্যন্ত লিখিয়াছি। আমার এই সামান্য দান আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম। মনে করিবেন যে সময়টা খারাপ। আমরা কষ্টে ও আশঙ্কাতে আছি। যাহা হউক, যাহা লিখিয়াছি, যৎপরোনাস্তি স্নেহের সহিত লিখিয়াছি।

আপনার চিরবন্ধু
J. D. ANDERSON.

তিনি অনেকবার আমায় লিখিয়াছেন, 'সমস্ত পৃথিবীময় আপনার ইংরাজী পুস্তকগুলির অনুরক্ত এত লোক আছেন যে তাঁহাদের খবর আপনি কিছুই জানেন না।' এক সাহেব বিমানে ভ্রমণ করার সময় আমার পুস্তক পড়িয়া প্রীত হইয়াছিলেন এবং অ্যাণ্ডারসনের নিকট চিঠি লিখিয়া আমার সন্ধান লইয়াছিলেন। সে চিঠি তিনি আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর একবার আমার অসুখের সংবাদ শুনিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আপনি সাবধানে থাকিবেন, বাংলাদেশে দুইটি দীনেশ নাই. পৃথিবীময় আপনার বন্ধু আছেন, আপনি যাঁহাদের জানেন তাঁহাদের চাইতে বেশী।

তাঁহাদের সকলের জন্য আপনি আপনার জীবনটাকে যত্ন করিবেন, আমাদের সকলের নিকট আপনার জীবনের মূল্য খুব বেশী জানিবেন।'[১৮]

ভালবাসা একটা অসীম সামগ্রী, ইহার চোখে পড়িলে কিছুই ক্ষুদ্র থাকে না। অ্যান্ডারসন তাঁহার অসামান্য ভালবাসা দিয়া আমার মত সামান্য লোককে বাড়াইয়া গিয়াছেন। মরিবার এক বৎসর পূর্বে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি অ্যান্ডারসনকে 'ডি. লিট.' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপাধি পাইয়া তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'আমা অপেক্ষা আপনি এই উপাধি পাওয়ার যোগ্যতর।'

১৮ "You must be careful of yourself. There are not two Dineshes in all Bengal, and for the sake of your friends all over the world more in number than you know, you must take care of a life that is very valuable to us."

২৩

ইংরাজীতে লিখিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

আমি ১৯০৭ সনে ইংরাজীতে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ইতিহাস রচনা করি। যাঁহারা এই বই দেখেন নাই, তাঁহাদের অনেকে মনে করিয়া থাকেন ইহা আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বাংলা গ্রন্থের ইংরাজী তর্জমা। এই ধারণা একেবারে ভুল। দুই পুস্তকের বিষয়গত সাদৃশ্য অবশ্যই আছে, কিন্তু ইংরাজী বই সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লেখা। ইহার বিষয়বিভাগ ও আলোচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন। তাহা ছাড়া অনেক নূতন কথা এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা হইয়াছে যাহা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' নাই। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' যখন লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমি ২১।২২ বৎসরের নবযুবক, আর ইংরাজী বই আমার ৪০ বৎসর বয়সে লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম। সুতরাং ইংরাজী পুস্তকের বিষয় নির্বাচনাদিতে কতকটা পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার পরিচয় থাকিবার কথা।

এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পরে য়ুরোপের বিখ্যাত পত্রিকাসমূহে যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহা আমার পক্ষে খুব শ্লাঘনীয় হইয়াছিল। ইহার পূর্বে স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'বিলাতের টাইমস্ পত্রিকায় যদি আপনার কোন পুস্তকের সমালোচনা তিনটি ছত্রেও হয়, তবে সেটি একটা মস্তবড় গৌরবের কারণ হইবে।' কিন্তু সেই সুবিখ্যাত 'টাইমস' পত্রিকায় আমার শুধু এই বহির নয়, মদ্‌রচিত অপরাপর অনেক পুস্তকেরই সুদীর্ঘ অনুকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছে। তাহার কোন কোনটি পূর্ণ দুই স্তম্ভব্যাপক এবং অপরাপর গুলির অধিকাংশই এক স্তম্ভের উপর। 'টাইমস্' লিখিয়াছিলেন,—'ইংরাজীতে লিখিত পঞ্চাশখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে হিন্দুদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, এই একখানি পুস্তকপাঠে তদপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞতা জন্মিবে, লোটির ত্রিবাঙ্কুরের মন্দির সম্বন্ধীয় কৌতূহলপ্রদ গ্রন্থ এবং এম. সেভ্রিলনের হিন্দুধর্মের সম্বন্ধীয় বিরাট পল্লবগ্রাহিতা এই অনাড়ম্বর হিন্দুলেখকের পুস্তকের নিকট একান্ত হীনপ্রভ বলিয়া মনে হয়।'[১] সুপ্রসিদ্ধ 'অ্যাথিনিয়ম' পত্রিকার মতে, 'বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যযুগ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সকল তত্ত্ব দিয়াছেন তাহা তাঁহার সময়কার অথবা কোন সময়ের কোন পুস্তকে প্রদত্ত হয় নাই'[২] এবং 'স্পেক্‌টেটর' বলেন, 'বোধহয় যে পরিশ্রম ও বিদ্যার

১ "He tells more about the Hindu mind than we can gather from 50 volumes of impressions of travel by Europeans. Loti's picturesque account of Travancore temples, and even M. Chevrillon's synthesis of much browsing on Hindu-Scriptures seem faint records by the side of this unassuming tale of Hindu Literature." Times Literary Supplement, June 20, 1912.

২ "In the middle age he has done more for the history of his national Language and Literature than any other writer of his own or indeed any time". Athenium, March 16, 1912.

ফলে এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে, তাহা অন্য কোন জীবিত গ্রন্থকারের নাই।'* এইরূপ অতিশয়োক্তিপূর্ণ কত যে সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। ফরাসী 'রিভিউ এসিয়াটিক' পত্রিকায়, ডেন্‌মার্কের 'বিজড্রজনে অব দি রয়েল ইনস্টিটিউট ফর ট্যাল' নামক মাসিক পত্রে এবং জার্মানীর 'ডিউটাস রাণ্ডস্যা' প্রভৃতি য়ুরোপের সর্বপ্রধান পত্রিকাসমূহ পুস্তকখানিকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এই সকল সমালোচনার আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে য়ুরোপের যাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যার শিরোভূষণ তাঁহারাই এই সকল সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। হল্যাণ্ডের সমালোচক ডাঃ কারন্ (Dr. Kern) তাৎকালিক প্রাচ্য প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মধ্যে পূজনীয় ছিলেন। ইঁহার সম্মানের জন্য সমস্ত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ একসময়ে যে বিরাট অভিনন্দন-পুস্তক সংকলন করিয়া উপহার দিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত নামে অলংকৃত করিয়াছিলেন, সেই পুস্তকখানির নাম 'কর্ণ-পূজা'। ইনি আমার বইখানির অষ্টপৃষ্ঠা-ব্যাপক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জার্মানীতে সর্বপ্রধান সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ সমালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ফরাসী দেশের 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি'র সভাপতি সেনার্ট এবং উদীয়মান প্রাচ্যতাত্ত্বিক জুলে ব্লক সুদীর্ঘ প্রশংসোক্তিপূর্ণ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। বিলাতের 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি'র জার্নালে প্রবীন ঐতিহাসিক এইচ. বেভারিজের সমালোচনা প্রকাশিত হয়, এবং 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী' পত্রিকায় আমার সমালোচনা করিয়াছিলেন হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি এবং অধুনাতম প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক পারজিটার। ইহা ছাড়া শিল্পাচার্য ই. বি. হ্যাভেল, ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ, য়ুরোপীয় কলাশিল্পের অগ্রণী রথেনস্টাইন, প্রত্নতত্ত্ববিৎ র‍্যাপ্‌সন, বারনেট, হুলজ্, ব্লুমহার্ড্‌ট, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ বৃদ্ধ টনি, আমাদের প্রিয় বিচারপতি তন্ত্ররত্নাকর উড্রোফ প্রভৃতি কত লেখক যে আমার পুস্তকের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আমার এখন সমস্ত মনে নাই। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কমিশনার প্রসিদ্ধ লেখক এফ. এস. স্ক্রাইন মহোদয় লিখিয়াছিলেন, 'আপনার পুস্তক একটি মনুমেণ্ট, আমি অতিশয় আনন্দ সহকারে এই পুস্তক পড়িতেছি, আমি যে সকল তত্ত্ব জানিতাম না, তাহা ইহা হইতে শিখিতেছি।'[৪]

য়ুরোপের সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী রথেনস্টাইন আমার পুস্তক পড়িয়া অযাচিত ভাবে আমাকে সুদীর্ঘ প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখিয়া আপ্যায়িত করেন। তিনি আমার সমস্ত বইগুলিই ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং উচ্ছ্বসিত কবিত্বময় ভাষায় লিখিয়াছিলেন, 'আপনার পুস্তক একখানি যাদুকার্পেটের ন্যায়, ইহাতে চড়িয়া আমি যেন আপনার প্রিয় দেশটি আবার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। আপনার বই পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল যেন আমি মন্দিরের আরতি-ঘণ্টা শুনিতে পাইতেছি, গঙ্গার

* "Perhaps no other men living has the learning and happy industry for the task he has successfully accomplished." Spectator, June 12, 1912.

৪ "Monumental work, I have been revelling in the book which taught me much of which I was ignorant."

ঘাটে নৌকারূঢ়া রমণীগণের কলধ্বনি যেন আবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। যদিও আপনি ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া আপনার হিন্দু হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি এমনই আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে আপনার লেখার গুণে আপনার দেশ আমার চোখের সামনে যেন একখানি জীবন্ত চিত্রের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছে।'

স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন আমার প্রত্যেকখানি পুস্তকের শুধু অশেষ গুণানুবাদ-সম্বলিত পত্র আমাকে লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তজ্জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মহাশয় এখন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের শীর্ষস্থানীয়, তিনি আমার পুস্তকগুলির যে গুণানুবাদ করেন, তাহা যে-কোন গ্রন্থকারের পক্ষে শ্লাঘা ও গৌরবের সামগ্রী হইতে পারিত। তিনি ইংরাজীতে লিখিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসখানি পাইয়া যে পত্রখানি লিখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

'আপনার পুস্তকখানি এই সপ্তাহ হইতে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি, আরম্ভ করিয়া ছাড়িতে পারিতেছি না। কোন প্রশংসাই ইহার পক্ষে অত্যুক্তি হইবে না। ইহা চিন্তামণি এবং রত্নাকর তুল্য, ইহাতে জীবন ও বিজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তকই আপনার পুস্তকের সঙ্গে তুলনা হয় না। বই পড়িতে পড়িতে মনে হইল—আমি আপনাদের সুন্দর দেশের ভিতর দিয়া, আপনার দেশীয় লোকদের হৃদয়ের অন্তস্তলে পৌঁছিতেছি। আপনার পুস্তকের মত কোন পুস্তকেই এমন জীবন্ত সাংসারিক ও সাহিত্যিক চিত্র আমি পাই নাই। আপনার দেশের সাহিত্য আপনার নিকট মৃত নহে,—ইহা যেন জীবন্তভাবে পরিপূর্ণ। বহু-যুগের ভাব ও আদর্শ ক্ষণকালের জন্য গ্রন্থকার-বিশেষে অভিব্যক্ত হইয়া পরিশেষে পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কিরূপে ছড়াইয়া পড়ে—আপনার পুস্তক তাহারই আলেখ্য। পণ্ডিত এবং কৃষক, যোগী এবং রাজা আপনার সৃষ্ট রঙ্গমঞ্চে সেক্সপীয়ার-সৃষ্ট জগতের মত মিলিত হইয়াছেন। আমি আপনাকে আমার আন্তরিক প্রীতি, শুধু তাহা নহে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস জানাইতে ব্যস্ত হইয়াছি।[৬]

[৬] "I have began this very week, and I cannot leave it off, I cannot give you praises enough. Your work is a Chintamani, a Ratnakar, full of science, and of life. No book about India would I compare with yours. It seems as if I were wandering through your beautiful country and through the heart of your people. Never did I find such a realistic sense of literature; literary works with you are no dead writing, but living beings, where the spirit of generations breathes freely, widely, embodied for a time in their author, expanded afterwards in the multitude of readers and hearers. Pundit and peasant, Yogi and Raja mix together in a Shakespearian way—should I say too "a-la Sudraka" on the stage you have built up. I am eager to send you my sympathy, nay to express you my admiration.

১৯১৩ খৃঃ জানুয়ারি মাসে সিল্‌ভ্যাঁ লেভি পুস্তকখানির একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

'মিস্টার সেনের পক্ষে কোন প্রশংসাই অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার মৌলিক এবং গভীর পাণ্ডিত্য সুস্পষ্ট কল্পনাশক্তির সহযোগী হইয়াছে। যদিও তিনি তাঁহার প্রস্তুত উপকরণরাশি লইয়া ঐতিহাসিকের পন্থাবলম্বী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তটি মহাকাব্য-লেখকদের মত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব গীতি-কবির প্রতিভাও তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন। তাঁহার উচ্ছ্বসিত সহৃদয়তা পুস্তকের সর্বত্র ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের আধুনিক পুস্তকগুলিতে মানবজীবনের প্রীতিমূলক জ্ঞান অত্যন্ত বিরল, কিন্তু এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত সেই সহৃদয়তায় অনুপ্রাণিত। পাঠক এই এক সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপক পুস্তকখানি আগাগোড়া কৌতূহলের সহিত পড়িবেন। যে বিরাট পরিশ্রমের ফলে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে—রচনার সরসতাগুণে পাঠকের চক্ষে তাহা এড়াইয়া যাইবে—বহুতত্ত্বের যে ভাণ্ডার গ্রন্থকার মুক্ত করিয়াছেন, তাহার ভিতরে পাঠক অনায়াস-লব্ধ প্রবেশ পাইবেন।'*

আমায় প্রতি বৎসরই ২৫০ হইতে ৩০০ পৃষ্ঠার একখানি ইংরাজী বই মৌলিক সন্ধান করিয়া লিখিতে হয়, রামতনু লাহিড়ী ফেলোসিপের এই শর্ত। এইভাবে সাতখানি বই লেখা হইয়াছে। তার মধ্যে চারখানি ছাপা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশিত পুস্তকের প্রত্যেকখানিই বিলাতের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যার পারদর্শী পণ্ডিতগণ সুচক্ষে দেখিয়াছেন। এই সূত্রে অনেক বড় লেখকের সঙ্গে আমার সর্বদা পত্র-ব্যবহারজনিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। বিলাতের বড় বড় গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের গ্রন্থে আমার পুস্তক হইতে মতামত উদ্ধৃত করিয়া এই সামান্য লেখকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। হ্যাভেলের শিল্পকলা সম্বন্ধীয় নানা পুস্তকে, Every man's Library Series -এর সম্পাদক Ernest Rhys -কৃত গ্রন্থাবলীতে, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে, ম্যাকনিকোলের ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে পুস্তকে, আণ্ডারউড, ফারকুহার, কুমারস্বামীর এবং অপরাপর বিবিধ গ্রন্থকারগণের পুস্তক ও প্রবন্ধে আমার ইংরাজী পুস্তক হইতে নানা অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমার পুস্তকগুলির য়ুরোপীয় সমালোচনা এত অধিক হইয়াছে যে, তাহা হইতে অংশবিশেষে উঠাইয়া দেখাইতে হইলেও একখানি বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

* One cannot praise too highly the work of Mr. Sen. A profound and original erudition has been associated with vivid imagination. . . . . The historian, though relying on his documents, has the temperament of an Epic poet. He has likewise inherited the lyrical genius of his race. His enthusiastic sympathy vibrates through all his pages. . . . . The appreciation of life, so rare in our book-knowledge, runs through-out the work. One reads these, thousand pages with a sustained interest; one loses sight of the enormous labour which it presupposes; one easily steps into the treasure of information which it presents. (Translated from French for the Bengali, April 18, 1912)

বাং ১৩১৯ সনের ১৯শে তারিখে আমেরিকা 508, W. High Street Urbana, Illinois হইতে কবিবর রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'আমার মনে হয় ইংলণ্ডে আপনার লেখা ছাপিবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ সেখানে আপনার ইংরাজী গ্রন্থটি প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছে। অথচ ছাপা কদর্য এবং ছাপার ভুল অপর্যাপ্ত। যাহা হউক, সেখানে যখন আপনার আসন প্রস্তুত হইয়াছে, তখন এ দেশের দিকে না তাকাইয়া সেই দিকেই চেষ্টা করা কর্তব্য হইবে।'

১৯১২ সনে বড়লাট হার্ডিঞ্জ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে আমার পুস্তকগুলির বিশেষ সুখ্যাতি করেন এবং ১৯১৬ সনের নভেম্বর মাসে রমেশ-ভবনের ভিত্তি স্থাপনোপলক্ষে লর্ড কারমাইকেলও আমাকে প্রকাশ্যভাবে প্রশংসা করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বিলাতে এবং দেশে এই পুস্তকগুলি লেখার ফলে আমি অনেক সম্মানিত বন্ধু লাভ করিয়াছি ; স্যর জর্জ গ্রীয়ারসন, পারজিটার, রথেনস্টাইন, হ্যাভেল, জুলে ব্লক, বেভারিজ, টাইমস্ পত্রিকার সহ-সম্পাদক ব্রাউন প্রভৃতি বহু সহৃদয় য়ুরোপীয় পণ্ডিত এখন আমার মাননীয় বন্ধুর মধ্যে গণ্য। বঙ্গীয় লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুরুলে সাহেব আমার 'Folk Literature of Bengal' পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন এবং বঙ্গদেশ এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক নানা সমস্যা লইয়া আমি অনেক বৎসর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্ট্যাপ্‌ল্‌টন সাহেবের সঙ্গে বহুসংখ্যক সুদীর্ঘ পত্রে নানারূপ তর্কবিতর্ক চালাইয়া আসিয়াছি।

পুস্তকের এই অধ্যায়টা অযথা বড় হইয়া গেল। কিন্তু পাঠকসম্প্রদায় মনে রাখিবেন, এই প্রশংসোক্তি লইয়া যদি আমি মুহূর্তের জন্যও স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার কামনা করিয়া থাকি, তবে আমার মত কৃপাপাত্র আর নাই।

আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই, যদি ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে হিতকামী হইয়া কার্য করা যায়, তাহা কখনই বিফল হয় না। আমি পূর্বের অধ্যায়গুলিতে লিখিয়াছি—এই বঙ্গভাষার সেবাব্রত যখন গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমার মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল না, চতুর্দিক হইতে আত্মীয় ও সুহৃদবর্গ আমারই হিত ইচ্ছা করিয়া হাত বাড়াইয়াছিলেন—আমাকে এই পথে অগ্রসর হইতে বারণ করিতে। আমি তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত কোমল বাধার প্রতিকূলতা করিয়া দৃঢ়ভাবে আমার লক্ষ্য অনুসরণ করিয়াছিলাম। রবিবাবুর প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি, তাঁহার ন্যায় কবিগণ ভগবানের আশীষমাল্য পরিয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছেন—ইঁহাদের কবিতা দেবীভারতীর নৃত্য-কলা ; যাহা লিখিয়াছেন তাহাই পৃথিবী কান পাতিয়া শুনিতেছে। গীতাঞ্জলির মত ক্ষুদ্র একখানি পুস্তক সাহিত্য-জগতকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি তো এই সকল ভাগ্যধরের মত প্রতিভার শ্রী কপালে পরিয়া আসি নাই—আমি এমন দুর্লভ আনন্দদানের শক্তি পাই নাই। আমার যাহা ছিল ও আছে, তাহা সকলেই পাইতে পারেন, কোন লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহার পশ্চাতে মুখ-রজ্জুবিমুক্ত অশ্বের ন্যায় দিগ্‌বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া ছুটিয়া যাওয়া—কোদাল-হস্তে পুষ্করিণী-খনন-শীল, রৌদ্র-বৃষ্টি-হিম অগ্রাহ্যকারী কুলির মত খাটিয়া যাওয়া। সে

খাটুনি যে আমি খাটিয়াছি, তাহা কেহ সন্দেহ করিবেন না। আমার লিখিত শুধু ইংরাজী পুস্তকগুলি দেখিয়া একজন সিনেটের 'ফেলো' প্রকাশ্যভাবে সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'দীনেশবাবুর প্রকাশিত রচনার আয়তন দেখিলে ভয় হয়।' স্বয়ং স্যর আশুতোষ এক সভায় বলিয়াছিলেন, 'দীনেশবাবুর অপর্যাপ্ত লেখায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাযন্ত্রালয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।' বহু খাটুনির ফল আমার লেখা। বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি মজুর ও কুলির খাটুনি খাটিতেছি। এই পরিশ্রমের ফল ভগবান আমাকে কিছু দিয়াছেন, সুতরাং আমি কর্মফল সম্বন্ধে একটুকুও সন্দিহান হই নাই। এই নির্ভর ও পরিশ্রমের পরিণাম সম্বন্ধে যদি আমার এই লেখা একটি মাত্র তরুণ যুবককেও কর্মে উদ্বোধিত করিতে পারে, লক্ষ্য অনুসরণ করিবার পথে দৃঢ় সংকল্পারূঢ় করিতে পারে, তবে এই যে প্রশংসোক্তির কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা সার্থক হইবে, নিজ হাতে নিজ জয়ডঙ্কা বাজাইবার অপরাধের বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পাইব।

দ্বিতীয়ত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া যদি আমি এই ভাষার বিন্দুমাত্রও উপকার করিয়া থাকি, তবে আমার সমস্ত প্রাণান্তকর খাটুনির যাহা কিছু পুরস্কার পাইয়াছি, তাহা খোয়াইতে আমি কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করিব না। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র যশ অটুট থাকুক, আমি ভগবানের নিকট এ প্রার্থনা করি না। আজ যাঁহারা বাংলায় এম. এ. উপাধি লাভ করিয়াছেন ও করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া আমার পুস্তকগুলিকে হীনশ্রী করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে। যদি আমার সামান্য পুস্তকগুলি সেই সেই বিষয়ে দীর্ঘকাল আদর্শ পুস্তক হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা বঙ্গসাহিত্যসেবীর অপবাদ আর কি হইতে পারে? ভাবী লেখকগণের চেষ্টায় যেন আমাদের অতি আদরের ভাষার ইতিহাস শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং আমার সামান্য গ্রন্থাবলী নিষ্প্রভ করিয়া ফেলে। তাহা হইলে যে মজুর প্রথম উদ্যমের ইট-সুরকি জোগাইয়াছে তাহার আনন্দের সীমা থাকিবে না। সে শুভ দিন কি আমি দেখিয়া যাইতে পারিব?

২৪

অপরাপর বন্ধু ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ

বহু বৎসর হইল, একদিন সাহিত্য-পরিষদের সভায় বসিয়া আছি। তখন এই সভা শ্যামপুকুর স্ট্রীটের মুখে দক্ষিণ দিকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর বসিত। এমন সময় ফড়িংয়ের মত শীর্ণ দেহ, অতি সামান্য সার্ট গায়ে, একটি ভদ্রলোক আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; মুখে খোঁচা খোঁচা ছোট ছোট দাড়ি, বোধহয় খেউরি হইবার অবকাশ হয় নাই, কিন্তু আমার মনে হইল পয়সা জুটে নাই। ইঁহার সঙ্গে আমি অনেকটা আমার নিজ অহঙ্কার বজায় রাখিয়া কথা বলিতে লাগিলাম, অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে, কারণ ইঁহাকে আমি কোন নগণ্য ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম। এই সময় টাকির জমিদার প্রসিদ্ধ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ল্যাণ্ডো হইতে অবতরণ করিলেন। ইনি দ্বিপ্রহরের সময়ও ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গাড়ীর দরজা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া চলাফেরা করেন, যতীন্দ্রবাবুর দেহটি বেশ একটু স্থূল, কিন্তু মূর্তি অতি সুদর্শন, বন্ধু-বান্ধবের আনন্দদীপ, চোখের সোনার চশমা মুখের গৌরবর্ণকে যেন আর একটু মনোরম করিয়াছে, ভুঁড়িটি একটু দোলাইয়া তিনি গৃহে প্রবেশপূর্বক, আমার পার্শ্ববর্তী সেই অতি দীনবেশী লোকটিকে দেখিয়া গর্ব-প্রীতি-ফুল্ল নেত্রে অভিবাদন করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া সভাপতির আসনের নিকটবর্তী একটা ভাল জায়গায়—ভদ্রলোকটির নানাভাবে এড়াইবার চেষ্টা সত্ত্বেও—যেন একটু জোর করিয়াই বসাইলেন। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইনি কে?' শুনিলাম, ইনিই প্রফুল্লচন্দ্র রায়—অধুনা স্যর উপাধিতে ভূষিত। রসায়নবিদ্যা ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া জগতে আরও কতকটা উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই জগম্মান্য ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম তাঁহার অনাড়ম্বর এমন কি দীন বেশ সত্ত্বেও, চক্ষু দুটি হইতে যেন প্রতিভা জ্বলিতেছে। রসায়নবিদ্যা লইয়াই তো ইঁহার জগতে গৌরব, কিন্তু তিনি ইতিহাস এবং সাহিত্যেরও অনুরাগী, তাহা শেষে জানিতে পারিলাম। হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে ইঁহার মহৎপ্রাণ একান্ত অধীরভাবে ব্যথিত, দুর্বাসার মতো ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে ইনি সামাজিক প্রতারকদিগকে কখনও কখনও গালিমন্দ দিয়া থাকেন—তাহা যে কত ব্যথা ও কত মমতার পরিচায়ক তাহা গোঁড়ামিতে অন্ধ হইয়া অনেকে বুঝিতে পারেন না। ইঁহার দানশীলতা গল্পের ন্যায়, সমস্ত আয়ই প্রায় বিলাইয়া দেন। জাতীয় চেষ্টায় ধনাগমের পথ, ইনিই বাঙালীকে প্রথম বুঝাইয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্র-চর্চার তুঙ্গ শৃঙ্গে বসিয়া ইনি ধ্যানী বুদ্ধের মত থাকেন নাই—ইনি ব্যবসায়ের দ্বারা জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিকল্পে যে প্রেরণা দিতেছেন তাহাতে ইঁহাকেই আমরা বর্তমান কালের উপযোগী একজন আদর্শ জননায়ক বলিয়া বরণ করিতে পারি। ইনি আমার ইংরাজী 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইখানি এমন ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, বোধ হয় খুব অল্প বাঙালীই সেরূপ ধৈর্য সহকারে বইখানি আলোচনা করার সুবিধা পাইয়াছেন। একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ জেমস্ সাহেবের কক্ষে বসিয়া উক্ত সাহেবের নিকট আমার পুস্তক হইতে এত কথা মুখে মুখে উদ্ধৃত

করিয়া বলিতে লাগিলেন যে আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম যে, তাঁহার ছাত্রসুলভ অধ্যয়নের স্বভাবটি এখনও বজায় আছে।

এই সময়ে আর একটি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল, এখনও তাঁহার কথা মনে পড়িলে চক্ষে জল আসে। হায় কবি রজনী সেন! আমার কাঁটাপুকুরের বাড়ীতে এমন অতিথি আর পাইব না। কত রাত্রি দুইটা পর্যন্ত যে ইনি কোকিল-কণ্ঠে গান করিয়া মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়াছেন! যিনি যেখানে বসিতেন, তিনি সেইখানেই ছবির মতন বসিয়া থাকিতেন—তাঁহার কথা কত বলিব! তাঁহার গানগুলি তো এখনও আছে, পাড়াগাঁয়ে কোকিলের ডাক, পাপিয়ার গান যেমন অহরহ শুনা যায়—রজনী সেনের গান শোনাও তেমনই সুলভ, কিন্তু যে ভক্তিতে 'হে বিশ্ববিপদ-হন্তা, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা, তব শ্রীচরণতলে নিয়ে যাও মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে' তিনি উন্মত্তের মত, সুরলহরীর ঐন্দ্রজালিক মোহ সৃষ্টি করিয়া গাহিতেন, সে ভক্তি আর কোথায় পাইব? আমার বাড়ীতে একটা হারমোনিয়াম এখনও আছে, যাহা রজনী সেনের হাতে পড়িয়া তাঁহার স্পর্শসুখে অধীরভাবে ভগবানকে যেন ডাকিয়া কথা শুনাইত. 'ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি, এক পাও ফিরে যাও নি' প্রভৃতি গানের কবিমুখোচ্চারিত সুরটি এখনও যেন স্বপ্নোত্থিতের মত শুনিতে পাই। রজনী তর্কযুদ্ধ ভালবাসিতেন না, গাহিয়া গাহিয়া কণ্ঠরোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যখন সেই কণ্ঠ ডাক্তারগণ নিষ্ঠুরভাবে কাটিয়া দিলেন, তখন কোকিলের কাকলি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ছিন্নকণ্ঠ কোকিলকে কলিকাতার হাসপাতালে দেখিয়া যে কষ্ট বোধ করিয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। প্রাণটা ছিল তাঁহার শিশুর মত কোমল। একদিন এক ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়া বাহাদুরী লইতেছিলেন; সতী যেরূপ শিবনিন্দা শুনিয়া অসহিষ্ণু হইয়াছিলেন সেইদিন রজনীর মুখে সেইরূপ নির্মম আঘাত পাওয়ার ভাব দেখিয়াছিলাম। সেই তর্কশাস্ত্রের বাহাদুর রজনীর মুখের ভাব দেখিয়াই তর্ক চালাইবার সাহস পাইলেন না; কোন অকথিত ত্রাস ও লজ্জার ভাবে চুপ করিয়া গেলেন। রজনীবাবুর গান শুনিবার জন্য একদা মহারাজ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর আমাকে চিঠি লিখিয়া সময় ঠিক করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেদিন সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত মহারাজ-প্রাসাদে আমরা তাঁহার গান শুনিয়াছিলাম। মহারাজ নির্দিষ্ট সময়ে আহারাদি করিতেন, কখনই প্রায় ব্যতিক্রম হইত না। কিন্তু সেদিন সময় অতিক্রম হইয়া গিয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে রজনী একদিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর বসিয়া গিয়াছে; কথা চাপা, যেন গলা দিয়া বাহির হইতেছিল না; বুঝিলাম গলায় ক্যান্সার হইয়াছে। তিনি বলিলেন, 'গুরুদাস লাইব্রেরী আমার 'বাণী ও কল্যাণী'র মুদ্রণস্বত্ব ৪০০ টাকা মূল্যে কিনিবেন, কিন্তু আমাকে তাঁহারা চেনেন না, আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন, তবে টাকাটা এখনই পাইতে পারি।' আমি বলিলাম, 'আমার জ্বর হইয়াছে, উঠিবার সাধ্য নাই। হরিদাসবাবুকে চিঠি দিতেছি, আমার হাতের লেখা তাঁহারা চেনেন, চিঠি পাইলেই টাকা দিবেন।' শুনিলাম, চিঠি লইয়া গিয়া তিনি টাকা পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ ছিল।

এ পর্যন্ত তাঁহার মত উদার, মনস্বী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি আমি দেখি নাই বলিলেই চলে। তিনি বাগ্মী ও সুলেখক ছিলেন, এ সকল তো তাঁহার জীবনের চালচিত্র মাত্র; কিন্তু তাঁহার জীবন ও চরিত্র ছিল একটা বড় আদর্শ। সমাজের গোড়া হইয়া অন্ধ কুসংস্কারাপন্ন বুড়ো বাপমায়ের কথা বলিতে যাইয়া কোন্ ব্রাহ্ম শাস্ত্রীমহাশয়ের মত এরূপ ব্যাকুলতা দেখাইয়াছেন! তাঁহাদিগকে যে তিনি ত্যাগ করিয়া কষ্ট দিয়াছেন, সে কথা শেলের মত তাঁহার হৃদয়ে বিঁধিয়াছিল; তাঁহার মাতা যে তাঁহার শৈশবে পীড়া হওয়ার দরুন ঠাকুরদেবতার কাছে ধরনা দিয়া বুকের উপরে গরম ধুনচি রাখিয়া ফোস্কা তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন—সেই কুসংস্কারের চরম কাহিনী বলিতে যাইয়া আর কোন্ ব্রাহ্ম অশ্রুসিক্ত হইতে পারিতেন! সমাজের গণ্ডির বাহিরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা তিনি যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত বলিতেন—জুয়োলজিকেল গার্ডেনে সিংহ দেখিতে পাইবেন, 'মায়ের বাহন' সিংহ দেখিবেন, শিশুর মতন পরমহংসদেব সেই কথা বলিতে বলিতে 'মা মা' বলিয়া সমাধি প্রাপ্ত হইলেন—এরূপ শ্রদ্ধার সহিত কোন্ ব্রাহ্ম এই সকল কুসংস্কারের পায়ে অর্ঘ্য দিতে প্রস্তুত হইতেন? ব্রাহ্মমন্দিরে মেয়েলোকের বাহুল্য দেখিয়া পরমহংসদেব শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, 'তোরা এ সকল কি করিয়াছিস্, চারাগাছ পুঁতিয়াই ছাগল লাগাইয়াছিস, ধর্মটা যে একেবারে সাবাড় হইয়া যাইবে।' এই কথা বলিতে বলিতে শাস্ত্রী মহাশয় হাসিয়া খুন হইতেন, কোন্ ব্রাহ্মের এ কথা বলিতে গিয়া মুখ রাগে রাঙিয়া না উঠিবে? এইটি ছিল তাঁহার বিশেষত্ব। তিনি ব্রাহ্মধর্মের জন্য সব ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু উদারতাটি ছাড়েন নাই, অন্যান্য সমাজের যাহা ভাল তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাটি ছাড়েন নাই। যিনি পিতামাতা, স্ত্রী, সকলের প্রতিকূলে ধর্মত্যাগী হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে যে এই উদারতা রক্ষা করা কত বড় মহত্ত্বের পরিচায়ক তাহা আর কি বলিব? তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশের পর আমার সম্বন্ধে যে উচ্চ গুণানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, আমি রোগশয্যায় পড়িয়া সেই মন্তব্য পাঠে মনে মনে তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়াছিলাম। আমরা উভয়ে সহযোগে বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রশ্ন করিতে নিযুক্ত ছিলাম। যাঁহারা বৃদ্ধ-সহযোগী হইতেন, তাঁহাদের কাজটা আমিই করিয়া দিতাম এবং একটা স্বাক্ষর লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু আমি সেইরূপ সমস্ত কাজ করিবার ভার নিজে লইতে ইচ্ছুক হইলেও তিনি রুগ্ন অবস্থায়ও কখনও তাহাতে সম্মত হইতেন না, তাঁহার অংশ তিনি তৈয়ারী করিয়া দিতেন। যে বৎসর হইতে তিনি উহা পারিবেন না, বুঝিলেন, সেইবার পদত্যাগ করিলেন। এই সততা সংসারে দুর্লভ! একদিন আমি বলিলাম, 'নমঃশূদ্রেরা পাছে ছেলেমেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে—এই আশংকায়, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তাঁহাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিতে সাহসী হইতেছেন না, পাদ্রীরা তাঁহাদের মধ্যে অনেককে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিতেছেন।' তিনি শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 'যে সকল দরজা খুলিয়া দিব বলিয়া হিন্দুসমাজের রুদ্ধগৃহ ত্যাগ করিলাম, ইঁহারা সেই সকল দরজা আটকাইতেছেন।' তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মসমাজের লোক বলিয়া মনে করি নাই, পুকুরে থাকিয়া যেরূপ পদ্ম-কুসুম সর্বদা ঊর্ধ্বে আলোকের দিকে চাহিয়া থাকে, সেইরূপ

তিনি ব্রাহ্মসমাজকে অবলম্বন করিয়া সেই ভাগবানের দিকে চাহিয়া ছিলেন, যিনি কোন এক সমাজের আরাধ্য নহেন, সর্বসমাজের একমাত্র নমস্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা ম্যাট্রিকুলেশনে বাংলার পরীক্ষক ছিলেন। সেই সূত্রে আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইতে হইত। যখনই যাইতাম, তখনই শাস্ত্রীমহাশয়ের কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া আসিতাম।

এই পুস্তক অতিরিক্ত বড় হইয়া চলিল। আরও বহু লোকের কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু জায়গায় কুলাইতেছে না। সুকবি অক্ষয় বড়াল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এ জগতে কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না। সুরেশ সমাজপতি মহাশয় আমার কাছে নিজের একটা দুর্ভাগ্যের কথা বলিতেন, তাঁহার সকল সাহিত্যিক বন্ধুই প্রথম প্রথম তাঁহার খুব পক্ষপাতী থাকিতেন—কিন্তু শেষে সেই বন্ধুত্বটি রক্ষা করিতে পারিতেন না। এরূপ হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন 'আমার স্পষ্টবাদিতা, 'সাহিত্যের' নিরপেক্ষ সমালোচনা, কাহারও মন যোগাইবার মত করিয়া আমি কথা কহিতে জানি না।' এই 'স্পষ্টবাদী' ব্যক্তির যে স্বল্পসংখ্যক স্থায়ী বন্ধু ছিলেন, তন্মধ্যে বড়াল-কবি একজন। কি ভাবে তাঁহার হৃদয় মৃত্যুকে জয় করিয়া জীবনের পরপার পর্যন্ত একনিষ্ঠতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহা তাঁহার বহুসংখ্যক কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি তাঁহার স্ত্রী সম্বন্ধে লেখা। বড়াল-কবি জীবন-মরণের সঙ্গী, যাঁহারা এই গৌরমূর্তি, ভট্টাচার্যের মত ঔদার্যপূর্ণ হাস্যমুখ বন্ধুকে জানিতেন, তাঁহারা আমার কথাগুলি নিশ্চয়ই সমর্থন করিবেন। কবি দেবেন্দ্র ছিলেন কবিতার রাজা, অন্য কবিদের দু-দশটা কবিতা বাদ দিলে আসে যায় না, বড় বড় কবিরও সব রচনা ভাল উৎরায় না—সমস্ত কবিতাতেই কিছু প্রতিভার ছাপ থাকে না, নামের জোরে দশটা ভাল সামগ্রীর সঙ্গে দুইটি খারাপ মালও বিকাইয়া যায়। লেংড়া আমের ঝুড়িতে পাইকার দুই-চারিটা মুর্শিদাবাদী বানরমুখো কালো আমও চালাইয়া দেয়। কিন্তু দেবেন্দ্র-কবির প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি ছত্র হইতে অসামান্য-শক্তির চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার যে কোন কবিতা পড়িলেই মনে হইবে ইহা প্রকৃত কবির লেখা—তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ, হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা, পল্লীলক্ষ্মীর অলক্তরঞ্জিত পদাঙ্ক দেবী-ভারতীর আঙ্গিনায় যেন ঝলমল করিতেছে। এই সকল গুণ—তাঁহার স্বকীয় প্রতিভার ছাপ—প্রত্যেকটি ছত্রে বিরাজ করিতেছে, তাহা ভুল করিবার যো নাই। দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার কথাবার্তায় এই কবিত্ব কিছুই ধরা পড়িত না। কথাগুলি ছিল এলোমেলো রকমের—একটা ঔদাসীন্য, সংসার ও বিষয়বুদ্ধির ত্রুটি কোথাও কোথাও ধরা পড়িয়া যাইত। কবি কবিতার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতেন, বাহিরে যেন ধরা দিতেন না। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় বেশী ঘনিষ্ঠ ছিল না, আমি তাঁহাকে অল্প সময়ের জন্য পাইয়াছিলাম। এই জন্য বোধহয় সামান্য পরিচয়ে তিনি নিজেকে আমার নিকট পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে সংকোচবোধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সভায় বসিয়া তাঁহার হাসির গান শুরু করিয়া দিলে সমস্ত দিকের কলকোলাহল চুপ হইয়া যাইত। দেহ তাঁহার ছিল কতকটা স্থূল, মাথায় বেশ বড় রকমের টাক, গৌরবর্ণ, মুখ-চোখ আনন্দময়, আদপেই বহুভাষী নন, বরং বহু জনতা দেখিলে চুপটি করিয়া এক কোণে বসিয়া থাকিতেন; কিন্তু

তাঁহার প্রতিভার এই সলজ্জ ভাবটা অন্তরঙ্গের কাছে একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইত। যখন তিনি নিজের হাসির গান গাহিতেন, তখন তাঁহার রচিত প্রত্যেকটি শব্দ যেন মূর্তিমান্ হইয়া আসরে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া দিত। সন্তোষের প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রায়ই সন্ধ্যার পর আমাদের মিলন হইত। তখন তিনি গাইবার সময় হাত ও মুখের এ রকম কায়দা করিতেন, যেন হঠাৎ গানের সুরটা কথাবার্তার সুরে পরিণত হইয়া যাইত। সংগীতের এই গদ্যে অনুবাদ এত দ্রুত হইত যে, তাহাতেই হাস্যরসটা খুব বেশী জমিয়া যাইত। ধরুন, বুড়াবুড়ীর গানে 'বুড়ো-বুড়ি দু' জনাতে মনের মিলে সুখে থাকত' হইতে 'পাড়ার লোকে পুলিস ডাক্‌ত' পর্যন্ত বেশ হাস্যরসোদ্দীপক কাতরকণ্ঠে বুড়া-বুড়ীর দাম্পত্যের এই ঝগড়াটার দুঃখে যেন কবি অতিশয় ব্যথিত, তাঁহার কণ্ঠস্বরে সেই করুণার ভাব জাগাইয়া, চোখেমুখে বিষণ্ণতা প্রকট করিয়া যখন তিনি গাহিতেন তখন তো আমরা হাসির উচ্চ শব্দে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া গান শুনিয়াছি। কিন্তু হঠাৎ যেন তিনি রাগিয়া গিয়া গান বন্ধ করিয়া ফেলিলেন, 'একদিন' পর্যন্তও কণ্ঠস্বরটা গানের মতই থাকিল তাহার পর 'ধত্তর' কথাটা আর গান নয়, সত্যসত্যই যেন কবি রাগিয়া গিয়া চোটের সহিত 'ধত্তর' কথাটা বলিয়া গানটা থামাইয়া দিলেন, তারপর 'বলে বুড়ো কোথায় গেল চলে।' আবার গানের সুর আরব্ধ হইল। মধ্যের 'ধত্তর' শব্দটা বৈরাগ্যব্যঞ্জক নিছক গদ্য; ঐ কথাটা ক্রোধের ভাবে উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহার ভ্রূ দুইটি সত্যসত্যই কুঞ্চিত হইত এবং মুখখানি বিরক্তি ও কুটিলতার ভাব ধারণ করিত। তাঁহার অপেক্ষা ঢের মিষ্টস্বরে এই সকল গান অপর গায়কেরা গাহিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার মত এই সকল গানের কমা, সেমিকলন দিয়া গাহিয়া কেহই সেরূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না,—রঙ্গরসের দেবীকে শ্রোতৃবর্গের সাক্ষাতে তেমন করিয়া আনয়ন করিতে পারেন না। একদিন তাঁহার বাড়ীতে তিনি আমার নিকট তাঁহার পুত্র দিলীপের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া 'আমরা ইরান দেশের কাজী' এই গানটি গাহিয়াছিলেন, দিলীপ তখন ছিলেন ৯।১০ বৎসর বয়স্ক; পিতাপুত্রের গান যাহা শুনিয়াছিলাম, নৃত্য যাহা দেখিয়াছিলাম, আমার মনের মধ্যে তাহার একখানি ফটোগ্রাফ রহিয়া গিয়াছে, এতদিনেও মুছিয়া যায় নাই। আর একদিন নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা-বিবাহের উপলক্ষ্যে দ্বিজেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন রায় সাহেব হারানচন্দ্র রক্ষিত। যেরূপ দুই একটা কথাবার্তা হইতেছিল, তাহাতে গতিক ভাল-না বুঝিয়া রায়-সাহেব মহাশয়কে হাত ধরিয়া আমার বাড়ীতে উঠাইয়া আনিলাম। দিলীপবাবু এখন বিলাত গিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে অ্যান্ডারসন সাহেব আমাকে অনেক প্রশংসার কথা লিখিয়াছিলেন, সে পত্রখানি আমার কাছে আছে।

আমার কাঁটাপুকুরের বাড়ীর প্রতিবেশী ছিলেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বোসপাড়া লেনে তিনি বসিয়া তাকিয়া ঠেস্ দিয়া থাকিতেন, যেন নগাধিরাজ। শেষ বয়সে পরমহংসদেবের কথা পাইলে তিনি আর কোন কথা বলিতেন না। তিনি কতবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, নাটক দেখিতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি সে অনুরোধ প্রতিপালন করিতে পারি নাই। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি যেন নিজে একটু লজ্জিত থাকিতেন। একদিন তিনি আমাকে সত্য-

সত্যই বলিয়াছিলেন, 'দীনেশবাবু আপনারা কি আমাকে ঘৃণা করেন?' আমি বলিয়াছিলাম, 'সে কি কথা? আপনি নাট্য-রাজা, সাহিত্যের রাজা, এখন ভক্তির রাজা—আপনাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।' কিন্তু মনে মনে তিনি লজ্জিত থাকিতেন। সভাসমিতিতে যাইতে বড়ই কুণ্ঠিত হইতেন।

তাঁহার সহচর সহকর্মী ছিলেন অমৃত বসু, এখন তিনি বৃদ্ধ, দীর্ঘ চুলগুলির সব শাদা, মুখশ্রী একখানি তরবারির মত। বাংলা বক্তৃতায় যেন বৈদ্যুতিক আলো খেলে—তাঁহার প্রহসনগুলি বড় দুঃখের হাসি, সে হাসির উপাদান শুধু অশ্রু—সেই নাটকগুলি বিয়োগান্ত কাব্য অপেক্ষাও করুণ—উহারা তীব্র কশাঘাতের ছলে অমৃত-প্রলেপ, ডাক্তারের ছুরি কাটিয়া ফেলে সত্য, কিন্তু আরাম করিবার জন্য। কথাবার্তা, বক্তৃতায় ইনি ধুরন্ধর, ভাষায় বাণীর মুখরতা ও কবিতার ছন্দ।

আমার বাড়ীর কাছে একজন শীর্ণকায় শ্যামাঙ্গ ব্যক্তি মাঝে মাঝে ঝড়ের মতন চলিয়া যাইতেন। আমি কখনও তাঁহার সঙ্গে দুই একটি কথা বলিবার সুযোগ পাইয়াছি মাত্র। তিনি বঙ্গদেশের কালবৈশাখী, প্রচণ্ড ঝটিকা, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ। ইনি যে ক্ষেত্রে যখন গিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে জনসাধারণকে যেন উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইনি তুবড়ির আগুন, কিন্তু যখন ভক্তিক্ষেত্রে নামিলেন, তখন সেই ঝটিকা অশ্রুজলে মিশিয়া সাইক্লোনের আকার ধারণ করিল। 'অমিয়নিমাই চরিত', 'কালাচাঁদ গীতা', 'নরোত্তম জীবনী', বন্যার মত বঙ্গীয় গৃহস্থকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। একজন লেখক বাইরন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'He came and went like a shooting-star, dazzling and perplexing' শিশিরবাবুর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রবাবুর পরে সাহিত্যের সিংহাসন কাহার অধিকারে আসিবে জানি না, কিন্তু শরৎচন্দ্র বোধহয় পারিবেন না। তাঁহার প্রতিভার যে পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম, তাহা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। সর্বপ্রথমে আমরাই তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলাম ; তাঁহার 'রামের সুমতি' ছোট হইলেও বাংলা সাহিত্যে তাহার জোড়া নাই. তাঁহার 'পণ্ডিতমশাই', 'চন্দ্রনাথ', 'বিন্দুর ছেলে', 'স্বামী' প্রভৃতি বহু পুস্তকে তিনি অপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। পল্লী হইতে আসিয়া তিনি শহরে জয়ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন। আমরা ছোটবেলায় যে শুনিয়াছিলাম 'বন হতে এল টিয়া. সোনার মুকুট মাথায় দিয়া', সেই ভাবেই আমরা তাঁহাকে বরণডালা লইয়া অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম—তাঁহার চরিত্রটিও প্রথম মিলনের সময় সাহিত্যসমাজে একটা অপূর্ব মহিমা-জাল বিস্তার করিয়াছিল। যশ-মানের দিকে একেবারে লক্ষ্য ছিল না. তাঁহার সম্বন্ধে খুব প্রশংসার সমালোচনা হইলেও তিনি একান্ত উদাসীনের মত থাকিতেন, তাহা পড়িয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার হইত না। একবার আমার বেহালার বাড়ীতে কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন এক রমণীর প্রতি চা-বাগিচার লোকদের অত্যাচারের কথা বলিতেছিলেন, হঠাৎ শরৎচন্দ্র বুক হাতে চাপিয়া সাশ্রুচক্ষে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।' তখন তাঁহার সুকোমল চিত্তবৃত্তির যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম ইনি হৃদয়বান, এরূপ লোক সচরাচর দেখা যায় না। আর একদিন শুনিলাম শরৎচন্দ্র তাঁহার একটি পোষা কুকুর হারাইয়া সারাদিন কলিকাতায় অলিতে-গলিতে

'হায় হায়' করিয়া বেড়াইতেছেন ; তখনও বুঝিয়াছিলাম, ইনি ঠিক সাধারণ লোকের মত নহেন, যাঁহাকে লোকে 'কবি' 'দেওয়ানা' প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন, ইনি খাঁটি সেই জাতীয়।

কিন্তু শহরের রোগ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। এমন যে শিউলিফুলের গাছ, যাহা অজস্র উপহার দিয়া শত শত ভক্তের সাজি ভর্তি করিয়া দেয়, তাহাকেও যদি কেহ কালে-অকালে 'ফুল দাও, ফুল দাও' বলিয়া ধরে, তবে কি সে তাহার কোমল উপঢৌকন বেশী দিতে পারে? অসময়ে ফুলের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া লাঠি দিয়া আঘাত করিলেও সে পাতা ছাড়া কিছু দিতে পারে না। একগোষ্ঠী পত্রিকা-সম্পাদক ও প্রকাশকের দল তাঁহাকে উপন্যাসের জন্য এমনই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন যে, শরৎ-বাবু অনন্যোপায় হইয়া মাসিকের মধ্যে অনেক আগাছা ও দূর্বাঘাস ছড়াইতেছেন। তাঁহার শেষ কয়েকখানি পুস্তকে রবিবাবুকে নকল করিতে যাইয়া, তিনি একরূপ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন ; রবিবাবুর সেই অপূর্ব কবিত্বের দীপ্তি তাহাতে নাই কিন্তু আছে দুর্নীতির বীভৎসতা ; এমন কি শ্রীকান্তের ভ্রমণের পূর্বভাগ, যাহা বঙ্গভাষার এক অদ্বিতীয় কীর্তিস্বরূপ গণ্য হইবার যোগ্য—তাহার শেষ কয়েক ভাগ তিনি ফেনাইয়া এমন দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন যে, যাহা ক্ষীর হইয়া শুরু হইয়াছিল তাহা প্রায় ঘোলে দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, আজকাল আর ইনি পরের মন্তব্যে তেমন উদাসীন নহেন : এজন্য অনেক সঙ্কুচিত হইয়া লিখিলাম।

২৫

বেহালায়

আমার মধ্যম পুত্র অরুণ এই সময় (১৯১৫) এম. এ. পাশ করিয়া আমাকে চিঠি লিখিলেন, তিনি আমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহেন। ইহার পূর্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং কিরণ পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া ৩০ টাকা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি দেখিলাম যাঁহারা সংসারের ভার লইবেন, তাঁহাদের কেহ অনিচ্ছুক, কেহ অপারগ, সুতরাং কলিকাতার কাছে কোন একটা পল্লীতে বাড়ী করিয়া কাঁটাপুকুরের বাড়ীর ভাড়া পাইলে সংসার-খরচটা আমার অভাবেও কতক পরিমাণে চলিয়া যাইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া বাড়ী করিবার জন্য নানা স্থান দেখিতে লাগিলাম। বেহালাই পছন্দ হইল ; সেখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস, ট্রাম আছে, জলের কল আছে, হাই স্কুল, মহাকালী পাঠশালা, ছাত্রবৃত্তি স্কুল, এবং দুইটি বাজার আছে। যে জায়গাটা পছন্দ করিলাম, তাহা অনেকটা আমার সুয়াপুরের বাগানবাটিকার মত। চারিদিকে গাছের নিকুঞ্জ,—আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, লিচু—সমস্ত ফলবান তরুর চারু সমাহার—গুবাকপংক্তিতে সজ্জিত ; একটি বাঁধাঘাট নির্মল নীলসলিলা বাপী ; সেই সুন্দর স্থানটি দেখিয়া আমার দেশের বাড়ী মনে পড়িল। কিন্তু আমি সেই সময়েই কিনিলাম না। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক এই তিনটি মাস রোজ যাতায়াত করিয়া দেখিলাম, কাহারও জ্বর হইল না ; ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোকদের চেহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখিলাম। সুতরাং ম্যালেরিয়ার অপবাদ অনেকটা বাজে কথা বলিয়া বোধ হইল।

বহুদিন কলিকাতায় বাস করিয়া পল্লীজীবনের আনন্দ নূতন বোধ হইল। কৃষ্ণদা (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) পথের লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। তিনি এতদূর আত্মীয়তা দেখাইলেন যে দুদিনের মধ্যে আমি তাঁহার ছোটবড়ো সকল ছেলেমেয়ের 'কাকাবাবু' হইয়া পড়িলাম। আশুবাবুরা কয়েক ভাই আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন এবং এতটা আত্মীয়তা দেখাইতে লাগিলেন যে আমি মুগ্ধ হইলাম। অক্ষয়বাবুর শুভ্রকেশ ও স্ফীতোদর, যেন আমাদের কতকালের চেনা, দুদিনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব হইল এবং দুর্গাপ্রসন্নবাবুর মাতা ঠিক মায়ের মত এত স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিলাম। হুকা হাতে লইয়া সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ গণেশবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত আমায় স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন। দেখিলাম ইঁহারা ঠিক কলিকাতার বন্ধুদের মত নহেন! তাঁহাদের বান্ধবতা মুখের কুশলবার্তাতেই শেষ, ইঁহারা কিন্তু স্নেহে দান ও প্রতিদান উভয়ের জন্যই লালায়িত। হরিদাস হালদার মহাশয়ের দ্বারা আমি সেই জমিটা কিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই হরিদাস হালদার এক অদ্ভুত জীব। বয়স আমার সমতুল্যই হইবে। নধরকান্তি, একান্ত নির্বিরোধ, ঝগড়া দেখিলে সে স্থান ত্যাগ করেন ; সর্বদা তামাক খান, হুকা-হাতে বাজার করেন, হুকা-হাতে রাস্তায় বেড়ান ; হুকা-হাতে দাওয়ায় বসিয়া থাকেন, নারদের সঙ্গে তাঁহার বীণার যে সম্বন্ধ, হুকার সঙ্গে ইঁহার তাহাই। এমন নিষ্কর্মা

লোক বিরল, নিত্য অভাব। একদিন আমি বলিলাম, 'আপনাদের অনেকগুলি নারিকেল গাছ আছে, কতক কতক ফল বিক্রয় করিয়া ফেলিলেও তো কিছু হয়—কষ্টে থাকেন, এতেও তো কিছু সুবিধা হইতে পারে।' খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কথা বলিতে যাইয়া কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল, অনেক কষ্টে মুখ হইতে কথা বহির্গত হইল, তখন খুব বড় দুই জোড়া গোঁফের মধ্য হইতে একটা বড় রকমের হাঁ বাহির করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'আমি কালী হালদারের ছেলে, আমাকে আপনি নারকেল বেচতে বলছেন! হায় রে হায়!' পর বৎসর সপরিবারে কাশী গিয়াছিলাম। হরিদাস হালদার ছিলেন আমার সঙ্গী। একদিন আড়াই সের মাংস বাজার হইতে আনিয়া দেখি, খোকা (কিরণ) আর আড়াই সের আনিয়াছেন; মোট ৫।৬টি প্রাণী, এত মাংস দিয়া কি হইবে? আমি বলিলাম, 'তিলভাণ্ডেশ্বরের কাছে কায়স্থ বাড়ী আছে, ইঁহারা আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে চাহেন,—ইঁহাদের বাড়ীতে আড়াই সের মাংস তত্ত্ব করা যাক।' হরিদাস হালদার আড় হইয়া পড়িলেন, 'সে হইতেই পারে না।' আমি বলিলাম, 'এই আড়াই সের আপনাকে খাইতে হইবে।' 'সে দেখা যাবে' বলিয়া হরিদাস খুব জোরে হুকো টানিতে লাগিলেন। রান্না হইল। বৈকালের জন্য এক টুকরা মাংসও হরিদাস রাখিতে দিলেন না। পাঁচ সের মাংসই রান্না হইল এবং এই দামোদরকল্প ব্রাহ্মণ ভুঁড়ির উপরের কাপড়ের বাঁধটা একটু শিথিল করিয়া দিয়া, তাল তাল মাংস খাইয়া, একাই আড়াই সের নিঃশেষ করিয়া বিষম এক উদ্গার উঠাইলেন। তারপর গেলাসটাকে অগ্রাহ্য করিয়া ঢক ঢক করিয়া একটা বড় ঘটীর জল নিঃশেষ করিলেন। ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ দিবানিদ্রার জন্য হুকার তামাক, টিকার ছাই প্রভৃতির নিকটস্থ একটা তক্তাপোশে হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং তাড়কাসুরের ন্যায় নাসারন্ধ্র হইতে এক উৎকট আওয়াজ বাহির করিতে লাগিলেন। আমরা ভাবিলাম, 'আজ অতিসার হইয়াই মরিবে, না হয় পেট ফুলিয়া দম বন্ধ হইয়া কাশীপ্রাপ্ত হইবে—বরাত ভাল, কাশীতে মরিয়া একেবারে নির্বাণ মুক্তি পাইবে।' সন্ধ্যার সময় সেই নাসারন্ধ্র সমুত্থিত বিপুল মেঘগর্জন থামিয়া গেল। বৌমা সবে সন্ধ্যাবাতি জ্বালাইয়া, রান্নাবান্নার ব্যবস্থাতে মনোযোগী হইয়াছেন, ইহার মধ্যে হরিদাস হালদার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'মাংসগুলি খাইয়াছিলাম, কিন্তু ভাত তো বেশী খাই নাই, বেশ ক্ষুধা পাইয়াছে। রান্নার আয়োজনটা শীঘ্র করিয়া ফেলুন।'

হরিদাস এখন আর তেমন খাইতে পারেন না, ভুঁড়িটাও অনেক সংবরণ করিয়াছেন।

আমি বেহালায় বাড়ী করিয়া পল্লীবাসী হইলাম। গণেশবাবু কত বিষয়ে আমাকে কত রকম সাহায্য করিয়াছেন; দুর্গাপ্রসন্নবাবু, কৃষ্ণবাবু ইঁহাদের সঙ্গে একত্র বেশ দিন কাটাইয়াছি; আমার পুকুরের ধারে চাঁপা গাছে অজস্র চাঁপা ফুটিত, মনে হইত যেন ঝাঁকে ঝাঁকে হলুদ পাখী গাছটির শাখায় শাখায় পাতার আড়ালে আড়ালে বসিয়া আছে, আম ও গুবাক গাছগুলির ফাঁক দিয়া যখন প্রাতঃসূর্য তাঁহার আলোর শর সন্ধান করিতেন, তখন বাগানবাটিকাটি যেন পুলকে কাঁপিয়া উঠিত। শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে 'কোকিল' 'চোখ গেল রে' 'বউ কথা কও'এর কলরব শুনিয়া মনে হইত যেন রাজরাজেশ্বরের ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য বন্দীরা বন্দনা করিতেছে। আমি

বাগানটি খুব পরিষ্কার রাখিয়াছিলাম—ছয় বিঘার মধ্যে একটা খড়কুটা পড়িতে দেই নাই। কলিকাতা হইতে আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রায়ই যাইতেন—জলধর সেন, অক্ষয় বড়াল, মণিলাল গাঙ্গুলী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রসময় লাহা, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সমরেন্দ্র, সুধীন্দ্র, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার প্রভৃতি বন্ধুরা দয়া করিয়া পায়ের ধুলা দিতেন, আহারাদি করিতেন। জলধরদা বেহালা গেলেই পুকুরে খুব সাঁতরাইয়া আমোদ করিতেন, গরম গরম পরটা ফরমাশ দিতেন। বাড়ীটি পরিষ্কার রাখিতে আমাকে অনেক খরচ করিতে হইত। তিনটি বাহিরের লোক বাড়ী ঝাঁট দিত। একদিন বেহালায় বড় ঝড় হইয়া গেল। রাস্তাঘাট সমস্ত ভাঙ্গা ডালে ও পাতায় ভর্তি হইয়া বেহালায় তিন ফুট আবর্জনা জমিয়া গেল। আমার বাড়ীতে গাছ বিস্তর; ঝড় একটু কমিয়া গেলে আমি তিনটি ঝি ও তিনটি চাকর এবং রাঁধুনি ঠাকুর এদের প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া ঝাঁটা দিলাম এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী সাফ করিয়া ফেলিতে বলিয়া দিলাম। তাহারা মেয়ে-পুরুষ একত্র হইয়া খুব স্ফূর্তির সঙ্গে বাগান সাফ করিয়া ফেলিল। আধ ঘণ্টা পরে আকাশ নির্মল হইল, গাছের ডালে কোকিল ডাকিতে লাগিল, পুকুরের নীল জল আবার স্থির হইয়া গেল, চাঁপা গাছের ডাল হইতে দুই একটি করিয়া ফুল পড়িতে লাগিল—এত ফুল যে ঝড়েও সমস্তগুলি নিঃশেষ করিতে পারে নাই। ছয় বিঘার বাগানে একটি পাতা রহিল না। বেহালার বন্ধুরা আসিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কি? আপনার এখানে যে একটিও পাতা পড়ে নাই'?—সমস্ত পল্লীটি যে ডালপাতার নীচে পড়িয়া গিয়াছে।' আমি বলিলাম, 'কই, দেখিতে পাইতেছেন, এখানে তো ডালপাতা কিছুই নাই।' তখন তাঁহারা অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক জল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ বলিলেন, 'পূর্ব দিকে নারিকেল গাছগুলির মাথার উপর দিয়া ঝড় চলিয়া গিয়াছে, নীচেকার গাছে ঝড় পায় নাই।' একজন বলিলেন, 'ঝড় বোধহয় এই বাড়ী পর্যন্ত এসে থেমে গেছে, যেমন বৃষ্টি কোন কোন জায়গায় এসে থেমে যায়, তা তো প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যায়।' আর একজন বলিলেন, 'তেতালা বাড়ীটি সামনে থাকাতে ঝড় প্রতিহত হইয়া আগাইতে পারে নাই।' কেহ বলিলেন, 'ঝড় পাতাগুলি উড়াইয়া লইয়া রাস্তায় ফেলিয়াছে। বাগানটি তাই পরিষ্কার রহিয়াছে।' কিন্তু কেহ বলিলেন না, 'এতগুলি চাকরবাকর রহিয়াছে, ইহারা সাফ করিয়া ফেলিয়াছে'।

বস্তুত মানুষের চেষ্টায় যে জঙ্গল সাফ হইতে পারে, বেহালার লোকের যেন এ ধারণা নাই। ডোবাগুলি অপরিষ্কার, তাহা সাফ্ করিবার প্রবৃত্তি নাই; বেশ বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যদি তাঁহাকে বলেন, 'আপনার বাড়ীর কাছে জঙ্গল রেখেছেন কেন?' উত্তরে বলিবেন, 'আরে মশায়, ওকি আবার জঙ্গল? যদি দশ বৎসর পূর্বে আসতেন, তবে দেখতেন দু' চারটা বনবরা ছুটে আসছে'। গ্রামে সাপ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'সাপ? কই সাপ, আমাদের গ্রামে সাপটাপ নেই'। তাহার পরদিন এক সাপ দেখাইয়া দেওয়া হইল। তখন বলিলেন, 'ওটা হেলে ও আবার সাপ! ওটা কেঁচো, ছেলেরা লেজ ধরে টেনে খেলা করে, ও আবার সাপ!' তারপর একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইলাম, উত্তরে শুনিলাম, 'কিছু ভয় করবেন না, মহাশয়,

ওটা দাঁড়াশ সাপ, বিষ নাই, দেখতেই ভয়ানক, বড় নিরীহ, harmless।' তারপর সত্যসত্যই একদিন একটা বড় গোখ্‌রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। গ্রামবাসী একজনকে বলিলাম, 'এটাকে কি বলবেন?' তিনি দাঁতে জিভ কাটিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, এটা বাস্তু, ইহাকে না উসকাইলে কোন অনিষ্ট করে না, ইঁহারা বাড়ীর লক্ষ্মী।' গ্রামে কাহাকেও সাপে কামড়াইয়াছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে দুই হাত নাড়া দিয়া 'না, না, সেটি আমাদের গ্রামে কখনও হয় না' বলিতে থাকেন। কিন্তু একদিন একটি সাপে কাটার খবর পাওয়া গেল, তখন কপালে আঙ্গুল ঠেকাইয়া বলিলেন, 'ও সব নিয়তি'। পাঁচ বৎসরের ছেলে হইতে আশি বৎসরের বৃদ্ধ, যাহাকে সাপে কাটার কথা বলিবেন, তাহারই একমাত্র অদ্বিতীয় উত্তর 'নিয়তি'। বস্তুত 'নিয়তি' পল্লীগ্রামের সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। ডোবা, জঙ্গল, সাপ, ম্যালেরিয়া, সকল সমস্যার এক সমাধান 'নিয়তি'। ঐ কথাটি উচ্চারণ করিলেই সমস্ত দায়িত্ব হইতে খালাস। বাড়ীর এত কাছে চৌরঙ্গীর বড় বড় রাস্তা, বড় বড় বাড়ী হইতে পুরুষকারের জয়কেতু পৃথিবী-জয়ের দুর্জয় স্পর্ধা ও প্রতিষ্ঠার বার্তা ঘোষণা করিতেছে, আর চার মাইল দূরে বেহালা আপনাকে নিয়তির হাতে নিঃসহায়ভাবে ছাড়িয়া দিয়া বঁড়শী দিয়া মাছ ধরা, দাবা, তাস ও পাশা খেলা দ্বারা মহামূল্য সময়ের শিরে বজ্রাঘাত করিতেছে। ম্যালেরিয়া বেহালায় থাকে মাত্র তিনটি মাস, ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক, কিন্তু অপর সময় কলিকাতা হইতে স্বাস্থ্য ভাল; ম্যালেরিয়া কোন বছর হয়, কোন বছর হয় না। সেই ম্যালেরিয়ারই বা দোষ কি দিব? আমার প্রতিবেশী মনোহর পণ্ডিত মহাশয় ৭৫ বৎসর বয়সে একটি অতি জঘন্য ডোবায় প্রাতঃকালে নামিতেন ঘন গুল্মের জঞ্জালগুলি সাফ করিতে। ১২টার সময় ডাঙ্গায় উঠিয়া আহারাদি করিয়া আবার সেই কার্যে নিযুক্ত হইতেন, রাত্রি আটটার সময় উঠিতেন, এই ভাবে দিনরাত্রি সেই অতি বিকট ডোবায় সাতদিন ক্রমাগত পড়িয়া থাকার পর তাঁহার জ্বর হইল। আমি দেখিতে গেলে বলিলেন, 'পাজি জায়গা— একটু জল গায়ে পড়েছে কি জ্বর হয়েছে'। অনেক সময় দেখিয়াছি, সকালে জ্বর হইয়াছে, দুপুরে অল্প অল্প জ্বর আছে, তাহাই লইয়া বিনা ছাতায় বকের মত পুকুর পাড়ে বসিয়া কোন ব্রাহ্মণ বঁড়শী জলে ফেলিয়া ধ্যানী বুদ্ধের মত স্থির হইয়া আছেন। অনাবৃত মাথায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতে গ্রাহ্য নাই। সাবধান থাকিলে জ্বর হয় না। আর সকলই ভাল—মাছ, দুধ, সন্দেশ, ফল সস্তা ও সব সময় পাওয়া যায়। ডাক্তার কবিরাজের সংখ্যাও যথেষ্ট। গ্রাম্য সুখের অবধি নাই। আহার করিতে বসিয়া প্রায়ই দেখিতাম, হরিহরের মাতা, কৃষ্ণ-দা কিংবা অপর কোন ব্রাহ্মণবাড়ী হইতে ব্যঞ্জনাদি আসিয়াছে। মেয়েরা ঘোমটায় অর্ধেক মুখ ঢাকিয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলিতেন। যে স্নেহবান্ধবতা কলিকাতায় শুষ্ক ভদ্রতায় পর্যবসিত, সেই স্নেহবান্ধবতার পল্লীলক্ষ্মী, মুখে ঢল ঢল। এই গ্রাম্য জীবনের জন্য কলিকাতায় থাকিয়া প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। তারপর রঞ্জনবিলাসবাবু আসিয়া বাড়ী করিলেন, বৃদ্ধ হইলেও স্ফূর্তি কি! ছোট ছোট মেয়েদের খোপা খুলিয়া দেওয়া, তিন বছরের মেয়েকে বিবাহ করিবার ভয় দেখানো, এস্‌রাজ হাতে করিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঢুকিয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন গান করা, এদিকে আশু বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে পল্লীরাজনীতির কূট বিশ্লেষণ, গণেশবাবু, দুর্গাপ্রসন্ন-

বাবুর একনিষ্ঠ সততা ও আন্তরিক সাহায্য—অক্ষয়বাবুর প্রাণখোলা হাসি ও কৃষ্ণদার আদর-আপ্যায়ন—অপর দিকে কোকিল, 'বউ কথা কও'-এর ডাক, ফুল্ল সন্ধ্যামালতী, চাঁপা ও গন্ধরাজের সুবাস, বকুল ও শিউলি গাছ হইতে অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টি, আমার বাড়ীর সেই ঐন্দ্রজালিক শোভামণ্ডিত পুকুর-পাড়টি, হরিসভার বাৎসরিক উৎসব, মাল্লাদিগের রাস ও মেলা, কৈবর্তদের ঘেটুর গান—এই সমস্ত গ্রাম্য আনন্দ আমার চিত্তকে জোর করিয়া দখল করিয়া লইয়াছিল। কলিকাতা হইতে রোজ রাত্রে বেহালায় ফিরিবার পথে মাথার উপর নীল পদ্মের মত নীলাকাশ যেন বিকশিত হইয়া উঠিত, সেই নীলের মধ্যে শ্বেত চন্দনানুরঞ্জনের ন্যায় চন্দ্রলেখা ও নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিত। আমি ট্রামে বসিয়া সেই শোভা দেখিতাম ও 'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসনবনমালী' প্রভৃতি জয়দেবী কবিতা আবৃত্তি করিতাম। এই পল্লী সুখানুভবের সময় আমার 'মুক্তাচুরি', 'রাগরঙ্গ', 'রাখালের রাজগী', 'কানুপরিবাদ', 'শ্যামলী খোঁজা' ও 'নীলমাণিক' লেখা হইয়াছিল, 'ফোক লিটারেচার' বই তৈয়ারী হইয়াছিল, এগুলির সমস্তই পল্লীপ্রসঙ্গ লইয়া।

আমাদের পাড়ায় একটা জিনিসের সঙ্গে আমার কিছুতেই ঐক্য হইত না। সেটা অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে বিরোধ। ইনি সাউথ সুবারবন মিউনিসিপালিটির সভাপতি এবং কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান। মূর্তিটি সুন্দর। অর্ধপক্ক-দাড়ি আবক্ষলম্বিত, ঋষির মত কতকটা যেন গাম্ভীর্যের আভাস দিতেছে। গৌরবর্ণ, ক্ষীণদেহ, মাঝে মাঝে বাতরোগে কষ্ট পান, কর্মঠতার বিরাম নাই। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ইনি চুপ করিয়া থাকেন নাই, দেশের অনেক কাজ করিয়াছেন, ইংরাজীতে বড় বড় বই লিখিয়াছেন—ঐশ্বর্যের তুঙ্গশৃঙ্গে বসিয়া আছেন, কিন্তু বেহালায় পল্লীলক্ষ্মী যখন নিকটবর্তী মহানগরীতে পদাঙ্ক স্থাপন করিতে যাইয়া এক পা মাত্র বাড়াইয়াছেন, তখন ইনি যেন 'তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহাকে স্বীয় গ্রামে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবুর প্রসাদে বেহালায় ট্রাম হইয়াছে, জলের কল হইয়াছে ; বোধহয় শীঘ্রই বৈদ্যুতিক আলো হইবে। তাঁহার চেষ্টায় বাজার ও হাই স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি। ইনি শত্রুর সহিত শত্রুতা করেন না, অন্যায়কারীকে জব্দ করিবার চেষ্টা নাই, তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ক্ষমা। কিন্তু একটু নিরীহ স্বভাবের সুবিধা পাইয়া বেহালার একদল লোক ইঁহার বিরোধী, নানারূপে ইঁহাকে আক্রমণ করিতেছেন। এই গ্রাম্য দলাদলি হইতে সর্বদা দূরে থাকিয়াছি। কাহার পিতামহ কুটিরে বাস করিতেন, সুতরাং পৌত্র অনাদিকাল হইতে বড় মানুষ নহেন ; কাহার পুত্রের বিবাহে কে নিজে না আসিয়া কবে তাঁহার আত্মীয়স্বজন পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করত কাহাকে অভূতপূর্ব অপমান করিয়াছেন, কাহার বাড়ীতে কে না যাইয়া তাঁহার অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, কোন্ দিন কে পক্ষপাত করিয়া কাহার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, পল্লী-রেজিষ্টারী খুঁজিয়া এই সকল দেখার আমার কোন দরকারই নাই। আমি ক্রমাগত সাত পুরুষ এক গ্রামে থাকিয়া পল্লী-বিরোধ উত্তরাধিকারসূত্রে পাই নাই, সুতরাং সে সকল বুক ঠোকাঠুকি ও আস্ফালনের মধ্যে আমি ছিলাম না। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার ভ্রাতাদের সুন্দর সৌম্য স্নিগ্ধ মূর্তি দেখিয়া প্রীত হইয়াছি, তাঁহাদের অজস্র স্নেহ পাইয়া ধন্য হইয়াছি, তাঁহারা যে গ্রামের সকলের অপেক্ষা বড়, তাহা বুঝিয়াছি, শুধু ধনে মানে শিক্ষাদীক্ষায় নহে,

সত্যবাদিতায়, ক্ষমায়, নৈতিক চরিত্রেও তাঁহারা বড়। ঐশ্বর্যবান হইয়াও তিনি বেহালা ছাড়িয়া কলিকাতায় প্রলুব্ধ হন নাই—তিনি দেশ-ভক্ত, ইহা বুঝাইতে দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।

বেহালা হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়া আমার তৃতীয় পুত্র বিনয় বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে এবং বেহালার স্কুল হইতে আমার চতুর্থ পুত্র বিনোদ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছে। বেহালা হইতে আমার জামাতা তমোনাশ দাশ বাংলা ও ইতিহাসে, এই দুই পরীক্ষায় এম. এ. পাশ করিয়াছেন, সুতরাং বেহালার স্মৃতি আমার নিকট প্রীতিকর। দুই বৎসর হইল আমার মধ্যমা কন্যা ফুলবালা দেবী ৬টি অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই ঘোর অশুভ বার্তা যেদিন বেহালায় শুনিয়াছিলাম, সেদিন বেহালার প্রতিবেশী রমণীরা আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন। সে শুধু মৌখিক ভদ্রতা নহে, কলিকাতার বন্ধুত্ব ঘোষণা হইতে তাহার কত তফাৎ!

২৬

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক

১৯০৫ অব্দে আমি বি. এ. পরীক্ষায় বাংলা পরীক্ষক হইবার জন্য আরজী করিয়াছিলাম। তখন পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয় ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের পরে পূর্ববঙ্গের লেখকগণের মধ্যে তিনিই অগ্রণী ছিলেন। গৌরবর্ণ দীর্ঘ কান্তি, মুখখানি গোল ছন্দ, কপালের ঊর্ধ্বে ছোট একটি আঁচিল, তাহা মুখখানির লাবণ্য যেন বাড়াইয়া দিয়াছিল ; দাগটি দেখিয়া আমরা হাফেজের 'আগর আতুরক সিরাজি' আওড়াইয়া তাঁহাকে প্রথম দিন অভিনন্দিত করিয়াছিলাম। আমি রাজাবাগানের বাড়ীতে থাকিতে তিনি কয়েকবার আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের জলধর, দীনেশ বসু ও পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত তিনটি লেখকই কানে একটু খাট ছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে গুপ্ত মহাশয়ের শ্রবণশক্তিটা একটু বেশী দুর্বল ছিল, কিন্তু ঠিক কানের গোড়ায় ঢাক পিটাইতে হইত না। হৃদয়টি ছিল তাঁহার সরলতার খনি এবং হাতের অক্ষর ছিল চোখভুলানো। রায় উমাকান্ত দাশ বাহাদুর (ত্রিপুরার রাজমন্ত্রী) ছিলেন রজনীবাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিন্তু রজনীবাবু কখনই নিজের নামের পশ্চাতে তাঁহাদের কৌলিক 'দাশ' উপাধি ব্যবহার করিতেন না, শুধু 'গুপ্ত' লিখিতেন। এই স্থানে জলধরবাবুর সম্বন্ধে একটি কথা লিখিব, ইঁনি হিমালয়ে গোপবধূর ভাণ্ডের দুগ্ধপানের চিত্র দিয়া আমাদিগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিলেন, এখন উপন্যাসগুলি দিয়া আমাদিগকে কাঁদাইয়া ছাড়িতেছেন।

'রজনী পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষকের পদপ্রার্থী হই। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস্-চান্সেলার। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইনের খসড়া তখনও প্রস্তুত হয় নাই, এনট্রান্স পরীক্ষা তখনও ম্যাট্রিকুলেশনে পরিণত হয় নাই। ভাবিলাম একবার ভাইস্-চান্সেলারের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। তখন আমি ১৭নং শ্যামপুকুর লেনে থাকি। শনিবার দিন, বেলা ৮টার সময় ভবানীপুরে উপস্থিত হইয়া একখানি কার্ড পাঠাইলাম। এখন ইনি দোতলার যে ঘরটায় লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন, তখন সে ঘরে বসিতেন না। সেই ঘরের সংলগ্ন উপরের লম্বা ঘরটায় বসিতেন। আমি তাঁহার নিকট দাঁড়াইবা মাত্র তিনি বলিলেন, 'আপনি তো ১৭নং শ্যামপুকুর লেনে থাকেন'? আমি বলিলাম, 'কি করিয়া জানেন?'—'কেন? আপনি যে আরজী করেছেন, তার নীচে তো ঠিকানা আছে'। আমি বলিলাম, 'সে আরজী তো অফিসে আছে।' তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আরজীতে যা লেখা আছে, তা বুঝি আর কারো মনে থাকতে পারে না'? আমি একটু আশ্চর্য হইলাম, কত লোক তো কত আবেদন করিয়া থাকে, কিন্তু একজন আবেদনকারীর বাড়ীর নম্বরসুদ্ধ ঠিকানাটি মনে করিয়া রাখা সহজ নয়। ইহার পরে তিনি বলিলেন, 'আমার কাছে এসে খুব ভাল করেছেন, না হলে পরীক্ষকের পদটি পেতেন না'। আমি বলিলাম, 'আমার আসা না-আসায় দাবীর তারতম্য কি করে হয়েছে'? তিনি আবার হাসতে হাসতে বলেন, 'কি করে হয়েছে?

তবে শুনুন, আপনার বন্ধুবান্ধবেরা ও সিণ্ডিকেটের গণ্যমান্য সদস্যগণের কেউ কেউ আপনার কাজ না হওয়ার জন্য বেশ একটি ফন্দি এ'টেছিলেন ; তা ভেস্তা হয়ে গেল। আপনার দাবী যে সবার চাইতে ভাল, এটা তো আর কেউ প্রতিবাদ করতে পারেন নি ; আপনি গ্র্যাজুয়েট, বাংলায় এত বড় একখানি বই লিখে প্রাণপাত করেছেন,—গভর্নমেণ্ট আপনাকে বিশেষ বৃত্তি দিয়েছেন, সে বিষয়ে তো আর কথাটি চলে না। কিন্তু তাঁরা আপনার কথা তুলতে বলে উঠলেন, আপনার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, এমন কি আপনি লোক চিনতে পারেন না, লেখাপড়ার শক্তি একেবারে হারিয়েছেন ও বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। যা হোক, এখন আপনাকে তো নিজের চোখে দেখলুম, এবার জবাব দিতে পারব। তাই বলছিলুম, আপনি না এলে আপনাকে কাজ দেওয়ার পক্ষে মুশকিল হত, এবার আপনার কোন ভয় নাই'। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। তাহার পর পরীক্ষক হইয়া কাজ করিলাম, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে খুব কমই গিয়াছি। বিজয়াদশমীর দিন ভবানীপুরে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়াছি। ইহার পর একদিন শুনিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য রিডার নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। এই সম্মান বড় কম নহে, কারণ ইহার পূর্বে অন্য কোন বাঙালী এ পদ পান নাই। পৃথিবীজোড়া যাঁহাদের নাম, এমন সকল বড় বড় সাহেব রিডার হইয়াছিলেন। শুনিলাম, সিণ্ডিকেটে একটা আপত্তির তুফান উঠিয়াছিল। কেহ বলিয়াছিলেন, বাংলা ভাষার গৌরব এত বড় নহে যে তজ্জন্য একটা রিডারের পদ সৃষ্টি হইতে পারে। কেহ বলিয়াছিলেন, দীনেশবাবু অপরাপর রিডারের তুলনায় নগণ্য ব্যক্তি। কিন্তু ভাইস-চান্সেলার নিজে যাহা বুঝেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। তিনি নাকি শেষে বলিয়াছিলেন, 'I know my man, যিনি যে কাজের যোগ্য আমি তাঁকে সেই কাজ দিই'।

তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলাম, 'ইংরাজী অনেক দিন লিখি নাই, লিখতে পারব তো'? তিনি বলিলেন, 'ঠিক পারবেন'।

এই একটা কথায় যেন আমার মধ্যে তড়িৎ-শক্তি সঞ্চারিত হইল। আমি ভাবিলাম, অপর সকলে তো এ ভাবে কাজ করেন না। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি এ কাজ পারবে কি'? কিন্তু আমার একটি ছত্র ইংরাজী লেখা না দেখিয়া তিনি বিশ্বাস করিলেন, 'আমি পারব'। প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিয়া দিলেন এবং আমাকে স্বীয় শক্তিতে সন্দিহান দেখিয়া অভয় দিয়া বলিলেন, 'ঠিক পারবেন'।

আমি আমার দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলাম, 'হে ঠাকুর, আমি যেন ই'হার কথার গৌরব রাখিতে পারি, ইনি পরম বিশ্বাসে প্রতিকূল ব্যক্তিদিগকে নিরস্ত করিয়া এ কাজের ভার আমাকে দিয়াছেন, ই'হাকে যেন আমার জন্য বিদ্রূপ না শুনিতে হয়'.

আমি এক সময়ে ক্লাসে ভাল ইংরাজী লিখিতে পারিতাম বলিয়া খ্যাতি ছিল. কিন্তু বহু বৎসর তো শুধু বাংলাই লিখিয়া আসিয়াছি ; এখন যে এতগুলি ইংরাজী বই লিখিয়াছি তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। ই'হারই উৎসাহ আমার লেখনীকে শক্তি দান করিয়াছে। আমার বই যখন বিলাতে আদৃত হইল, বড় বড় য়ুরোপীয়

পণ্ডিতগণের প্রশংসা লাভ করিল, তখন আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম, 'হে ঈশ্বর, আমার নিয়োগ-কর্তার মান রাখিয়াছ, আমি কাজে বিফল হইলে যে শ্লেষ ও টিটকারি পড়িত, তাহাতে আমি অপদস্থ হইতাম না—কিন্তু ইনি একটু অপ্রস্তুত হইতেন'। তারপর একদিন রোগশয্যায় পড়িয়া ছিলাম, হঠাৎ একদা প্রাতে ধম্মপদের অনুবাদক চারুবাবু আমায় বলিয়া গেলেন, আমি ইউনিভারসিটির 'ফেলো' হইয়াছি। অযাচিতভাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই সম্মান প্রদান করিয়াছেন। যতই তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুবিধা হইল, ততই ইঁহার 'মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম' প্রতিভা আমার চক্ষে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল। সিনেটে বহু-সংখ্যক উচ্চপদস্থ মনস্বী সাহেব ও বাঙালী সদস্য একত্র হইয়া ইঁহার প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন, কেহ কেহ একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে এমনই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন যে, মনে হইত, সেই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে আর কি কথা থাকিতে পারে? হয়ত ইংরেজ-বাঙালী একত্র হইয়া তিন-চারি ঘণ্টা-কাল সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে একেবারে লৌহস্তম্ভের মত দৃঢ় করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু শেষে যখন আশুতোষ উঠিলেন, ১৫ মিনিট কাল তাঁহার গভীর কণ্ঠের উচ্চারিত শব্দের গোলাগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়া পূর্বপক্ষকে ধূম্রাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, এবং শেষে উপসংহারে ইঁহার সিদ্ধান্ত বিদ্যুতের মত এমনই স্পষ্ট, এমনই আশ্চর্যরূপ উদ্দীপনার ভাষায় প্রকাশিত হইল যে ৬০।৭০ সদস্য-সম্বলিত সভা একেবারে স্তব্ধ হইয়া দেখিলেন যে, প্রতিপক্ষের যুক্তি-হর্ম্য-শিরে একেবারে বজ্রপাত হইয়া তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। এম. এ. পরীক্ষার অধ্যাপনার ভার বড় বড় কলেজ হইতে তুলিয়া লইয়া যে দিন বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, সেদিন কি ভীষণ প্রতিবাদের ঝটিকাই না উত্থিত হইয়াছিল। ৩৫টি ধারা লইয়া কয়েক মাস ব্যাপিয়া সিনেটসভায় বাদানুবাদ হইয়াছিল—রেগুলেশন পরিবর্তনের কত প্রস্তাব কত বার হইয়াছে—এই বিরাট দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত তর্কবিতর্কে ভগবৎ-দত্ত ক্ষমতার বলে অদ্বিতীয় সারথি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রথ চালাইয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা বুদ্ধির প্রখরতায় অন্যত্র দিগ্বিজয়ী, তাঁহারা ইঁহার প্রতিভালোকের কাছে দিবা-প্রদীপবৎ হইয়া গিয়াছেন; কোন সাহেব বা কোন বাঙালী ইঁহার নিকট উঁচু মাথায় দাঁড়াইতে পারেন নাই।

ইনি স্বদেশী ভাবের উপর শিক্ষার ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছেন—সিনেট-সিণ্ডিকেট এখন বাঙালীর আয়ত্ত। ইনি দেশীয় পরিচ্ছদকে সম্মানিত করিয়াছেন, বড় বড় সাহেবের পার্শ্বে বাঙালী সদস্যেরা ধুতি চাদর পরিয়া সিনেট সভা অলংকৃত করেন। অধ্যাপকগণ বিদেশী সাজসজ্জা একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সমস্ত ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আহ্বান করিয়া আমাদের বিদ্যাগারকে এক মহা-জাতীয় কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছেন। বৌদ্ধ স্তূপাকৃতি টুপি-পরা তিব্বতীয় লামা, বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত পাগড়ী-পরিহিত মারহাট্টা, স্ফীতোজ্জ্বল-গণ্ড তীব্র-চক্ষু জাপানি ও চীনে-সাহেব, গৈরিক-রঞ্জিত আলখাল্লা-পরিহিত সিংহলী ভিক্ষু, নেকটাই ও হ্যাটধারী য়ুরোপীয় পণ্ডিত,—স্বর্ণপাড়দীপ্ত উত্তরীয়-গায়ে মাদ্রাজী, কত ভিন্ন বর্ণ, কত ভিন্নদেশীয় পণ্ডিত আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভূষিত করিতেছেন —পঞ্চতলসৌধ আকাশভেদী জয়পতাকা তুলিয়া এই বিভিন্নদেশী অধ্যাপকমণ্ডলী-

অলঙ্কৃত হইয়া আজ বাঙালী প্রতিভাকে ভারতবর্ষে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। ডঃ বেনীমাধব বড়ুয়ার 'আজীবকশ্রেণী' সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস', ডাঃ ইয়ামোকামার বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং অপরাপর অধ্যাপকের মৌলিক গবেষণা প্রাচ্য-প্রত্নতাত্ত্বিক রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছে। পোষ্ট গ্রাজুয়েটের কাজ অব্যাহতভাবে চলিলে অচিরে প্রাচ্য জ্ঞানের যে দীপ এই গোলদীঘির বিদ্যামন্দিরের চূড়ায় জ্বলিবে, তাহা সমস্ত জগতের দিগ্‌দর্শনী হইবে। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত সম্প্রতি যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, এবং স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন, জুলে ব্লক, প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি করিয়া যে সকল চিঠিপত্র লিখিতেছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বশালার নবজাগরণে প্রাচ্যবিদ্যার আলোক-কেন্দ্র যে প্রতীচ্য হইতে পুনরায় প্রাচ্যে প্রবর্তিত হইবে, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই গৌরব সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছেন। স্যার আশুতোষের গ্রাজুয়েটের দল অক্ষৌহিণীর সেনার ন্যায় বঙ্গদেশের হাট-মাঠ-বাট ছাইয়া ফেলিতেছেন। গ্রাজুয়েটের সংখ্যা বাংলা দেশে বাড়িয়া গিয়াছে—ইহাই কাহারও কাহারও আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নূতন রেগুলেশনের ফলে পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই রেগুলেশনের বলেই স্যার আশুতোষ এ দেশের পক্ষে অনুরূপ বিধান করিতে পারিয়াছেন। দেশের শিক্ষাশক্তি এ দেশে কল্যাণকারী হইয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছে। বজ্র ধ্বংসের জন্য আরোপিত হইতে পারে, কিন্তু সেই বজ্র ব্যবহারের গুণে আবার রক্ষার উপাদানও হইয়া থাকে। আজ উচ্চশিক্ষা বাংলা দেশের প্রতি পল্লীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে এই যে উচ্চশিক্ষার স্রোত অবাধভাবে বহিয়া গিয়া এ দেশের সভ্যতাকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করিতেছে, এই মহাদান আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি অপেক্ষাও এই উচ্চ শিক্ষার বিস্তৃতিতে এ দেশ লাভবান হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের দারিদ্র্য ঘুচাইবার স্থান সরস্বতীর মন্দির নহে, আমগাছের নীচে যাইয়া বেলফুল প্রার্থনা করা বৃথা। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষাও উচ্চশিক্ষার অন্তর্গত করা যায়; অর্থাভাব না হইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সকল দরজা খুলিয়া রাখার ব্যবস্থা অনায়াসে হইতে পারে। ভবিষ্যতে যদি ভারতে নেতৃত্ব করিবার লোকের দরকার হয়, তাহা হইলে এই উচ্চ-শিক্ষার গুণেই বঙ্গদেশ হইতে যত লোক আমরা সরবরাহ করিতে পারিব, অন্য কোন প্রদেশই তাহা পারিবে না। মাড়োয়ারীর ধনদৌলত ও ব্যবসায়ের বুদ্ধি তাহাকে নেতৃত্বপদ দিবে না, ভারতীয় উন্নতির পথে বাঙালীই বড় থাকিবে। আমাদের অর্থের অভিমান নাই, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষার অভিমান আছে। বাঙালী যে জন্য শ্রেষ্ঠ, সেই পথ রোধ করিলে বাংলার গৌরবকে কণ্ঠ-চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইবে। এই একটি পথ তৈয়ারী হইয়াছে, বাঙ্গালীর আর কোন পথ নাই, অপরাপর পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা আমরা অবশ্য করিব, কিন্তু তাই বলিয়া যে একটি বৃহৎ পথ খোলা আছে, যাহা এখনও যশ-মান ও ক্ষমতার দিকে বাঙ্গালীর পক্ষে রাজপথ হইয়া আছে—সেটিকে প্রতিরোধ করা কি আত্মহত্যা হইবে না? সেই পথে লইয়া যাইবার পক্ষে স্যার আশুতোষ ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি

নাই। তিনি মানুষ, সুতরাং তাঁহার কোন দোষ নাই, একথা বলা যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি মহাসমুদ্রের পাড়ে আসিয়া শুধু জলের লবণত্ব খুঁজিয়া নাসিকা কুঞ্চন করে, হিমাদ্রি দেখিতে আসিয়া তাহার পাদমূলের কাঁকরের নিন্দা করিয়াই চলিয়া যায়, তাহার গুণগ্রাহিতার প্রশংসা আমরা করিতে পারিব না। যিনি বিষয়-নিস্পৃহ যোগীর ন্যায় অসামান্য ত্যাগের দ্বারা স্বীয় অতুল্য মহাশক্তির প্রয়োগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে জগতের চক্ষে সমুজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়া যাঁহারা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অভিমানের প্রবৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহারা মিত্র বলিয়া পরিচয় দিলেও আমরা তাঁহাদিগকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বিশ্বাসের জায়গায় আমাদের অবিশ্বাস আসিয়াছে।

এই সুবিস্তৃত শিক্ষার ভিত্তিতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, ভারতবর্ষের অন্যত্র তাহার আশা করা অসম্ভব।

যে অক্লান্ত কর্মী মহাজন বিনিদ্র চক্ষে, অশ্রান্ত হস্তে, অকুণ্ঠিত চিত্তে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্র উর্বর করিবার জন্য হলচালনা করিতেছেন, তাঁহার চর্ম মশক-দংশনে ব্যথা অনুভব করে না, তাঁহার চিত্ত প্রতিকূলতায় অধিকতর দৃঢ় সংকল্পারূঢ় হয়, বিরুদ্ধ অবস্থায় আরও যুযুৎসু হইয়া উঠে। এই মানুষটিকে আমি যেরূপ দেখিলাম, এরূপ আর একটি দেখি নাই, ইহা অত্যুক্তি নহে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ইঁহার প্রবল ব্যক্তিত্বের দরুণ দয়াগুণটি কতকটা আড়াল পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পর্বতরাজের আড়ালে সুরধুনী খেলা করিতেছেন, এ বিষয়ে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনি দৃঢ় পুরুষোচিত মহিমামণ্ডিত আশু-চরিত্রের নিগূঢ় স্থানে যে দ্রবময়ী গঙ্গার ধারার ন্যায় দয়ার স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছে, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন—তাঁহারা সেটি শতবার লক্ষ্য করিয়াছেন। একদা একটি ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতেছিল, বাংলা পরীক্ষার দিন জ্বর হওয়াতে পরীক্ষা দিতে পারিল না। সে নিতান্ত গরীব, আশুবাবুর নিকট যাইয়া কাঁদিয়াই আকুল, তাহার এক নিরুপায়া বিধবা মাতাকে জমিদার আশা দিয়াছেন, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হইলে ছেলেটিকে একটা চাকুরি দিবেন। সে পরীক্ষায় ফেল হইলে মাতা-পুত্র উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। এ অবস্থায় আশুবাবু কি করিতে পারেন? যে পরীক্ষা দেয় নাই, তাহাকে কি করিয়া পাশ করানো যায়? ছেলেটি সম্ভব-অসম্ভব অবস্থার সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না, সে যুক্তিতর্ক মানিল না, কাঁদিয়াই আকুল। সে কান্না নিরাশ্রয়ের কান্না, শোকার্তের কান্না, তাহা আশুবাবুর প্রাণ ছুঁইল, অমনই উপায় হইল। তিনি বলিলেন, 'ব্যস্, ভাবতে হবে না, তুমি আই. এ. পরীক্ষার বাংলা পেপার যেদিন হবে, সেদিন পরীক্ষা দিতে ব'সে যেও'। ম্যাট্রিক ও আই. এ.-র বাংলা প্রশ্ন অনেকটা একরূপ, শেষোক্ত পরীক্ষা একটু শক্ত, এই মাত্র প্রভেদ; কিন্তু উভয় পরীক্ষায়ই কোন পুস্তক হইতে প্রশ্ন হয় না, শুধু রচনার কৃতিত্ব দেখাইতে হয়। ইহার বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইলেন না, যেহেতু জ্বরের জন্য ছেলেটি পরীক্ষা দিতে পারে নাই এবং সেই ত্রুটি সংশোধন জন্য সে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। এই যে উপায়টি আশুবাবুর মাথায় আসিয়াছিল তাহা তাঁহার গভীর দয়ার দ্বারা প্রবর্তিত। তিনি 'আহা' 'উঁহু' প্রভৃতি সহৃদয়তাব্যঞ্জক কথা বলিয়া

আর্তকে সান্ত্বনা দেন না, তাঁহার দয়াবৃত্তি কার্যকরী, সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তিনি বিপন্নকে উদ্ধার করেন। আমি নিজে জীবনে তাহা বহুবার অনুভব করিয়াছি। আমার এক পদস্থ বন্ধু একবার বিপদে পড়িয়া আশুবাবুর চেষ্টায় অব্যাহতি পান। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ইনি যে ভাবে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, যে নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, আমার পিতা তাহার অপেক্ষা বেশী করিতে পারিতেন না'। লোকের কষ্টের কথা শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, এবং যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির উপকার করিতে না পারেন, তবে লজ্জিত হন, যেন বঙ্গদেশের যাবতীয় দুঃখীর দুঃখ নিবারণের দায় তাঁহারই। আমাদের দেশের ভদ্র-পরিবারদের দুঃখের সমদুঃখী ব্যক্তি ইঁহার মত এদেশে আর কেহ নাই। কত শত লোককে তিনি যে কতভাবে উপকার করিয়াছেন, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার 'ফি' বাড়াইবার কথা লইয়া তাঁহার বিপক্ষ দল তাঁহাকে নানারূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রদের প্রকৃত হিতৈষী ও ব্যথিত তাঁহার মত তাঁহাদের কেহই নহেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, একটি ছাত্র আজকালকার দিনে ৩০০ শত টাকার নীচে বাৎসরিক খরচ নির্বাহ করিতে পারে না, সেই জায়গায় মাত্র ৫ টাকা বাড়াইলে ৩০৫ টাকা হয়। ডাক্তারেরা 'ফি' বাড়াইয়াছেন, কলেজে স্কুলে মাসে মাসে ছাত্রগণ বেশী 'ফি' দিতেছে, সমস্ত জিনিসপত্র বেশী দামে কেনা হইতেছে, এই সময়ে বৎসরে একবার মাত্র ৫ টাকা দিলে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় টিকিতে পারে, এই ৫ টাকা প্রতি ছাত্র দিলে আমাদের দেড় লক্ষ টাকা আয় বাড়িয়া যায়, নতুবা বিশ্ববিদ্যালয় চলিবে না। তিনি শুধু এই প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, চাঁদা তুলিয়া একটা ফণ্ড সৃষ্টি করিবার উদ্যোগে ছিলেন যাহাতে নিতান্ত অসমর্থ ছাত্রকে সাহায্য করা যাইতে পারিত। এই প্রস্তাবটি বাতিল করার দরুন বিশ্ববিদ্যালয় আজ টলমল। ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি নহে, বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের মুখে দেওয়ার জন্য কেহ কেহ কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষাসংকোচ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা সিংহকে মূষিক হইয়া বাঁচিয়া থাকার উপদেশ দিতেছেন। আমার বিবেচনায় ঐরূপ জীবন না থাকাই ভাল।

হিব্রু, গ্রীক, কেমিস্ট্রি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ববিভাগের উন্নতির জন্য স্যর আশুতোষের যে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি আছে, সেই সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণেরও তাহা নাই। জাতিগঠন করিবার আদর্শ সমক্ষে রাখিয়া ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডার চালাইতেছেন। আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যরূপ মহারথের নগণ্য চক্র মাত্র। তের-চৌদ্দ বৎসর যাবৎ আমি ইঁহাকে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষার সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলাম, প্রতি বারই ইনি উপেক্ষার ভাবে আমার অনুরোধ এড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিন বৎসর হইল, তিনি নিজে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এইবার বাংলায় এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা করিব; আসুন, নিয়মগুলির খসড়া তৈয়ারী করি'। তখন একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আপনি তো বাংলায় এম. এ. পরীক্ষার জন্য আমায় বহুদিন ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, আপনি ভাবিয়াছিলেন, আমি একেবারে উদাসীন! তাহা নহে, দীনেশবাবু, তোড়জোড় নাই কি লইয়া কাজ করিব, শেষে একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়া বেকুব বনিব? এই কয় বৎসর ধরিয়া আমি আপনাকে দিয়া 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' সংকলন করাইয়াছি, ইংরাজীতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস

লিখাইয়াছি, বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রাম্য কথা-সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি কত বই লিখাইয়াছি, 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোসিপে'র সৃষ্টি করিয়াছি, দাশগুপ্ত, বিজয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকগণের দ্বারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বই তৈয়ারী করাইয়াছি—কোন একটা উদ্দেশ্য ছাড়া এই সকল করিয়াছি কি? এম. এ. পরীক্ষা হইবে, কি পড়াইব? তাহার তো একটা ব্যবস্থা আগে করিয়া ফেলিয়া তবে তো কাজে হাত দিব! আপনারা চেঁচামেচি করিয়াছেন, ততক্ষণ আমি জমি তৈয়ারী করিয়া লইয়াছি।' তখন বুঝিলাম আমরা জগন্নাথের রথের চাকা, শুধু ঘুরিয়া গিয়াছি মাত্র, যাঁহার মতলবে ঘুরিতেছি, তাহা নিজেরাই জানিতে পারি নাই। এই জন্যই বঙ্গেশ্বর কারমাইকেল সাহেব সত্যই বলিয়াছিলেন, 'কোন এক বিরাট বিষয়ে কল্পনা করিবার শক্তি যেরূপ স্যর আশুতোষের আছে, তেমনই সেই কল্পনা কার্যে পরিণত করিবার যোগ্য কর্মশক্তিও ইঁহার আছে'। এই দুই গুণের সমন্বয় সংসারে বড় দুর্লভ।

সমুদ্রের মত প্রকাণ্ড আশ্রয় পাইলে যেরূপ যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী তাহার দিকে আপনা-আপনি ছুটিয়া আসে, ধূর্জটি তাঁহার জটা খুলিয়া গঙ্গাধারাকেও ছাড়িয়া দেন—সেই আশ্রয়ের ভরসায়; সেইরূপ পালিত, ঘোষ ও খয়ড়া প্রভৃতি নানাদিক হইতে এই কর্মবীরের আশ্রয়ে মুক্তস্রোতে অজস্র দান আসিয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাহা ছুটিয়া আসে নাই, তাহাদের লক্ষ্য আশুতোষ। এমন কি, ইঁহারই দরুণ শিবজটা হইতেও কুটিল মিণ্টো প্রভৃতি লাটের কোষাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কয়েকটি ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া পোঁছিয়াছে।

আশুবাবুর একাধিপত্যে কেহ কেহ বিরক্ত; এই একাধিপত্য জাতীয় গৌরবজনক। ব্যক্তিগতভাবে আশুবাবুর একটি ভিন্ন ভোট নাই; এই আধিপত্য গায়ের জোরে নহে, 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'—বিষ্ণুশর্মার সময় কিংবা তাঁহারও পূর্ব হইতে অনাদি-কাল হইতে এই বল স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে; ইহা পশুরাজের আধিপত্য নহে, ইহা নররাজের আধিপত্য, ইহা পৈতৃক দাবী কিংবা তোপ-কামানের দ্বারা সমর্থিত বাহ্যবল নহে—ইহা ভগবৎ-দত্ত তিলক-লিপির জোরে দাঁড়ায়। ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ান, গ্লাডষ্টোন, লয়েড জর্জ ইঁহারা সাম্যবাদীদের মধ্যে সিংহাসন পাইয়াছেন—আশু-বাবুর সেই সিংহাসন। ইঁহার মত কর্মবীর আমি দেখি নাই। সাম্যতন্ত্রবাদীদের ইহাতে আপশোষের কোন কারণ নাই। স্যর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রান্ত বিষয়গুলি এত জানেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি এত তীক্ষ্ম, তিনি এরূপ সর্বতো-ভাবে উচ্চশিক্ষার হিতকামী, এরূপ ত্যাগপরায়ণ ও নিঃস্বার্থ যে অপর কোন বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি ইঁহার সমকক্ষ নহে। ইঁহাকে বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নায়কত্ব কি আমাদের কল্যাণকর হইবে? শুনিলাম হাই-কোর্টে আশুবাবু আর দুইজন সহকারী-জজ লইয়া একবার এজলাসে বসিয়াছিলেন। তিন জনে ৮০৩ খানি রায় এক বৎসরে লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৮০০ খানি লিখিয়াছিলেন আশুবাবু, আর দুই জনে লিখিয়াছিলেন তিনখানি। অবশ্য অনেকেই জানেন যে আশুবাবুর রায়গুলি প্রায়ই খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং সুদীর্ঘ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এরূপ কেন হইল'? তাঁহার এক বন্ধু উত্তরে বলিলেন, 'সেরূপ পৃথিবীতে সর্বদা হয়ে থাকে, কেউ সংসারে সর্বদা শ্রম করে, কেউ বিশ্রাম করে'।

হাইকোর্টে আশুবাবুর কর্মঠতা অপরিসীম, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেরূপ কাজ করেন, তাহা ৩।৪ জন সাহেব একত্র হইয়া পারিবেন কিনা সন্দেহ। প্রতি মাসে বহুসংখ্যক সভা—সিনেট, সিণ্ডিকেট, ফ্যাকালটি-বোর্ড, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট-সমিতি তো আছেই ; তাহা ছাড়া প্রশ্ন করা, পরীক্ষা করা, প্রভৃতি শত শত কাজ। প্রত্যেক সভার তিনি কাণ্ডারী, সর্বেসর্বা, অপরেরা চালচিত্র,—কবি কেন লঙ্কাধিপের যে দশমুখ কুড়িহস্ত কল্পনা করিয়াছিলেন, ইঁহার বিরাট কার্যশীলতা দেখিলে কতকটা অনুমান করা যায়। এইজন্য বলিয়াছি এরূপ কর্মবীর আমি দেখি নাই। তিনি বেঞ্চ হইতে বারে নামিলে মাসে ৫০,০০০ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তিনি তাঁহার এই বহুমূল্য শ্রম বিশ্ববিদ্যালয়কে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিতেছেনে, এরূপ ত্যাগীই বা কে? যখন এত করিয়াও কেবল প্রতিকূলতা, বিদ্রোহ, আক্রমণ ও মিথ্যা অভিযোগ সহিতে হইয়াছে, শাসনের তুঙ্গশৃঙ্গ সিমলাশৈল হইতে যখন এত করিয়াও নির্যাতন, চোখরাঙ্গানি সহ্য করিয়াছেন, অন্য হইলে তো তখন ধিক্কার দিয়া কাজ-কর্ম গুটাইয়া ফেলিত, এই 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার' ব্যাপার হইতে ঘৃণায় সরিয়া বসিত। কিন্তু আশু সে শর্মাই নহেন। এমতাবস্থায়ও তাঁহার নিকট যাইয়া শুনিয়াছি, 'কোন ভয় নাই, আমরা তো খাটিব, এই সর্তে আসিয়াছি, ফল যাহা হইবে হোক না, দমিবার কারণ নাই, শেষ পর্যন্ত খাটিয়া মরিব'। তখন মনে হইয়াছে গীতার 'কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' শ্লোকটি বিরাট গুম্ফ ও তেজো-দৃপ্ত বপু লইয়া যেন আমার চক্ষের সম্মুখে মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কয়েক মাস হইল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় লালগোলার রাজার নিমন্ত্রণে তথাকার স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণকে যে সাত্ত্বিক মহিমামণ্ডিত মূর্তিতে দেখিলাম, তাহাতে প্রাচীন হিন্দুরাজার আদর্শটি চক্ষে পড়িল। লালগোলা ষ্টেশনে ভোর পাঁচটায় পোঁছিয়া দেখি, গেরুয়া রংয়ের একটি সামান্যরকমের বৈরাগীর আলখাল্লা পরিয়া নগ্নপদে রাজাবাহাদুর আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তখন তিনি চাতুর্মাস্য করিতেছিলেন, অর্থাৎ সন্ধ্যায় একবার সামান্য আহার করিতেন, সারাদিন কিছু খাইতেন না ; নিরামিষ খাওয়া, কিন্তু তাহার মধ্যে আম, কমলালেবু প্রভৃতি সমস্ত সুখাদ্য ফল ভগবানকে বহু বৎসর ধরিয়া নিবেদন করিয়া বসিয়া আছেন। সুতরাং অতি কঠোর জীবনই যাপন করেন,—"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে" মহাপ্রভুর এই উপদেশ যেন মূর্তি ধরিয়া আমাকে দেখা দিল। কিন্তু নিজের প্রতি যিনি এইরূপ কঠোর বিধান করিয়াছেন, অপরের সম্বন্ধে তাঁহার মুক্তহস্তে ভোজনের ব্যবস্থা। তথাকার দরিদ্র ও অতিথিমাত্রই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। লালগোলাধিপের মুক্তহস্ত দানের কথা বাংলাদেশে সকলেই জানেন। সাহিত্য-পরিষদে বোধহয় ইনি ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন। শত শত গ্রন্থকারকে ইনি আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছেন। তাঁহার এই অজস্র দান হইতে বর্তমান লেখকও বঞ্চিত হন নাই। আমার 'বেহুলা', 'গৃহশ্রী' ও 'ওপারের আলো', এই তিনখানি বহির প্রথম সংস্করণের ছাপার সমস্ত খরচ ইনি বহন করিয়াছিলেন। সেদিন বহরমপুর হাসপাতালের জন্য লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

কিন্তু যাঁহার টাকা থাকে, তিনিই দান করিতে পারেন, অনেক সময় তাহা

প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় হয়। কিন্তু রাজাবাহাদুরকে তথায় যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না। তিনি শতাধিক কুড়ানো ছেলেকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে শুরু করিয়া মুসলমান ও মুচি প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর অনাথ বালক আছে। ইহাদিগকে তিনি ভাল ধুতি শাড়ী, নানারূপ ছিটের কাপড়, সতরঞ্চী, সুজনী, কারপেট প্রভৃতি বুনাইতে শিখাইয়াছেন; ইহারা হাতীর দাঁতের উপর কাজ করিতে শিখিতেছে। এই উদ্দেশ্যে মুজাপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি কারিগর আনাইয়া ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজাবাহাদুরের একটি প্রেস আছে, এই সকল অনাথ বালকই তথায় কম্পোজিটারের কাজ শিখিতেছে, তাঁহার হাইস্কুলে ইহারা পড়িতে পায়। সুতরাং প্রতিটি ছেলের যথেষ্ট গুণপনা আছে। এই কুড়ানো ছেলেদের তিনি এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন যে, কলিকাতা শহরে আসিলে ইহাদিগের জীবিকা অর্জনের বিলক্ষণ সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু রাজা-বাহাদুর ইহাদিগকে সমস্ত কাজ শিখাইয়াও অভিমানী হইতে দেন নাই। কোন ব্যক্তি লালগোলা হইতে অন্যত্র গেলে এই সকল ছেলেরা মোট বহিয়া ষ্টেশনে লইয়া যায়। সন্ধ্যাকালে দেখিলাম, রাজাবাহাদুর এই ছেলেগুলি লইয়া মজলিস বসাইয়া দিলেন। তিনি ইহাদের অনেককে উৎকৃষ্টরূপ গান বাজনা শিখাইয়াছেন, ইহাদের কেহ কেহ নর্তকী সাজিয়া সুন্দররূপ নাচিতে ও গাহিতে লাগিল। রাজাবাহাদুর নিজের অবজ্ঞাত অনাথ প্রজাদের লইয়া এইভাবে একদিকে কর্মক্ষেত্র, অপরদিকে উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যদিও নিজে সংযমী ও কঠোররূপে ব্রাহ্মণ্যব্রত পালন করেন, তথাপি তিনি নিম্নতম শ্রেণীর হিন্দু কি অহিন্দু প্রভৃতি জাতিকে আদৌ ঘৃণা করেন না। এই উপবাসশীল ব্রতনিরত ব্রাহ্মণকে আমি সর্বনিম্নশ্রেণীর ছেলেদিগের গায়ে হাত দিয়া আদর করিতে দেখিলাম। ছোটখাট শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে তিনি এই কুড়ানো ছেলেদের মধ্য হইতে বাছিয়া ব্রাহ্মণ-বালকদিগকে খাওয়াইয়া পদ্ধতিটি রক্ষা করেন। ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত আমরা ছিলাম, এই সময়টা রাজাবাহাদুর উপবাসী ছিলেন। বয়স ৭২, আনন্দময়, একবারও বসিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তাঁহার শিল্পবিদ্যালয় শ্রীরামপুর বিদ্যালয় হইতে নানা গুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহার ঘোষণা নাই; ইনি একান্ত আড়ম্বরহীন ও সর্বদা দেশের কল্যাণ লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার হাই স্কুলের বোর্ডিংয়ে ছাত্রদের মাত্র ৫ টাকা দিতে হয়, প্রতিটি ছাত্রের জন্য আরও ঢের লাগে—তাহা রাজসংসার হইতে দেওয়া হয়। বস্তুত লালগোলায় 'রাজা' দেখিলাম না, রাজর্ষি দেখিয়া চোখ ভুলিয়া গেল।

পুস্তক বড় হইয়া গেল, আমার শত শত বন্ধুবান্ধবের অনেকের কথাই লিখিতে পারিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বন্ধু—কাহাকে ছাড়িয়া কাহার কথা লিখিব! কৃষ্ণ-কীর্তনের সম্পাদক বসন্তরঞ্জনের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে, তাঁহার শুভ্র দাড়ির চুল-গুলি যেরূপ কুটিল, মনটি তদনুপাতে সরল। যদিও প্রাচীন পুঁথির চর্চা করেন, নবীন জগতের সঙ্গেও বিলক্ষণ যোগ রাখিয়াছেন। বহু বৎসর হইল স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু এখনও সেই শোকে রাত্রে ঘুম হয় না, স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলিলেই চক্ষের কোণে অশ্রু দেখা দেয়। বসন্তবাবুর মত অমায়িক বন্ধু বিরল, দরকার হইলে বন্ধুর উপকারার্থ শারীরিক ও মানসিক নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে ইনি প্রস্তুত;

নিরামিষভোজী কিন্তু মাছের ভাল ব্যঞ্জন হইলে সেইদিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়াছি। স্ত্রীর শোকেই নিরামিষ খান, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে বোধহয় তাঁহার চুড়ির নিক্কণ-সংযোগে মৎস্যের রন্ধন ইনি অবহেলা করিতে পারিতেন না, হস্তের সেই মধুর শব্দ সহকারে পরিবেশন হইলে এখনও খাইয়া তৃপ্ত হইতেন। পুরুষ হইয়াও তাঁহার এই বৈধব্যযোগ ললাটলিপি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে হারাইয়া প্রকৃতই দুঃখিত হইয়াছি। এরূপ সরল, উদার, মধুরপ্রকৃতি, পণ্ডিতশিরোমণি দুর্লভ। ভাণ্ডারকর তাঁহার সুরঞ্জিত পাগড়ী লইয়া মধুর হাস্যে ও নানারূপ শ্লেষোক্তির আপ্যায়ন দ্বারা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জায়গাটা দখল করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তুলনা নাই, ইনি পণ্ডিতোচিত সাজসজ্জার খড়কুটার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নি; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিয়া ইঁহাকে উপেক্ষা করা চলে না। ইঁহাকে রাগাইলে ইঁহার পণ্ডিতী মুক্ত-কচ্ছ মল্লবেশে পরিণত হয় এবং খাগের কলম শাণিত তরবারির আকার ধারণ করে, এত বড় জেদী লোক বিলাতফেরতদের মধ্যেও দুর্লভ। কিন্তু যাঁহারা ইঁহার বন্ধুত্বের অভিমানী, তাঁহারা জানেন, ইঁহার প্রাণটি ভীমনাগের সন্দেশের মত মিষ্ট। আমাদের প্রিয় শ্যামাপ্রসাদের বুকটা যেমন চওড়া, প্রাণটাও তেমনি গড়ের মাঠের মত খোলা। এখন যাঁহারা সিণ্ডিকেট ও সিনেটের তরুণ সদস্য, তাঁহাদের মধ্যে মন্মথ রায় ও প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুদ্বয় নানা গুণে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। প্রথমটি তাঁহার সদাশয়তায় ও দ্বিতীয়টি তাঁহার জ্বলন্ত প্রতিভায়। আর একজনের নাম স্বতঃই এই সঙ্গে মনে হয়, কিন্তু শুনিলাম সিঁড়ি হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া তাঁহার মাথায় আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাঁহার স্মৃতি-ভ্রংশ হইয়াছে। রেজিষ্ট্রার মিঃ জ্ঞান ঘোষ এবং কণ্ট্রোলার রায় বাহাদুর অবিনাশ চন্দ্র—কে বেশি ভালো মানুষ, আড়াআড়ি করিয়া তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কাহার সৌজন্য বেশী তাহা এখনও সুধীমণ্ডলী মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অতি নম্র, বিনয়ী ও সাধু চরিত্রের লোক, কিন্তু ইঁহার ভিতরে যে অনন্যসাধারণ কর্মঠতা ও সংকল্পের দৃঢ়তা আছে, তাহা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার প্রকাশের চেষ্টায় বুঝিয়াছি। ইনি যে বিষয়ে হাত দিবেন, তাহা গড়িয়া তুলিবেন—এটি আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, সংকল্পের পিছনে পিছনে ইঁহার অনাড়ম্বর অথচ অক্লান্ত অধ্যবসায় আছে. অল্পভাষী—কিন্তু যেটুকু বলেন, তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য বিরাট প্রযত্ন। মৎস্য ধরিবার চেষ্টায় নিরত, বড়বাজারের দোকান-দর্শী, অঙ্কশাস্ত্রের মহাপণ্ডিত শীর্ণকায়, মহা-চতুর, মহাপ্রাজ্ঞ সতীশবাবুকে নমস্কার জানাইতেছি। যাঁহারা বাংলায় এম. এ. পাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বপতি চৌধুরী সাহিত্যজগতের উদীয়মান প্রতিভা। গানে, চিত্রাঙ্কণে, সমালোচনায়, কবিতা রচনায় ও গল্প লেখায় ইঁহার যে শক্তির পরিচয় পাইতেছি, তাহা হরিদ্বারের গঙ্গার ন্যায় সূক্ষ্মস্রোতা হইলেও শুভযোগ-সমন্বয়ে কালে কল্লোলিনী স্রোতস্বতীতে পরিণত হইতে পারে, আশা করি আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে।

আর জায়গায় কুলাইল না, তথাপি নবীন বয়সে প্রবীণ বুদ্ধিসম্পন্ন, গম্ভীর-প্রকৃতি, অনড় কর্মব্রতী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মুক্তহস্ত বদান্যবর দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, স্নিগ্ধ অমায়িক ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত এবং প্রাতঃশেফালিকাশায়ী শিশিরকণার মত নম্রতা

ও সৌজন্যের প্রতিমূর্তি শিশিরকুমার মিত্র—বাংলা সাহিত্যের প্রকাশকগণের উদ্দেশ্যে প্রীতিনমস্কার জানাইয়া, পুস্তকখানি সাঙ্গ করিতেছি। আর একজনের কথা মনে পড়িতেছে, মুখের কথায় তুবড়ীর আগুন, লেখনীর সম্পদে অসামান্য, বাগ্দেবীর প্রসাদে কল্পতরুসম ; রহস্যের তিক্ত-মধুর আমলকী, গুণগ্রাহিতার লেংড়া আম,— সামাজিক তত্ত্ব-বিদ্রূপের কণ্টকাবৃত বেল, কোন্ ফল তোমার কাছে না পাওয়া যায়? প্রাচীন ধর্ম ও আচারপদ্ধতির তুমি ঘুণ, কিন্তু হইলে কি হইবে? কি অভাবে, পাঁচকড়ি, তোমার ক্ষুরধার প্রতিভা ভোঁতা হইয়া গেল? আমাদের উক্তিতে যদি রাগ কর—তবে বুঝিব তুমি আর শোধরাইবে না—একেবারে hopeless। তোমার প্রতিভাসুন্দরীকে নানা সাজে সাজাইয়া ভগবান কেন সেই সুন্দরীর কপাল হইতে সিন্দুরের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা জানি না, সে সৌন্দর্য দেখিলে ভয় হয়। কিন্তু আলাপে-গল্পে-আপ্যায়নে-স্নিগ্ধ ব্যবহারে তোমার ব্যভিচারী প্রতিভাকে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না।

সাহিত্য জগতের এক কোণে মধুর বিনয়ে নিজেকে আবৃত করিয়া যতীন্দ্রনাথ পাল উপন্যাস লিখিয়া যাইতেছেন। তাঁহার লেখনীই বেশী ক্ষিপ্র কি মুদ্রাযন্ত্রই বেশী ক্ষিপ্র—তাহা জানি না। এত লিখিলে যাহা হয়, তাহাই হইতেছে— 'এক পাড়াকুঁদুলী' ছাড়া আর কোন একখানি পুস্তক তেমন উতরাইল না। আরও কত বন্ধু রহিয়া গেলেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না, কিন্তু তাই বলিয়া বর্তমান লেখক তাঁহাদের গুণের আদরে ও বন্ধুত্বের অভিমানে কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে। বন্ধুবর ঐতিহাসিক নিখিলনাথ, যাঁহার চোখ দুটি দেখিলে মনে পড়ে 'একি হরি এ কি দেখি! ঘুমে ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি'। তিনি তাঁহার রচিত অধিকাংশ পুস্তক পুলিশ কমিশনার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়াতে পক্ষচ্ছিন্ন জটায়ুবৎ হইয়া আছেন।

নবদ্বীপের বিদগ্ধজননীসভার মহামহোপাধ্যায়গণ আমাকে 'কবিশেখর' এবং ভারতীয় ধর্মমহামণ্ডল আমাকে 'প্রত্নতত্ত্বভূষণ' উপাধি দিয়াছিলেন। এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে 'ডি. লিট.' এবং গভর্নমেণ্ট 'রায়বাহাদুর' উপাধি দিয়াছেন। কিন্তু এ বৎসরের ভগবৎ-দত্ত সমস্ত সুখ বিষমিশ্রিত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। নানারূপ পারিবারিক বিপদে আমি ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিতেছি। এই সকল বিপদ দিয়া ভগবান এই দুর্বলের বল পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি বল না দিলে আমি কিরূপে নিজেকে রক্ষা করিব?

সম্পূর্ণ

নির্ঘণ্ট

১. ব্যক্তি ২৫৭
২. স্থান ২৬৩
৩. বইপত্র ২৬৫
৪. প্রতিষ্ঠান ২৬৮

১. ব্যক্তি

অ

অনাথবন্ধু মল্লিক ৩৪, ৬৯
অন্নদাচরণ ৬৮
অবনীমোহন দাশ ১৮
অবনীশ ৭০, ৭১
অবনীন্দ্র ২৪০
অবিনাশ ৪৫, ৪৬, ৬০, ৭১, ৭৬
অভয় সেন ১২
অভয়শঙ্কর সেন ৮, ২৭, ৪২
অমৃত বসু ২৩৬
অম্বিকাচরণ সেন ২৮, ৩৩
অম্বিকাবাবু ৭৫, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭
অরুণ ১৯৬, ১৯৮
অক্ষয় বড়াল ২৩৪, ২৪০
অক্ষয়বাবু ২৩৮, ২৪
অ্যান্ডারসন ২৩৪

আ

আজগর মিঞা ৭১
আজাহার ৪৫, ৪৬
আন্ডারউড ৯, ২২৮
আর্নেস্ট রীস ২২৮
আনন্দ পণ্ডিত ৩১, ৩২
আনন্দচন্দ্র রায় (জমিদার) ১০৫, ১০৬
আনন্দ বর্ধন ১০৬
আলিয়েট সাহেব ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১
আলেকজেণ্ডার ২১০
আশু বাঁড়ুজ্জে ২৪১

ই

ইন্দ্রমোহন ৭৭
ই. বি. হ্যাভেল ২২৬
ইভানস্ (ডঃ) ২১৩
ইলিয়ট সাহেব ১০৮
ইয়াসিনউদ্দিন ৯২

ঈ

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৪
ঈশ্বরচন্দ্র সেন ২৩, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

উ

উড্রো ২৯
উমাচরণ গাঙ্গুলী ৪২
উমাচরণ দাশ ৬৩
উমানাথ সেন ৪৭, ১০৪
উমাপ্রসন্ন রায় ৭১, ৭২, ৭৩
উড্রোফ ২২৬

এ

এ. কে. রায় ১১৬
এস্কেন্দার আলি ১০৮
এইচ. বেভারিজ ২২৬
এফ. এস. স্ক্রাইন ২২৬
এইচ. সি. হিল ৯২

ও

ওল্ডেনবার্গ ২২৬

ক

কটন (সিভিলিয়ান) ১১৬
কর্পূরা দিদি ৫, ৫২, ৯৮
করুণা ৭, ১৭
করুণানিধান (কবি) ২৪০
কবিকঙ্কণ ১১৭, ১২৩
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ১২৩
কলিন. সি. গ্যালিল্যান্ড ২১৬
কাদম্বিনী ৩৯, ৫২, ৯৬
কান্তিবাবু ১১৬
কামাখ্যাচরণ বসু ২৮

কামিনী সেন ২৯
কার্ন্ (ডঃ) ২২৬
কারমাইকেল ২৫০
কালিদাস ৬২, ৯১
কালিদাস রায় ২৪০
কালী হালদার ২৩৯
কালীকিঙ্কর রায় ৯
কালীচরণ চক্রবর্তী ৩২
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৪৫, ৬৩, ৮৭, ৯০, ১২৬, ১২৭
কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ৯২
কালীমোহন দাশ ২১, ২২
কালীশঙ্কর সেন ১১৫, ১২৪, ১২৭
কাশী ১
কাশীদাস ৮৪
কাহ্নু খাঁ ৯৪
ক্রাইস্ট ৮৯
কিরণ (খোকা) ২৩৮, ২৩৯
কুমারস্বামী ২২৮
কুমুদবন্ধু বসু ২০৬
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ২৪০
কুমুদিনী বসু ৬০, ৬৯, ৭০
কুশলী ১
কৃত্তিবাস ১৯৯
কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণদা) ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১
কৃষ্ণ গোবিন্দ দে ৩১
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ২৭
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ৮৮
কৃষ্ণানন্দ স্বামী ৮৭
কেদার বসু ৪৫, ৪৬
কেদারনাথ রায় ২৯
কেশবচন্দ্র সেন ৪৪, ৪৫
কৈলাশবাবু (হেড মাস্টার) ৬৮
কৈলাশবাবু ৭২, ৭৩
কৈলাশচন্দ্র সিংহ ১১৭, ১১৮, ১২২
কোকা সিং ৩৯, ৫২

খ

খগেন মিত্র ১৯৯, ২০০
খাঞ্জা খাঁ ৩৭

গ

গগনেন্দ্রনাথ ১৯৭, ২৪০
গণি মিঞা ৬৯, ৮৫
গণেন ব্রহ্মচারী ২০৯, ২১০, ২১২
গণেশবাবু ২৩৮, ২৩৯, ২৪১
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৩৫
গিরীশ ২১৬
গিরীশচন্দ্র ৭৭, ৮১, ৯৬
গিরীশ পণ্ডিত ৩৬, ৪৫
গুরলে ২২৯
গুরুচরণ কবিরাজ ৯৭
গোকুলচন্দ্র মুন্সী ২৩, ৩২, ৮৪, ৮৫
গোপাল উড়ে (কৃষ্ণ) ২৩
গোপাল বসু ১১৬
গোল্ডস্মিথ ২৮
গোলাপী ১১৭
গোপীচন্দ্র ১৫
গৌরমণি দেবী ২
গৌরমোহন রায় ৩৫
গ্যানো ৯২, ৯৩
গ্লাডস্টোন ২৫০

চ

চণ্ডীদাস ৪৩, ৬৩, ৭৯ ১১৭-১২৩, ২১৫
চণ্ডীবর ১৩
চন্দ্রকুমার বাবু ১১৬, ১১৯
চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ ১১৭
চন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ৪৭, ৬৪, ৬৫, ১০৪, ১০৫, ১০৬
চন্দ্রমোহন সেন ৭৮, ১২৭
চন্দ্রনাথ বসু ১১৩
চন্দ্রশেখর কালী ২৯, ৩০
চাঁদমিঞা ৫৫
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২, ২৪০
চার্লি ১১৬
চ্যাটারটন ৮০
চৈতন্য ৮২, ১২০, ১২৮

জ

জগদীশবাবু (সেন) ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৪, ৯৬
জগদ্বন্ধু ভদ্র ৬৩, ৬৪
জগন্নাথ বাবু ৩২
জগা গয়লা ৬, ১০
জন ৮৮
জন ওয়েবস্টার ৮০
জনসন ২৮
জলধর সেন, জলধর দা ৯৬, ১৯৯, ২০০, ২৪০, ২৪৪
জয়দেব ১
জাহাঙ্গীর বাদশাহ ২১
জ্ঞান ঘোষ ২৫৩
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ২০, ২১
জুলে ব্লক ২২৬, ২২৯
জুলে লিমেটার ২১৯
জেমস সাহেব ২৩১
জে. ডি. এ্যান্ডারসন (ডঃ) ২১৭, ২১৮, ২২০, ২২৩, ২২৪

ঝ

ঝাড়ু মিঞা ১০৮

ট

টনি ২২৬
টলেমি ১৫
টেইন ৮০, ৯২
টেনিশন ৮০

ড

ডঃ ইভান্স ২১৩
ডগলাস ৮৮
ডাউডেন ৮০
ডান্টে ৮০
ড্রাইডেন ২৮
ডিক্রুজ ১১৭
ডিমস্থেনিস ৭৬
ডেঙ্গু (ভৃত্য) ৭২
ডোনাল্ড ফ্রেজার ২১৭, ২১৮

ত

তরিফুদ্দি ৪৫
তারিণীচরণ রায় ১০

থ

থিয়োডোর পার্কার ২৮

দ

দক্ষিণারঞ্জন দাশগুপ্ত ৩৫
দ্বারকানাথ ১০
দ্বারকা সিংহ ৬৫
দ্বরাকানাথ অধিকারী ২৪
দিগিন্দ্র হাজরা ৭০
দিগম্বরী দেবী ৩৫, ৩৮, ৪০, ৫০, ৬৮, ৭৭, ৯৭, ১০৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯৫, ১৯৬, ২০৪
দিবাকর দাশ ১২
দিলীপ রায় ২৩৫
দীনবন্ধু মজুমদার ৬৯
দীনবন্ধু (কাগজের দোকান) ৮১
দীননাথ সেন ২৯, ৩২, ৩৪, ১০৫, ১০৬
দীননাথ মুনশী ৭১
দীনেশ বসু ৭৫, ৯৫, ৯৬
দীনেশ বাবু ২৪৪
দীপঙ্কর ১৪
দুর্গাকান্ত ৪৫, ৪৬
দুর্গাপ্রসন্ন বাবু ২৩৮, ২৩৯, ২৪১
দেবীচরণ দাশ ৩, ৬, ৯, ২৩
দেবেন্দ্রনাথ সেন ২৩৪
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২৪০, ২৫৩

ধ

ধীমন্ত ১৫
ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২০
ধোয়ী ১

ন

নব রায় ৭২, ৯৬
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ২৮, ২৯
নরহরি সরকার প্রভু ১৩

নবীনচন্দ্র সেন ৭৫
নলিনী ৫৯, ৬০
নগেন দত্ত ১১৬
নগেন্দ্র গুপ্ত ৬৩
নালু গয়লা ৫২
নাটোরের মহারাজা (জগদিন্দ্র) ১৯৯, ২০০
নিউটন ৯০
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ৩৯
নিধুবাবু ২১৫
নীলকণ্ঠ মজুমদার ৮০, ৮১
নীলরতন ৬৩
নীলাম্বর ৮৫
নেপোলিয়ন ২৫০

প

পন্থ ১৩, ১৪
পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত ৯৬, ২৪৪
পরাগল খাঁ ১২৩
পারজিটার ২২৬, ২২৯
প্যারীমোহন বাবু ৪২, ৪৩,
পি. কে. রায় ৯২
পুণ্ডরীক ১
পূর্ণ রাউত ৭০
পূর্ণচন্দ্র রায় ৩৫
পূর্ণচন্দ্র সেন ২৯, ৪২, ৪৬
প্রকাশচন্দ্র সিংহ ১১৬, ১১৭
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ২৩১
'প্রভুপাদ জগদ্বন্ধু' ৬৪
প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৩
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ২৪০
প্রসন্ন গুহ ৪৫, ৪৬, ৫৪
প্রসন্ন গুপ্ত ১১৬
প্রসন্নকুমার সেন ৯৭
প্রসন্ন পণ্ডিত ৯২
প্রিয়নাথ সেন ৩১
প্রিয়ম্বদা দেবী ২০১
প্রেমাঙ্কুর আতর্থি ২৪০

ফ

ফণিভূষণ সেন ৯৯
ফার্গুসন ১৩
ফারকুহার ২২৮
ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার ৮০
ফিলিপ টি. স্মিথ ৪৮
ফুকাই চাকর ১০০
ফুলবালা ২৪৩
ফ্রেণ্ড সাহেব ১৪
ফোর্ড ৮০

ব

বগলাদেবী ৩৫
বঙ্কিমচন্দ্র ২৫, ৭৫
বল্লাল সেন ১৩, ১৪
বরদাচরণ মিত্র ১১৪, ১১৫
বসন্তবালা ৩৫
বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ ২৪০, ২৫২
বাইরন ৭৬, ৮২, ৯২,১৯৮, ২৩৬
বাজ সেন ৪
বার্কলি ৯৫
বামা (দাসী) ৭২
বারনেট হুল্জ ২২৬
বাল্মীকি ৪, ৭, ৮১, ৯১
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১০১
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ২০১, ২৪৭
বিটশন বেল ১১৫
বিদ্যাপতি ৪৩, ৪৪, ৬৩, ৭৯, ১১৭, ১২৩
বিদ্যাসাগর ২৭
বিধু ৯৯, ১০০, ১০২
বিনয় ১৯৫, ২৪৩
বিনোদ ২৪৩
বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ১২৩, ১২৪
বিপিন চক্রবর্তী ৬৮
বিপিন ঠাকুর ৫১
বিবেকানন্দ ২১০
বিশ্বপতি চৌধুরী ২৫৩
বিশ্বম্ভর সাহা ১২, ৪০, ৪১ ৪২
বিষ্ণুদাস ফৌজদার ১৩
বীরচন্দ্র মাণিক্য ১১৭
বীরভদ্র ২১১
বুথ সাহেব ৯২

বেণীমাধব বাবু ১১৪, ১১৫
বেণীমাধব বড়ুয়া ২৪৭
বেভারিজ ২২৯
বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত ৬৯
ব্যোমকেশ মুস্তাফি ১৯৭
ব্রজসুন্দর মিত্র ২৭
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় ৬৮
ব্রজেন্দ্রকুমার দাশ ২৯, ৩৪
ব্রজেন্দ্রমোহন ৩৫, ৬৪
ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত ২৫৩
ব্রাউন ৮৮, ২২৯
ব্রাউনিং ৮০
ব্রুম হার্ড্ট ২২৬

ভ

ভগবান দাশগুপ্ত ১৭, ২৩
ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা ২১০, ২১৪
ভবভূতি ৮০
ভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত ১
ভরত মল্লিক ১
দাশ ৩৫
দাশগুপ্ত ১০
ভাণ্ডারকর ২৫৩
ভিক্টর হিউগো ৮০
ভিন্সেণ্ট স্মিথ ২২৬, ২২৮
ভীম নাগ ২৫৩
ভোলা ৫৮
'ভোলা ময়রা' ২৪

ম

মগ্নময়ী ৩৬
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২০১, ২৪০
মথুর বাবু ১০২, ১০৩
মন্মথ রায় ২৫৩
মহিম চাকর ৬৪, ৬৫
মহেন্দ্র ১৫ ,৭১, ৮৩, ৮৪, ৮৫
মহেন্দ্রলাল রায় ৮৯, ৯২, ৯৩
মনোমোহন দাশ ৩৪
মনোহর পণ্ডিত ২৪১
মাখনবালা ১০৪
মার্টিন ২৯
মারলো ৮০
ম্যাকনিকোল ২২৮
ম্যাগি ১১৬
ম্যাডান ৫৮
মিছির দারোয়ান ৯৭
মিলটন ৭৮, ৮২, ৯১
মিল ৯৫
মিস মার্গারেট নোবেল ২০৬-২১২, ২১৪ (নিবেদিতা)
মুকুন্দ ৬৪
মৃন্ময়ী ৩৯, ৫২, ৯৭
মোহিনী ৬০

য

যতীন বসু ১৯৯, ২০২
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৬৩, ২৩১
যতীন্দ্রনাথ পাল ২৫৪
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২৩২
যাদবানন্দ দাশগুপ্ত ৯৭
যামিনীমোহন দাশ ১৯, ২০

র

রঘুনাথ ২, ২৩
রজনী পণ্ডিত ৭০
রজনীকান্ত গুপ্ত ১১৩
রজনীবাবু ১৯৯
রজনীকান্ত সেন ২৩২
রজার্স ৩০
রণধীর ১৫
রথেনস্টাইন ২২৬, ২২৯
রবিবাবু (রবীন্দ্রনাথ) ৬৩, ৮৮, ১৯৩-১৯৮, ২০১-২০৫, ২২৯, ২৩৬, ২৩৭
রমণী মল্লিক ৬৩
রমানাথ ২
রমানাথ মালাকার ৩০
রমাপ্রসন্ন রায় ৭১
রমাপ্রসাদ ২৫৩

রমেশ দত্ত ১১৪
রসময় লাহা ২৪০
রসিক বসু ৭০
রসিকলাল সেন ১১৫, ১১৬
রঙ্গলাল ২৫
রঞ্জনবিলাসবাবু ২৪১
রাঘব ১
রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ২৫৩
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৩২
রাণী মৃণালিনী ২০১
রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র ২৫৩
রায় উমাকান্ত দাশবাহাদুর ১৪৪
রামকমল দাশ ১৭
রামকুমার দাশ ২৩
রামকুমার বিদ্যারত্ন ১০১
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ২৩৩, ২৩৫
রামগতি ন্যায়রত্ন ৬৩
রামদয়াল মজুমদার ৮০, ৮১, ৯৫, ১০৩
রামদুর্লভ সিংহ ৩৯
রামপ্রসাদ ২১৪, ২১৫
রামমোহন রায় ২৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১১৩
রাসবিহারী ৭০
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১১৭
র‍্যাপসন ২২৬
রিপন ৮৭, ৯০
রেনেল ১৫
রেবতী চক্রবর্তী ১২

ল

লর্ড কারমাইকেল ২২৯
লর্ড হার্ডিঞ্জ ৩১, ২২৯
ললিত ৬৮
লয়েড জর্জ ২৫০
লক্ষ্মণ সেন ১
লক্ষ্মী ১, ১০, ১৭
লক্ষ্মী (পরিচারিকা) ৬, ৩৯
লালগোলা রাজা ২৫১, ২৫১
(যোগীন্দ্রনারায়ণ)
লুক ৮৮
লোতি ২২৫

শ

শতদল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪
শম্ভুনাথ ১০৪
শরৎচন্দ্র ২৩৬
শশাঙ্কমোহন ৮৩
শশীনিয়োগী ৪৫, ৪৬
শঙ্কর ৯৫
শার্লি ৮০
শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ২
শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী ৩১, ৪২
শ্যামাপ্রসাদ ২৫৩
শিবধন বিদ্যার্ণব ১১৮, ১১৯
শিবনাথ শাস্ত্রী ২৮, ৮৭, ৮৮, ২৩২
শিবপ্রসন্ন ৭০
শিলার ৮১, ৯৫
শিশিরকুমার ঘোষ ২৩৬
শিশিরকুমার মিত্র ২৫৪
শ্রীবৎস ১
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৬৩, ২০৩
শ্রীমোহন সেন ৫৮
শ্রীনাথ গুপ্ত ৬০
শ্রীনাথ সেন ৯০
শেক্সপীয়র ৭৮, ৮০, ৮২, ৯২
শেলী ৯২
শৈলেশ ১৯৪, ২০২, ২০৩, ২০৪

স

সতীশ ঘোষ ২৫৩
সতীশ বিদ্যাভূষণ ২৫৩
সতীশ রায় ৬৩
সত্যবাবু ১১৬
সমরেন্দ্র ২৪০
সরলাদেবী ২০১, ২০২
সঞ্জয় ১২৩
স্ট্যাপলটন ২২৯
স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯৬, ১৯৯,
২০৫, ২৩০, ২৪৪, ২৪৬-২৫১
স্যর জগদীশচন্দ্র ২১৪

স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ২২৪, ২২৭, ২২৯
সারদা মিত্র ৬৩
সারদারঞ্জন ৯২
স্মিথ সাহেব ৮৮, ৯০, ৯১
সিলভ্যাঁ লেভি ২২৭, ২২৮
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৮, ২৪০
সুরেশ সমাজপতি ২৩৪
সুরেশচন্দ্র সিংহ ১১৬
সুরেন্দ্রনাথ রায় ২৪২
সেনার্ট ২২৬
স্পেন্সার ৯৫
সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০২

হ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৩
হরিদাস হালদার ২৩৮, ২৩৯
হরিদাসবাবু ২৩২
হরিদাস সেন ৯৯
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ২৪০, ২৫০
হরিমোহন চক্রবর্তী ৩৪
হরিশ্চন্দ্র ১৫
হরিশ্চন্দ্রবাবু
হরি সাহা ৫২
হরিহর ২৪১
হলিন শেড ৮০
হাফেজ ৪৪
হ্যাভেল ২২৮, ২২৯
হিঙ্গু সেন ১
হীরালাল ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮৬, ৮৮
হীরেন্দ্র দত্ত ১৯৭
হ'রে চাকর ২১৭
হেম নিয়োগী ৪৫, ৪৬
হেমচন্দ্র ৭৭, ৮১, ৯৬
হেমচন্দ্র খাস্তগীর ১১৬
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩, ৭৫, ১১৪, ২০৪
হেমলতা ২৩৪
হেমেন্দ্রকুমার রায় ২৪০
হোর্‌ন্‌লি মহাশয় ১২৩

২. স্থান

আ

আমেরিকা ৩৫, ৫৮, ২১০
আলিপুর ২০
আউটশাহী (বিক্রমপুর) ৩১

ই

ইয়োরোপ ৩৫
ইটালী ৩৮
ইসলামপুর ৯৫
ইংল্যাণ্ড ৫৮, ২২৯
ইলিনয় ২২৯

ক

কণারক ৫৬
কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ২০১, ২০১
কলিকাতা ১৯৩, ২০৫, ২০৬, ২১১, ২১৭, ২১৮
কাঁটাপুকুর ২৩২, ২৩৫, ২৩৮
কানাই নদী ১৫, ৫৯, ৬০
কারেবী ২৫০
কারবালা ৮১
কালীঘাট ২১৭
কাশী ৩৮, ৬৮, ১০৪, ২৩৯
ক্রীটদ্বীপ ২১৩
কুমিল্লা ২, ১৯, ৬৩, ৬৪, ১০৪, ১০৮, ১১৩-১১৭, ১২৫, ১৯৩
কৃষ্ণনগর ৩৮, ১১৬

খ

খড়্‌দহ ২১১
খুলনা জেলা ১
খোয়াই (ক্ষেমঙ্করী) ৯৯, ১০০, ১০৩, ২২২

গ

গঙ্গা ২১১
গাজিখালী নদী ২, ১৫, ৫৯
গাজিপুর ৩১
গোদাবরী ২৫০

চ

চট্টগ্রাম ৩৪, ১০৮, ১২৩, ২১৭
চৌরঙ্গী ২০০, ২৪১

জ

জলপাইগুড়ি ২৪৩
জপসা ৩১
জেন্দাবহরের গলি (ঢাকা) ২৩
১৯৩, ২০১

ট

টাকি ২৩১

ঢ

ঢাকা ৬৪-৬৭, ৭০-৭৩, ৭৯, ৮১, ৮৮,
৯১, ৯৮, ১০১, ১২৩, ২১৮

ত

তাঁতিবাজার ৭১, ৭২
তিলভাণ্ডেশ্বর ২৩৯
ত্রিপুরা ৩৪, ৬৮, ৮৫, ১১৭, ১২৩,
১৯৭, ২৪৪
ত্রিবাঙ্কুর ২২৫
তেজপুর ২১৮

দ

দার্জিলিং ২১৪
দাশোড়া ৭৬
দিনাজপুর ২৬
'দিবাকর' ১২

ধ

ধলেশ্বরী ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৬
ধামরাই ১৪, ১৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪,
৩৫, ৩৬, ৬৯

ন

নদীয়া ২১৮
নবদ্বীপ ২৫৪
নান্নার ৫, ১৪, ১৫, ৭৫
নারায়ণগঞ্জ ৬৫
নোয়াখালি ১৯, ৩৪, ১২৩

প

পটুয়াটুলি ৮১, ৯১
পয়োগ্রাম ১
পঞ্জাব ১১৭
পদ্মা ৬০, ৬৭
পাবনা ৩৪
প্যারিস ২১৮
পুরী ৫৬
প্রশান্ত মহাসাগর ২১৯

ফ

ফরিদপুর ৩৪, ৬৪, ১৯৩
ফুলিয়া ১৯৯, ২০০

ব

বগজুরি ৩২, ৩৬, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৭৮,
৮৪, ৯৭
বর্ধমান ১২৩
বরিশাল ৩৪
বল্লভদি গ্রাম ১৩
বংশাই নদী ১৫, ৬০
বাখরগঞ্জ ৫৫
বাগবাজার ২১০, ২১১, ২১৩
বাজাসন ১৪, ১৫
বানরী পাড়া ৫৫
বাবুর বাজার ৭১
বালিয়াটি ৩২
বালিগঞ্জ ২০১
বাসণ্ডা ১৭
বাঁকিপুর ২৯
বায়রা ৩৫
বিক্রমপুর ১৪
বিলাত ১৯, ২১৩, ২৪৭
বুড়িগঙ্গা ৭২, ৮১

বৃন্দাবন ধাম ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৬৭
বেহালা ৮৮, ২০৬, ২৩৬, ২৩৯-২৪৩
বোলপুর ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০২, ২০৪
বোসপাড়া লেন ২০৬, ২১৫
(নিবেদিতা লেন)
ব্রহ্মপুত্র ২১৮
ব্রুকল্যাণ্ড অ্যাভিনিউ ২২৩

ভ

ভবানীপুর ২০২, ২৪৫
ভাওয়াল ১৫
ভাটপাড়া ১২৩

ম

মত্তগ্রাম ৩৩, ৬৩, ৯৭
মথুরা ২০০
ময়মনসিংহ ১৫, ৩৪, ৬৮, ১২৩
ময়ূরভঞ্জ ২৮
মাণিকগঞ্জ ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৫৪

য

যমুনা ২৫০

র

রঘুনাথপুর ৩৮
রংপুর ২১৭
রাজাবাগান ২৪৪
রুরকি ৬৮
রোয়াইল ৩১
রৌওরা ৫

ল

লণ্ডন ২৫, ২১৮

শ

শাঁখারীবাজার ৯৬
শান্তিনিকেতন ১৯৯, ২০৫
শ্যামপুকুর স্ট্রীট ২৩১
শ্যামপুকুর লেন ২৪৪
শ্যামবাজার ২০১
শিলাইদহ ১৯৩
শ্রীখণ্ড ১৩
শ্রীহট্ট ৩১, ৩৪, ৯৮

স

সন্তোষ ২৩৫
সাভার ১৫, ৪৭, ৯৭
সিলেট ৮৫, ২২২
সুখাবতী ১৩
সুয়াপুর ১, ১২-১৫, ২১, ২২, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৮-৪০, ৪৯, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬৬, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৯৭

হ

হবিগঞ্জ ১০, ৩১, ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৬, ২২২
হেমনগর ৭৬

৩. বইপত্র

অ

অনুসন্ধান ১১৩, ১১৪
অবকাশরঞ্জিনী ৭৫
অমিয় নিমাই চরিত ২৩৬
অমৃতবাজার পত্রিকা ৬৩
অ্যাথিনিয়ম ২২৫

আ

আরব্য উপন্যাস ৬৪
আজীবক শ্রেণী ২৪৭

ই

ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী ২২৬
ইংলিশম্যান ২৮

উ

উবারবেগস্ হিস্ট্রি অব ফিলসফি ৮১

এ

এক পাড়া কুঁদুলি ২৫৪
এডওয়ার্ড ৮০

এপিফেনি ৪৮, ৮৮
এশিয়াটিক কোয়ার্টারলি ২২০
এশিয়াটিক রিভিউ ২৫

ও

ওথেলো ৮০
ওপারের আলো ২৫১
ওয়েবস্টার ১৯৩

ক

কর্ণপুজা ২২৬
কবি কাহিনী ৭৫, ৯৫
কলিকাতা রিভিউ ৯, ১১৪
কানুপরিবাদ ২৪২
কামিনীকুমার পুঁথি ১
কালাচাঁদ চরিত ২৩৬
কাশীদাশী মহাভারত ১২৩
কিং জন ৮২
কিং লিয়ার ৮০
কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ ১০৮, ১১১
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ১২৬
ক্ষণিকা ১৯৩

খ

খেয়া ১৯৫

গ

গ্র্যাণ্ড ফাদারস্ টেলস্ ৭৫
গীতগোবিন্দ ১, ৮০
গীতাঞ্জলি ১৯৫, ২২৯
গৃহশ্রী ২৫১
গোরা ১৯৪, ১৯৫
গৌরপদ তরঙ্গিনী ৬৩
গৌরাঙ্গপ্রভু ১১৮

চ

চন্দ্রনাথ ২৩৬
চন্দ্রপ্রভা ১
চাইল্ড হেরল্ড ৭৬, ৮২
চারুপাঠ ৪২
চিত্রবিচিত্র ২০৩
চৈতন্য চরিতামৃত ৪০
চোখের বালি ১৯৪, ১৯৫

ছ

ছুছুন্দরী বধ কাব্য ৬৩

জ

জন্মভূমি ১১৩, ১৯৩
জন্মান্তরবাদ ১১৪
'জলদ' ৭৫
জড় ভরত ২০৬

ট

টাইমস্ ২২৫, ২২৯, ২৪৭
টিনটার্ন অ্যাবি ১২০

ড

ডন জুয়ান ৭৬, ৮২
ডিউসি র‍্যাণ্ডসা ২২৬
ডেথ অব চার্লস বডউইন ৮

ঢ

ঢাকা প্রকাশ ৯৫, ৯৬

ত

তত্ত্ববোধিনী ৩৪, ৬৩
তিনবন্ধু ২০৩

দ

দাদার কাণ্ড ২০৩
দাসী ১১৩, ১৯৩
দি ওয়াণ্ডারিং জিউ ৮১
দি রবারস্ ৮১

ধ

ধম্মপদ ২৪৬
ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ ২০৬

ন

নবজীবন ৮১, ১১৩
নরোত্তম জীবনী ২৩৬
নিভৃতচিন্তা ৯০
নীলমাণিক ২১৯, ২২০, ২৪২
নৈবেদ্য ১৯৫
নৌকাডুবি ১৯৫

প

পণ্ডিত মশাই ২৩৬
পবনদূত ১
পরাকালি মহাভারত ১২৩
পশুপতি ন্যায়রত্ন ১১২
প্রদীপ ১৯৩, ২০৪
প্রবাসী ১২, ১৪, ১৯৩
প্রভাতচিন্তা ৯০
প্যারাডাইস লস্ট ৭৯, ৯১
পূজার কুসুম ৮১

ফ

ফুল্লরা ২০৬
ফোক লিটারেচার ২৪২
ফোক লিটারেচার অব বেঙ্গল ২২৯

ব

বঙ্গবাণী ২৫৩
বঙ্গদর্শন ৭৫, ১৯৩, ১৯৪, ২০২, ২০৪
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (বক্তৃতা) ২৪৫
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রবন্ধ) ১১৪
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৯৩, ১৯৭, ২০৬, ২২৯, ২৩১, ২৩৩
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ইংরাজি) ২০৬, ২১৪, ২১৭, ২২৫
বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১৯৭, ২০৬, ২৪৯
ব্রহ্ম সঙ্গীত রত্নাবলী ২৭, ২৯
ব্রহ্ম সঙ্গীত সংগ্রহ ২৯
বাইবেল ৮৮, ৮৯, ৯০
বাণী ও কল্যাণী ২৩২
বামাবোধিনী ১৯৩
বান্ধব ৯০
বিন্দুর ছেলে ২৩৬
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৬৪
ব্রিজডজনে অব দি রয়্যাল ইন্স্টিটিউট ফর ট্যাল (ডেনমার্ক) ২২৬
বেদান্তসূত্র ২৩
বেহুলা ২০৬, ২৫১
বৈদ্যকুল পঞ্জিকা ১
বৈষ্ণব পদাবলী ৬৩

ভ

ভাগবত ২০০, ২১২
ভাণ্ডার ২০১
ভারত সুহৃদ ৭৫
ভারতী ৯৭, ১৯৩, ২০১, ২০২

ম

মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য (ইংরাজি) ২১৮
মহানির্বাণতন্ত্র ৫১
মহাভারত ৪০, ৪১
মাদার কালী ২১৪
ম্যাকবেথ ৮
মুক্তাচুরি ২৪২
মুক্তালতাবলী ৭৬
মুগলুব্ধ ১২৩
মেঘনাদবধ ৬৩, ৮৭

র

রঘুবংশ ৯২
রত্নাবলী ৩৪
রাখালের রাজগি ২৪২
রাগরঙ্গ ২৪২
রাজমালা ১১৭
রামমঙ্গল ৫৬
রামায়ণ ৪০, ৪১

রামায়ণী কথা ১৯৭, ২০৬
রামের সুমতি ২৩৬
রাসেলাস ২৮
র‍্যাম্‌ব্লার ২৮
রিভিউ এশিয়াটিক ২২৬

ল

লাইফ অব এম্পারার চার্লস্‌ দি ফিফথ্‌ ২৮

শ

শ্যামলী খোঁজা ২৪২
শিল্পদর্শন ৩২
শ্রীকান্ত ২৩৬
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৫২
শূণ্যপুরাণ ২০৮
শেক্সপীয়রস্‌ মাইণ্ড এ্যাণ্ড আর্ট ৮০

স

সখিনা ৮১
সতী ২০৬, ২১৯
সত্যধর্মোদ্দীপক নাটক ২৪, ২৯
সত্যব্রতের পরীক্ষা ৪৪
সদ্ভাব শতক ২৭
সফলতার সদুপায় ১৯৭
সাহিত্য ১০১, ১২৩, ১৯৩, ২৩৪
স্বামী ২৩৬
সীতার বনবাস (কাব্য) ২৭
সুকথা ২০৬
স্পেক্‌টেটর ২৮, ২২৫
সেলফ্‌ হেলপ্‌ ৩৪

হ

হ্যামলেট ৮০, ৮২
হিমালয় ৯৬, ১১৯

৪. প্রতিষ্ঠান

অ

অক্সফোর্ড ২১৯
অক্সফোর্ড মিশন ৪৯, ৮৮, ৯১

ই

ইম্পিরিয়্যাল সেমিনারী ৬৯

এ

এইচ. এল. সেন এ্যাণ্ড ব্রাদার্স ৫৮
এভরি ম্যানস্‌ লাইব্রেরী ২২৮
এলফিনস্টোন ৫৮
এশিয়াটিক সোসাইটি ১২৩

ক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০৬, ২২৯, ২৩৩, ২৩৮, ২৪৪-২৪৭, ২৪৯-২৫৪
কার্জেন (হল) ১৯৭
কুমিল্লা গভর্নমেণ্ট স্কুল ৬৩
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুল ১০৮
কুমিল্লা শম্ভুনাথ ইনস্টিটিউশন ১০৪
কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ২১৭, ২১৯, ২২৩, ২২৪

গ

গুরুদাস লাইব্রেরী ২৩২
(গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স)

জ

জগন্নাথ কলেজ (ঢাকা) ৩৪
জগন্নাথ স্কুল ৬৯, ৮৭
জুয়োলজিক্যাল গার্ডেন ২৩৩

ঢ

ঢাকা কলেজ ৭৮, ৮০, ৮১
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ৬৪, ৬৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২২৯

থ

থ্যাকারস্পিঙ্ক ১০২

দ

দিনাজপুর এণ্ট্রান্স স্কুল ৭৯

ন

ন্যাশন্যাল কলেজ ৬৯
নিউহ্যাম কলেজ ২২০
কাণ্ড ২১০, ২১৩

প

পীস অ্যাসোসিয়েশন ১১৩, ১১৪
প্রেসিডেন্সি কলেজ ২৩১, ২৪৩

ফ

ফরিদপুর জেলা স্কুল ৬৪

ব

বহরমপুর হাসপাতাল ২৫১
ব্রাহ্ম সমাজ ২৪, ২৮, ১০১, ২৩২
বেহালা মহাকালী পাঠশালা ২০০
বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল ২৪২

ভ

ভাওয়াল এস্টেট ১২৭
ভিক্টোরিয়া ইন্সিটিটিউশন ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮

ম

মজুমদার লাইব্রেরী ২০২
মহতাশ্রম
মহাকালী পাঠশালা ২৩৮
মাণিকগঞ্জ মাইনর স্কুল ৪২, ৪৫-৪৭, ৭৯
মিনার্ভা (হল) ১৯৭
মেট্রোপলিটান ৯২

র

রমেশভবন ২২৯
রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ২২৬
রয়্যাল বায়স্কোপ
রামকৃষ্ণ মঠ ২১২
রামমোহন রায় হল ২০০

ল

লণ্ডন-ল্যাঙ্কাশায়ার ২১৬
(বীমা কোম্পানী)

শ

শম্ভুনাথ স্কুল ১০৬
শ্যামসুন্দর মন্দির
শ্রীরামপুর (শিল্প) বিদ্যালয় ২৫২

স

সঙ্গত সভা ১০১
সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপ্যালিটি ২৪২
সাহিত্য পরিষৎ (বঙ্গীয়) ৬৩, ২৩১, ২৫১
সিটি অব গ্লাসগো ২১৬

হ

হবিগঞ্জ স্কুল ৯৯